وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

তাহসীনুল হাদীস
ফী উলূমিল হাদীস

সংকলনে

শাইখুল হাদীস হুসাইন আহমদ হবিগঞ্জী

শাইখুল হাদীস

জামেয়া হেমায়াতুল ইসলাম গড়গাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার।

সাবেক প্রিন্সিপাল

জামেয়া রাহমানিয়া টাটাপাড়া, মাধবদী, নরসিংদী, ঢাকা।

তাহসীনুল হাদীস ফী উলূমিল হাদীস

সংকলনে:	শাইখুল হাদীস হুসাইন আহমদ হবিগঞ্জী
সম্পাদনায়:	মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
স্বত্ব:	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ:	শাওয়াল ১৪৪৭ হিজরী মার্চ ২০২৬ খৃস্টাব্দ
প্রচ্ছদ:	মোহনা এন্টারপ্রাইজ (রাজনগর, মৌলভীবাজার)
বর্ণবিন্যাস:	হাস্‌সান কম্পিউটার
মুদ্রিতমূল্য:	১২৫০৳

প্রাপ্তিস্থান

☞ **মাকতাবাতুল ফারেস**
৪৮ বাংলাবাজার, ঢাকা

☞ **আলবারাকা তিজারাহ এন্ড লাইব্রেরি**
আল আকসা শপিং সেন্টার, ঢাকা সিলেট রোড, কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার।

☞ **কাশেমিয়া লাইব্রেরি**,
মাদ্রাসা মার্কেট, মডেল থানার সামনে, বাহুবল

☞ **মদীনা লাইব্রেরি**
হামিদ নগর, বাহুবল

☞ **মাকতাবাতুল মা'আরিফ**,
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট (নীচতলা) সিলেট

☞ **দারুল কুরআন**
হিলাতলা, খুলনা

☞ **মদিনা লাইব্রেরী**
বিশ্বরোড মোড়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
মোবাইল: ০১৯২২ ২৪৫৮২৮

☞ **আন-নূর লাইব্রেরি ও সাহাবা কুতুবখানা** ময়মনসিংহ,
মোবাইল: ০১১৭৩৪৪৫১৮৫৫

☞ **আহমদিয়া লাইব্রেরি**
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম,
মোবাইল: ০১৬২৯১৬৩২৪৮

☞ **নিউ রাহমানিয়া লাইব্রেরি**
সাত মসজিদ সুপার মার্কেট মুহাম্মদপুর, ঢাকা

☞ **মাকতুবাতুদ দাওয়াহ**
রোড-১১/এ উত্তরা-১১, ঢাকা

☞ **শাহজাদা লাইব্রেরী** জামিয়া মার্কেট স্টেশন রোড কিশোরগঞ্জ
০১৭১১ ০৭২৩০২

☞ **পশ্চিম শাওড়া নূরানীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা**
মোল্লাবাড়ি গৌরনদী বরিশাল
মোবাইল: ০১৮২৭১৫৫৬৩৭

এ কিতাবের বৈশিষ্ট্যাবলী

১. হাদীসের মান (সহীহ-হাসান-যঈফ) নির্ণয়ের সূত্র ও হাদিস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রথম সোপান।

২. شرح نخبة الفكر এ বর্ণিত ৭৫ প্রকার হাদীসের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, প্রাকার, শর্ত, হুকুম, পার্থক্যও উদাহরণ নতুন বিন্যাসে বিন্যস্ত।

৩. উলুমে হাদীসের বুনিয়াদী সংকলন "مقدمة الدهلوى" ও এর সরল অনুবাদ গ্রন্থের শেষে সংযোজিত।

৪. 'হাদীস অস্বীকারের বিভ্রান্তি' নামক প্রবন্ধে তাদের প্রতারণা-ষষ্টদের জবাবসহ আমাদের عقل ও نقل প্রমাণাদি উপস্থাপিত।

৫. 'আদালতে সাহাবা' নামক প্রবন্ধে ১০টি আয়াত, ১০টি হাদীস, ১০টি ইজমার উদ্ধৃতি, ও ১০টি যুক্তির মাধ্যমে ও 'তাকলীদে আইম্মা' নামক একাধিক নিবন্ধে সমকালীন বিভ্রান্তির দাঁত ভাঙ্গা জবাব।

৬. তাকমীল ফিল হাদীস ও ফযীলত জামাতের সকল হাদীসের কিতাবের বৈশিষ্ট্যাবলী, সংকলনের কারণ, কপি সংখ্যার বিবরণ।

৭. তাকমীল ফিল হাদীস ও ফযীলত জামাতের সকল হাদীসের কিতাবের সংকলক, সাহাবী, তাবেঈসহ শতাধিক রাউইর জীবনী।

৮. তাকমীল ফিল হাদীসের "علوم الحديث" ও ফযীলতের "شرح نخبة الفكر" সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে লিখিত।

৯. ইলমে হাদীসের প্রকার চতুষ্টয়ের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য।

১০. হাদীসের ৩২ প্রকার কিতাব পরিচিতি, হাদীসের কিতাব ও রাউইদের স্তর ও যরাহ-তা'দীলসহ উলূমে হাদীসের সামগ্রিক বিষয়াদি সবিস্তারে উপস্থাপিত হয়েছে।

উৎসর্গ

জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চাসনে
মরহুম আব্বাজানের মর্যাদা বুলন্দী
কামনায়- যিনি অন্তিম শয্যায় শায়িতাবস্থায়ও
ভাইজানদের প্রতি কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন
'আসো
আমার হাতে হাত রাখো
অঙ্গিকার করে বলো
জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও ছোট ভাইটাকে
আলেম হিসেবে গড়ে তুলব' ।

শায়খুল আরব ওয়াল আজম, আওলাদে রাসূল, সায়্যিদ হুসাইন আহমদ
মাদানী রহ.এর অন্যতম খলীফা, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া
বাংলাদেশ-এর সাবেক সভাপতি, জামেয়া আহলিয়া
মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী চট্টগ্রাম
এর সাবেক মহাপরিচালক

আল্লামা আহমদ শফী রহ. এর

বাণী ও দু'আ

জামেয়া হেমায়াতুল ইসলাম গড়গাঁও টাইটেল মাদ্রাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, মাওলানা হোসাইন আহমদ কর্তৃক লিখিত **'তাহসীনুল হাদীস'** কিতাবখানা পড়ে আমি খুবই আনন্দবোধ করেছি। আমি মনে করি এটা যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাভাষী হাদীসের ছাত্র-শিক্ষক, বিশেষ করে বেফাকের অধীনে পরীক্ষার্থীদের জন্য উত্তম সহায়ক হবে। উলূমে হাদীসের প্রায় সামগ্রিক বিষয়াদি এতে স্থান পেয়েছে। আল্লাহ তাঁর মেহনতকে কবূল করুন। তার লেখা-লেখির গতি আরো বাড়িয়ে দিন । আমীন ।

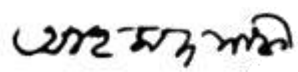

আহমদ শফী
১২.০১.১২

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ,বহুগ্রন্থ প্রণেতা, বেফাকুল
মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর সাবেক মহাসচিব,

হযরত মাওলান আব্দুল জব্বার জাহানাবাদী রহ. এর

বাণী ও দু'আ

প্রতিভাবান আলেমে দ্বীন, জামেয়া গড়গাঁও এর সুদক্ষ মুহাদ্দিস মাওলানা হুসাইন আহমদ কর্তৃক লিখিত **"তাহসীনুল হাদীস"** কিতাবখানা আমি দেখে খুবই আনন্দিত হলাম। হাদীসের ছাত্র/ছাত্রী-শিক্ষকদের/শিক্ষিকাদের জন্য ইহা খুবই উপকরী হবে বলে মনে করি। আমি কিতাবখানার বহুলপ্রচার ও লেখকের কলম আরো শানিত হওয়ার দু'আ করি।
হাদীসের খিদমতের জন্য আল্লাহ পাক তাঁকে কবূল করুন। আমীন ।

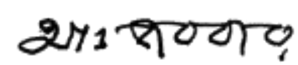

আব্দুল জব্বার জাহানাবাদী
১২.১০.১৩ ঈসায়ী

বিশ্বময় ইলমে মারিফতের ময়দানে সেনাপতির অশ্বে আরোহী, বৃটিশ খেদাও আন্দোলনের দুর্ভেদ্য দুর্গ, দারুল উলুম দেওবন্দের সুযোগ্য স্বার্থক সন্তান, দরসে নেজামীসহ যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটে সংকলিত বহু কিতাবপুস্তক প্রণেতা, জামেয়া মাদানিয়া কাজিরবাজারের স্বনামধন্য ও সুদক্ষ মুহাদ্দিস ও ইফতা বিভাগীয় প্রধান, আমার আবু দাউদ শরীফ **১**ম খন্ড ও সিরাজি-এর উস্তাদ,

হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুর রহমান সাহেব এর অমূল্য

বাণী ও দু'আ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم - أما بعد

গোটা জাহান মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তবে সে সৃষ্টির পাশাপাশি রয়েছে আরেকটি বিষয়। আর তা হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালাম, কথা বা বাণী, যার নাম আল কুরআন। সৃষ্টি হচ্ছে স্রষ্টার বহির্গত বিষয়। তিনি ইচ্ছা করেছেন তাই তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য কোন কিছুই আল্লাহর সত্তা থেকে বের হয়ে আসেনি। বরং সবকিছুই হলো তার ইচ্ছার বাস্তবায়ন। পক্ষান্তরে, আল্লাহর কালাম আল কুরআন সরাসরি আল্লাহর সত্তা থেকে নির্গত। কারণ, বক্তার ভেতর থেকেই তার কথা বেরিয়ে আসে।'কথা আর কাজ' এ দু'বিষয়ের মাঝেই বস্তুত আল্লাহর যাবতীয় কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ। আল কুরআনের ঘোষণা-

ألا له الخلق والأمر

'সৃষ্টি যার নির্দেশ (বিধান) তাঁর।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনই হলো, কথা আর কাজের সমষ্টি। বিশ্ব নবীর কথামালা, কার্যাবলী আর অবস্থার বিবরণই হলো হাদীস। একজন মুমিন যে পরিমাণ কুরআন-হাদীস গ্রহণ করবে সে, সেই পরিমাণ ধন্য বলেই গণ্য হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

تَبْرُک بِالْقُرْاٰنِ فَاِنَّهٗ كَلَامُ اللهِ وَخَرَجَ مِنْهُ

অর্থাৎ তুমি কুরআন দ্বারা বরকত গ্রহণ করো, কারণ এটি হলো আল্লাহর কালাম এবং তার ভেতর থেকে নির্গত।

তাই যারা কুরআন হাদীস নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা কতোইনা ভাগ্যবান। মহান আল্লাহর সত্তা থেকে নির্গত বাণী যাদের অন্তরে প্রবিষ্ট তাদের তুলনা কেবল তারাই। রাসূলের ভেতর হতে বের হওয়া হাদীস যারা নিজ অন্তরে গ্রহণ করেন, অনুধাবন-অনুশীলন করেন এজগতে তাদের জুড়ি নেই।

কুরআন-হাদীস চর্চাকারী সেই ভাগ্যবানদের একজন আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা হুসাইন আহমদ। তাঁর প্রতিভা-মেধার ধারণা পেয়েছিলাম আমরা তাঁর ছাত্র যামানায়-ই। আল্‌হামদু লিল্লাহ বিভিন্ন কিতাব মন্থন করে তিনি ইলমে হাদীস বিষয়ক যে সংকলন তৈরি করেছেন, ইনশাআল্লাহ তা ইলমে দ্বীন পিপাসুদের জন্যে হবে অত্যন্ত উপযোগী, উপকারী। তার এ সংকলনটি দেখেছি। তথ্য, তত্ত্ব কিংবা ভাষাগত ত্রুটি থাকা একেবারেই স্বাভাবিক। কারণ, প্রকাশনার তাড়া থাকায় কাজটি হতে হয়েছে অতিদ্রুত।

আশা করি পরবর্তী সংস্করণ হবে আরো পরিশোধিত, পরিমার্জিত। হাদীস শিক্ষার্থী, শিক্ষক নির্বিশেষে হাদীস চর্চাকারী সকলের জন্যে এ কিতাবখানা হয় যেন উপকারী, জড়িত সকলের চেষ্টা-প্রচেষ্টা হয় যেন মঞ্জুর-মকবূল মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে এ প্রার্থনা। গ্রন্থকার মাওলানা হুসাইন আহমদ দ্বীনি খেদমতে দ্রুতপদে সম্মুখপানে যেন এগিয়ে যান, করি এ কামনা।

মুহাম্মদ শফীকুর রহমান
০৫/০৯/২০১২ইং

উস্তাজুল আসাতিজাহ, বৃহত্তর সিলেটের প্রবীণতম হাদীস বিশারদ,
ওলীয়ে কামেল, জামেয়া গড়গাঁও ও দারুস সুন্নাহ গলমুকাপন মাদ্‌রাসার
স্বনামধন্য শায়খুল হাদীস

আল্লামা আলহাজ্ব হাফেয মাসউদ আহমদ সাহেব এর

বাণী ও দু'আ

আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মেধাবী ছাত্র, জামেয়া গড়গাঁও এর সুদক্ষ মুহাদ্দিস,
মাওলানা হুসাইন আহমদ কর্তৃক লিখিত **'তাহসীনুল হাদীস'** কিতাবখানা
আমি দেখে খুবই আনন্দিত হলাম। হাদীসের ছাত্র-
শিক্ষকদের জন্য ইহা খুবই উপকারী হবে বলে
মনে করি। আল্লাহ তাঁর মেহনতকে কবূল
করুন ও হাদীসের খেদমতে আজীবন
শ্রম দেওয়ার জন্য মঞ্জুর করুন।

مسعود أحمد

١٥-١٠-١٤٣٥ هـ

জামেয়া হেমায়াতুল ইসলাম গড়গাঁও-এর স্বনামধন্য ও সফল প্রিন্সিপ্যালশায়খে বাঘাসহ
অসংখ্য আহলে দিল বুর্জুগানে দ্বীনের দীর্ঘ সুহবত প্রাপ্ত, সানীশায়খে বাঘা
দারুসসুন্নাহ গোলমুকাপন ও জামেয়া হেমায়াতুল ইসলাম গড়গাঁও এর ভূতপূব শায়খুল
হাদীস, বৃহত্তর সিলেটের প্রাচীনতম হাদীস বিশারদ আল্লামা হাফেজ মাসউদ আহমদ
সাহেব কর্তৃক খেলাফত প্রাপ্ত বিশিষ্ট বিচারক ও সমাজ সেবক জনদরদী ওদানবীর

আলহাজ্ব ক্বারী শায়খ মুহাম্মদ শামসুল হক সাহেব-এর

বাণী ও দু'আ

আমার স্নেহভাজন মেধাবী ছাত্র, প্রতিভাবান আলেমে দ্বীন, আমার জামেয়ার অন্যতম অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস মাওলানা হোসাইন আহমদ বাহুবলীর ছাত্র জীবনের সাফল্য আমার নখদর্পণে। 'তানযীমুল মাদারিস' এর অধীনে মিজান জামাআতের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় আমার মাদরাসা থেকে অংশগ্রহণ করে সম্মিলিতি মেধা তালিকায় মুমতাযে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বেফাকের অধীনে মুতাওয়াসসিতায় মুমতাজ ২০তম স্থান, সানাবিয়্যায় মুমতাজ ১৫তম স্থানসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় অনবরত সাফল্যই আজকের এই অবদানের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিল তার ছাত্র যমানায়ই। উলুমে হাদীসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যা ছাড়া শায়খুল হাদীস ও মুহাদ্দীস সাহেবান হাদীসের কিতাব শুরুই করতে পারেন না, হাদীস বেত্তাদের বড় বড় কিতাব মন্থন করে উলুমে হাদীসের যে অনবদ্য সংকলন তিনি তৈরী করেছেন তা দেখে আমার হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে। অবশ্যই এর একটি বিশেষ কারণও আছে, আর তা হলো আমার মাদরাসায় তাকে নিয়োগ দানের পর বলেছিলাম 'মাওলানা তোমার মাঝে প্রতিভা আছে, কিতাব লেখ' আমার এই নির্দেশের সফল বাস্তবায়ন দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি দারুনভাবে। আশা করি তার এ সংকলন ইলমে হাদীস পিপাসুদের তৃষ্ণা কিছুটা হলেও নিবারণ হবে। তার এই শ্রম কবূল হোক। এই যাত্রা অব্যাহত থাকুক। কলম আরও শানিত হোক। তার দ্বারা হাদীসের মসনদ অলংকৃত থাকুক জীবন ভর এই কামনা করি সর্বশ্রেষ্ট বেনিয়ায রবের শাহী দরবারে।

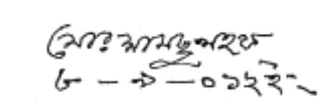

আলহাজ্ব ক্বারী শায়খ মুহাম্মদ শামছুল হক
০৮/০৯/১২ইং

রঈসুল উলামা, উস্তাযুল আসাতিযা, খতীবে যমান, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বংলাদেশ মৌলভীবাজার জেলা শাখা ও তানযীমুল মাদারিসিল আরাবিয়া মৌলভীবাজার-এর মুহতারাম সভাপতি,

শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল বারী (ধরমপুরী হুজুর) এর মূল্যবান

বাণী ও দু'আ

ঐতিহ্যবাহী জামেয়া গড়গাঁও মৌলভীবাজার জেলার প্রাচীনতম দ্বীনি বিদ্যাপীঠ, যেখানে আমিও লেখাপড়া করেছি। সে জামেয়ার তরুণ মুহাদ্দিস মাওলানা হুসাইন আহমদ কতৃক সংকলিত **'তাহসীনূল হাদীস'** কিতাব খানা দেখে খুশি হয়েছি। আমি মনে করি এটা যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাভাষী হাদীসের ছাত্র-শিক্ষক বিশেষ করে বেফাকের অধীনে পরীক্ষার্থীদের জন্য উমদা হাদিয়া হবে। উলূমে হাদীসের প্রয়োজনীয় বিষয়াদী এতে স্থান পেয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর মেহনতকে কবূল করুন। তাঁর লেখালেখির গতি আরো বাড়িয়ে দিন । আমীন ।

আব্দুল বারী ধরমপুরী
১৪ই রজব ১৪৩১ হি.

ওলীয়ে কামিল, রাহবারে শরীয়ত, শায়খ বর্ণভী রহ. এর সুযোগ্য বড় সাহেবযাদা, জামেয়া লুৎফিয়া আনওয়ারুল উলুম হামিদ নগর বরুণা মাদরাসার স্বনামধন্য মুহতামিম
ও শায়খুল হাদীস আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শায়খ খলীলুর রহমান হামিদী সাহেব শায়খে বরুণীর

দু'আ ও বাণী

জামেয়া হেমায়াতুল ইসলাম গড়গাঁও টাইটেল মাদ্রাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, মাওলানা হোসাইন আহমদ কর্তৃক লিখিত **'তাহসীনুল হাদীস'** কিতাবখানা পড়ে আমি খুবই আনন্দবোধ করেছি। কারণ আমাদের উলামায়ে কেরামকে এ লাইনে খুব একটা বেশি দেখা যায় না। আশা করি কিতাবখানা সকলের জন্য সমান হারে উপকারী হবে। এবং দোআ করি কিতাবখানা যেন সংশ্লিষ্ট সকলের মুক্তির সবব হয়। লেখকের কলমে এরকম আরও বহু খেদমত হয়। দ্বীনের খেদমতের জন্য আল্লাহ তাঁকে কবূল করুন।

হযরত মাওলানা শায়খ খলীলুর রহমান হামিদী
১২.০৪.১৩ ঈসায়ী

ওলী ইবনে ওলী, ওলীয়ে কামিল, ফেদায়ে মিল্লাত, মুরশিদে বরহক, জামেয়া লুৎফিয় আনওয়ারুল উলুম হামিদ নগর বরুণা মাদ্রাসার সুযোগ্য শায়খুল হাদীস, শেখ এম এ জব্বার কওমী মাদরাসা কমপ্লেক্স (শেখ বাড়ী মাদ্রাসা) এর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, আমার মুরশিদ আল্লামা **আলহাজ্ব মুফতি রশিদুর রহমান ফারুক সাহেব (পীর সাহেব বরুণা)**এর

দু'আ ও বাণী

نحمده ونصلي علي رسوله الكريمأما بعد!

আমার স্নেহভাজন মুরীদ, জামেয়া গড়গাঁও এর সুযোগ্য মুহাদ্দিস, মাওলানা হোসাইন আহমদ কর্তৃক লিখিত **'তাহসীনুল হাদীস'** কিতাবখানা কিয়দাংশ আমি দেখে খুশি হইলাম। আশা করি কিতাবখানা মুয়াল্লিমীন মুতায়াল্লিমীন সকলের জন্য ফায়দার সবব হবে। লেখকের কলমে আল্লাহ যেন নূর ও ধার দান করেন। এবং তার এই মেহনতকে সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন এই দু'আ করি।

মুফতি রশীদুর রহমান ফারুক (সাহেব)
১২.০৪.১৩ ঈসায়ী

উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, ক্ষণজন্মাশিক্ষাবিদ, দরসে বুখারী ও দরসে মিশকাত প্রণেতা, জামেয়া মাদানিয়া কাজিরবাজার ও সোবহানী ঘাট সহ একাধিক জামেয়ারস্বনামধন্য সাবেক শায়খুল হাদীস। বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ও তিরমিযী শরীফ প্রথম খন্ড-এর আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ,আল্লামা শায়খ **মুহাম্মদ ইসহাক** রহ.এর

বাণী ও দু'আ

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم أما بعد!

আমার শাগরিদে রশীদ মাওলানা হুসাইন আহমদের মাঝে আমার তিনটি গুণ দেখতে পেতাম ১. স্বল্প বয়সে হাদীসের দারস গ্রহণ। ২. প্রখর মেধা। ৩. প্রচন্ড মেহনত। উলূমে হাদীসে একখানা জামে মানে কিতাব সংকলন ছিল আমার দীর্ঘ দিনের লালিতস্বপ্ন । বেফাকের কাছেও এমন কোন কিতাব না থাকায় প্রতি বছর নমুনা প্রশ্ন ছাপানোর ঝামেলা ভোগ করে আসছিল বোর্ডটি। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার দরুন আর হয়ে উঠছিলনা।

ماشاءالله پدر نہ کرد پسر کرد

মাশা আল্লাহ পেদর নাহ করদ পেছরকরদ (আল্লাহর ইচ্ছায় পিতা না করলেও ছেলে করেছে)। তার সংকলিত তাহসীনুল হাদীস গ্রন্থ খানা আমার এ স্বপ্ন ও বোর্ডের এ শূণ্যতা পূরণ হয়েছে বলে মনে করি। আল্লাহ তার এই মেহনতকে কবূল করে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের উসিলা করে দিন। আমীন।

মুহাম্মদ ইসহাক
০৮.০১.১৩ ঈসায়ী

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, উস্তাযুল আসাতিযা, বাংলার সিংহপুরুষ, বৃহত্তর সিলেটের গৌরব, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, বাতিলের আতংক, নাস্তিক-মুরতাদ বিরোধী আন্দোলনের আপোষহীন সিপাহসালার, বারবার কারা নির্যাতিত মযলুম জননেতা, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর, জামেয়া মাদানিয়া কাজিরবাজার মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, শামায়েলে তিরমিযী শরীফের আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান সাহের এর

বাণী ও দু'আ

نحمده ونصلي علي رسوله الكريمأما بعد!

পবিত্র কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। চিরন্তন হিদায়াতের উৎস। আর প্রিয়নবী সা.-এর মুখ নিঃসৃত হাদীস, কুরআনের বাখ্যা, শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। হাদীসের চর্চায় রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। এসব নীতিমালা এড়িয়ে হাদীস চর্চা করলে বিভ্রান্তি অপরিহার্য। এতদসংক্রান্ত নীতিমালা ও মুলনীতিগুলোই হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় **উসূলে হাদীস** নামে পরিচিত। এ বিষয়ে মাদ্‌রাসার ছাত্র শিক্ষক ও ইলমে হাদীস পিপাসু ভাইদের জন্য আমার স্নেহের ছাত্র মাওলানা হুসাইন আহমদ **'তাহসীনুল হাদীস'** নামক একখানা অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। গ্রন্থটির কিয়দাংশ আমি পড়েছি । আমি মনে করি তা সকলের জন্যে উপকারী হবে। আমি কিতাবটির সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি। আল্লাহ পাক লেখককে উত্তম বদলা দিন।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
০৬.০৯.১২ ঈসায়ী

আল্লামা গহরপুরী রহ. এর সান্নিধ্যও যায়াতপ্রাপ্ত, বিচক্ষণ ও দুরদর্শী ব্যক্তিত্ব প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, জামেয়া হুসাইনিয়া গহরপুর ও জামেয়া রহমানিয়া মৌলভীবাজার এর সুযোগ্য শায়খুল হাদীস, বাতিলের বিরুদ্ধে অকুতোভয় লড়াকু সৈনিক, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর, বুখারীশরীফ দ্বিতীয় খন্ড এর আমার মহামান্য উস্তাদ, জননেতা **আলহাজ্ব মাওলানা নেজাম উদ্দিন সাহেব রহ**.এর অমূল্য

বাণী ও দু'আ

نحمده ونصلي علي رسوله الكريمأما بعد!

আমার অত্যন্ত স্নেহের মেধাবী ছাত্র, জামেয়া হেমায়েতুল ইসলাম গড়গাঁও টাইটেল মাদ্‌রাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস মাওলানা হুসাইন আহমদ কর্তৃক লিখিত **'তাহসীনুল হাদীস'** কিতাবখানা মাঝে মাঝে আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। আমি মনে করি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য বিশেষভাবে ইলমে হাদীসের সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন ছাত্র উস্তাদদের জন্য কিতাবখানা অত্যন্ত মুফীদ হবে। কিতাবখানা সকলের অধ্যয়ন প্রয়োজন মনে করি। আমি কিতাবখানার বহুলপ্রচার ও লেখকের কলম আরো শানিত হওয়ার দু'আ করি। হাদীসের খেদমতের জন্য আল্লাহ তাকে কবূল করুন।

নেজাম উদ্দিন
২১/০৮/২০১২ইং

রঈসুল উলামা, উস্তাযুল আসাতিযা, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস হবিগঞ্জ জেলা শাখা-এর মুহতারাম সভাপতি, জামেয়া মদীনাতুল ডুবাঐ এর সুদীর্ঘ কালের মহাপরিচালক

হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ আকিল পুরী এর মূল্যবান

বাণী ও দু'আ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم – أما بعد

আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা হুসাইন আহমদ কতৃক উলুমুল হাদীসের এক খানা প্রামান্য কিতাব সংকলন করেছেন তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। বেফাকের কাছে এমন কোন কিতাব না থাকায় প্রতি বছর নমুনা প্রশ্ন ছাপানোর ঝামেলা ভোগ করে আসছিল বোর্ড। তার সংকলিত তাহসীনুল হাদীস গ্রন্থখানা বোর্ডের এ শূণ্যতা পূরন হয়েছে বলে মনে করি। আল্লাহ তার এ মেহনত কবূল করে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের উসিলা করে দিন। আমীন।

আব্দুল্লাহ আকিলপুরী
২১/০৮/২০১২ইং

উপমহাদেশের বরেণ্য হাদীস বিশারদ, জামালী তবিয়তের শতাব্দী শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামীল, শায়খুল হাদীস, আল্লামা শরফ উদ্দিন আহমদ, শায়খে ভেড়াখালী রহ. এর সুযোগ্য খলীফা, জামেয়া গড়গাঁও-এর স্বনামধন্য শিক্ষাসচিব ও শায়খুল হাদীস, পীরে কামেল,

আল্লামা মুফতি আলতাফুর রহমান সাহেব শায়খে রাজাপুরী-এর

নসীহত ও দু'আ

আমার স্নেহভাজন ছাত্র জামেয়া গড়গাঁও এর মুহাদ্দিস মাওলানা হুসাইন আহমদ কর্তৃক লিখিত **'তাহসীনুল হাদীস'** কিতাবখানার সূচীপত্র পড়েই আমার অনুমান হয়েছে যে কিতাবখানা অত্যন্ত মূল্যবান। সুযোগে এই কিতাবখানা নিজে পড়ার চেষ্টা করব এবং দু'আ করি আল্লাহ যেন তাকে এরকম আরো কিতাব পুস্তক লিখার তাওফীক দান করেন এবং আজীবন হাদীসের খেদমতের জন্য কবূল করেন । আমীন।

আলতাফুর রহমান
০৭/০৯/২০১২ইং

খতীবে যমান, বৃহত্তর সিলেটের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বাগ্মীপুরুষ, বাতিলের বিরোদ্ধে আপোষহীন সিপাহসালার, অনৈসলামিক কার্যকালাপের বিরুদ্ধে বলিষ্ট কণ্ঠস্বর, জেলাব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের বীর সেনানী, মৌলভীবাজার-এর কেন্দ্রীয় পশ্চিম বাজার জামে মসজিদের সুদীর্ঘ কালের সাবেক খতীব, জামেয়া হেমায়াতুল ইসলাম গড়গাও এর সাবেক শায়খুল হাদীস, জামেয়া রহমানিয়া মৌলভী বাজার এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খুল হাদীস, **আলহাজ্ব হযরত মাওলানা খলীলুর রহমান সাহেব মুহাদ্দিসে রাজনগরী রহ.** এর মূল্যবান

বাণী ও দু'আ

আমার স্নেহাস্পদ, প্রতিভাবান তরুণ আলেমে দ্বীন, জামেয়া হেমায়াতুল ইসলাম গড়গাও-এর সুযোগ্য মুহাদ্দিস, মাওলানা হুসাইন আহমদ বাহুবলী তার ছাত্র যমানায়ই প্রখর মেধা ও বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে এর প্রমাণ দেন।

তার সংকলিত **'তাহসীনুল হাদীস'** কিতাব খানা তাঁর মেধারই সুন্দরতম বহিঃপ্রকাশ। বর্তমান সময়ে বাতিল ময়দানে নেমেছে pen is mighter than the sword সূত্র অবলম্বনে কলমের তরবারি নিয়ে। এসবের মধ্যে হাদীস অস্বীকারের ফিতনা আজ বিশ্বময় ও তুঙ্গে। মূলনীতি এড়িয়ে কোন শাস্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই অসম্ভব প্রায়। হাদীসের মূলনীতি সম্বলিত উলূমে হাদীসের প্রামাণ্য কিতাবাদি মন্থন করে সংকলিত তাঁর এ গ্রন্থখানা চমৎকার হয়েছে।

প্রথমতঃ সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এক দুঃসাহসিক অভিযান, কারন এই কিতাবে 'হাদীস অস্বীকরের বিভ্রান্তি ও 'আদালতে সাহাবা' নামক দুটি প্রবন্ধে বিভ্রান্তির উপযুক্ত জবাব সবিস্তারে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ তাকমীল ফিল হাদীসের 'উলূমে হাদীস' ও ফযীলতের 'শরহে নুখবাহ'-এর সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে متن علوم الحديث খ্যাত মুকাদ্দিমাতুদ্দেহভী-এর সরল অনুবাদ ও নুখবাতুল ফিকারে বর্ণিত ৭৫ প্রকার

হাদীসের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, প্রকার, উদাহরণ, শর্ত, হুকুম সহ উলূমে হাদীসের সামগ্রিক বিষয়াদি উপস্থাপিত হয়ে দরসে নেযামীর এক শূণ্যতা পূরণ হয়েছে।

যা হাদীসের ছাত্র উস্তাদ সকলের জন্য মুফীদ হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাঁর এ মেহনতকে কবূল করুন। তাসনীফ-তা'লীফের ময়দানে এগিয়ে যাক তাঁর অভিযাত্রা। হাদীসের খেদমতে আরো দক্ষতা সহকারে কাজ করে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

খলীলুর রহমান রাজনগরী
১০/১০/২০১২ইং

লেখক পরিচিতি

মাওলানা হুসাইন আহমদ। ১৯৮৩ সালের ১১ই জুন হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানাধীন কাইতগাও (প্রকাশিত রাজাপুর) গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মরহুম জনাব আবুল হোসেন ও বেগম ফয়জুন্নেসার চতুর্থ পুত্র।

বড় ভাইদের কাছে অক্ষর জ্ঞান লাভের পর প্রাথমিক শিক্ষা রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সমাপ্ত করেন। পাশাপাশি মরহুম পিতার মাদরাসায় পড়ানোর ওসীয়তের কারণে রাজাপুর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ইদ্রিস আলী (রাজাপুরী) ও মাওলানা আকবর আলী (দুর্গাপুরী) সাহেবদ্বয়ের কাছে কিরাআত ও উর্দু শিক্ষা লাভ করেন।

অতঃপর মাদরাসা শিক্ষা লাভের লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলাধীন খুজারগাঁও নুসরাতুল উলূম মাদরাসায় মক্তব চাহারম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

১৪১৪ হিজরীতে জামেয়া হেমায়াতুল ইসলাম গড়গাঁও টাইটেল মাদরাসায় ইবতেদাইয়্যাহ (পঞ্চম শ্রেণীতে) ভর্তি হয়ে 'বেফাকের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ১ম শ্রেণী।

১৪১৫ হিজরীতে মুতাওয়াসসিতা দ্বিতীয় বর্ষে বেফাকের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মুমতাজ, সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২০তম স্থান, ১৪১৭ হিজরীতে মুতাওয়াসসিতা ৩য় বর্ষে 'আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীমে'র কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী, সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১০ম স্থান, ইলমুত্ তাজবীদ ওয়াল কিরাআতে খামিছ জামাতে 'আঞ্জুমানে তালিমুল কুরআন' এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মুমতাজ, সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান,

১৪১৮ হিজরীতে সনদ জামাতে একই বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী, সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১তম স্থান, ১৪২০ হিজরীতে জামেয়া মাদানিয়া থেকে সানাবিয়া উলিয়ায় বেফাকের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মুমতাজ, সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৫তম স্থান,

১৪২১ হিজরীতে ফযীলত জামাতে 'এদারায়েতালীম হবিগঞ্জ-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মুমতাজ সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান,

১৪২২ হিজরীতে জামেয়া মাদানিয়া থেকে দাওরায়ে হাদীস জামাতে বেফাকের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী অর্জন করে প্রখর মেধা ও বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

ফারেগ হওয়ার পর থেকে জামেয়া হেমায়াতুল ইসলামে তা'লীমী খেদমতে বুখারী শরীফ, তিরমিযী ১ম খন্ড, আবূ দাউদ শরীফ ১ম খন্ড, নাসায়ী শরীফ, মিশকাত শরীফ ১ম খন্ড, তাফসীরে বায়যাভী, মুখতাসারুল মা'আনী ১ম খন্ড, সিরাজীসহ দরসে নেজামীর প্রথম সারীর গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদির দরস দিয়ে আসছেন। এর পাশাপাশি আল হাইয়াতুল উলিয়া লিল জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশের অধীনে দাওরা হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব মুসলিম শরীফ এর মুমতাহিন, 'বেফাকুল মাদারিস' এর নেগরানে আলা ও পরীক্ষক, 'আঞ্জুমানে তালীমুল কুরআনের' পরীক্ষক ও পরিদর্শক, 'সাগরদীঘির পাড় জামে মসজিদের খতীব ও উলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হওয়া ছাড়াও জাতীয় ও স্থানীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত আছেন।

তাঁর প্রকাশিতব্য কিতাবাদি

১. الذهب والنحاس فى دفع قال بعض الناس
২. من ذاالذى لايفهم الترمذى
৩. সিয়াম সাধনা
৪. বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্বনবীর মেরাজ
৫. অফুরন্ত দৌলত মাতাপিতার খেদমত
৬. আক্রান্ত ইসলামী শিক্ষা
৭. সামাজিক বিশৃংখলায় গীবতের ভূমিকা: পরিত্রাণের উপায়

সূচিপত্র

কেন এ প্রচেষ্টা ৪৫
উলুমুল হাদীস-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৪৭
ইলমে হাদীসের গুরুত্ব ও ফযীলত ৫২
দরূদ পাঠের চার বিধান ৫৪
হাদীসের ছাত্রদের জন্য সতর্কতা ৫৫
হাদীস বিশারদ ও শিক্ষার্থীদের আদব ৫৫
أداب الشيخ শায়খের জন্য পালনীয় শিষ্টাচার: ৫৬
হাদীস চর্চাকারীদের উপাধি ৫৮
হাদীস শব্দের বিশ্লেষণ ৬০
হাদীস এর পারিভাষিক অর্থ ৬২
হাদীসের সংজ্ঞায় বিভিন্ন অভিমত ৬২
কুরআন, হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববীর সংজ্ঞা ও পার্থক্য ৬৩
ইলমে হাদীসের সংজ্ঞা ৬৮
ইলমে হাদীসের প্রকারভেদ ৬৯
হাদীসের সূত্রজ্ঞান ৭২
ইলমে হাদীসের প্রকার চতুষ্টয়ের সারাংশ ৭২
হাদীসের নামকরণের চার কারণ ৭৩
উসূলে হাদীসের উদ্ভাবন ও এর উন্নতির ক্রমধারা ৭৩
নুখবাতুল ফিকার ও শরহে নুখবাহ সংকলনের কারণ ৭৩
উসূলে হাদীসের লিখকসহ কতিপয় গ্রন্থ ৭৩
হাদীস প্রাথমিক ভাবে সাত ভাগে বিভক্ত ৭৭
প্রথম বিভক্তি রাবীর সংখ্যা হিসাবে ৭৭
হাদীসে মুতাওয়াতির ৭৮

হাদীসে মুতাওয়াতিরের উদাহরণ ৮০
হাদীসে মুতাওয়াতিরের শর্তাবলী ৮১
হাদীসে মুতাওয়াতিরের হুকুম ৮১
হাদীসে মুতাওয়াতিরের প্রকারভেদ ৮২
হাদীসে মুতাওয়াতিরের অস্তিত্ব ৮২
হাদীসে মাশহুর ৮২
হাদীসে মাশহুর এর উদাহরণ ৮৩
হাদীসে মাশহুর এর হুকুম. ৮৩
হাদীসে মুসতাফীয ৮৩
হাদীসে মাশহুর ও মুস্তাফীযের পার্থক্য. ৮৩
হাদীসে মুসতাফীযের হুকুম... .... ৮৪
হাদীসে আযীয ৮৪
হাদীসে আযীযের হুকুম ৮৪
হাদীসে আযীযের উদাহরণ ৮৫
হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া শর্ত কিনা ৮৫
হাদীসে গরীব ৮৫
হাদীসে গরীবের হুকুম ৮৫
হাদীসে গরীবের প্রকার ৮৫
ফরদে মুতলাক ৮৬
ফরদে মুতলাকের উদাহরণ ৮৬
ফরদে নিসাবী ৮৬
ফরদে নিসাবীর উদাহরণ. ৮৬
নিদর্শন জড়িত খবরের আহাদ (الخبرالمحتف بالقرائن) এর তিন প্রকার ৮৭
প্রথম প্রকার ৮৭
প্রথম প্রকার থেকে বহিস্কৃত দুই শ্রেণী ৮৭

দ্বিতীয় প্রকার....	৮৮
তৃতীয় প্রকার.	৮৮
দ্বিতীয় বিভক্তি সনদের শেষ প্রান্ত হিসাবে	৮৮
হাদীসে মারফু’...	৮৮
হাদীসে মাওকুফ..	৮৯
হাদীসে মাক্বতু’	৮৯
তৃতীয় বিভক্তি রাবীর দোষগুণ অনুপাতে	৯০
তৃতীয় বিভক্তি ৫ প্রকারে ৪০ প্রকার হাদীস	৯০
প্রথম প্রকার....	৯০
হাদীসে মাকবুল...	৯২
হাদীসে মারদুদ.	৯২
হাদীসে সহীহ লিযাতিহী...	৯২
হাদীসে সহীহ লিগাইরিহি.	৯২
হাদীসে হাসান লিযাতিহী...	৯২
হাদীসে যঈফ..	৯৩
হাদীসে হাসান লিগাইরিহি.	৯৩
দ্বিতীয় প্রকার..	৯৩
অন্য হাদীসে মাকবুল	৯৩
হাদীসে মাহফুয	৯৩
হাদীসে শায	৯৩
হাদীসে মা’রুফ	৯৩
হাদীসে মুনকার	৯৪
তৃতীয় প্রকার	৯৪
মুহকাম	৯৪
মুখতালাফুল হাদীস	৯৪
নাসিখ...	৯৪

মানসূখ	৯৫
নাসিখ মানসূখ চিহ্নিত করণ পদ্ধতি.	৯৫
মতন সংশ্লিষ্ট وجوه ترجيح....	৯৬
সনদ সংশ্লিষ্ট وجوه ترجيح	৯৬
মারজুহ	৯৭
মুতাওয়াকক্বাফফীহি	৯৭
চতুর্থ প্রকার	৯৭
হাদীসে মাওযূ’	৯৮
হাদীসে মাওযূ’ চেনার উপায়	৯৮
হাদীসে মাওযূ’ এর উদাহরণ...	৯৮
হাদীসে মাওযূ’ এর হুকুম	৯৮
হাদীসে মাওযূ’ করণের কারণ	৯৯
হাদীসে মাওযূ’ করণের ধরন....	৯৯
অন্য হাদীসে মুনকার	১০০
উভয় মুনকারের পার্থক্য	১০১
হাদীসুল মুবতাদি’ حديث المبتدع	
বিদআতির হাদীসের হুকুম حكم حديث المبتدع	১০২
পঞ্চম প্রকার	১০৩
হাদীসে মুআল্লাল	১০৪
মুদরাজুল ইসনাদ	১০৪
মুদরাজুল ইসনাদ-এর চার প্রকার	১০৪
মুদরাজুল মতন	১০৫
ইদরাজ জানার উপায়	১০৫
ইদরাজের হুকুম	১০৬
মাক্বলূব	১০৭

মাক্বলূবের দুই প্রকার... ১০৭
মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ ১০৭
মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ-এর উদাহরণ................................... ১০৭
মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ-এর শর্ত....................................... ১০৮
মুযতারাব.. ১০৮
মুযতারাবের তিন প্রকার. ১০৮
মুযতারাব ফিসসানাদ (مضطرب في السند) ১০৮
মুযতারাব ফিস সানাদ এর উদাহরণ ১০৯
মুযতারাব ফিল মাতান مضطرب في المتن... ১০৯
মুযতারাব ফিল মাতান এর উদাহরণ.. ১০৯
মুযতারাব ফী হিমা.. ১০৯
মুযতারাব ফী হিমা এর উদাহরণ.... .... ১১০
মুযতারাবের দুই শর্ত.. .... ১১০
ইযতেরাব দূর করার দুই উপায়. ১১০
মুযতারাবের হুকুম.... .... ১১০
মুসাহহাফ ১১১
মুসাহহাফের দুই প্রকার. ১১১
মুহাররাফ ১১১
মুহাররাফের দুই প্রকার. ১১২
মুত্তাফিক্ব ও মুফতারিক্ব.... .... ১১২
মুত্তাফিক্ব ও মুফতারিক-এর কয়েকটি সুরত ১১২
মুত্তাফিক্ব ও মুফতারিক জানার ফায়দা.. ১১৩
মুত্তাফিক্ব ও মুফতারিক এবং মুহমালের পার্থক্য ১১৩
মু'তালিফ ও মুখতালিফ.... .... ১১৩
মুতাশাবিহ ১১৪

মুতাশাবিহ এর তিন সুরত.. .... ১১৪
হাদীসে গায়রে মুসাম্মা ১১৫
হাদীসে গায়রে মুসাম্মা-এর হুকুম.. ১১৫
تعديل مبهم এর হুকুম ১১৫
হাদীসু গায়রিল মা'রুফ ১১৫
হাদীসু গায়রি মা'রুফের হুকুম.... .... ১১৫
হাদীসু মুকিল্লিল হাদীস ১১৫
হাদীসু মুকিল্লিল হাদীসের হুকুম. ১১৬
হাদীসে মাসতূর ১১৬
হাদীসে মাসতূরের হুকুম.. ১১৬
আরেক শায ১১৭
হাদীসে মুখতালিত্ব ১১৭
হাদীসে মুখতালিত্ব-এর হুকুম ১১৭
চতুর্থ বিভক্তি সনদ থেকে রাবীর নাম লুপ্ত হওয়া না হওয়ার অনুপাতে ১১৭
সাত প্রকার হাদীস.. ১১৭
মুত্তাসিল ১১৮
মুসনাদ ১১৮
মুনক্বাতি' ১১৮
মুআল্লাক্ব ১১৯
মুআল্লাক্ব-এর হুকুম.. ১১৯
মুরসাল ১২০
মুরসাল-এর হুকুম... ১২০
মু'যাল ১২১
মুদাল্লাস ১২১
তাদলীস-এর হুকুম. ১২২

তাদলীসের কারণ...... ১২২
তাদলীস এর তিন প্রকার...... ১২২
তাদলীসুল ইসনাদ...... ১২৩
তাদলীসুল ইসনাদ-এর হুকুম...... ১২৩
তাদলীসুস শুয়ূখ...... ১২৩
তাদলীসুস শুয়ূখ-এর হুকুম...... ১২৩
তাদলীসুস তাসবিয়াহ...... ১২৩
তাদলীসুস তাসবিয়াহ-এর হুকুম...... ১২৪
পঞ্চম বিভক্তি সনদের মাধ্যম কম বেশি হওয়ার অনুপাতে...... ১২৪
৩ প্রকার হাদীস...... ১২৪
আলী...... ১২৪
নাযিল...... ১২৫
মুসাভী...... ১২৫
আলী এবং নাযিল আবার দুই প্রকার...... ১২৫
মুত্বলাক্ব আলী...... ১২৬
নিসাবী আলী...... ১২৬
মুত্বলাক্ব নাযিল...... ১২৬
নিসাবী নাযিল...... ১২৭
কোন প্রকার সনদের হাদীস উত্তম...... ১২৭
আলী নিসাবিয়্যান আবার চার প্রকার...... ১২৭
মুয়াফাক্বাত...... ১২৭
বদল...... ১২৭
মুয়াফাক্বাত ও বদলের উদাহরণ...... ১২৮
মুসাওয়াতের উদাহরণ...... ১২৮
মুসাফাহা...... ১২৮

ষষ্ঠ বিভক্তি روايت বা বর্ণনার ধরন অনুপাতে আট প্রকার হাদীস...... ১২৯
রিওয়ায়াতুল আকরান...... ১২৯
রিওয়ায়াতুল মুদাব্বাজ...... ১৩০
রিওয়ায়াতুল আকরান ও রেওয়ায়াতুল মুদাব্বাজ-এর পার্থক্য...... ১৩০
রিওয়ায়াতুল আকাবির আনিল আসাগির...... ১৩০
রিওয়ায়াতুল আকাবির আনিল আসাগির-এর প্রকার ও উদাহরণ...... ১৩০
রিওয়ায়াতুল আসাগির আনিল আকাবির...... ১৩১
রিওয়ায়াতে সাবিক্ব...... ১৩২
রিওয়ায়াতে লাহিক্ব...... ১৩২
সাবিক্ব ও লাহিক্ব-এর উদাহরণ...... ১৩২
সাবিক্ব ও লাহিক্ব জানার উপকারিতা...... ১৩৩
রেওয়ায়াতে মুহমাল...... ১৩৩
মুহমাল জানার ফায়দা...... ১৩৩
রাবী চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি...... ১৩৪
মুহমালের হুকুম ও উদাহরণ...... ১৩৪
মুহমাল ও মুবহাম এর পার্থক্য...... ১৩৪
হাদীসে মানহাদ্দাসা ওয়ানাসিয়া...... ১৩৪
হাদীসে মানহাদ্দাসা ওয়ানাসিয়া-এর হুকুম...... ১৩৫
হাদীসে মানহাদ্দাসা ওয়ানাসিয়া-এর উদাহরণ...... ১৩৫
সপ্তম বিভক্তিঃ হাদীস বর্ণনায় শব্দ প্রয়োগ ও রাবীর অবস্থা অনুপাতে...... ১৩৬
দুই প্রকার হাদীস...... ১৩৬
মুসালসাল...... ১৩৬
মুসালসালের চার প্রকার...... ১৩৬
মু'আনআন...... ১৩৭
মু'আনআন গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত...... ১৩৮

হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা.. ১৩৮
হাদীস সংকলনের চার যুগ ১৩৯
(১) একত্রিকরণের যুগঃ (৯৯ হি.-১৫১হি.) ১৩৯
(২) শৃংখলিতকরণের যুগ : (১৫১ হি.-২০০ হি.) ১৪০
(৩) পৃথককরণের যুগ : (২০০ হি.-২১৫ হি. প্রায়) ১৪১
(৪) বাছাঁইকরণের যুগ (প্রায় ২১৫ হি.-৩১৫ হি.) ১৪১
ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের আগমন. ১৪২
বাংলাদেশে ইলমে হাদীসের আগমন ১৪৩
হাদীসের কিতাবের ৩২ প্রকার ১৪৩
হাদীসের আট বিষয়ের পরিচয় ১৪৪
হাদীসের আট বিষয়ের ঠিকানা ১৪৮
হাদীসের কিতাবের স্থর বিন্যাস ১৪৯
রাবীদের স্তর: অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে ১৫০
যরাহ ও তা'দীলের ব্যাখ্যা ১৫১
جرح যরাহ-এর তিন স্তর ১৫১
تعديل তা'দীল-এর তিন স্তর ১৫২
যরাহ ও তাদীল-এর স্তর. ১৫২
কার تعديل গ্রহণযোগ্য ?... ১৫৪
جرح অগ্রগণ্য নাকি تعديل ?. ১৫৪
হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই বা গ্রহণ-বর্জনের মূল নীতি ১৫৫
রাবীদের স্তর: যুগের ভিত্তিতে ১৫৫
হাদীস বর্ণনায় সনদের গুরুত্ব অপরিসীম . ১৫৭
একটি সনদ ও মতন ১৫৯
লেখক থেকে রাসূল পর্যন্ত বুখারী শরীফের একটি সনদ ১৬০
লেখক থেকে রাসূল পর্যন্ত আবু দাউদ শরীফের একটি সনদ ১৬১

تحمل الحديث বা হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি ১০টি ১৬১
হাদীস বর্ণনা পদ্ধতির স্তর ৮ টি ১৬২
হাদীস অর্জন ও বর্ণনার প্রকার সমূহ একত্রে.. ১৬৩
তাহউইলের ১৬৪
تحويل এর প্রকার ১৬৪
সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও মুখাযরামীনদের পরিচয় ১৬৫
আদালতে সাহাবার মর্ম ১৬৬
আদালতের তিনটি সংজ্ঞা ১৬৭
কুরআনের আলোকে আদালতে সাহাবা ১৬৭
হাদীসের আলোকে আদালতে সাহাবা ১৭০
ইজমার আলোকে আদালতে সাহাবায় ১০ টি উদ্ধৃতি ১৭৩
১০ টি যুক্তির আলোকে আদালতে সাহাবা ১৭৭
সিহাহ্ সিত্তার পরিচয় ১৭৯
সিহাহ্ সিত্তার শ্রেণি বিন্যাসের মানদন্ড ১৭৯
সিহাহ্ সিত্তার শ্রেণি বিন্যাস ও কিছু কথা ১৮০
সিহাহ সিত্তার মুসান্নিফদের মাযহাব.. ১৮২
সিহাহ্ সিত্তার শর্তাবলী. ১৮৩
সিহাহ সিত্তার বৈশিষ্ট্যাবলী... ১৮৪
বুখারী শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী ১৮৪
বুখারী শরীফ সংকলনের কারণ ১৮৬
বুখারী শরীফের নুসখা বা কপি ১৮৭
মুসলিম শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী ১৮৭
মুসলিম শরীফ সংকলনের কারণ ১৮৮
মুসলিম শরীফের নুসখা বা কপি. ১৮৯
নাসাঈ শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী ১৮৯

নাসাঈ শরীফ সংকলনের কারণ. ১৯০
নাসাঈ শরীফের রাবী (বর্ণনাকারী) গণ ১৯১
আবুদাউদ শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী... .... ১৯১
আবুদাউদ শরীফ সংকলনের কারণ.. .... ১৯২
আবুদাউদ শরীফের নুসখা বা কপি ১৯২
তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী.... .... ১৯৩
তিরমিযী শরীফ সংকলনের কারণ.... .... ১৯৫
ইবনে'মাজাহ শরীফের বৈশিষ্টাবলী ১৯৫
ইবনে'মাজাহ শরীফ সংকলনের কারণ ১৯৬
সুনানে ইবনে মাযার বর্ননাকারীগণ. ১৯৭
মুয়াত্বা মালিক শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী ১৯৮
মুয়াত্বা মালিক শরীফ সংকলনের কারণ.. .... ১৯৯
মুয়াত্বা মালিক শরীফের নুসখা বা কপি ১৯৯
মুয়াত্বা মুহাম্মদ শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী ২০০
ত্বহাবী শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী ২০০
ত্বহাবী শরীফ সংকলনের কারণ ২০১
ত্বহাবী শরীফের নুসখা বা কপি ২০১
এক নজরে দাওরায়ে হাদীসের কিতাব সমূহ ২০২
সিহাহ্ সিত্তাহ সংকলকগণের জীবনী.. .... ২০৩
ইমাম বুখারী (রহঃ).... .... ২০৪
বংশ পরম্পরা ২০৫
বাল্যকাল, হাদীসের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ২০৫
উস্তাদ দাখিলীর দরসে এক দিন ২০৬
উস্তাদ বায়কান্দীর সম্বোধন ২০৬
হাদীসের জন্য তাঁর সফর ২০৭
তাঁর পাঠ দান ২০৭

তাঁর মেধার প্রখরতা. ২০৮
তাঁর স্মৃতিশক্তি ও মেধার প্রখরতার পরীক্ষা ২০৯
ইলালে হাদীসে তাঁর একক বৈশিষ্ট্য ২১০
হাদীস গ্রহণে তাঁর সতর্কতা ২১১
তাঁর আমলী বৈশিষ্ট্য ২১২
তাঁর পরহেজগারী. ২১৩
অপবাদ থেকে তাঁর আত্মরক্ষা. ২১৫
তাঁর বিনয় ২১৬
প্রসিদ্ধ কাহিনী : ইলমের মর্যাদা রক্ষায় তাঁর আদর্শ ২২৫
তাঁর অনাহারসহ বদান্যতা ২২৬
তাঁর তিলাওয়াত ও ইবাদাত ২২৭
তাঁর প্রশংসায় উস্তাদ ও সহকর্মীবৃন্দ.... .... ২২৮
কঠিন পরীক্ষা ও মৃত্যুর কারণ ২২৯
প্রথম কারণ- ২৩০
দ্বিতীয় কারণ. ২৩৪
তাঁর ইন্তেকাল-. ২৪০
তাঁর কবরের মাটির সুঘ্রাণ ২৪৫
তাঁর কবরের মাটির কারামত কিতাবে প্রত্যাবর্তন ২৪৬
তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী ২৪৭
ইমাম মুসলিম রহ. ২৪৮
ইমাম নাসায়ী রহ ২৪৯
ইমাম আবু দাউদ রহ. ২৪৯
ইমাম তিরমিযী রহ ২৫০
ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. ২৫২
ইমাম মালিক রহ... .... ২৫৫
ইমাম মুহাম্মদ রহ ২৫৬

ইমাম ত্বাহাবী রহ. ২৫৭
তাঁর মাযহাব পরিবর্তনের পাঁচ কারণ. ২৫৮
শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযহাব পরিবর্তন........ ২৫৯
ফুকাহাদের প্রসিদ্ধ সাতটি স্থরঃ... .... ২৬০
ফকীহগণের স্তরে ত্বাহাবীর স্থান........ ২৭০
ত্বাহাবীর চরিত্র থেকে শিক্ষণীয় কাহিনী ২৭১
ইমাম শাফেঈ রহ........ ২৭১
মিশকাতুল মাসাবীহ-এর সংকলন.. .... ২৭২
আল-মাসাবীহ-এর সংকলক. ২৭২
মিশকাতুল মাসাবীহ-এর সংকলক........ ২৭৩
কিতাবুল আছারের সংকলক ২৭৫
ফিকহ্ শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর পরিশ্রম........ ২৭৫
প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান.. .... ২৭৬
নুখবাতুল ফিকার-এর সংকলক ২৭৬
নুখবাতুল ফিকারের নামকরণের কারণ ২৭৬
নুখবাতুল ফিকারের বৈশিষ্ট্য........ ২৭৬
হাদীস অস্বীকারের বিভ্রান্তি... .... ২৭৬
তাদের ছয়টি প্রতারণা ২৭৬
তাদের প্রতারণার জবাব ২৭৬
১ম বাহানার খন্ডন.. .... ২৭৭
হাদীস লিখনে রাসূল সা.-এর নিষেধ সম্বলিত হাদীসের সাত জবাব........ ২৭৭
২য় বাহানার (প্রতারণার) খন্ডন ২৭৭
কাহিনী ১ .... ২৭৭
কাহিনী ২ .... ২৭৭
৩য় বাহানার (প্রতারণার) খন্ডন. ২৭৮
চতুর্থ বাহানার (প্রতারণার) খন্ডন.. .... ২৭৮

৫ম বাহানার (প্রতারণার) খন্ডন.. .... ২৭৮
৬ষ্ঠ বাহানার (প্রতারণার) খন্ডন........ ২৭৮
আয়াতের মাধ্যমে দলীল গ্রহণে তাদের অপচেষ্টা ও আমাদের জবাব... ২৭৮
হাদীস দলীল হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত ২৭৮
আমাদের যুক্তিভিত্তিক দলীল সমূহ ২৭৮
রাবী ও মুহাদ্দিসীনের জীবনী........ ২৭৮
চার খলীফা. ২৭৮
হযরত আবু বকর রা. ২৭৮
হযরত উমর রা. ২৭৯
হযরত উসমান রা ২৭৯
হযরত আলী রা.... .... ২৭৯
হযরত আবূ মুসা আশআরী রা ২৭৯
হযরত আবূ হুরায়রা রা... .... ২৮০
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা........ ২৮১
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা........ ২৮১
হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. ২৮১
হযরত আনাস বিন মালিক রা........ ২৮১
হযরত জাবের ইবনে আব্দুললাহ রা........ ২৮১
হযরত আবু সাইদ খুদরী রা........ ২৮১
হযরত মা'য বিন যাবাল রা... .... ২৮১
হযরত সালমান ফারসী রা........ ২৮১
হজরত আবু যর গিফারী রা. ২৮১
হযরত নুমান বিন বশির রা........ ২৮১
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা........ ২৮১
হযরত আমর ইবনুল আস রা ২৮১
হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রা ২৮২

হযরত বিলাল বিন রাবাহ রা.. .... ২৮২
হযরত যায়দ বিন ছাবিত রা........ ২৮২
হযরত হাফসা রা ২৮২
হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলীদ রা........ ২৮২
হযরত উম্মে সালমা ২৮২
হযরত আয়শা সিদ্দিকা রা ২৮৩
হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা ২৮৩
হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা........ ২৮৩
হযরত আলক্বামা ইবনে ওয়াক্কাস রা ২৮৩
হযরত ক্বাতাদা ইবনে নু'মান রা.... .... ২৮৩

কয়েকজন তাবেঈর জীবনী

হযরত হাসান বসরী রহ ২৮৪
হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহ........ ২৮৫
হযরত ইকরামা রহ........ ২৮৫
হযরত আলক্বামাহ রহ.... .... ২৮৬
হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ রহ........ ২৮৬
হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ রহ........ ২৮৬
হযরত হিশাম বিন উরওয়াহ রহ........ ২৮৬
হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ. ২৮৭
হযরত আতা ইবনে আবি রিবা রহ........ ২৮৭
হযরত ইব্রাহীম নখই রহ. ২৮৭
ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আনসারী মাদানী রহ ২৮৮
হযরত আল আসওয়াদ রহ........ ২৮৮
হযরত মুজাহিদ রহ........ ২৮৮

হযরত ক্বাতাদা রহ. ২৮৮
হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ........ ২৮৯
হযরত শাবী কুফি রহ........ ২৯০
হযরত আবু বকর মাখযুমী রহ........ ২৯০
ইমাম আহমদ রহ.. .... ২৯০

হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও হাদীস বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতাগণ।

ইমাম দারেমী রহ........ ২৯০
ইমাম বায়হাকী রহ........ ২৯০
ইমাম বগবী. রহ........ ২৯০
আল্লামা নিমবী রহ........ ২৯১
ইবনে আবি শায়বা রহ........ ২৯১
ইবনুল যযরী রহ. ২৯১
মুনযিরি রহ.... .... ২৯১
ইবনে খুজায়মা রহ ২৯১
আলী মুত্তাক্বি রহ........ ২৯১
হাকীম তিরমিযি রহ........ ২৯১
সাঈদ ইবনে মানসুর রহ........ ২৯১
ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রহ........ ২৯২
ইমাম হুমায়দী রহ ২৯২
ইমাম হাকিম রহ........ ২৯২
ইমাম তাবরানী রহ........ ২৯২
ইমাম যায়লাঈ রহ........ ২৯২
ইমাম খতিবে তিবরিযি রহ........ ২৯২
মাওলানা ইউসুফ রহ........ ২৯২
মাওলানা আযিমাবাদী রহ ২৯২

শায়খুল হাদীস রহ.. ২৯৩
আল্লামা বলিয়াবী রহ ২৯৩
মাওলানা ইদ্রিস কান্দলবী রহ ২৯৩
মাওলানা ফখর উদ্দিন মুরাদাবাদী রহ ২৯৩
মাওলানা যুফার আহমদ থানবী রহ ২৯৩
মাওলানা বদরে আলম মিরাটী রহ ২৯৩
আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.. ২৯৩
মুহাম্মদ মুবারকপুরী রহ.. ২৯৩
আলামা শাহ আনওর কাশ্মীরী রহ.. ২৯৪
মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ.. ২৯৪
মাওলানা আব্দুল হাই লখনবী রহ ২৯৪
মুহাদ্দিসে সাহারনপুরী রহ... .... ২৯৪
শাহ ওলী উললা মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.. ২৯৪
আল্লামা সিন্দী রহ.. ২৯৪
আল্লামা কুতুব উদ্দিন দেহলভী রহ.. ২৯৪
আল্লামা শওকানী রহ.. ২৯৪
শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.. ২৯৫
মুল্লা আলী ক্বারী রহ.. .... ২৯৫
আল্লামা ত্বীবী রহ ২৯৫
আল্লামা খাত্তাবী রহ.. ২৯৫
আল্লামা নববী রহ.. ২৯৫
আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ.. ২৯৫
আল্লামা ক্বাসতালানী রহ. ২৯৫
আল্লামা হাফিজ আইনী রহ.. ২৯৬
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.... .... ২৯৬

হাদীস বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা

আল্লামা তাহের পাঠনী রহ ২৯৬
আল্লামা সাখাবী রহ.. ২৯৬
আল্লামা হাফেজ ইরাক্বী রহ.. .... ২৯৬
হাফিজ যাহাবী রহ.. ২৯৬
আল্লামা ইবনে হাযিম রহ. ২৯৭
আল্লামা মিযযী রহ ২৯৭
আল্লামা ইবনুল আসির রহ. ২৯৭
আল্লামা ইবনে শিহাব যুহরী রহ ২৯৭
আবু বকর বিন হাযাম রহ. ২৯৭
হাম্মাদ বিন আবীসুলায়মান রহ ২৯৭
রবীআতুর রায় রহ.. ২৯৭
আউযাঈ রহ.. ২৯৭
শু'বা রহ.. ২৯৮
সওরী রহ ২৯৮
হাম্মাদ বিন সালামাহ রহ ২৯৮
ইবনে মুবারক রহ ২৯৮
ইয়াহইয়া আল ক্বাত্তান রহ ২৯৮
আব্দুর রহমান বিন মাহদী রহ ২৯৮
সুফইয়ান বিন উইয়াইনা রহ.. ২৯৯
ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহ.. ২৯৯
আলী ইবনুল মাদীনী রহ.. ২৯৯
খতীব বাগদাদী রহ.. ২৯৯
মাক্কী বিন ইবরাহীম রহ.. ২৯৯
হুমায়দী রহ.. ২৯৯

ইসহাক বিন রাহওয়াই রহ ৩০০
ইসহাক বিন মুসা আনসারী রহ ৩০০
নুআইম বিন হাম্মাদ রহ........ ৩০০
কুতায়বা বিন সাঈদ রহ. ৩০০
আবু যুরআ রহ. ৩০০
আবু হাতিম রহ ৩০১
ইবনে খুযাইমা রহ. ৩০১
ইবনে হাব্বান রহ. ৩০১

তাক্বলীদে আইম্মা বা ইমামগণের অনুকরণ

কোরআনের আলোকে তাকলীদ ৩০৩
হাদীসের আলোকে তাকলীদ ৩০৪
মাযহাব ও তার অপরিহার্যতা ৩১০
মুসলিমদের মাঝে অনৈক্যের বিষ বাষ্প ছড়াচ্ছে আহলে হাদীস গোষ্ঠি ৩১৮
মুকাল্লিদ কাকে বলে? আর গায়রে মুকাল্লিদ কাকে বলে? ৩১৯
তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী মানেই হল মুকাল্লিদ ৩২০
রাসূল সাঃ-এর জমানায়ই তাকলীদে শখসী ছিল, ছিল ইজতিহাদও ৩২১
দ্বীনী বিষয়ে সাহাবাদের অনুসরণ আবশ্যক ৩২২
যারা বলে আমরা সাহাবাদের চেয়ে দ্বীন বেশি বুঝ ওরা বেদ্বীন ৩২৩
ওরা সালাফী না খালাফী? ৩২৪
একটি ধোঁকাবাজী প্রশ্ন ৩২৪
মাযহাব কি? ৩২৫
রাসূল সাঃ-এর মাযহাব কি?এবং কেন? ৩২৬
সাহাবীদের মাযহাব কি? ৩২৯
তাবেয়ীদের মাযহাব ৩৩০
কুরআন ও হাদীস দেখে আমল করলে অসুবিধা কোথায়? ৩৩০
মুহাদ্দিসগণ কি মাযহাব মেনেছেন? ৩৩০

কেন একটি মাযহাবই মানতে হবে? ৩৩১
নাসীরুদ্দীন আলবানীর স্বীকারোক্তি ৩৪১
আহলে হাদীসদের কাছে নাসীরুদ্দীন আলবানীর মর্যাদা ৩৪২
নামাযের যে সকল মাসআলায় আহলে হাদীস ভাইদের দলিল নেই ৩৪৬
সানার উপরে আলোচনা ৩৫২
সালামের উপর আলোচনা ৩৮১
সহীহ হাদীসের দাবিদার আহলে হাদীসদের দৈন্যদশা ৩৯০
কাদিয়ানী কি আহলে হাদীস? ৩৯৬
মির্যা কাদিয়ানীর বিবাহ হানাফী আলেম পড়িয়েছে না আহলে হাদীস? ৪০০
সময়ের প্রেক্ষাপটে মাযহাবের গুরুত্ব ৪০৬

মুকাদ্দিমাতুদ্ দেহলবী

হাদীসে মারুফ', মাওকুফ ও মাক্বতু' ৪০৯
হাদীস খবর, আছর, সুন্নত শব্দের ব্যবহার ও পার্থক্য ৪১১
হাদীসে সরীহী ও হুকমী. ৪১২
হাদীসে ক্বওলী, ফেয়লী ও তাকরীরী-এর উদাহারণ- ৪১৩
সনদ ও মতন ৪১৩
মুত্তাসিল ও মুনকাতি.. .... ৪১৬
মুআল্লাক-এর হুকুম ৪১৬
মুরসাল-এর হুকুম ৪১৭
মু'যাল-এর হুকুম ৪১৮
মুদাল্লাস ৪১৯
তাদলীসের নিন্দাবাদ ৪২০
তাদলীসের হুকুম ৪২১
তাদলীসের কারণ ৪২১
মুযত্বারাব ৪২১

রেওয়ায়াত বিল মা'না.... ৪২২
হাদীসে মু'আন আন ৪২৩
হাদীসে মুসনাদ ৪২৩
শায ও মুনকার.... ৪২৪
মু'আল্লাল ৪২৫
মুতাবি' ৪২৬
মুতাবাআতের প্রকারদ্বয় ৪২৬
শাহিদ ৪২৭
ই'তিবার ৪২৭
সহীহ, হাসান ,যঈফ. ৪২৭
সহীহ লিযাতিহী ৪২৮
সহীহ লিগাইরিহী. ৪২৮
হাসান লিযাতিহী ৪২৮
হাসান লিগাইরিহী ৪২৮
আদালত, তাক্বওয়া, মুরুয়াত ৪২৯
যবত সদর ও কিতাবত ৪২৯
আদালত বিনষ্টকারী ৫টি দোষ ৪৩০
মিথ্যুক রাবী ৪৩০
মিথ্যার অপবাদ আরোপিত রাবী. ৪৩১
ফিসক বা পাপাচার.. ৪৩১
জাহালত বা রাবীর অপরিচিতি ৪৩২
বিদ'আত ৪৩২
বিদ'আতির হাদিস ৪৩২
যবত বা সংরক্ষণ বিনষ্টকারী ৫টি দোষ ৪৩৪
فرط الغلط বা সীমাতিরিক্ত ভুল ৪৩৪

كثرة الغفلة অত্যাধিক অলসতা ৪৩৪
مخالفة الثقات বিশ্বস্থ রাবীদের বিরোধিতা ৪৩৪
وهم বা ধারণার বশিভূত হওয়া ৪৩৪
سوء الحفظ বা স্মরণ শক্তির দুর্বলতা ৪৩৫
سوء الحفظ বা স্মরণ শক্তির দুর্বলতার প্রকার ৪৩৬
মুতাওয়াতির ৪৩৬
গরীব, আযিজ, মশহুর, মুসতাফিজ শায ৪৩৭
হাদীসে যঈফ ৪৩৮
أصح الأسانيد বা সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতম সনদ ৪৩৮
হাসানুন সহীহুন, হাসানুন গারীবুন, গারীবুন সাহীহুন ৪৩৯
হাসানের সাথে গরীবের সম্মিলনের ব্যাখ্যা ৪৩৯
আহকাম বা বিধানাবলীতে কোন প্রকারের হাদীস দলীল হয় ? ৪৩৯
ফাযায়েলে আমালে কোন যঈফ গ্রহণযোগ্য? ৪৪০
أصح الكتب বা সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতম কিতাব ৪৪১
মুত্তাফাকুন আলাইহি এর সংজ্ঞা ও সংখ্যা ৪৪১
সহীহ হাদীসের ৭টি স্তর ৪৪২
বুখারী ও মুসলিমের শর্ত ৪৪৩
সহীহ হাদীস সহীহাইনে সীমাবদ্ধ নয় ৪৪৪
বুখারি শরিফের হাদীসের সংখ্যা ৪৪৪
সহীহ হাদীসের অন্যান্য কিতাব ৪৪৫
সিহাহ সিত্তাহর পরিচয় ৪৪৬

কেন এ প্রচেষ্টা?

সকল প্রশংসা ও স্তুতি সেই মহা মহীয়ানের যিনি আমার মত অধমের জ্ঞানের স্বল্পতা, অভিজ্ঞতার দীনতা ও কলমের জড়তা সত্ত্বেও হাদীস শাস্ত্রের সুউচ্চ দুর্গম পথে কদম রাখার দুঃসাহস দেখাবার শক্তি যুগিয়েছেন। প্রকৃত অর্থে একে অনধিকার চর্চাই বলা যায়। এটা বিনয় নয়, অনস্বীকার্য বাস্তবতা। তবে কেন এই প্রয়াস? আসলে কম্পোজ-প্রিন্টিং পর্যন্ত গড়াবে এমন বর্ণিল কল্পনা তখন করিনি। ১৪২২ হিজরী ২০০১ ঈসায়ী সালের কথা। আগের বছর জামেয়া সিরাজিয়া ভাদুঘরে ফযীলত জামাতের দরস গ্রহণকালে হাদীস শাস্ত্রের **'মাবাদিয়াত'** বা হাদীস শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়াদি যা প্রাথমিকভাবে জানা জরুরী তা ডায়রিবদ্ধ করতাম। পরের বছর এদেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া কাজির বাজার, সিলেট' এ দাওরায়ে হাদীসে পড়া কালে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মাদ ইসহাক রহ.-এর উস্তাদ 'আল্লামা ইউসুফ বিননুরী রহ.এর উক্তিসম্বলিত তাকরীর, মুফতি শফিকুর রহমান সাহেব মৌলভীবাজারী হুজুরের পাথর খোদা তাহক্বীক, তৎকালীন শিক্ষা সচিব আল্লামা নেজাম উদ্দীন সাহেব হুজুরের খোদাদাদ তাওযীহাতসহ অন্যান্য আসাতিজায়ে কেরামের কাছ থেকে পাওয়া হাদীস শাস্ত্রের মৌল উপাদান আমার ডায়রিকে সমুদ্র সেঁচা মণিমুক্তার থলিতে পরিণত করছিল প্রতিনিয়ত। অবশ্য সকলের জন্য নয় স্রেফ আমার জন্য। যাকে হ্যান্ড নোট বলা যায়। পরীক্ষার উত্তরপত্র আরবীতে লেখার সুবিধার্থে নোটটি লিখেছিলাম আরবীতে। পরীক্ষা শেষে নোটটির প্রতি আমার আগ্রহে ভাটা পড়লেও পরবর্তী ক্লাসের ছাত্র ভাইদের বিশেষ করে মাও. ক্বারী আব্দুল আহাদ ভাই (রাজসুরতী, বর্তমানে জামেয়া যিন্নুরাইন সিলেট-এর শিক্ষা সচিব)-এর আগ্রহ বেড়ে যায়।

ফলে অন্যান্য সকল নোটের সাথে এটিও তিনি নিজের কাছে রেখে দেন। বছর দুয়েক পর যখন মিশকাত শরীফ ১ম খন্ডের দরস অধমের দায়িত্বে চলে আসল, তখন ফের নোটটি নিয়ে ভাবতে লাগলাম, যদি এথেকে ছাত্রদেরকে বলি তাহলে আমারও কিতাব ঘাটতে হবে কম, তাদেরও উপকার হবে বেশি। প্রয়োজনে তারা কপি করে নিতে পারবে। পরে যখন দাওরায়ে হাদীসে তিরমিযি শরীফ ১ম খন্ড, বুখারী শরীফ, নাসাঈ ও আবূ দাউদ শরীফ দরসের যিম্মাদারী আসল তখন এর প্রয়োজন আরও চরমভাবে অনুভব করলাম। উপলব্ধি মোতাবেক দারস দিতে শুরু করলাম। একদিন ছাত্ররা কপি করার জন্য নোটটি চাইলে তাদের সামনে মেলে ধরতেই তাদের আশার আলোটুকু যেন দপ করে নিভে গেল। তারা চাহনিতে বিস্ময় ও বিরক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে যেন বলতে চায় এটা আবার কোন 'যবুর' নাযিল করেছেন আপনি? পরক্ষণেই তারা অভিযোগ অনুযোগ আরজ আবদার একত্র করে বলে উঠল, 'হুজুর এটার উর্দুতে ভাষান্তর করা যায় না? এ সপ্তাহেই হয়ে গেলে আমাদের জন্য মঙ্গল হতো। বড় ছেলের আবদার উপেক্ষা করার সাধ্য ক'জনের আছে? উর্দু করলাম। কপিও হলো। কিন্তু, ইতোমধ্যে আমার সহধর্মিনী উম্মে হাস্‌সান দাওরায়ে

হাদীসের ছাত্রী হিসেবে শ্রীমঙ্গলের সিন্দুর খাঁ রোডস্থ 'জামেয়া ইসলামিয়া মহিলা মাদরাসায় অবস্থানকালে সেখানে যাতায়াতের সুযোগে মুহতামিম সাহেব ত্বাহাবী শরীফের দারসের জন্য অনুরোধ করেন। অনেকটা یک گولی دو شکار হাতী দেখা আর বাদাম বেচা'র মত মেনে নিলাম। হাদীসের দারসের শুরুতে প্রাথমিক বিষয়াদীর ধারণা দেওয়ার জন্য ঐ নোটবদ্ধ কথাগুলো তো বলতেই হয়।

এ সুবাদে নোটটি তাদের হস্তগত হলে এবার এটা যেন তাদের কাছে 'ইঞ্জিল' মনে হলো। কারণ যুগতো অবনতির দিকে ধাবমান। আমার আহলীয়ার মাধ্যমে এবার তাদের 'দুই দফা' উত্থাপিত হলো।এক. বাংলা করা হোক, দুই. শ্রীঘ্রই ছাপানো হোক। তাদের আর্জি! অন্ততঃ আমাদের মতো দুর্বলদের দিকে তাকিয়ে সকল ধর্মীয় শিক্ষাবিদদের জন্য এটা করা বর্তমান সময়ের দাবী। শেষতক অঙ্গীকার করিয়েই ছাড়ল। নিজ অবস্থানে ফিরে এসে ছোট ছোট হলেও অত্যধিক কাজের ফাঁকে অঙ্গীকার বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছিল। কিন্তু দেখলাম 'সারা দেশে একই হেমন্ত'। উর্দু কপি প্রাপ্ত ছাত্ররা এসে সেই একই দাবী পেশ করল 'হুজুর বাংলা হলে উপকৃত হতাম। কি আর করা! একেতো অঙ্গীকার, 'অন্যদিকে মরার উপর ছয় মনও মাটি নয় মন ও মাটি'। বাংলা করা শুরু করেছি।

'মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়' এ প্রবাদের নাম ভাঙ্গিয়ে সকলের ভুলের ভীড়ে নিজের ভুলটাকে আড়াল করতে চাই না। লেখাটিকে নির্ভুল করার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টার পরও আমাদের অজান্তে অথবা অনভিজ্ঞতার ফাঁকে কোন ভুল থেকে গেলে তথ্য সহকারে অবগত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে সাদরে গ্রহণ করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেবো। এ মহৎ কাজে যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলের মেহনতকে দয়াময় মেহেরবান তাঁর নিজ কৃপায় কবূল করে সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন

অধম

হুসাইন আহমদ

১৪ই রজব ১৪৩১ হিজরী

০১৭১৭-৮০১৬৪৭

E-mail: hussain801647@gmail.com

উলুমুল হাদীস-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

তরুণ মুহাদ্দিস সুবক্তা মাওলানা হুসাইন আহমদ একজন ভাল শিক্ষক হিসেবে ইতোমধ্যে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সমাদৃত হয়েছেন। এই সমাদরের সুভাস ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। তাঁর অনুসন্ধিৎসা নতুন নয়। ছাত্রজীবন থেকেই নিরন্তর অধ্যাবসায় তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। উলূমে হাদীসের উপর তাঁর পড়া শোনা ব্যাপক। এ শাস্ত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ বহুদিনের। সব মিলিয়ে তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে উলূমে হাদীসের উপর এক সমৃদ্ধ জামে-মানে কিতাব 'তাহসীনুল হাদীস'। এই কিতাবটির পঠন পাঠনে ইলমে হাদীসের ছাত্র শিক্ষক সকলেই উপকৃত হতে পারবেন বলে মনে করি।

মহান আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন মাজীদ নাযিল করেছেন। কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা নিয়ে গড়ে উঠেছে তাফসীর শাস্ত্র। কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি বিষয়ে গড়ে উঠেছে উলূমুল কুরআন বা উসূলে তাফসীর। তেমনিভাবে নবী কারীম সা. কথা, কাজ, আমল-আচরন ও সমর্থনের মাধ্যমে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা করেছেন। এসব বর্ণিত হয়েছে হাদীস বিজ্ঞানে। হাদীস বিজ্ঞানের দুটি অংশ আছে। ১. সনদ, ২. মতন। হাদীস বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সঙ্গত কারণেই হাদীস ভান্ডারকে পচাত্তর প্রকারে বিভক্ত হয়েছে। এসব প্রকারভেদ এর পরিচয় কার্যকারিতা নিয়ে গড়ে উঠেছে উলূমুল হাদীস। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মানবজীবনের বিধি বিধান। এগুলোকে সুবিন্যাস্ত করে সাজানো হয়েছে ইলমুল ফিক্‌হ। ফিকাহ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও মাসআলা উদ্ভাবনের সূত্রাবলী নিয়ে গড়ে উঠেছে উসূলে ফিক্‌হ।

আর কুরআন হাদীস ফিক্‌হ এর সমন্বয়েই উলূমে শরইয়া। উলূমে শরইয়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার ইহ-পরকালীন কল্যাণ সাধন। উলূমে শরইয়া নিয়ে যারা লেখা পড়া করেন তাদের জন্য উলুমুল হাদীস সম্পর্কে জানা অত্যাবশ্যক।

আজকাল অনেকেই সহীহ হাদীস, সহীহ হাদীস বলে বেড়ান। এটাও এ শাস্ত্রের অনেক বিষয়ের একটি। যেমন-হাদীসের সনদ ও মতন ক্রটিমুক্ত হলে হাদীসকে সহীহ বলা হয়। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন: 'যে হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়, বর্ণনাকারী আদিল ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হন, এবং সনদটি শায কিংবা মুআল্লাল নয়; এমন হাদীসকে সহীহ বলে। মোটকথা, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে: ১. সনদ মুত্তাসিল হওয়া। ২. রাউইর আদিল হওয়া। ৩. রাউইর যাবিত হওয়া। ৪. শায না হওয়া। ৫. মু'আল্লাল না হওয়া।

প্রথমত: সনদ মুত্তাসিল হওয়ার অর্থ, হাদীসের সনদে বিদ্যমান প্রত্যেক বর্ণনাকারী তার শিক্ষক থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন প্রমাণিত হওয়া। শায়খের অনুমতি গ্রহণ করা, শায়খকে হাদীস শুনিয়ে সম্মতি নেয়াকে সরাসরি শ্রবণ বলা হয়।

দ্বিতীয়ত: রাউইর 'আদিল' হওয়া। عدل 'আদ্‌ল' শব্দের অর্থ সোজা ও বক্রতাহীন রাস্তা, যেমন বলা হয় طريق عدل 'সোজা রাস্তা'। পাপ পরিহারকারী ও সুস্থরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি ন্যায় ও সোজা রাস্তার অনুসরণ করে, তাই তাকে 'আদিল' বলা হয়। عادل কর্তাবাচক বিশেষ্য, অর্থ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। হাদীসের পরিভাষায় দীনদারী ও সুস্থরুচিকে عدالة বলা হয়। 'আদিল' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হচ্ছে- মুসলিম, বিবেকবান, সাবালক, দীন বিরোধী কর্মকান্ড থেকে মুক্ত ও সুস্থ রুচির অধিকারী ব্যক্তিকে উসূলে হাদীসের পরিভাষায় 'আদিল' বলা হয়। আদিল হওয়ার শর্তাবলী হচ্ছে:

১. মুসলিম: রাউইর 'আদিল হওয়ার জন্য মুসলিম হওয়া জরুরি।

২. সাবালক: রাউইর আদিল হওয়ার জন্য সাবালক হওয়া জরুরি। কেউ শৈশবে হাদীস শ্রবণ করে যদি সাবালক হয়ে বর্ণনা করে, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য, সাবালিগ হওয়ার পূর্বে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু কয়েকজন সাহাবির ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়, যেমন ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন যুবায়ের ও নুমান ইব্‌ন বাশির প্রমুখ, তাদের হাদীস শৈশবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. বিবেকবান: রাউইর আদিল হওয়ার জন্য বিবেকসম্পন্ন হওয়া জরুরি। বিবেকহীন ও পাগল ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। পাগল দু'প্রকার: ১. স্থায়ী পাগল ও ২. অস্থায়ী পাগল। স্থায়ী পাগলের হাদীস কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। অস্থায়ী পাগলের মধ্যে যদি সুস্থাবস্থায় সহীহর অন্যান্য শর্ত বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য, তবে শ্রবণ করা ও বর্ণনা করা উভয় অবস্থায় সুস্থ থাকা জরুরি।

৪. দীনদারী: রাউইর 'আদিল হওয়ার জন্য দীনদার হওয়া জরুরি, তাই পাপের উপর অটল ব্যক্তি আদিল নয়। পাপ হলেই 'আদল বিনষ্ট হবে না, কারণ মুসলিম নিষ্পাপ নয়, তবে বারবার পাপ করা কিংবা কবিরা গুনাহে লিপ্ত থাকা 'আদল' পরিপন্থী। দীনের অপব্যাখ্যাকারী, তাতে সন্দেহ পোষণকারী ও বিদ'আতির হাদীস গ্রহণ করা সম্পর্কে আহলে ইলমগণ বিভিন্ন শর্তারোপ করেছেন।

সুস্থ রুচিবোধ: রাউইর 'আদিল হওয়ার জন্য সুস্থ রুচিবোধসম্পন্ন হওয়া জরুরি। সুস্থ রুচিবোধের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। প্রত্যেক সমাজের নির্দিষ্ট প্রথা, সে সমাজের জন্য মাপকাঠি, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নানা প্রকার হয়। সাধারণত সৌন্দর্য বিকাশ ও আভিজাত্য প্রকাশকারী কর্মসমূহ সম্পাদন করা এবং তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্নকারী কর্মসমূহ পরিত্যাগ করাকে সুস্থ রুচিবোধের পরিচায়ক বলা হয়।

হাফিয ইব্ন হাজার (র.) 'আদল' এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, 'আদল' ব্যক্তির মধ্যে এমন যোগ্যতা, যা তাকে তাকওয়া ও রুচিবোধ আঁকড়ে থাকতে বাধ্য করে।' অতএব ফাসিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী 'আদিল' নয়, যদিও সে সত্যবাদী। জামাআত ত্যাগকারী 'আদিল' নয়, যদিও সে সত্যবাদী, সুতরাং তাদের বর্ণনাকৃত হাদস সহীহ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।"

ফাসিক ব্যক্তির সংবাদ যাচাই ব্যতীত গ্রহণ করা যাবে না, পক্ষান্তরে আদিল ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণযোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ

"আর তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ দু'জন সাক্ষী বানাবে। আর আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে।" এ আয়াতে আল্লাহ 'আদিল' ব্যক্তিদের সাক্ষীরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সারকথা হলো যে 'আদিল' ব্যক্তির মধ্যে দু'টি গুণ থাকা জরুরি: দীনদারী ও সঠিক রুচিবোধ। এ দু'টি গুণকে 'আদালত' বলা হয়। কখনো 'আদিল' ব্যক্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষ্য 'আদ্ল' শব্দ ব্যবহার করা হয়।

তৃতীয়ত: রাউইর 'যাবিত' হওয়া। ضبط ক্রিয়াবিশেষ্য, আভিধানিক অর্থ নিয়ন্ত্রণ। এ থেকে যিনি শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন, তাকে ضابط বলা হয়। 'যাবিত' কর্তাবাচক বিশেষ্য, অর্থ সংরক্ষণকারী, নিয়ন্ত্রণকারী। যাব্ত এর পারিভাষিক অর্থ শায়খ থেকে শ্রবণ করা হাদীস হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি ব্যতীত অপরের নিকট পৌঁছে দেয়া।

'যাব্ত' দু'প্রকার: ১. স্মৃতি শক্তির যাব্ত বা মুখস্ত করা ও ২. খাতায় লিখে রাখা। সাহাবীগণ ও প্রথম যুগের তাবেয়িগণ স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করতেন, পরবর্তীতে লেখার ব্যাপক প্রচলন হয়। তখন থেকে লেখার উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়, তবে লিখিত পান্ডুলিপি নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করা জরুরি।

চতুর্থত: মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য রাউই যদি তাদের চেয়ে উত্তম বা অধিক নির্ভরযোগ্য রাউইদের বিপরীত বর্ণনা করেন, তাহলে তাদের বর্ণনাকে শায বলা হয়'। সুতরাং কোন হাদীস সহীহ হতে হলে এমন না হওয়া। গ্রহণযোগ্য রাউই, যার একা বর্ণিত হাদীস ন্যূনপক্ষে 'হাসানের মর্যাদা রাখে। মকবুলের চেয়ে উত্তম রাবিকে সিকাহ বলা হয়, যার একা বর্ণিত হাদীস 'সহীহ'র মর্যাদা রাখে।

পঞ্চমত: ইল্লত দ্বারা উদ্দেশ্য গোপন, ইল্লত বা ত্রুটি, বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ব্যতীত যা কেউ বলতে পারে না। সনদ ও মতন উভয় স্থানে দোষনীয় ইল্লত হতে পারে।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبراهيم التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُهَا أو إلى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

বর্ণিত হাদীসটির সনদে ইমাম বুখারি থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৬ জন রাউই রয়েছেন। যথা:

১. হুমাইদি (আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের) ২. সুফিয়ান ৩. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারি ৪. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তাইমী

৫. আলকামাহ ইবনে ওয়াক্কাস আল্-লাইসি

৬. সাহাবি উমর ইবনে খাত্তাব রা.

উপরোক্ত প্রত্যেক বর্ণনাকারী নিজ শায়খ থেকে হাদীসটি শুনেছেন যা হাদীসটির সনদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাই সনদটি মুত্তাসিল। প্রত্যেক রাউই আদিল ও

পরিপূর্ণরূপে যাবিত ছিলেন। তাছাড়া বর্ণিত হাদীসটি শায বা মু'আল্লাল নয়। এ হাদীসটি ইমাম বুখারি (র.) তার সহীহ বুখারিতে সর্বপ্রথম পেশ করেছেন। এতে সহীহ হাদীসের পাঁচটি শর্ত পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে এটি একটি সহীহ হাদীস।

এমনিভাবে প্রতিটি হাদীসকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে এর মান ও পর্যায় নির্ণয় করা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার জন্য হাদীস বিজ্ঞানীগণ যে নীতিমালা তৈরি করেছেন তাকেই উসূলে হাদীস বলে। অন্য কথায় হাদীসের সাগরে ডুব দিয়ে মণি-মুক্তা আহরণের কলা কৌশলের নাম উসূলে হাদীস।

আজকাল কিছু লোক সমাজে উসূল বিহীন ইসলাম চর্চা করছেন। তারা উস্তায ও উসূলের ধার ধারেন না। এ জন্যে বিশ্বব্যাপী বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে।

বিশ্ববরেণ্য আলেম ও ইসলামী স্কলার আল্লামা ইউসুফ আল-কারাযাভী যথার্থই বলেছেন যে, 'বিশ্বব্যাপী মুসলিম শিক্ষিত যুবকদের বিভ্রান্তি ও অস্থীরতার মূল কারণ ২টি।

১. উস্তাযবিহীন দীন চর্চা, (নেট থেকে দীন শেখা) ২. উসূল (মূলনীতিবিহীন দীন চর্চা)।' সুতরাং আমাদেরকে বিজ্ঞ উস্তাযের নিকট থেকে দীন শিখতে হবে এবং উসূলে ভিত্তিতে কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চা করতে হবে। ইসলামের সঠিক ধারায় থাকতে হলে এর বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে স্নেহভাজন মাওলানা হুসাইন আহমদ (হাফিযাহুল্লাহু)-এর 'তাহসীনুল হাদীস' নামক চার শতাধিক পৃষ্ঠার এ কিতাবটি গুরুতপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। লেখক প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। সম্পাদনা করতে গিয়ে আমারও যথেষ্ট সময় ও শ্রম এর পেছনে ব্যয় হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এসবকে কবূল করুন। ভুলক্রুটি থাকা একেবারেই স্বাভাবিক। সুহৃদয় পাঠক দয়া করে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে-ইন্‌শা আল্লাহ! মহান আল্লাহ লেখককে জাযায়ে খাইর দান করুন এবং কিতাবটিকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে ধন্য করুন। আমীন

শাহ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

সহকারী পরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়।

তারিখঃ ৪ যিলকাদ ১৪৩৭, সোমবার।

بسم الله الرحمن الرحيم

ইলমে হাদীসের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইলমে হাদীসের গুরুত্ব ও ফযীলতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এ ইলমে প্রতিটি মুমিনের প্রাণাধিক প্রিয় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিসৃত বাণীসহ অন্যান্য কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা হয়, প্রিয়জনের উক্তি, অভিব্যক্তি আচার-আচরণ যেমন রক্তে শিহরণ জাগায়, হৃদয়ে স্পন্দন সৃষ্টি করে, প্রাণে দেয় অব্যক্ত দোলা, তেমনিভাবে হাদীসে নববী প্রতিটি মুমিনের অন্তকরণে জাগরণের সুর তোলে, হারানো রত্ন ফিরে পাওয়ার শান্তনা দেয়, আশার আলো জ্বালে, প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।

কুরআনে কারীমে হাদীসে নববীর গুরুত্ব

এক.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহন কর এবং যা নিষিদ্ধ করেন তা বর্জন কর। (সূরা হাশারঃ ৭)

দুই.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (نساء: ٥٩)

হে মুমিনগন তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদেরও, যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ এবং রাসূলের নিকট যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে থাক। সূরা নিসা -৫৯।

তিন.

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

অর্থাৎ যে রাসূলের (সুন্নাহর) আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল (সূরা নিসাঃ ৮০) এছাড়া ও অসংখ্য আয়াতে হাদীসে নববীকে আল্লাহর ঘোষণার মর্যাদা দান করা হয়েছে। হাদীসে নববীর ফযীলতে নবীজীর বাণী

❖ হাদীস বিশারদ নবীজীর প্রতিনিধি

(১) عن ابن عباس ﷺ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ ارحم خلفائى قلنا من خلفائك يا رسول الله قال الذين يرون الأحاديث ويعلمونها الناس (رواه الطبراني فى الأوسط)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ আমার প্রতিনিধিদের প্রতি দয়া করো। আমরা শুধালাম হে আল্লাহর রাসূল আপনার প্রতিনিধি কারা? উত্তরে তিনি বলেন, যারা হাদীসসমূহ বর্ণনা করেন এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেন। সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাসতাল্লানী (র.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাদ্দিসীনে কেরামকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদান করেছেন।

❖ নবীজীর দু'আ: হাদীসের ধারক-বাহকদের জীবন আলোকিত হোক

(২) عن ابن مسعود رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضرالله امرء سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع (رواه الترمذى)

হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ আলোকময় করে দিন ঐ ব্যক্তির জীবন যে আমার কাছ থেকে হাদীস শুনল অতঃপর তা যেভাবে শুনেছিল সেভাবেই পৌঁছে দিল, কারণ অনেক (পরের যুগে) হাদীসপ্রাপ্ত ব্যক্তি (সরাসরি) হাদীস শ্রবণকারীর তুলনায় হাদীসের বেশি উপযুক্ত (মর্মোদঘাটনকারী)। আল্লামা আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন হাদীসে বর্ণিত দু'আর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন হাদীসের শিক্ষা দানকারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। তাদের চেহারায় খোদা প্রদত্ত এক প্রকার জ্যোতি বিদ্যমান থাকে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন আমি কাশফের অবস্থায় দেখলাম আল্লাহর আরশের নীচ থেকে একটা নূরের রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে মুহাদ্দিসীনদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে এই নূর নবীজী সা.এর বক্ষ (সীনা) মোবারক থেকে বেরিয়েছিল।

❖ কেয়ামতের কঠিন দিবসে হাদীস চর্চাকারীগণ নবীজীর সান্নিধ্য পাবেন

(৩) عن ابن مسعود رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بى يوم القيامة اكثرهم على صلوة (رواه الترمذى)

হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; আমার প্রতি অধিক দরুদ পাঠকারী কেয়ামত দিবসে আমার অধিক নিকটবর্তী হবে।

আল্লামা ইবনে হিব্বান (র.)বলেন হাদীসে বর্ণিত অধিক দরূদ পাঠকারী হচ্ছেন হাদীস চর্চা কারীগণ, কারণ হাদীস চর্চায় স্বয়ংক্রীয়ভাবে বারবার নবীজীর নাম আসে, আর যতবার নবীজীর নাম আসে ততবারই দরূদ পাঠ করা হাদীস শিক্ষার্থীদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

দরূদ পাঠের চার বিধান

(১) ফরজ: প্রত্যেক মুমিন জীবনে একবার নবীজীর উপর দরূদ পাঠ করা ফরজ। দলীল: কুরআন মজীদের আয়াত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا হে ঈমানদারগণ তোমরা নবীজীর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। (সূরা আহযাব: ৫৬)

এখানে **صلوا** নির্দেশ সূচক আমর ব্যবহৃত হয়েছে। তাই জীবনে ন্যূনতম একবার দরূদ পাঠ ফরজ হবে।

(২) ওয়াজিব: কোন মজলিসে নবীজীর নাম শুনলে কমপক্ষে একবার দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব।দলীল:

عن كعب بن عجرة رض فى وسط الحديث بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك

হযরত কা'ব বিন উজরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের মধ্যাংশে আছেঃ ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যার কাছে আপনার আলোচনা করা হলো অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।

হাদীসে যে وعيد হুশিয়ারী এসেছে এতে প্রতীয়মান হয় তখন দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হবে।

(৩) সুন্নাতে মুআ'ক্কাদাহ: নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করার পর দরূদ পাঠ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। দলীল:

إنه ﷺ قال لابن مسعود رض اذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلواتك

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে বলেছেন যখন তুমি তাশাহহুদ পড়ে নিবে অথবা তাশাহহুদ পড়া পরিমাণ সময় বসে যাবে তখন তোমার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। দরূদ শরীফ ছাড়াই শুধু তাশাহহুদ পড়লে নামায পূর্ণ হয়ে যাওয়া মানেই দরুদ এখানে ওয়াজিব নয়।

এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল অধিকাংশ সময় করেছের এবং মাঝে মধ্যে ছেড়েছেন তা সুন্নত।

(৪) মুস্তাহাব: কোন বৈঠকে নবীজীর নাম শুনে প্রথম বার দরূদ পাঠের পর যতবার নবীজীর নাম উল্লেখ হবে তত বার দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। দলীল:

قال رسول الله ﷺ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي

কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার কাছে আমার আলোচনা হলো কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করলো না। হাদীসের নরম ভাষার প্রয়োগ দরূদ পাঠ মুস্তাহাব হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

হাদীসের ছাত্রদের জন্য হুশিয়ারি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শুনার সাথে সাথে প্রতিবারই দরুদ পাঠ করার উপর যেহেতু হাদীসচর্চা কারীদের ফযীলতের ভিত্তি তাই একাজে অবহেলা করা অনুচিৎ।

হাদীস বিশারদ (মুহাদ্দিস) ও শিক্ষার্থীর পালনীয় আদবসমূহ:

নুখবাতুল ফিকার এর এবারত معرفة أدب الشيخ والطالب ব্যাখ্যায়

(ক) আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন: **أدب الطالب**

১। تصحيح النية বিশুদ্ধ নিয়ত। পার্থিব উদ্দেশ্য বিহীন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হাদীস চর্চা করা।

২। تحسين الخلق সুন্দর চরিত্র গঠন করা।

৩। يوقر الشيخ উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদর্শন করা।

৪। لا يضجره উস্তাদকে বিরক্ত না করা।

৫। يرشدغيره নিজে যা শিখবে তা অন্য ভাইকে শিখতে সহযোগীতা করবে।

৬। لا يدع الاستفادة لحياء লজ্জার কারণে শিক্ষা গ্রহণ ও প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকবে না।

৭। أو تكبر অথবা অহমিকার কারণে।

৮। يكتب ما سمعه تاما যা শুনবে তা পূর্ণরূপে লিখবে।

৯। يعتني بالتقييد والضبط লিখার সাথে মুখস্থকরণের অনুশীলন করবে।

১০। يذاكر بمحفوظه মুখস্তগুলি সর্বদা চর্চা করবে, যাতে স্মৃতিতে মজবুত হয়ে যায়।

(খ) সাঈদ আহমদ পালনপুরী (র.) تفحة الدرر এ লিখেন:

১১। أداب গুলির প্রতি যত্নবান থাকা, কারণ

بی ادب محروم گشت از فضل رب

১২। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

১৩। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতের অটুট রক্ষণশীল হবে।

১৪। গীবত, ঠাট্টা, সাথী ভাইকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

১৫। কিতাব, ক্লাস রুম (এমনকি মসনদ, টুল বেঞ্চ) গুলিরও এহতেরাম করবে।

১৬। সবকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাজির থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবে, যাতে উস্তাদের কোন কথা ছুটে না যায়।

১৭। উস্তাদের কথা মনযোগ সহকারে শুনবে ও লেখবে। যাতে প্রয়োজনে কাজে আসে।

১৮। সর্বদা শুকরিয়া আদায় করতে থাকবে যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের বরকতময় বাণী পড়ার তাওফীক দান করেছেন।

(গ) শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.)বলেন:

১৯। اصلاح كيفية الجلوس হাটুদ্বয় মিলিয়ে ভদ্রতার সাথে বসবে।

২০। عدم النوم في اثناء الجلوس সবকে বসে ঘুমাবে না।

২১। عدم الاعتماد على الكتاب কিতাব বা তেপায়ায় হেলান দেবে না।

২২। عدم الضحك **সব**কে কোন কারণেই হাসবে না।

২৩। إصلاح الهيئة নেককারদের পোশাক পরিচ্ছদ, দৈহিক পরিপাটিও গুরুত্বপূর্ণ।

أداب الشيخ শায়খের জন্য পালনীয় শিষ্টাচার:

(ক) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.)বলেন

১। تصحيح النية একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিশুদ্ধ নিয়ত করা।

২। تحسين الخلق সুন্দর চরিত্র গঠন করা।

৩। أن يتطهر পবিত্রতা অবলম্বন করা।

৪। أن يجلس بوقار ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্যের সাথে বসা।

৫। لا يحدث قائما দাঁড়িয়ে হাদীস শিক্ষা না দেওয়া।

৬। হাদীস শিক্ষাদানে তাড়াহুড়া না করা।

৭। لا في الطريق অপারগতা ছাড়া রাস্তায় হাদীস বর্ণনা না করা।

৮। إذا خشي التغير রোগ ব্যাধি বা বার্ধক্যের কারণে হাদীসে ওলটপালটের সম্ভাবনা থাকলে হাদীস শিক্ষা দানে বিরত থাকা।

৯। أو النسيان স্মৃতি বিস্মৃতির আশংকা থাকলে হাদীস শিক্ষা দানে বিরত থাকা।

১০। أن يكون له مستمل يقظ উস্তাদের বর্ণিত হাদীস লিখার জন্য একজন সতর্ক-চৌকান্না লেখক থাকা।

(খ) আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরী (র.) বলেন:

১১। ইলমে হাদীস যেহেতু দ্বীনী ইলম, ইলমুল ওহী ও মীরাসে নবুওয়্যাত তাই এর আহরণ কারীদেরকে সেভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে।

১২। সদা সত্য বলা, মিথ্যা ত্যাগ করা।

১৩। সহীহ হাদীস বর্ণনা করা, মুনকার হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকা।

১৪। শিক্ষার্থীদের কল্যাণকামী হওয়া।

১৫। হাদীসের দরসে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা না বলা।

১৬। বিনয়কে ভূষণ বানানো।

১৭। সর্বদা শুকরিয়া আদায় করা যে আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবের বরকতময় বাণী পড়ানোর তৌফিক দিয়েছেন।

১৮। শরীয়তের নির্দেশ বাস্তবায়নে এবং নিষিদ্ধ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

১৯। বিশেষ করে ফরজ, ওয়াজিব আদায়ে একনিষ্ঠ হওয়া।

২০। আত্মার রোগ যথা- লোভ, ক্ষোভ, হিংসা, অহংকার, কৃপণতা, স্বার্থপরতা, কাম, লৌকিকতা, আত্মম্ভরিতা, ধারণা থেকে মুক্ত থাকা।

أقسام حاملي الحديث

হাদীস চর্চাকারীদের উপাধি:

তালিব, মুসনিদ, মুহাদ্দিস, শায়খ, হাফিয, হুজ্জত, হাকিম, আমীরুল মু'মিনীন।

১. **ত্বালিব:-** হাদীস সংগ্রহে/অধ্যয়নরত ব্যক্তি বা হাদীস ক্লাসের ছাত্রকে ত্বালিবে হাদীস বলে।

২. **মুসনিদ:-** নিজ সনদে হাদীস বর্ণনাকারীকে বলে মুসনিদ হাদীসের সনদ বা মতন সম্পর্কে ধারণা থাকুক বা নাই থাকুক।

৩. **মুহাদ্দিস:-** হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে যার পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে অথবা হাদীস নিয়ে গবেষণায় মগ্ন ব্যক্তিকে মুহাদ্দিস বলে। বাংলাদেশের পরিভাষায় দাওরায়ে হাদীসের ক্লাসে হাদীসের কোন কিতাব দরসদানকারীকে মুহাদ্দিস বলে।

৪. **শায়খ:-** হাদীসের মতনের অর্থ, মর্ম, সনদের দোষ-গুণের বিশ্লেষণ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারীকে শায়খ বলে। বাংলাদেশের পরিভাষায় বোখারী শরীফ ১ম খন্ড এর দরস দানকারীকে বিশেষভাবে এবং ২য় খন্ড এর দরসদানকারীকে সাধারণভাবে শায়খুল হাদীস বলা হয়।

৫. **হাফিয:-** মুহাদ্দিসের তুলনায় অধিক অভিজ্ঞ হাদীস বিশারদকে হাফিয বলে। কারো কারো মতে সনদ-মতন সহ এক লক্ষ হাদীস মুখস্থকারীকে হাফিয বলে।

৬. **হুজ্জত:-** হাফিযের তুলনায় অধিক প্রাজ্ঞ হাদীস বিশারদকে হুজ্জত বলে। কারো মতে সনদ মতন সহ তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থকারীকে হুজ্জত বলে।

৭. **হাকিম:-** হুজ্জতের তুলনায় অগ্রজ ও দক্ষ হাদীস বিশারদকে হাকিম বলে। কারো মতে নবীজি (সা:) থেকে বর্ণিত সকল হাদীস মুখস্থকারীকে বলে।

আমীরুল মু'মিনীন:- যিনি ইলমে হাদীস ও ইলালে হাদীসে হিফজ ও ইতক্বানের দিক দিয়ে পূর্বোল্লেখিত (তালিব, মুসনিদ, মুহাদ্দিস, শায়খ, হাফিয, হুজ্জত, হাকিম,) এর তুলনায় এমন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন যে তার দক্ষতা ও পারদর্শিতার দরুন হাফিয, হুজ্জত, হাকিম প্রমূখদের مرجع বা আশ্রয়স্থল হয়ে গেছেন। যেমন ১. হযরত সুফিয়ান সওরী (র.), ২. হযরত শু'বা (র.), ৩. হযরত হাম্মাদ বিন সালামাহ (র.), ৪. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (র.), ৫. হযরত আহমদ বিন হাম্বল (র.), ৬. হযরত ইমাম বুখারী (র.), ৭. হযরত ইমাম মুসলিম (র.), প্রমুখ।

হাফিয, হুজ্জত, হাকিম সম্পর্কে মতপার্থক্য: আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র.), শায়খ আবদুল্লাহ টুংকী (র.) ও একদল মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করণের মাধ্যমেই এ সকল উপাধি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে, আল্লামা যাহিদ কাওসারী, ইবনে হাজার আসকালানী, শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানীসহ আরেক দল মুহাদ্দিসীন প্রথমোক্ত দলের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মাওলানা আব্দুল মালিক সাহেব ও তার পদাঙ্ক অনুসারী শিষ্য মাওলানা মুহাম্মদ আলমগীর হুসাইন সাহেব প্রথমোক্ত মত পোষণকারী ওলামায়ে কেরামের ভুল ভাঙানোর প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এমর্মে তারা দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন: ১। আগে কেউ নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদীস মুখস্তকরনের সাথে উক্ত উপাধি গুলিকে সম্পৃক্ত করেননি। ২. হাফিয উপাধিতে ভূষিত মুহাদ্দিসীনে কেরামের কারো পক্ষ থেকে দশ হাজারের বেশি হাদীস বর্ণিত পাওয়া যায়নি।

১ম কারণ এর জবাবে প্রথম মত পোষণকারীরা বলেন, বহু ক্ষেত্রে পরবর্তী পরিভাষাই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সুতরাং মোল্লাআলী ক্বারী প্রমুখদের পরিভাষা শুধুমাত্র পরবর্তী পরিভাষা হওয়ার দরুণ ভুল হওয়া নিশ্চিত হতে পারে না। ২য় কারণের জবাবে বলেছেন: পদবীগুলিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদীস মুখস্থ থাকার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, বর্ণনা করার সাথে নয়, সুতরাং হতে পারে তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদীস মুখস্থ ছিল কিন্তু বর্ণনা করেছেন অনেক কম। আর এমনটিই স্বাভাবিক। ইমাম বুখারী (র.) ৬ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে ৭২৭৫টি (তাকরার ছাড়া ৪০০০টি) হাদীস, ইমাম আবূ দাউদ (র.) ৫ লক্ষ হাদীস থেকে বাঁচাই করে ৪৮০০ হাদীস। ইমাম নাসাঈ (র.) ৪ লক্ষ থেকে বাছাই করে ৫৭৬১ হাদীস সংকলনের দিকে তাকালে তা সহজেই প্রতিভাত হয়। তারা বলেন নিজ নিজ সীমাবদ্ধতার মানদন্ডে তাদেরকে তুলনা করে নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদীস মুখস্ত করাকে অসম্ভব মনে করা উচিত হবে না।

হাদীস সংরক্ষণে নজীরবিহীন স্বরণশক্তির ঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টি ফিরালে সকল সংকীর্ণতার অবসান হয়ে যায়। মূলত ইসলামের হেফাজতের জন্য এমন সব ব্যক্তি বর্গের জন্ম দেওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতী ব্যবস্থাপনা। ইসলামের হেফাজতের জন্য আল্লাহর কুদরতী ব্যবস্থাপনার তালিকা দীর্ঘ। সুতরাং পূর্বসূরী বুযুর্গদের দিকে ভুলের তীর নিক্ষেপকরার পরিবর্তে তাদের মতপার্থক্য বর্ণনার ওপর ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয় মনে করি।

تحقيق لفظ الحديث

হাদীস শব্দের বিশ্লেষণ

১. حَدَثَ (ن) حُدُوْثاً স্থাপিত হওয়া, ঘটনা ঘটা।

২. أَحْدَثَ (اف) إِحْدَاثاً আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা।

৩. حَدَّثَ (تفع) تَحْدِيْثاً বর্ণনা করা, সংবাদ দেওয়া।

৪. تَحَدَّثَ (تفع) تَحَدّثاً অবহিত করা।

৫. مُحَادَثَةً (مفا) حَادَثَ কথোপকথন, আলাপচারিতা।

৬. تَحَادَثَ (تفا) تَحَادُثًا পরস্পর সংলাপ।

৭. اِسْتَحْدَثَ (است) اِسْتِحْدَاثًا নতুন অবস্থায় পাওয়া।

৮. اَلْحَدِثُ সুবক্তা।

৯. اَلْحَدُثُ উত্তম কথাকার।

১০. اَلْحَدَثُ বিদআত, সুন্নত বিরোধী নতুন কথা।

১১. اَلْحِدِّ يْثُ অধিক কথোপকথনকারী।

১২. اَلْحِدَاثُ অধিক আলোচকের দল।

১৩. اَلْمُحْدَثُ কিতাব সুন্নাত, ইজমা বিরোধী নতুন মতবাদ।

১৪. مُتَحَدَّثُ সভা কক্ষ।

১৫. اَلْحَادِثُ (ج) حادثات وحوادث নব সৃষ্টি বস্তু, পুরাতনের বিপরীত।

১৬. اَلْحَدِيْثُ (ج) حُدَثَاءُ حِدَاثٌ নতুন।

১৭. (ج) اَلْحَدِيْثُ أَحَادِيْثُ খবর।

المعاني الخاصة التي استعمل فيها لفظ الحديث

এছাড়াও আরো কয়েকটি বিশেষ অর্থে হাদীস শব্দটি ব্যবহৃত হয়

১. (الموضوع) **বিষয়বস্তু অর্থে -**

যেমন وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا এবং যখন নবীজী তার কোন সহধর্মীনীকে গোপন বিষয়বস্তু খোলে বললেন। (সূরা তাহরীম: ৩)

২. (الواقعه) **কাহিনী অর্থে -**

যেমন هل أتاك حديث موسى হযরত মূসার কাহিনী আপনার কাছে এসেছে কি? (সূরা নাযিআত: ১৫)

৩. (الرؤيا) **স্বপ্ন অর্থে -**

যেমন وعلمتني من تأويل الأحاديث

এবং আপনি আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা ইউসুফ: **১১**)

المعانى الثلاثة المنتخبة للفظ الحديث

হাদীস শব্দের নির্বাচিত তিনটি অর্থ

হাদীস শব্দের উপরোল্লোখিত অর্থসমূহ থেকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ৩টি অর্থ বাচাই করেছেন।

(১) কথা:

আল্লামা জওহরী তাঁর “صحاح” নামক কিতাবে লিখেন الحديث الكلام قليلة وكثيره وجمعه أحاديث কম হোক, বেশি হোক কথাকে হাদীস বলে।

(২) নতুন

যেমন আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারীতে লিখেন الحديث كانه أريد به مقابلة القرآن অর্থাৎ حديث শব্দ দ্বারা যেন কুরআন এর বিপরীত বুঝানো হয়েছে। যেহেতু কুরআন قديم বা পুরাতন, তাই এর বিপরীত حديث অর্থ হবে নতুন।

(৩) **বর্ণনা**

যেমন আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী বলেন إنه مأخوذ من قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث শব্দটি যেন আল্লাহর বাণী فحدث থেকে সংগৃহীত। এখানে حدّث অর্থ বর্ণনা কর, সুতরাং حديث অর্থ হবে বর্ণনা।

মোদ্দাকথা: অভিধান থেকে حديث শব্দের নির্বাচিত অর্থ দাঁড়াল ‘নতুন কথা বর্ণনা’ করা।

معنى الحديث اصطلاحا

হাদীস এর পারিভাষিক অর্থ

উলামায়ে উসূলে ফিকহের মতে হাদীস:

قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله فقط

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শুধু কথা ও কাজকে হাদীস বলে।

মুহাদ্দিসীনের ভাষ্যমতে হাদীস:

هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وتقاريره وصفاته الخِلْقِيَّةُ الخُلُقِيَّةُ في اليقظة والمنام ووقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ, অবস্থা, সমর্থন, সৃষ্টিগত ও চারিত্রিক গুণাবলী, তাঁর জন্মের স্থান ও কাল ইত্যাদি সকল বর্ণনাকে হাদীস বলে।

অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসীনের ভাষ্যমতে হাদীস

أقوال النبي ﷺ أو الصحابة أو التابعين وأفعالهم وأحوالهم فقط

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও তাবেঈগনের শুধু কথা কাজ ও অবস্থাকে হাদীস বলে।

তাঁদের মতে সমর্থন কাজের অন্তর্ভুক্ত। সৃষ্টিগত গুণাবলী, জন্মের স্থান ও কাল অবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, সুতরাং সংজ্ঞা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই।

হাদীসের সংজ্ঞায় বিভিন্ন অভিমত

১. জমহুর মুহাদ্দিসীনদের অভিমত

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكذالك يطلق على قول الصحابة والتابعين وفعلهم وتقريرهم.

যে কথা, কাজ ও সমর্থনের সম্বন্ধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে করা হয়েছে, তাকে হাদীস বলে। এমনিভাবে হাদীস বলতে সাহাবা ও তাবেঈগনের কথা, কাজ ও সমর্থনকেও বুঝায়।

২. আল্লাামা হাফিজ সাখাভী স্বীয় গ্রন্থ ফতহুল মুগীস এর ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেন

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة حتى الحركات والسكنات فى اليقظة والمنام.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, সমর্থন, এমনকি ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় তাঁর গতি ও স্থিতিই হচ্ছে হাদীস।

৩. মুফতি আমিমুল ইহসান সাহেব বলেন-

الحديث هو اعم من ان يكون قول الرسول والصحابة و التابعين وفعلهم وتقريرهم

হাদীস ব্যাপকভাবে রাসূলুল্লাহ, সাহাবা ও তাবেঈগনের কথা ও কাজ ও সমর্থনকে বুঝায়।

৪. আল্লামা আব্দুল মালেক সাহেব হাফিযাহুল্লাহ বলেন

هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خِلْقِيَّةٍ أو خُلُقِيَّةٍ سواء كان قبل النبوة أو بعدها

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংশ্লিষ্ট সবই হাদীস, চাই কথা, কাজ সমর্থন হোক, চাই সৃষ্টিগত বা চারিত্রিক গুনই হোক, চাই নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের হোক বা পরের হোক।

উসূলিয়্যিন ও মুহাদ্দেসীনের সংজ্ঞায় পার্থক্যের কারণ: উসূলিয়্যিনদের বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুধু কথা ও কাজ থেকে উসূল (সূত্র) বের করে মাসাইল চয়ন করা যায়। বাকীগুলি থেকে নয়, তাই আমরা শুধু তাঁর কথা ও কাজকেই হাদীসের আওতাধীন করবো।

অন্য দিকে মুহাদ্দিসীনের বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য হাদীস থেকে শুধু উসূল ও মাসাইল বের করা নয় বরং রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত সকল বিষয়াদি বিশ্ব বাসীর সামনে তুলে ধরা তাই আমাদের কথা ও কাজের সাথে অবস্থা, সমর্থন, জন্ম স্থান ও কাল ইত্যাদি সকল বিষয়াদি সন্নিবেশিত থাকতে হবে। (দরসে তিরমিযী, আল্লামা তক্বী উসমানী (দা.বা.) কৃত)

الفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي

কুরআন, হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববীর মধ্যে পার্থক্য

(ক) কুরআন: যে বাক্যের অর্থ এবং শব্দ উভয় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে তাকে কুরআন বলে।

হাদীসে কুদুসী: যে বাক্যের অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং শব্দ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে এসেছে, তাকে হাদীসে কুদসী বলে।

হাদীসে নববী: যে বাক্যের অনুভুতি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং অর্থ ও শব্দ উভয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে এসেছে তাকে হাদীসে নববী বলে। (কুলিয়াত লি আবিল বাক্কা)

(খ) কোন কোন ইমামের মতে কুরআন মু'জিয (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে কুরআনের মত শব্দ প্রয়োগ করা অসম্ভব) আর হাদীসে কুদসী মু'জিয নয়, তবে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। হাদীসে নববী তো মু'জিয নয়ই, তদুপরী সম্বন্ধটা ও আল্লাহর দিকে নয় বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে।

(গ) আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, কুরআন অবতরণকৃত ঐ সকল শব্দমালা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিব্রীল আ. নিয়ে এসেছেন। পক্ষান্তরে হাদীসে কুদসী যা জিব্রীল নিয়ে আসেননি বরং ইলহামের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয় নবীজীকে জানানো হয়েছে। নবীজী নিজ ভাষায় তা উম্মতকে অবহিত করেছেন। আর হাদীসে নববী ইলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত নবীজির ব্যাপক ধর্মীয় অনুভূতি থেকে যা প্রকাশ হয়েছে। (উসূলে তাফসীর: ২৩)

(ঘ) কাহিনী আল্লামা সাইয়্যিদ আহমদ ইবনুল মুবারক কিতাবুল ইবরীয এ স্বীয় শায়খ সায়্যিদ আব্দুল আযীয দাব্বাগ (র.) এর কারামতের আলোচনা করে বলেন আমার শায়খ এর কারামত অসংখ্য ও অসীম এখানে তার এমন একটি কারামত উল্লেখ করে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানছি যা তার আধ্যাত্মিক উচ্ছাসন ও আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ভান্ডারের পরিচায়ক।

উল্লেখ্য যে, শায়খ প্রচলিত বিদ্যায় অনভিজ্ঞ নিরক্ষর ছিলেন। কোন বিদ্যালয় থেকে সনদ প্রাপ্ত আলেম ছিলেন না। তথাপিও আশ্চর্যের বিষয় এই ছিল যে, সকল প্রশ্নের জবাব এমনভাবে দিতেন যা একজন মুহাদ্দিস, হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ইমামের পক্ষেই সম্ভব। আমি তার বাতেনী অভিজ্ঞতা অনুধাবনের নিমিত্ত হাদীসে সহীহ ও যঈফ, কুরআন হাদীসে কুদুসী ও নববী এর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়ের প্রশ্ন করব।

অবশ্য তখন আমার কাছে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র.) কৃত الدرر المنثرة فى الأحاديث المشتهرة এই কিতাবটি বিদ্যমান ছিল। যাতে তিনি ঐ সকল হাদীস একত্রিত করেছেন যা জনসাধারণের কাছে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, অথচ সনদের দিক দিয়ে এর কোন ভিত্তি নেই। আমি এরকম একটি হাদিস أمرت أن أحكم بالظواهر والله يتولى السرائر সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন নবীজি একথা বলেননি। এদিকে আমি দেখছি সুয়ূতীও তাকে জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অতঃপর এমন আরেকটি হাদীস كنت كنزا إلا أعرف সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে পূর্বের ন্যায় উত্তর দেন, সুয়ূতীও তাকে জাল হাদীস বলেছেন।

অতঃপর এমন আরেকটি হাদীস اول ماخلق الله العقل সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি একই উত্তর দেন। আমিও দেখলাম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও ইবনুল জাওযী একে জাল হাদীস বলে গণ্য করেছেন।

অবশেষে আমি আরজ করলাম শায়খ আমায় আপনি যেভাবে বলেছেন আইম্মায়ে হাদীসগণও সেভাবেই উক্ত হাদীস গুলিকে মাওযু ও ভিত্তিহীন বলেছেন।

এভাবে অনেক হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম আর তন্ময় হয়ে তার জবাবগুলি শুনলাম। বিশেষ করে সীমাহীন আশ্চর্যবোধ করছিলাম তখন, যখন শায়খ সহীহ হাদীসগুলির মধ্যে এই পর্যন্ত বলতে শুরু করলেন যে, এই হাদীসটি সহীহাইনে আছে, বা একটি আছে, বা সহীহাইন ভিন্ন অন্য কিতাবে আছে।

আমি শুধালাম হে শায়খ! আপনি কিভাবে এই পার্থক্য নির্ণয় করেন। জবাবে তিনি বললেন, তোমরা দেখে থাক প্রচন্ড শীতকালে কেউ কথা বললে তার মুখ থেকে শব্দের সাথে ধোয়া বের হয়, গ্রীষ্মকালে বের হয় না। ঠিক তদ্রুপ যে ব্যক্তি নবীজির হাদীস উচ্চারণ করে তার মুখ থেকে শব্দের সাথে এক প্রকার নূর (আলো) বের হয়।' পক্ষান্তরে হাদীস ভিন্ন অন্য বাক্য নূর বিহীন বের হয়।

এছাড়া এও বললেন- 'নবীজির বাণী শ্রবণে আরেফীন (আল্লাহ ওয়ালা) দের অন্তর্জ্ঞান, হৃদয়ের জ্যোতি বৃদ্ধি পায় এতেই তারা অনুভব করেন যে, আমাদের কান নবীজির বাণী শ্রবণ করছে। অপর দিকে নবীজির বাণী ছাড়া অন্য কোন কথা শ্রবণে এই বৃদ্ধি হয় না। বরং অন্তর পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকে। মারিফাতের সমুদ্রে কোন তরঙ্গ সৃষ্টি হয় না। আমার কাছে যখন

স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শায়খ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার, হাদীস পরিচয়ে তার দৃঢ়পদ কখনো নড়বড়ে হয় না, তখন আমি ইচ্ছা করলাম কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্যের প্রশ্ন করে তাকে পরীক্ষা করব, যেহেতু তিনি হাফেযে কুরআন ছিলেন না। তাই আমি তার মুখোমুখি বসে কখনো কোন আয়াত তিলাওয়াত করে জিজ্ঞেস করতাম এটা হাদীস নাকি আয়াত? তিনি বলতেন আয়াত, আবার কখনো হাদীস পাঠ করে বলতাম, এটা আয়াত নাকি হাদীস? বলতেন হাদীস, এভাবে আমি অনেক আয়াত ও হাদীস তার সামনে পেশ করি। তিনি তার অন্তর্জ্ঞান দিয়ে সঠিক জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি একটি আয়াতের মধ্যখানে তাফসীরী শব্দসহ

حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى وهى العصر وقوموا لله قانتين

তিলাওয়াত করে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এ বাক্যে কুরআনও আছে হাদীসও আছে। وهى العصر তো নবীজির বাণী, বাকীটুকু আয়াত। আমার সাথে

মজলিসে ফুকাহা মুহাদ্দেসীনের একটি অংশ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তার এই ইলমী গভীরতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অবাক হলেন।

এরপর আমি ইচ্ছা করলাম কুরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য জানব। আমি ভাবতাম ইহা প্রচলিত হাদীস শাস্ত্র ও কুরআনের হাফেয হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ বাহ্যতঃ হাদীসে কুদসীও আয়াতে কুরআনী উভয়ের উপস্থাপনের শিরোনাম قال الله تبارك وتعالى হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়-

قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلواة فاغسلوا إلى آخرالأية

قال الله تبارك وتعالى كذابني ابن أدم ولم يكن له ذالك وشتمني إلى آخرالحديث

তাই আমি হাদীসে কুদসীগুলো উপরোক্ত শিরোনাম সহকারে শায়খের সামনে উপস্থাপন করতে থাকলাম আর জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম ইহা কি কুরআন?

জবাবে তিনি বলতে লাগলেন ইহা কুরআনও নয় আবার ঐ প্রকার হাদীসও নয় যেগুলি সম্পর্কে তুমি ইতিপূর্বে প্রশ্ন করতেছিলে। বরং ইহাতো হাদীসের এমন প্রকার হবে যাকে হাদীসে রব্বানী বলা যায়। আমি অনিচ্ছায় শায়খের দস্ত মোবারকে চুমু দিলাম আর আরজ করলাম, হযরত আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে কুরআন, হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববী বিষয়ত্রয়ের এমন পার্থক্য বাতলে দিন যা আমার অন্তর্চক্ষু দিয়ে অনুভব করব। উত্তরে তিনি বললেন, 'যদিও প্রত্যেকটি বাক্যই নবীজির যবান মুবারক থেকে নির্গত এবং প্রত্যেকটিতেই নূর আছে তবুও প্রকার তিনটির মাঝে পার্থক্য আছে। কুরআনে যে নূর বিদ্যমান তা আল্লাহ তা'লার সত্তাগত অবিনশ্বর চিরস্থায়ী নূর। হাদীসে কুদসীতে যে নূর বিদ্যমান তা নবীজির রূহের নূর যা কুরআনের নূরের মতো চিরস্থায়ী নয়, নশ্বর। হাদীসে নববীতে যে নূর পাওয়া যায় তা নবীজির সত্তা ও অস্তিত্ব গত (শারীরিক) নূর। মোদ্দাকথা কুরআন আল্লাহর অবিনশ্বর নূর, হাদীসে কুদসী নবীজির আত্মার নূর এবং হাদীসে নববী তাঁর শারিরীক নূর। আমার তৃষ্ণা যেন মিটেনা, জিজ্ঞেস করলাম নবীজির আত্মার নূর ও শারীরিক নূরের মর্ম ও পার্থক্যটা একটু বলবেন? শায়খেরও যেন বিরক্তি নেই, অনর্গল বলে যাচ্ছেন, শরীর মাটি দ্বারা সৃষ্ট এবং মাটি দ্বারাই আদম আ. ও সমগ্র আদম সন্তান সৃষ্ট, আর আত্মা (ملأ أعلى) উর্ধ্বজগত থেকে আগত যেমন আল্লাহ বলেন (قل الروح من أمر ربي) (বলে দাও আত্মা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ মাত্র) তাই সকল আত্মার নূরের সম্পর্ক হবে আল্লাহর সাথে এবং শারীরিক দৈহিক নুরের সম্পর্ক হবে সৃষ্ট জীবের সাথে। যেহেতু হাদীসে কুদসী আত্মার নূরের মধ্যস্থতায় আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত তাই দেখা যায়, হাদীসে কুদসী

আল্লাহর কর্তৃত্ব, মহত্ব, গুণাবলী, অবারিত রহমত, অসম্ভব ক্ষমতা, অজস্র দান-অনুগ্রহের বর্ণনায় সমৃদ্ধ। এমন একটি হাদীসে কুদসী নিম্নরূপ-

يا عبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل وأحد منكم مازاد ذالك فى ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل وأحد منكم ما نقص ذالك من ملكى شيئا يا عبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسئلوني فاعطيت كل انسان مسئلته مانقص ذالك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اذا أدخل البحر فى رواية عطائي كلام وعذابي كلام انما امرى لشيئ إذا اردت أن اقول له كن فيكون

হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের পূর্বাপর সকল মানব দানব তোমাদের মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্টতম পরহেজগার হৃদয়ের অধিকারীর মত হয়ে যায়, এতে আমার রাজত্বে বিন্দু পরিমাণ বৃদ্ধি হবে না। আর যদি সর্বনিকৃষ্ঠতম পাপিষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারীর মত হয়ে যায়, এতে আমার রাজত্বে কিঞ্চিৎ পরিমাণ হ্রাসও হবে না।

হে আমার বান্দাগণ যদি তোমাদের পূর্বাপর সমগ্র মানব দানব এক ভুখন্ডে একত্রিত হয়ে প্রত্যেকেই তার (সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পেশ করে, আর আমি সকলের সমুদয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি তবুও আমার ভান্ডার থেকে কমবে না। তবে সমুদ্রে চোবানো সুঁই সমুদ্র থেকে যা কমায়। কারণ কথাই আমার দান কথাই আমার শাস্তি। কোন কিছু করার ইচ্ছা করে বলতে চাই 'হও' এমনিই হয়ে যায়। (মুসলিম, মেশকাত: ২০৩/আহমদ,তিরমিযী, ইবনে মাযা মিশকাত ২০৫)

আরেক হাদীসে কুদসী

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عيين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি, কোন মানব হৃদয় কোনদিন কল্পনাও করেনি। (সহীহ বুখারী, মুসলিম, মেশকাত: ৪৯৫) পক্ষান্তরে হাদীসে নববীতে হারাম-হালাল, পুরস্কার, তিরস্কার, জাযা-সাজা, বিশ্ববাসীর নিরাপত্তা, সংশোধন ও সার্বিক কল্যাণের বর্ণনা বিদ্যমান থাকে।

মোট কথা হাদীসে কুদুসী যা উর্ধ্বজগত ও আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত, আর হাদীসে নববী যা ইহজগতের বিধিবিধান সম্বলিত হয়ে থাকে। (উসূলে তাফসীর: ২৬) মালিক কান্দলভী (র.) কৃত

تعريف علم الحديث

ইলমে হাদীসের সংজ্ঞা

(১) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) উমদাতুল ক্বারী গ্রন্থে লিখেন-

علم يبحث فيه عن أقوال رسول الله ﷺ وأفعاله وأحواله

যে শাস্ত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমে হাদীস বলে।

নোট: এই সংজ্ঞা পূর্ণাঙ্গ নয়, কারণ ইহা সাহাবী ও তাবেঈদের বর্ণিত হাদীসে মওকুফ ও মাক্বতুকে সন্নিবেশিত করে না।

(২) ফতহুল বাকী শরহে আলফিয়াতুল ইরাকী এর গ্রন্থকার লিখেন

معرفة ما أضيف إلى رسول الله ﷺ إوإلى صحابى أوالى من دونه قولا أو فعلا أو صفة أو تقريرا.

যে শাস্ত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী বা পরবর্তী কারো কথা, কাজ, গুন, সমর্থন নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমে হাদীস বলে।

নোট: এই সংজ্ঞা পূর্ণাঙ্গ হলেও হাদীসের বহির্ভূত বিষয়াদি যেমন রাজা বাদশাহর ইতিহাস, কাহিনীর জন্য প্রতিবন্ধক নয়। এই সংজ্ঞার আলোকে রাজা বাদশাহর কাহিনীকেও হাদীস বলতে হয়।

(৩) আল্লামা তাক্বী উসমানী(দা. বা:) দরসে তিরমিযীতে বলেন-

هو معرفة ما أضيف إلى رسول الله ﷺ أو إلى صحابى أو إلى من دونه ممن يقتدى بهم فى الدين قولا أو فعلا أو صفة أو تقريرا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী, অথবা পরবর্তী যুগের ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তির কথা, কাজ, গুন, সমর্থন জানার নাম ইলমে হাদীস।

নোট: এই সংজ্ঞায় ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তির কোন সীমারেখা নেই। ফলে এ সংজ্ঞার আলোকে ইমাম, মুয়াজ্জিন, মুদাররিস, মুহাদ্দিস, মুফতী, মুফাসসিরসহ সকল আলেমের কথা, কাজকে হাদীস বলতে হবে, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(৪) কোন কোন মুহাদ্দেসীন ইলমে হাদীসের পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব সম্মত সংজ্ঞা এভাবে করেছেন-

هو معرفة ما أضيف إلى رسول الله ﷺ أو إلى صحابى أو إلى من دونه ممن يقتدى بهم فى الدين من القرون الثلاثة قولا أو فعلا أو تقرير أو صفة

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী অথবা কুরূনে ছালাছার ভিতরকার ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসরীয় ব্যক্তির কথা, কাজ, অথবা অবস্থা জানার নাম ইলমে হাদীস।

(৫) মুহাম্মাদ আকিল সাহেব বলেন-

هوعلم يشتمل على أقوال النبي ﷺ أو الصحابى أو من دونه ممن يقتدى بهم فى الدين من القرون الثلاثة أو أفعالهم وأحوالهم

موضوع علم الحديث
ইলমে হাদীসের আলোচ্য বিষয়

ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله

আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে মহানবীর সত্ত্বা ও ব্যক্তিত্ব।

غرض علم الحديث
ইলমে হাদীসের উদ্দেশ্য

معرفة كيفية الاقتداء به أى النبي ﷺ

মহানবী সা.-এর অনুসরণের পদ্ধতি জানা।

أصناف علم الحديث
ইলমে হাদীসের প্রকারভেদ

ইলমে হাদীস প্রথমত দুই প্রকার:

(১) علم الحديث رواية / علم رواية الحديث

বা হাদীসের তথ্য/অনুসন্ধান জ্ঞান।

(২) علم الحديث دراية / علم درية الحديث

বা হাদীসের তত্ত্ব/ ব্যাখ্যা জ্ঞান।

علم الحديث رواية / علم رواية الحديث

হাদীসের তথ্য/অনুসন্ধান জ্ঞান

هو علم بنقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها

নবীজির কথা কাজ অবস্থাকে অবিচ্ছেদ্য শ্রবণের মাধমে বর্ণনা করা, সংরক্ষণ করা ও লিখার জ্ঞান অর্জন করা। (অর্থাৎ কোন হাদীস কোন কিতাবে, কোন সনদে, কোন শব্দে বর্ণিত আছে এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে যে শাস্ত্রের আলোচনা করা হয় তাকে ইলমে রিওয়ায়াতুল হাদীস বলে।

الموضوع: আলোচ্য বিষয়: الحديث المذكور من حيث النقل

তথ্য ও অনুসন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখিত হাদীস

الغرض: উদ্দেশ্য: الصيانة عن الخطأ في نقل الحديث المذكور وضبطه وتحريره;
উল্লেখিত হাদীসের লিখন পঠন ও বর্ণনায় ত্রুটিমুক্ত হওয়া।

علم الحديث دراية / علم دراية الحديث

হাদীসের তত্ত্ব/ব্যাখ্যা জ্ঞান

هو علم يبحث فيه عن أحوال السند ومعانى المتن

(১) কোন কোন মুহাদ্দেসীন বলেন: যে শাস্ত্রে হাদীসের সনদের অবস্থা ও মতনের মর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমে দিরায়াতুল হাদীস বলে।

(২) আল্লামা তক্বী উসমানী (দা. বা:) বলেন-

هو علم يتعرف به أنواع الرواية أو حكامها وشروط الروايات واصناف الروايات واستخراج معانيها

যে শাস্ত্রের মাধ্যমে রিওয়ায়াতের প্রকারভেদ (যেমন মারফূ', মাওকুফ, মাক্বতু') বিধান (যেমন মাকবূল, মরদূদ) রাবীদের শর্তসমূহ (যেমন আ'দিল যাবিত্ব) বর্ণিত হাদীসগুলির স্তর বিন্যাস (যেমন সহীহ, হাসান, যইফ ও মর্ম উদঘাটনের পদ্ধতি জানা যায় তাকে ইলমে দিরায়াতুল হাদীস বলে।

(৩) আমার উস্তাদ শায়খুল হাদীস আল্লামা ইসহাক জালালাবাদী (র.) বলেন -

هو علم ذو قوانين يعرف به أحوال السند والمتن

যে কানুন সম্বলিত শাস্ত্রের মাধ্যমে সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায় তাকে ইলমে দিরায়াতুল হাদীস বলে।

(৪) কোন কোন অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসীন বলেন:

هو علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها مبنيا على قواعد الشريعة وضوابط العربية مطابقا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم

যে শাস্ত্রে হাদীসের শব্দ থেকে চয়নকৃত এমন অর্থ ও মর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয় যা শরীয়তের কানুনসমূহ, আরবী রীতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাকে ইলমে দিরায়াতুল হাদীস বলে।

الموضوع : আলোচ্য বিষয়

السند من حيث الانتقاد والمتن من حيث الاستنباط

যাচাই-বাছাই এর দৃষ্টিভঙ্গিতে হাদীসের সনদ। এবং
মর্ম উদঘাটনের দৃষ্টিভঙ্গিতে হাদীসের মতন।

الغرض : উদ্দেশ্য

الصيانة عن الخطأ فى الانتقاد والاستنباط

যাচাই-বাছাই ও মর্ম উদঘাটনে ত্রুটিমুক্ত হওয়া
ইলমে দিরায়াতুল হাদীস আবার দুই প্রকার:

علم اصول الحديث বা হাদীসের সুত্রজ্ঞান।

علم فقه الحديث বা হাদীসের মর্মজ্ঞা

علم أصول الحديث
হাদীসের সূত্রজ্ঞান

هو علم يبحث فيه عن سند الحديث أصلا وعن متنه ضمنا

যে শাস্ত্রে হাদীসের সনদ ও শব্দ নিয়ে মুল আলোচনা এবং মতন ও অর্থ নিয়ে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমে উসূলে হাদীস বা হাদীসের সুত্রজ্ঞান বা হাদীস ব্যাখ্যার মূলনীতি বলে।

الموضوع : আলোচ্য বিষয়

السند أصلا أو المتن ضمنا : মূলত সনদ, প্রসঙ্গত মতন।

الغرض : উদ্দেশ্য

الصيانة عن الخطأ فى انتقاد السند

সনদ যাচাই বাছাইয়ে ত্রুটিমুক্ত হওয়া।

علم فقه الحديث : **হাদীসের মর্মজ্ঞান**

هو علم يبحث فيه عن معاني الحديث أصلا وعن سنده ضمنا

যে শাস্ত্রে হাদীসের অর্থ নিয়ে মূল আলোচনা, এবং সনদ নিয়ে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা হয় তাকে ইলমে ফিকহুল হাদীস বা হাদীসের মর্ম জ্ঞান বলে।

الموضوع : আলোচ্য বিষয়

المتن أصلا و السند ضمنا : মূলত: মতন, প্রসঙ্গত সনদ।

الغرض: উদ্দেশ্য

الصيانة عن الخطأ فى استنباط معاني الحديث

হাদীসের অর্থ চয়নে ত্রুটি মুক্ত হওয়া।

ইলমে হাদীসের প্রকার চতুষ্টয়ের সারাংশ

(১) ইলমে রিওয়ায়াতুল হাদীসের মাধ্যমে জানা যাবে কোন হাদীস কোন কিতাবে কোন সনদে কোন শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

(২) ইলমে দিরায়াতুল হাদীসের মাধ্যমে জানা যাবে, হাদীসখানা মুতাওয়াতির নাকি মাশহুর, সহীহ নাকি যঈফ, মুত্তাসিল নাকি মুনক্বাতি, হাদীসখানার

বর্ণনাকারী বিশ্বস্থ নাকি অবিশ্বস্থ। এছাড়াও জানা যাবে হাদীসখানার অর্থ কি? ইহা থেকে কোন কোন মাসআলা বের হয়, হাদীস খানা অন্য কোন হাদীসের বিরোধী মনে হয় কিনা? হলে তার সামঞ্জস্য কিভাবে?

(৩) ইলমে উসূলে হাদীসের মাধ্যমে শুধু জানা যাবে, মুতাওয়াতির, মাশহুর ইত্যাদি।

(৪) ইলমে ফিকহুল হাদীসের মাধ্যমে শুধু জানা যাবে হাদীসের অর্থ, হাদীস থেকে চয়নকৃত মাসআলা ইত্যাদি।

وجوه تسمية الحديث بالحديث: হাদীসের নামকরণের কারণসমূহ

(১) আল্লামা জালালুদ্দীন (র.) বলেন حديث হাদীস অর্থ নব আবিষ্কার হওয়া ক্রমশ: ক্রমশ:প্রকাশ পাওয়া, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা কাজ অবস্থাগুলি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ প্রকাশ পেয়েছে তাই এ গুলোকে حديث হাদীস বলে।

(২) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন হাদীস শব্দটি ক্বাদীম এর বিপরীত যেহেতু আল্লাহর বানী কুরআন মাজীদকে ক্বাদীম বলা হয়, তাই এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ইত্যাদিকে হাদীস বলা হয়।

(৩) আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী বলেন, حديث এসেছে فَحَدِّثْ থেকে।

সূরা (ضحى) তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত বড় বড় তিনটি নিয়ামতের কথা আলোচনা হয়েছে। প্রতিটি নিয়ামতের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর করণীয় কী? তাও উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি নিয়ামতের আলোচনা এভাবে হয়েছে যে, 'আপনি ইলম ও হেদায়াত সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন, আল্লাহ আপনাকে অবহিত করেছেন। এ নিয়ামতের বিনিময়ে করণীয় হিসাবে নির্দেশ এসেছে فَحَدِّثْ অর্থাৎ আপনার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত ইলম ও হেদায়াত মানব দানবের মাঝে বর্ণনা কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা, কাজ ও অবস্থা فَحَدِّثْ নির্দেশের কারণে প্রকাশ করেছেন, তাই তাঁর কথা, কাজ ও অবস্থাকে হাদীস বলা হয়।

(৪) আল্লামা তাক্বী উসমানী সাহেব বলেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর কথা, কাজ ও অবস্থা বোঝানোর জন্য حديث শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন-

(١) حدثوا عني ولاحرج صحيح مسلم ج٢ ص ٤١٤

(٢) عن على رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللّٰهُمَّ ارحم خلفائي قلنا من خلفائك يا رسول الله قال الذين ياتون من بعدي يروون احاديثي ويعلمونها الناس (ألإلماع: صـ ١٧)

(٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حفظ على أمتي أربعين حدثنا فى أمردينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا (مشكوة: صـ ٢٦)

(٤) عن سمرة بن مغيرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين (مسلم)

(٥) عن بن عباس رضـ قال قال رسول الله ﷺ اللّٰهُمَّ ارحم خلفائى قلنا من خلفائك يا رسول الله قال الذين يرون أحاديثى ويعلمونها الناس (رواه الطبرانى فى الاوسط)

(٦) عن ابن عباس ﷺ قال قال رسول الله ﷺ اتقوا الحديث عني الاما علمتم فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. (مشكوة: ٢٥)

প্রথমোক্ত তিনটি কারণে একথার উল্লেখ নেই যে কে, কখন নামকমরণ করেছেন এজন্য দীর্ঘ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেহেতু চতুর্থটিতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নামকরণের তত্ত্ব পাওয়া গেল। তাই চতুর্থ কারণটিই সর্বাধিক গ্রহণীয় হবে।

উসূলে হাদীসের আবিষ্কার ও এর উন্নতির ক্রমধারা

প্রথমে উসূলে হাদীস ছিল মৌখিক, হাদীসের কিতাব রচনার সাথে সাথে তাও রচনায় আসে বিক্ষিপ্তভাবে, স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ সংকলনে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের তালিকা নিম্নরূপঃ

১। আলী ইবনে মাদীনী (র.) (১৬১-২৩৪ হি.) তিনি কয়েক অধ্যায়ের একখানা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন।

২। ইমাম শাফেঈ (র.) (১৫০-২০৪ হি.) তিনি الرسالة নামক পুস্তিকায় উসূলে ফিকাহের মাঝে মাঝে حكم المرسل ـ قبول حديث المدلس ـ الرواية بالمعنى ـ شرط حفظ الراوي ইত্যাদির আলোচনা করেছেন।

৩। ঈসা বিন আবান (র.) (১৫০-২২১ হি.) তিনি তার الحجة الصغيرة এর মুকাদ্দিমায় উসূলে হাদীস নিয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।

৪। ইমাম দারেমী (র.) (১৮১-২৫৫) তিনি স্বীয় سنن دارمي এর মুকাদ্দিমায় উসূলে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন।

৫। ইমাম মুসলিম (র.) (২০৪-২৬১) স্বীয় অমর গ্রন্থ صحيح مسلم এর মুকাদ্দিমায় উসূলে হাদীসের বিশদ আলোচনা করেছেন।

৬। ইমাম তিরমিযী (র.) (২০৯-২৭৯ হি.) তিরমিযী শরীফ এর শেষের দিকে স্বতন্ত্রভাবে উসূলে হাদীসের আলোচনা করেছেন।

৭। ইমাম আবূ দাউদ (র.) (২০২-২৭৫ হি.) মক্কাবাসীর উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁর رسالته في نصف سنة তে এই আলোচনা করেছেন।

৮। আহমদ বিন আমর আল বাযযার (র.) (২৯০ হি.) ও এ আলোচনায় বিশেষ অবদান রেখেছেন।

৯। ইমাম ত্বাহাবী (র.) (২৩৯-৩২১ হি.) তিনি তাঁর التسوية بين حدثنا وأخبرنا فما سمع من الشيخ أو قرئ عليه নামক গ্রন্থে উসূলে হাদীসের বিশ্লেষণ করেছেন।

১০। আরো অনেকে স্বতন্ত্র বা অন্য বিষয়ের অধীনে উসূলে হাদীসের জরুরী আলোচনা করেছেন। এই ক্রমধারা ছিল হিজরী চতুর্থ শতাব্দির পূর্ব পর্যন্ত।

(لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لابي غده)

নুখবাতুল ফিকার ও শরহে নুখবাহ সংকলনের কারণ

উসূলে হাদীসের লিখকসহ কতিপয় গ্রন্থ: উসূলে হাদীসের উপর নুখবাতুল ফিকার প্রথম কিতাব নয়। এর পূর্বে অনেকে এ শাস্ত্রে কিতাব রচনা করেছেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় তিনি নুখবাতুল ফিকার লিখার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত গ্রহনের নেপথ্য কারণ কি ছিল? এবং কোন প্রেক্ষাপটে তিনি এ কিতাব রচনার সিদ্ধান্ত নেন? তা তিনি নিজেই গ্রন্থটির ভূমিকায় তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেন: হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের মনীষীদের প্রচুর রচনা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম দিকের অন্যতম লেখক কাজী আবূ মুহাম্মদ হাসান বিন খাল্লাদ রামাহরমুযী (২৬৫-৩৬০ হি.) কৃত (১) المحدث الفاضل بين الراوى والواعى। কিন্তু তিনি তাতে এ সংক্রান্ত সকল বিষয় সন্নিবেশিত করেননি। অতঃপর হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (৩২১-৪০৫ হি.) কৃত (২) معرفة علوم الحديث ও (৩) المدخل الى معرفة الصحيح والسقيم من الاخبار। কিন্তু তাঁর গ্রন্থদ্বয় পরিমার্জিত ও বিন্যস্ত ছিলনা। আবু নাঈম ইস্পাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি.) কৃত (৪) المستخرج على علوم الحديث। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরীর গ্রন্থথেকে যে বিষয় গুলো বাদ পড়ে গিয়েছিল তা সংযুক্ত করেন। তথাপি আরো বেশ কিছু বিষয় থেকে যায়, যা পরবর্তীগন সংকলন করেন। অতঃপর আবু বকর খতীবে বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.) হাদীস বর্ণনার নিয়ম কানুন সম্পর্কে (৫) الكفاية على علوم الحديث ও হাদীস বর্ণনার আদব ও শিষ্টাচার সম্পর্কে (৬) الجامع لاداب الشيخ و السامع রচনা করেন। এমনকি হাদীস শাস্ত্রেও প্রায় সকল বিষয়ে তিনি পৃথক পৃথক কিতাব রচনা করেন। অতঃপর আরো কতিপয় মনীষী আবির্ভূত হন যারা এ বিষয়ে ছিলেন যথার্থ পারদর্শী। যেমন কাযী ইয়ায (৪৭৯-৫৫৫ হি.) কৃত

(৭) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع। অতঃপর আবু হাফস ওমর আল মাইয়ানিযী (৪৭৫-৫৫৫ হি.) কৃত

(৮) ما لايسع للمحدث جهله এবং সর্বশেষে ফকীহ তকীউদ্দীন ওসমান বিন সালাহুদ্দীন শাহরাযুরী (৫৭৭-৬৪৩ হি.) কৃত

(৯) معرفة أنواع علم الحديث যার অপর নাম مقدمة ابن الصلاح। এই গ্রন্থখানা অল্প অল্প করে অনেক দিন ধরে রচনা করায় এর বিন্যাস যথোপযুক্ত হয়নি। গ্রন্থটি মূলত: খতীবে বাগদাদীর বিভিন্ন রচনার উপর ভিত্তিকরে সেসব রচনার বিক্ষিপ্ত বিষয়সমূহ একত্রিত করেন এবং তার সাথে সংযোজন

করেন অন্যান্য গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত বিষয়গুলি। ফলে তাঁর গ্রন্থখানা অনেকগুলি গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকা বিষয়বস্তুর অপূর্ব সমাহার। তাই মানুষ এর দিকে ঝুকে পড়ল, এবং তা আয়ত্ত ও সহজ করার চেষ্টায় মগ্ন হল। এরই ধারাবাহিকতায় আমার কতিপয় দ্বীনি ভাই-বন্ধু আমাকে অনুরোধ করেন উসূলে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সংক্ষেপে রচনা করার জন্য। তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে আমি কয়েক পৃষ্টায় উসূলে হাদীসের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে এর নাম রেখেছি

(১০) نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر এই গ্রন্থখানা ইঙ্গিত ও রহস্যের ভান্ডার হওয়ায় দ্বিতীয়বার আমাকে উৎসাহিত করা হয় এর একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখার জন্য। তাই বিরল পন্থায় একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখলাম যার নাম (১১) نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر যা শরহে নুখবা নামে যুগ যুগ ধরে দরসে নেযামীর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

أقسام الحديث
হাদীসের প্রকারভেদ

সাতটি বিভক্তির মাধ্যমে হাদীসের প্রায় সকল (৭৫) প্রকারকে সন্নিবেশিত করা যায়।

প্রথম বিভক্তি: হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যার অনুপাতে চার প্রকার।

(১) মুতাওয়াতির (متواتر) (২) মাশহুর (مشهور) (৩) আযীয (عزيز) (৪) গরীব (غريب)

দ্বিতীয় বিভক্তি: হাদীসের সনদের শেষ প্রান্ত অনুপাতে তিন প্রকার।

(১) মারফূ' (مرفوع) (২) মাওকূফ (موقوف) (৩) মাকতু' (مقطوع)

তৃতীয় বিভক্তি: হাদীসের বর্ণনাকারীদের: দোষগুন অনুপাতে ৪০ প্রকার।

ইহা আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

(১) রাউইর দোষের প্রতিকার থাকা বা না থাকার অনুপাতে সাত প্রকার।

১। مقبول মাকবূল ২। مردود মারদূদ ৩। صحيح لذاته সহীহ লিযাতিহী ৪। حسن لذاته হাসান লিযাতিহী ৫। ضعيف যঈফ ৬। صحيح لغيره সহীহ লিগাইরিহী ৭। حسن لغيره হাসান লিগাইরিহী

(২) রাউইর বৃদ্ধির বর্ণনা অনুপাতে ৫ প্রকার,

১। مقبول (আরেক) মাকবুল ২। محفوظ মাহফুজ ৩। شاذ শায ৪। معروف মারুফ ৫। منكر মুনকার

(৩) হাদীসের পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতো অনুপাতে সাত প্রকার

১। محكم মুহকাম ২। مختلف الحديث মুখতালাফুল হাদীস ৩। ناسخ নাসিখ ৪। منسوخ মানসূখ ৫। راجح রাজিহ ৬। مرجوح মারজূহ ৭। متوقف فيه মুতাওয়াক্কাফ ফীহি

(৪) আদালত বিনষ্টকারীর দোষ অনুপাতে চার প্রকার

১। موضوع মাওযু' ২। متروك মাতরূক ৩। منكر মুনকার

৪। حديث المبتدع বিদআতী কতৃক বর্ণিত হাদীস

(৫) যবত বিনষ্টকারীর দুষ, বিশ্বস্ত রাউইর বিরোধীতা ও রাউইর অপরিচিতি হিসাবে সতের প্রকার

১। معلل মু'আল্লাল ২। مدرج الإسناد মুদরাজুল ইসনাদ

৩। مدرج المتن মুদরাজুল মতন ৪। مقلوب মাক্বলূব

৫। مزيد فى متصل الأسانيد মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানিদ

৬। مضطرب মুযতারাব ৭। مصحّف মুসাহহাফ ৮। محرّف মুহাররাফ ৯। متّفق ومفترق মুত্তাফিক্ব ও মুফতারিক্ব

১০। مؤتلف ومختلف মু'তালিফ ও মুখতালিফ

১১। متساوي মুতাসাউই ১২। حديث غير مُسَمًّى হাদীসু গাইরি মুসাম্মা ১৩। حديث غير المعروف হাদীসু গাইরীল মা'রুফ

১৪। حديث مجهول العين হাদীসু মাজহুলিল আইন

১৫। حديث مجهول الحال হাদীসু মাজহুলিল হাল

১৬। الشاذ الأخر অন্য প্রকার শায ১৭। مختلف মুখতালিফ

৪র্থ বিভক্তি: সনদ থেকে কোন রাউইর নাম লুপ্ত হওয়া না হওয়ার অনুপাতে ৭ প্রকার।

১) متصل মুত্তাসিল ২) مسند মুসনাদ ৩) مرسل মুরসাল ৪) معضل মু'যাল ৫) منقطع মুনকাতি' ৬। معلق মুয়াল্লাক ৭) مدلس মুদাল্লাস

৫ম বিভক্তি: সনদের واسطة বা মাধ্যম কমবেশী হওয়া অনুপাতে ১১ প্রকার।

১) عالي আলী ২) نازل নাযিল ৩) مساوي মুসাবি ৪) العالي المطلق মুত্বলাক্ব আলী ৫) العالى النسابي নিসাবী আলী ৬) النازل المطلق মুত্বলাক্ব নাযিল ৭) النسابي النازل নিসাবী নাযিল ৮) موافقة মুয়াফাকাত ৯) بدل বদল ১০) مساواة মুসাওয়াত ১১) مصافحة মুসাফাহা

৬ষ্ঠ বিভক্তি: كيفية الرواية বা বর্ণনার ধরন (কোন স্তর থেকে কোন স্তর বর্ণনা করেছেন) অনুপাতে আট প্রকার।

১) رواية الأقرآن রিওয়ায়াতুল আক্বরান ২) رواية المدبج রিওয়ায়তুল মাদুব্বাজ ৩) رواية الأكابر عن الأصاغر রিওয়ায়তুল আকাবির আনিল আসাগির ৪) رواية الأصاغر عن الأكابر রিওয়ায়তুল আসাগির আনিল আকাবির ৫) رواية السابق রিওয়ায়তুস সাবিক ৬) رواية اللاحق রিওয়ায়তুল লাহিক্ব ৭) رواية المهمل রিওয়ায়তুল মুহমাল

৮) روايةمن حدث ونسى রিওয়ায়তু মান হাদ্দাসা ওয়ানাসিয়া।

৭ম বিভক্তি: হাদীস বর্ণনায় শব্দ প্রয়োগ ও রাউইদের অবস্থান অনুপাতে দুই প্রকার:

১) مسلسل মুসালসাল ২) معنعن মুআ'নআ'ন'।

(সংক্ষেপে গেল মোট ৭৫ প্রকার হাদীস)

নীচে প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা, শর্ত ও হুকুম বর্ণনা করা হল।

১ম বিভক্তি: হাদীসের বর্ণনাকারী (রাউই)র সংখ্যা অনুপাতে চার প্রকার।

১) মুতাওয়াতির متواتر ২) মাশহুর, مشهور ৩) আযীযعزيز ৪) গারীব غريب

মুতাওয়াতির متواتر আভিধানিক অর্থ متواترশব্দটি تفاعل বাবের التواتر মাসদার থেকে নির্গত অর্থ ধারাবাহিকভাবে আগমন করা এ হিসাবে متواتر শব্দটিاسم فاعل এর সীগাহ। অর্থ ধারাবাহিকভাবে আগমনকারী।

পারিভাষিক অর্থ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন-

وان بلغت رواته في الكثرة إلى ان يستحيل العادة تواطئهم واجتماعهم على الكذب يسمى متواترا

মুতাওয়াতির এর উদাহরণ:

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

এছাড়াও মোজার উপর মাসেহ করা ও খতমে নবুওত সম্বলিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির।

মুতাওয়াতিরের শর্তাবলী (৫টি)

১) রাউই অসংখ্য হওয়া যদিও কেউ কেউ ৩১৩, ৭০, ৪০, ৭, ৫, ৪ ইত্যাদি সংখ্যার কথা বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।
২) সকল রাউইর মিথ্যার উপর একমত পোষণ অসম্ভব মনে হওয়া।
৩) সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল স্তরে রাউইর সংখ্যাধিক্য বহাল থাকা।
৪) সনদের শেষ রাউই শুনা বা দেখার অনুভুতি প্রকাশ করা।
৫) রাউইদের সংবাদে শ্রোতার দৃঢ় বিশ্বাস علم يقيني অর্জন হওয়া। ৫ম শর্তটিকে কেউ কেউ মুতাওয়াতিরের حكم বা ফায়দা বলেছেন।

العلم الضروري ও العلم النظري এর মধ্যকার পার্থক্য

العلم الضروري

১) যে ইলম কোন প্রকার যুক্তি বিন্যাস ছাড়াই অর্জন হয়,
২) যে ইলম যুক্তিবিন্যাসের যোগ্যতাহীন সাধারণ ব্যক্তির ও অর্জন হয়,
৩) যে ইলম অর্জন করতে মানুষ বাধ্য, অর্জনকে ঠেকাতে পারে না।

العلم النظرى

১) যে ইলম যুক্তিবিন্যাস দ্বারা অর্জন করতে হয়,

২) যে ইলম যুক্তিবিন্যাসের যোগ্যতাহীন সাধারণ ব্যক্তির অর্জন হয় না ,

৩) যে ইলম অর্জন করতে মানুষ বাধ্য নয় , অর্জনকে ঠেকাতে পারে যুক্তিবিন্যাস ত্যাগ করার মাধ্যমে।

মুতাওয়াতিরের হুকুম

এতে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়

ক) আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত

১। علم يقيني বা দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন হওয়া।

২। زيادة على كتاب الله বা এতদ্বারা কুরআনে সংযোজন বৈধ হওয়া।

৩। يجب العمل عليه বা এহেন হাদীসের উপর আমল ওয়াজিব।

৪। نسخ القرآن এতদ্বারা কুরআনে রহিত করণ বৈধ।

৫। تكفير المنكر এহেন হাদীসেরর অস্বীকারকারী কাফের।

খ) হাসান বসরী, কারখী, ইমামুল হারামাইন, আবু বকর জাসসাস ও দাক্কাক এর অভিমত।

علم نظري বা (যৌক্তিক জ্ঞান যা استدلال বা যুক্তি সাজানোর মাধ্যমে অর্জন হয়) এর ফায়দা দেয়।

গ) অধিকাংশ মু'তাযিলাদের অভিমত

১। علم طمانينت বা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান লাভ হয়।

২। অস্বীকারকারী কাফির নয়।

৩। আয়াতে সংযোজন বৈধ।

মুতাওয়াতিরের প্রকারভেদ

ক) জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে মুতাওয়তির দুই প্রকার।

১। التواتر اللفظي ২। التواتر المعنوي

তাওয়াতুরে লফযী

ما تواتر لفظه ومعناه. যে হাদীসের শব্দ ও অর্থ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে যেমন. من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

তাওয়াতুরে মা'নউই

ما تواتر معناه دون لفظه যে হাদীসরে শব্দ নয় বরং অর্থ ধারাবাহিকভাবে বর্নিত হয়ে আসছে যেমন

احاديث اثبات عذاب القبر- احاديث المسح على الخفين

খ) আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (র.) এর মতে মুতাওয়াতির চার প্রকার

১। تواتر الإسناد ۔ ২। تواتر الطبقه

৩। تواتر العمل ۔ ৪। تواتر قدر المشترك

১। تواتر الإسناد বা সনদের ধারাবাহিকতা যে হাদীস বিপুল সংখ্যক রাউইর ধারাবাহিকতায় মিথ্যার সম্ভাবনা দুরীভূত হয়ে বর্ণিত যেমন من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

২। تواتر طبقه বা স্তরের ধারাবাহিকতা যে হাদীস শ্রেণীভিত্তিক বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতায় মিথ্যার সম্ভাবনা দুরীভূত হয়ে বর্নিত। যেমন تواتر قرآن

৩। تواتر عمل বা কর্মের ধারাবাহিকতা যে হাদীস বর্ণনাকারীদের বিশেষ কর্মের ধারাবাহিকতায় মিথ্যার সম্ভাবনা দুরীভূত হয়ে বর্ণিত। যেমন-

تواترالسواك عند الوضوء

৪। تواتر قدر مشترك বা মৌলিক ধারাবাহিকতা যে হাদীসের মৌলিক মর্ম ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হওয়ার কারণে মিথ্যার সম্ভাবনা দুরীভূত যেমন تواتر معجزات

মুতাওয়াতিরের অস্তিত্ব

মুতাওয়াতিরের উদাহরণ আছে কি নেই এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

১। ইবনে হিব্বান ও হাযেমীর মতে মুতাওয়াতিরের উদাহরণ নেই।

২। ইবনুস সালাহ এর মতে আছে তবে খুবই কম।

শুধু من كذب على متعمدا হাদীসটি মুতাওয়াতিরের উদাহরণ।

৩। ইবনে হাজার আসকালানীর মতে, আছে, বেশিই আছে। তিনি বলেন মুতাওয়াতিরের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকার সবচেয়ে বড় দলীল হল হাদীসের যে প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিজ্ঞজনদের হাতে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে এবং এসবের পরে তারাই যে এ কিতাবগুলো লিখেছেন এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই।

যদি এ সকল কিতাবে এক যুগে একটি হাদীস সংকলিত পাওয়া যায় এবং হাদীসটির এত অধিক সংখ্যক সনদ থাকে যে কারনে স্বভাবত মিথ্যার আশংকা দুরীভূত হয়। এভাবে মুতাওয়াতিরের সকল শর্ত পুরণ হয়। তাহলে এটি যে নবীজি সা. এর হাদীস এ বিষয়ে

আমরা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারব। এ ধরনের হাদীসই তো মুতাওয়াতির। আর তা প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে প্রচুর বিদ্যমান।

মাশহুর مشهور

আভিধানিক অর্থ:

مشهور শব্দটি الشهرة মাসদার থেকে اسم مفعول এর সীগাহ। অর্থ প্রসিদ্ধ, প্রকাশিত।

পারিভাষিক অর্থ: আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন-

المشهور ما له طرق محصورة باكثر من اثنين

যে হাদীস দুই এর অধিক তবে সীমিত সংখ্যক রাউই বর্ণনা করেছেন।

মাশহুরের উদাহরণ

১। طلب العلم فريضة على كل مسلم

২। من دل على خير فله مثل أجر فاعله

৩। من أتى الجمعة فليغتسل

মাশহুরের হুকুম

১। علم طمأنينة বা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান লাভ হয়।

২। زيادة على كتاب الله বা কুরআনে সংযোজন বৈধ।

৩। অস্বীকারকারী কাফির নয় ফাসেক -পাপিষ্ট।

মুসতাফীয م س ت ف يض

ক) কারও মতে মাশহুর হাদীসের অপর নাম মুসতাফীয।

খ) কারও মতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

মাশহুর ও মুসতাফীযের পার্থক্য

১। মাশহুরে রাউইর সংখ্যা দুই এর অধিক তবে সকল স্তরে এ সংখ্যা সমান থাকেনা। মুসতাফীজে রাউইর সংখ্যা দুই এর অধিক এবং সকল স্তরে এ সংখ্যা সমান থাকে।

২। কারও মতে মাশহুর মুতাওয়াতিরের অন্তভূক্ত নয়। মুসতাফীয মুতাওয়াতিরের অন্তর্ভূক্ত।

৩। কারও মতে মশহুর মুসতাফীযের নীচের স্তরের। মুসতাফীয মুতাওয়াতির ও মাশহুরের মধ্য স্তরের।

৪। কারও মতে মাশহুর মুতাওয়াতিরের চেয়ে শক্তিশালী নয়। মুসতাফীয মুতাওয়াতিরের চেয়ে শক্তিশালী।

মুসতাফীযের হুকুম

ক) কারও মতে

১। আমল করা ওয়াজিব।

খ) ইমাম জাসসাসের মতে।

১। علم يقيني বা অকাট্য জ্ঞান অর্জন হয়।

২। অস্বীকারকারী কাফির।

গ) জমহুরের মতে।

১। علم ظني বা ধারণামুলক জ্ঞান লাভ হয়।

২। অস্বীকারকারী কাফির নয় ফাসেক- পথভ্রষ্ট।

৩। কুরআনে সংযোজন বৈধ নয়

আযীয (عزيز)

আভিধানিক অর্থ: العزيز অর্থ সম্মানী, শক্তিশালী, বিরল, অপরাজেয় বাদশাহ, আল্লাহর গুণবাচক নাম, মিশরের শাসনকর্তার উপাধি।

পারিভাষিক অর্থ: ক) শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) বলেন

الحديث الصحيح ان كان راويه اثنين يسمى عزيزا যে সহীহ হাদীসের রাবী দু-জন তাকে আযীয বলে।

খ) ইবনে হাজার আসকালানী বলেন العزيز وهو أن لايرويه أقل من اثنين عن اثنين যে হাদীসের সনদে কমপক্ষে দুজন রাউই থাকবেন তাকে আযীয বলে।

আযীযعزيز এর হুকুম

১। علم ظني আমল ওয়াজিব।

৩। অস্বীকারকারী কাফির নয় ফাসেক।

৪। কুরআনে সংযোজ ও রহিতকরণ বৈধ নয়।

আযীযের উদাহরণ

لا يؤمن أحدكم حتي أكون احب إليه من والده وولده والناس أجمعين.

হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া শর্ত কিনা?

১। আবু আলী যাবাঈ মু'তাযিলীর মতে হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া শর্ত, গরীব হাদীস সহীহ হতে পারেনা।

২। জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে শর্ত নয় বরং গরীব হাদীসও সহীহ হতে পারে। এখানে জমহুরের মতই যে সঠিক তার বড় প্রমান হল বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস إنما الأعمال بالنيات এবং শেষ হাদীস كلمتان حبيبتان উভয়টিই গরীব অথচ হাদীসদ্বয় সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

গরীব (غريب)

আভিধানিক অর্থ: অভিনব, মুসাফির, অপরিচিত, আশ্চর্যজনক, দুর্বোধ্য

পারিভাষিক অর্থ:

الغريب وهو مايتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند

যে হাদীস একক রাউই কর্তৃক বর্ণিত, এককত্ব সনদের যে কোন স্থানেই আসুক।

গরীবের হুকুম

বিরুধী হাদীস না থাকার ক্ষেত্রে আমল ওয়াজিব

গরীব হাদীস দুই প্রকার

১। ফরদে মুতলাক فرد مطلق

২। ফরদে নিসাবী فرد نسبي

ফরদে মুতলাক

আভিধানিক অর্থ: সর্বত্র একক, ব্যাপকভাবে একক

পারিভাষিক অর্থ:

ان تكون الغرابة في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع عنه

যে হাদীসের সনদে মূল থেকেই (তাবেঈ থেকে) রাউই একজন হয়।

ফরদে মুতলাকের উদাহরণ

الولاء لحمة كلمة النسب لايباع ولايوهب ولايورث

হাদীসটি ইবনে দিনার তাবেঈ একাকি হযরত উমর থেকে বর্ণনা করেছেন।

الإيمان بضع وسبعون شعبة

হাদীসটি আবু সালিহ তাবেঈ একাকি হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

ফরদে নিসাবী

আভিধানিক অর্থ: আনুপাতিক একক।

পারিভাষিক অর্থ: ان تكون الغرابة في أثناء السند সনদের মাঝে (তাবেঈর পরে) রাউই একজন হওয়া।

ফরদে নিসাবীর উদাহরণ:

أن النبي دخل مكة وعلي رأسه المغفر

হাদীসটি অনেক তাবেঈ হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। পরে যুহরী থেকে শুধু মালিক বর্ণনা করেছেন।

প্রথম বিভক্তির প্রথম প্রকার (মুতাওয়াতির) ছাড়া অবশিষ্ট তিন প্রকার (যথা মাশহুর, আযীয, গারীব) কে একবচনে খবরে ওয়াহিদ, বহুবচনে আখবারে আহাদ বলে। প্রথম প্রকার বা মুতাওয়াতিরের দ্বারা যে প্রকার জ্ঞান অর্জন হবে অবশিষ্ট তিন প্রকার (আখবারে আহাদ)

দ্বারা সেই প্রকারের জ্ঞান লাভ না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে أخبار أحاد যদি محتف بالقرائن বা নিদর্শন জড়িত হয়, তবে সেই আখবারে আহাদ দ্বারা প্রথম প্রকারের মত علم ظني বা যৌক্তিক জ্ঞান লাভ হবে।

الخبر المحتف بالقرائن **নিদর্শন জড়িত খবরে আহাদ তিন প্রকার**

প্রথম প্রকার ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ولم يبلغ حد التواتر

যে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের গ্রন্থদ্বয়ে একযুগে বর্ণনা করেছেন বটে কিন্তু হাদীসটি মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌছায়নি। কারণ তাদের বর্ণিত হাদীস দ্বারা علم نظري বা যৌক্তিক জ্ঞান অর্জন হওয়ার قرينة বা নিদর্শন আছে। তা হলো

১। হাদীস বর্ণনায় তাদের মর্যাদা সর্বোচ্চ।

২। غير صحيح হাদীস থেকে صحيح হাদীসগুলো পৃথক করণে তাঁরা ছিলেন অগ্রগামী।

৩। তাদের গ্রন্থদ্বয়ে সহীহ হাদীস বর্ণনায় তাঁরা ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

৪। তাদের গ্রন্থদ্বয় উলামা মুহাদ্দিসীন তথা গোটা উম্মতে মুসলিমার কাছে সহীহ গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত ও গৃহীত।

এ প্রকারের হাদীস দ্বারা علم نظري অর্জন হবে বলে ঘোষণা করেছেন।

১। উস্তাদ আবু ইসহাক ইসফারাইনী (র.)

২। ইমামুল হাদীস আবু আব্দুল্লাহ হুমাইদী (র.)

৩। ইমামুল হাদীস আবুল ফজল ইবনে ত্বাহির (র.) তবে এই প্রকারের হাদীস থেকে দুই শ্রেণীর হাদীস দ্বারা علم نظري অর্জন হবেনা।

প্রথম শ্রেণী: কিতাবদ্বয়ের যে সকল হাদীসে হুফফাযে হাদীসগণ সমালোচনা করেছেন। এমন হাদীস ২১০টি। শুধু বুখারীতে ৭৮টি, শুধু মুসলিমে ১০০টি উভয় কিতাবে ৩২টি

দ্বিতীয় শ্রেণী: কিতাবদ্বয়ের যে সকল হাদীসের মর্ম উক্ত কিতাবদ্বয়েরই অন্য হাদীসের মর্মের সাথে এমন সাংঘর্ষিক যে উভয় হাদীসের মধ্য থেকে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া যায়না।

দ্বিতীয় প্রকার:

الحديث المشهور إذا كانت له طرق مباينة سالمة عن ضعف الرواة والعلل

যে হাদীসে মশহুরের এমন বিভিন্ন সনদ রয়েছে যা রাউইর দুর্বলতা ও সুক্ষ্ম ত্রুটি থেকে মুক্ত। কারন রাউইর দুর্বলতামুক্ত হওয়া ও হাদীস সুক্ষ্ম ত্রুটিমুক্ত হওয়া হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য মুখ্য বিষয়। যখন এই মুখ্য বিষয় দ্বারা কোন হাদীস সমর্থনপুষ্ট হবে সে হাদীস বিশুদ্ধতার দিকে উন্নীত হওয়াই স্বাভাবিক।

হাদীসের উক্ত প্রকার দ্বারা علم نظري অর্জন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন

১। উস্তাদ আবু মানসূর বাগদাদী (র.)

২। আবু বকর ইবনে ফূরাক (র.)

তৃতীয় প্রকার

الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا

যে হাদীস অভিজ্ঞ হাফিযুল হাদীসগনের ধারাবাহিকতায় বর্ণিত এবং তা গারীব নয়। অর্থাৎ যে হাদীসের সনদের প্রত্যেক স্তরে অন্তত দুই জন নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস রয়েছেন। যেমন কোন হাদীসের সনদের পাঁচটি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তরে রাবী ইমাম আহমদ ও তাঁর মত আরেকজন। দ্বিতীয় স্তরে ইমাম শাফেঈ ও তাঁর মত আরেকজন। তৃতীয় স্তরে ইবনে শিহাব যুহরী ও তাঁর মত আরেকজন। চতুর্থ স্তরে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব ও তাঁর মত আরেকজন। আর তাঁরা রেওয়াত করেছেন সাহাবী থেকে। এ ধরনের হাদীস যে-ই শুনবে তারই علم نظري বা যৌক্তিক জ্ঞান অর্জন হবে। এ ঘোষণা দিয়েছেন জুমহুর মুহাদ্দিসীন।

দ্বিতীয় বিভক্তি সনদের শেষ প্রান্ত অনুপাতে

এ হিসাবে হাদীস তিন প্রকার।

১। মারফূ' مرفوع

২। মাওকুফ موقوف

৩। মাক্বতূ' مقطوع

মারফূ '.: (مرفوع)

আভিধানিক অর্থ, مرفوع শব্দটি বাবে فتح থেকে اسم مفعول এর সিগাহ অর্থ উঁচু, উত্থিত, উন্নত, মর্যাদাসম্পন্ন পেশা বিশিষ্ট।

পারিভাষিক অর্থ: ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع যে হাদীসের সনদ (কে বা কার থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক নামসমূহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মারফূ' বলে।

উদাহরণ: যেমন বলা হয় قال رسول الله ﷺ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক কথাটি বলেছেন, أو فعل كذا অথবা করেছেন, أو قرر অথবা সম্মতি দিয়েছেন।

মাওকূফ موقوف

আভিধানিক অর্থ:

موقوف শব্দটি বাবে ضرب থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ স্থগিত, স্থির।

পারিভাষিক অর্থ ঃ

ما انتهى إلى الصحابي يقال له الموقوف যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

উদাহরণ:

كما يقال قال أو فعل أو قرر ابن عباس أو عن ابن عباس موقوفا أو موقوف على ابن عباس

যেমন বলা হয় قال إبن عباس ইবনে আব্বাস বলেছেন, أو فعل করেছেন, أو قرر সম্মত ছিলেন, অথবা বলা হয় ইবনে আব্বাস থেকে স্থগিতাবস্থায়, অথবা موقوف على ابن عباس ইবনে আব্বাসের উপর (বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিকতা তিনি পর্যন্ত গিয়ে আটকে গেছে বা) নির্ভরশীল।

মাক্বতূ': مقطوع

আভিধানিক অর্থ:مقطوع শব্দটি বাবে فتح থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ কর্তিত, বিচ্ছিন্ন, পৃথক ইত্যাদী।

পারিভাষিক অর্থ: وما انتهى إلى التابعي يقال له المقطوع যে হাদীসের সনদ তাবেঈ পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মাক্বতূ' বলে। উদাহরণ যেমন বলা হয় قال سعيد ابن المسيب সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব বলেছেন- عن ابن سيرين ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত।

তৃতীয় বিভক্তি: রাউইর দোষ গুণ অনুপাতে।

ইহা আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

(১) রাউইর দোষের প্রতিকার থাকা বা না থাকার অনুপাতে সাত প্রকার।

১। مقبول মাকবূল

২। مردود মারদূদ

৩। صحيح لذاته সহীহ লিযাতিহী

৪। حسن لذاته হাসান লিযাতিহী

৫। ضعيف যঈফ

৬। صحيح لغيره সহীহ লিগাইরিহী

৭। حسن لغيره হাসান লিগাইরিহী

১) মাকবূল: যে হাদীসের সনদ ও মতনে কোন প্রকার ত্রুটি নেই তাকে মাকবূল বলে।

২) মারদূদ: যে হাদীসের সনদ বা মতনে কোন প্রকার ত্রুটি আছে তাকে মারদূদ বলে।

৩) সহীহ লিযাতিহী: صحيح لذاته

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)বলেন

الصحيح ما يثبت بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولاشاذ فان كانت هذه الصفات على وجه الكمال والتمام فهو الصحيح لذاته

যে হাদীসটি বিশ্বস্থ, মেধাবী রাউই কর্তৃক মুআল্লাল ও শায হওয়া ছাড়াই মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয় তাকে সহীহ বলে। যদি এ সকল গুণ পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থভাবে থাকে তাহলে উক্ত হাদীসকে সহীহ লিযাতিহী বলে।

৪। সহীহ লিগাইরিহী: صحيح لغيره

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন-

وإن كان فيه نوع قصور ووجد ما يجبر ذالك القصور من كثرة الطرق فهو الصحيح لغيره

যদি এ সকল গুণে কোন প্রকার ঘাটতি হয় আর সনদের আধিক্য ইত্যাদি দ্বারা এ ঘাটতি পূর্ণ করা যায় তাহলে তাকে সহীহ লিগাইরিহী বলে।

৫। হাসান লিযাতিহী: حسن لذاته

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)বলেন

وإن لم يوجد فهو الحسن لذاته

আর যদি ঘাটতি পুরনের কিছু না পাওয়া যায় তাহলে তাকে হাসান লিযাতিহী বলে।

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন-

وظاهر كلامهم أنه يجوز أن يكون جميع الصفات المذكور فى الصحيح ناقصات فى الحسن لكن التحقيق ان النقصان الذى اعتبر فى الحسن انما هو بخفة الضبط وباق الصفات بحالها

মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্যে বাহ্যিক ভাবে বুঝা যায় সহীহ এর সংজ্ঞায় উল্লেখিত সকল গুনেই দুর্বলতা থাকলে হাদীস হাসান হয়। কিন্তু ব্যাপার এমন নয় বরং বাস্তব কথা হলো সহীহ ও হাসানের মধ্যকার পার্থক্য হচ্ছে শুধু স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে সহীহ হাদীস হাসানে পরিণত হয়।

৬। যঈফ: ضعيف আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন-

وما فقد فيه الشرائط المعتبرة فى الصحيح كلا أو بعضا فهو الضعيف

যদি উল্লেখিত গুণসমূহ পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক অনুপস্থিত থাকে আর এ ঘাটতি পূরণের কোন উপায় না থাকে তাহলে তাকে যঈফ বলে।

যঈফের হুকুম: নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে প্রমানিত আমলের ফযিলত বর্ণনায়, ওয়ায ও উপদেশে مناقب ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় যঈফ হাদীসে আমল করা বৈধ, দুই শর্তে।

১) হাদীসটি মারাত্মক যঈফ না হওয়া

২) হাদীসটি গৃহীত আমলের কোন সূত্রের অধীনস্থ হওয়া।)তুফহাতুদ্দুরার আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরী কৃত পৃষ্টা-৪৫)।

৭। হাসান লিগাইরিহী: حسن لغيره

والضعيف أن تعدد طرقه وانجبر ضعفه يسمى حسنا لغيره

যইফ হাদীসের ঘাটতি যদি সনদের আধিক্য ইত্যাদি কোন উপায়ে দূর হয়ে যায় তাহলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলে।

(২) রাউইর বৃদ্ধির বর্ণনা অনুপাতে ৫ প্রকার:

১। مقبول أخر (আরেক) মাকবূল

২। محفوظ মাহফুয

৩। شاذ শায

৪। معروف মা'রূফ

৫। منكر মুনকার

মাকবূল مقبول

আভিধানিক অর্থ-مقبول শব্দটি বাবে سمع থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ গ্রহণযোগ্য, গৃহীত।

পারিভাষিক অর্থ- ثقه বিশ্বস্ত রাউইর ঐ বর্ধিত অংশ যা أوثق (বেশি বিশ্বস্ত) রাউইর রিওয়ায়াতের বিপরীত নয়। এই বর্ধিত অংশকে স্বতন্ত্র অন্য হাদীস সাভ্যস্থ করা হবে অথবা এই হাদীসেরই অবশিষ্ট অংশ গণ্য করা হবে। যা أوثق (বেশি বিশ্বস্ত) রাউই কোন কারণে বর্ণনা করেন নাই।

মাহফূয محفوظ: আভিধানিক অর্থ- محفوظ শব্দটি سمع বাব থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ-সংরক্ষিত।

পারিভাষিক অর্থ- যদি ثقه (বিশ্বস্ত) রাউইর বর্ণনা أوثق (বেশি বিশ্বস্ত) রাবীর বর্ণনার বিপরীত হয় তাহলে বেশী বিশ্বস্ত রাউইর বর্ণনাকে মাহফূয বলে।

শায شاذ আভিধানিক অর্থ- شاذ শব্দটি বাবে نصر থেকে اسم فاعل এর সিগাহ। অর্থ-বিরল, দুষ্প্রাপ্ত।

পারিভাষিক অর্থ- যদি বিশ্বস্ত রাউইর বর্ণনা বেশি বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত হয় তাহলে বিশ্বস্ত রাউইর বর্ণনাকে শায বলে।

মা'রূফ معروف আভিধানিক অর্থ- معروف শব্দটি ضرب এর বাব থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ-পরিচিত, নীতি সম্মত।

পারিভাষিক অর্থ- যদি দুর্বল রাউইর বর্ণনা বিশ্বস্ত রাউইর বর্ণনার বিপরীত হয় তাহলে বিশ্বস্ত রাউইর বর্ণনাকে মা'রূফ বলে।

মুনকার منكرআভিধানিক অর্থ- منكر শব্দটি বাবে سمع থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ-অপরিচিত, অপছন্দনীয়, মন্দ।

পারিভাষিক অর্থ- যদি দুর্বল রাবীর বর্ণনা বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত হয় তাহলে দুর্বল রাউইর বর্ণনাকে মুনকার বলে।

(৩) হাদীসের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতো অনুপাতে সাত প্রকার:

১। محكم মুহকাম

২। مختلف الحديث মুখতালাফুল হাদীস

৩। ناسخ নাসিখ

৪। منسوخ মানসূখ

৫। راجح রাজেহ

৬। مرجوح মারজূহ

৭। متوقف فيه মুতাওয়াক্কাফ ফীহি

মুহকাম محكم

আভিধানিক অর্থ- محكم শব্দটি বাবেنصر থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ-শক্তিশালী, অনঢ়, নির্ধারিত।

পারিভাষিক অর্থ- هو الحديث السالم عن المعارضة যে হাদীসের বিপরীতে কোন হাদীস নেই তাকে মুহকাম বলে।

উল্লেখ্য হাদীস গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীসই মুহকাম।

মুখতালাফুল হাদীস مختلف الحديث

আভিধানিক অর্থ- مختلف শব্দটি বাবে افتعال থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ-মতানৈক্য, একাধিক।

পারিভাষিক অর্থ:

هو الحديث المقبول المتعارض بمثله ويمكن الجمع بينهما

বিশুদ্ধতায় সমান যে হাদীসগুলী বিরুধী হলেও তাদের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব সেগুলোকে মুখতালাফুল হাদীস বলে। মুখতালাফুল হাদীস এর উদাহরণ এক হাদীসে আছে لا عدوى রোগ সংক্রামক নয়। অন্য হাদীসে আছে فرّ من المجزوم فرارك من الأسد। কুষ্ঠ রোগীর কাছ থেকে পলায়ন কর, সিংহ থেকে পলায়নের মত। এই দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা রোগ সংক্রামক বুঝা যায়। উভয় হাদীসে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব

ক) এভাবে যে প্রথম হাদীসটি বাস্তব অর্থাৎ রোগ মূলত সংক্রামক নয় এবং দ্বিতীয় হাদীসটিও অবাস্তব নয় কারণ কোন কোন রোগীর সংস্পর্শ রোগের কারণ হতে পারে।

খ) অথবা এভাবে যে পলায়নের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাস বন্ধের জন্য। অর্থাৎ রোগ আসে আল্লাহর হুকুমে অথচ সে বিশ্বাস করে রোগ এসেছে ছুয়াচে বা সংক্রমণের মাধ্যমে।

নাসিখ ناسخ

আভিধানিক অর্থ- ناسخ শব্দটি فتح বাব থেকে اسم فاعل এর সিগাহ। অর্থ-রহিতকারী, মুচনকারী, কপিকারী।

পারিভাষিক অর্থ- هو الحديث المقبول المتعارض بمثله وقد ثبت انه متأخر عنه بوجهٍ مّا

বিশুদ্ধতায় সমান পরস্পর বিরোধী যে দুই হাদীসে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হলেও কোন ভাবে একটি আগের এবং অপরটি পরের বলে জানা যায়, পরের হাদীসটিকে নাসিখ বলে। যেমন- متعة বা নির্ধারিত মেয়াদের চুক্তিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস।

মানসুখ: منسوخআভিধানিক অর্থ- منسوخ শব্দটি বাবে فتح থেকেاسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ-রহিত, স্থগিত, অকার্যকর।

পারিভাষিক অর্থ-هو الحديث المقبول المتعارض بمثله وقد ثبت أنه متقدم بوجه ما

বিশুদ্ধতায় সমান পরস্পর বিরোধী যে দুই হাদীসে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হলেও কোন ভাবে একটি আগের এবং অপরটি পরের বলে জানা যায়, আগের হাদীসটিকে মানসূখ বলে। যেমন- متعة বা নির্ধারিত মেয়াদের চুক্তিতে বিবাহ বৈধ হওয়ার হাদীস।

নাসিখ মনসূখ চিহ্নিত করণ পদ্ধতি:

১) হাদীসের মতনের মধ্যেই নসখ এর বিষয়টি উল্লেখ থাকবে। এটি হচ্ছে নসখ জানার সর্বোচ্চ ও সুস্পষ্ট পদ্ধতি। যেমন

عن بريده قال قال رسول الله صـ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الأخرة (رواه مسلم)

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারতে নিষেধ করতাম এখন থেকে তোমরা যিয়ারত করতে পার। কারন ইহা পরকাল স্মরন করিয়ে দেয়। হাদীসের মতনই বুঝিয়ে দিল কবর যিয়ারত পূর্বে নিষিদ্ধ ছিল উক্ত হাদীসের মাধ্যমে বৈধতা ঘোষণা করা হচ্ছে। সুতরাং কবর যিয়ারতের নিষেধ সম্বলিত হাদীস মানসুখ। এবং অনুমতি সম্বলিত হাদীস নাসিখ।

২) হাদীসের রাউই কোন কোন সাহাবী কোন বিধানের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে বলবেন যে এটা নবীজির সর্বশেষ নির্দেশ। যেমন

عن جابر رضـ قال كان أخر الأمرين من رسول الله صـ ترك الوضوء مما مست النار (رواه أصحاب السنن)

আগুনে ছুয়া বস্তুব্যবহারের পর অযু না করাই ছিল নবীজির সর্বশেষ নির্দেশ। হযরত যাবের রা. এর বক্তব্যে সুস্পষ্ট বুঝা যায় আগুনে স্পর্শ করা বস্তু ব্যবহার করার পর ওযু করার নির্দেশ ছিল পূর্বের এবং ওযু না করার নির্দেশ ছিল শেষের। সুতরাং পূর্বের নিষেধ সম্বলিত হাদীস মানসূখ এবং পরের আদেশ সম্বলিত হাদীস নাসিখ।

৩) ইতিহাসের মাধ্যমে যদি জানা যায় কোনটি আগের কোনটি পরের তাহলে আগেরটি মানসূখ ও পরেরটি নাসিখ হবে। যেমনافطر الحاجم والمحجوم যে সিঙ্গা লাগায় এবং যাকে লাগায় উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যায়। ইতিহাসের মাধ্যমে জানা যায় হাদীসটি অষ্টম হিজরীতে বর্ণিত। অতঃপর ইবনে আব্বাস থেকে দশম হিজরীতে বর্ণিত হাদীস إن النبي صـ احتجم وهو صائم

নবীজি রোযা অবস্থায় সিঙ্গা লাগিয়েছেন। হাদীস দুটি পরস্পর বিরোধী। অতএব আগের হাদীসটি মানসূখ ও পরের হাদীসটি নাসিখ।

৪) পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস যদি পূর্বে ইসলাম গ্রহণ কারী সাহাবীর বিরোধী হয় তবে দুটি শর্তে আগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস মানসূখ হবে ও পরে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস নাসিখ হবে।

শর্ত দুটি এই

ক) পরে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী হাদীসটি সরাসরি রাসুলুল্লাহ সা. থেকে শুনেছেন। পুর্বে ইসলাম গ্রহণকারী কোন সাহাবীর কাছ থেকে শুনেননি বলে নিশ্চিত হতে হবে।

খ) আগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীও হাদীসটি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে শুনেছেন। পরে ইসলাম গ্রহনকারী কোন সাহাবী থেকে শুনেননি বলে নিশ্চিত হতে হবে।

৫) পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীসের মধ্য হতে উম্মত যদি একটি হাদীসের উপর আমল করে অপরটির উপর আমল ছেড়ে দেয় তাহলে তাদের এই আমল ছেড়ে দেওয়াটাই উক্ত হাদীস মনসূখ হওয়ার দলীল। যেমন এক হাদীসে এসেছে

عن أبي هريرة ومعاوية رضـ قالا قال رسول الله صـ من شرب الخمر فاجلدواه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه رواه أبوداود والترمذي)

মদ পানকারীকে বেত্রাঘাত কর। চতুর্থবার মদ পানকারীকে হত্যা কর। উক্ত হাদীসটির উপর আমল তরক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। কারন অন্য এক হাদীসে আছে চতুর্থবার মদ পানকারীকে হত্যা করা হয়নি বরং প্রহার করা হয়েছে অতএব হত্যা করার হাদীসটি মনসূখ ও হত্যা না করার হাদীসটি নাসিখ যার উপর ইজমা হয়েছে।

এমনিভাবে (إكسال) বীর্যপাতহীন সহবাসে গোসল ফরয হওয়ার বিষয়ে ইজমা হয়েছে। অর্থাৎ বীর্যপাতহীন সহবাসে গোসল ফরয হবে কিনা এ ব্যাপারে হযরত ওমর রা. এর যুগে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়।

আনসারী সাহাবীরা বললেন গোসল ফরয হবেনা। কারণ হাদীসে আছে إنما الماء بالماء গোসল ফরয হওয়ার জন্য বীর্যপাত প্রয়োজন।

মুহাজির সাহাবীগণ বললেন গোসল ফরয হবে। হযরত উমর রা. সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আলী রা. এর পরামর্শে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.হযরত আয়শা রা.এর কাছ থেকে একখানা হাদীস নিয়ে এলেন। যাতে গোসল ফরয হওয়ার কথা স্পষ্ট ছিল। হযরত আয়শা রা. বলেন

إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل

فعلته انا ورسول الله صـ فاغتسلنا

যখন শীশ্ন যোনী অতিক্রম করে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়, আমি ও নবীজি এমনটি করার পর গোসল করেছি।

হযরত ওমর রা. হাদীসটি পাওয়ার পর ঘোষনা করেন আজ থেকে إكسال বীর্যপাতহীন সহবাসে গোসল ফরয হওয়ার উপর ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হল। এটা অমান্যকারীকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করা হবে। সুতরাং হযরত আয়শা রা.'র হাদীসের মাধ্যমে ইজমা হয়ে আনসারী সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস মানসূখ হয়ে গেল।

রাজেহ راجح

আভিধানিক অর্থ- راجح শব্দটি باب فتح থেকে اسم فاعل এর সিগাহ। অর্থ- অগ্রগণ্য, প্রাধান্যপ্রাপ্ত, বিজয়ী।

পারিভাষিক অর্থ-

هو الحديث المقبول المتعارض بثمله وقد رجح بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن والإسناد

বিশুদ্ধতায় সমান অথচ পরস্পর বিরোধপূর্ণ দুটি হাদীস যদি এমন হয় যে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় না, নাসিখ মনসুখ ও নির্ধারণ করা যায় না তবে মতন বা সনদ সংশ্লিষ্ট প্রাধান্য দানকারী কোন বিষয় দ্বারা যদি কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া যায় তাহলে প্রাধান্যপ্রাপ্ত হাদীসকে রাজেহ راجح এবং প্রাধান্য বঞ্চিত হাদীসকে মারজূহ مرجوح বলে।

মতন সংশ্লিষ্ট প্রাধান্য দানকারী বিষয় (وجوه ترجيح) এর নমূনা

ক) এক হাদীস مثبت (হ্যাঁ বাচক) অন্য হাদীস منفي (না বাচক) এমতাবস্থায় المثبت أولى من النافي মূলনীতি অনুযায়ী مثبت হ্যাঁ বাচক হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

খ) এক হাদীস محرّم বা অবৈধ সাব্যস্থকারী অপরটি مبيح বা বৈধ সাব্যস্তকারী। এমতাবস্থায় محرّم হাদীসটিই প্রাধান্য পাবে।

সনদ সংশ্লিষ্ট প্রাধান্য দানকারী (وجوه ترجيح) এর নমূনা

ক) একটি হাদীসের সনদ صحيح অপরটির সনদ أصح তা হলে أصح টি প্রাধান্য পাবে।

খ) একটি متفق عليه অপরটি غير متفق عليه এই স্থলে متفق عليه টি প্রাধান্য পাবে।

গ) একটি সনদ ضعيف দুর্বল অপরটিصحيح তাহলে صحيح টি প্রাধান্য পাবে।

ঘ) একটি সনদ এক সনদে অপরটি একাধিক সনদে বর্ণিত। এমতাবস্থায় একাধিক সনদে বর্ণিত হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

মারজূহ مرجوح

আভিধানিক অর্থ- مرجوح শব্দটি باب سمع থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- প্রাধান্য বঞ্চিত, পরিত্যক্ত, পরাজিত।

পারিভাষিক অর্থ- هو الحديث المقبول المتعارض بمثله وقد رجح عليه بوجه من وجوه الترجيح

বিশুদ্ধতায় সমান অথচ পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীস যদি সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয় নাসিখ মনসূখও চিহ্নিত করা না যায় কিন্তু হাদীসটি প্রাধান্য বঞ্চিত হয় তাহলে তাকে মারজূহ বলে।

মুতাওয়াক্কাফ ফীহি متوقف فيه

আভিধানিক অর্থ- متوقف শব্দটি باب تفعل থেকে اسم مفعول এর সিগা। অর্থ- স্থগিত, স্থির।

পারিভাষিক অর্থ-

هو الحديث المقبول المتعارض بمثله ولم يرجح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه

বিশুদ্ধতায় সমান অথচ পরস্পর বিরোধী যে দুই হাদীসে সম্বয় সাধন সম্ভব হয়না, নাসিখ মনসুখও চিহ্নিত করা না যায়, এমনকি কোন একটাকেও কোনভাবে প্রাধান্য দেওয়া যায়না তাকে মুতাওয়াক্কাফ ফীহি বলে।

(৪) আদালত বিনষ্টকারী দোষ অনুপাতে চার প্রকার:

১। موضوع মাওযু'

২। متروك মাতরূক

৩। منكر أخرا (আরেক) মুনকার

৪। حديث المبتدع বিদআতীর বর্ণিত হাদীস

মাওযূ' موضوع

আভিধানিক অর্থ- موضوع শব্দটি باب فتح থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- গড়া, বানানো, বানোয়াট, জাল, নকল।

পারিভাষিক অর্থ- حديث المطعون بالكذب يسمى موضوعا মিথ্যার দোষে দোষী রাবীর হাদীসকে موضوع বা জাল হাদীস বলে।

জাল হাদীসের হুকুম

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন

ومن ثبت عنه تعمد الكذب فى الحديث وإن كان وقوعه فى العمر مرة وإن تاب من ذالك لم يقبل حديثه أبدا

যে ব্যক্তি থেকে হাদীসে সেচ্ছায় মিথ্যাচার প্রমাণিত হয় যদিও তা জীবনে এক বার হয়,

যদিও সে এরূপ মিথ্যা থেকে তওবা করে, তবুও তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না।

মাওযূ' চিনার উপায়

ক) হাদীস শাস্ত্রবিদদের দৃঢ় বিচক্ষণতার মাধ্যমে। যেমন ইমাম দারাকুতনীর বিচক্ষণতা ।

খ) জালকারীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। যেমন আব্দুল করিম আউযি চার হাজার হাদীস জাল করণের কথা স্বীকার করেছে।

গ) বর্ণিত হাদীস কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া। যেমন -

ولد الزنا لا يدخل الجنة

ঘ) হাদীসের অর্থ ও শব্দ যদি হাস্যকর ও বাচালতা পূর্ণ হয়। যেমন-

لا تسبوا الديك فإنه صديقي

ঙ) হাদীসটি স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধির প্রচন্ড বিরোধী হওয়া। যেমন-

خلق الله فرسا فاجرايها فعرقت فخلق نفسه منها

চ) সাহাবীদের ঘটনা সম্বলিত হাদীস হওয়া সত্ত্বেও সাহাবীদের যুগে হাদীসটি প্রচার লাভ না করা। যেমন

إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا الخلافة فى غديرخم حين رجوعه من حجة الوداع بحضرة جم غفير أكثرمن مأة ألف

ছ) শীয়া কর্তৃক নবীর বংশের অতিরঞ্জিত প্রসংসা সম্বলিত হাদীস। যেমন- তারা প্রথম দুই সাহাবীর কুৎসা রটনায় ও হযরত আলী রা.'র প্রসংশায় যে হাদীসগুলো জাল করেছে, কারণ তারা তাদেরকে হযরত আলীর খেলাফত হরণকারী মনে করত।

জ) হাদীসে বর্ণিত ঘটনা সুপ্রমাণিত ইতিহাসের বিপরীত হওয়া। যেমন-

كتب معاوية ابن أبي سفيان رفعت الجزية عن اهل خيبر لموت سعدابن معاذ

১) হযরত সা'দ রা. খায়বার যুদ্ধের বহু আগেই খন্দক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

২) ঝিযিয়া কর বিধিবদ্ধই হয়েছিল খায়বার যুদ্ধের বহু পরে এমনকি তাবুক যুদ্ধেরও পর।

৩) হযরত মু'আবিয়া রা. ইসলামই গ্রহণকরেছিলেন ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময়।

হাদীস জাল করার হুকুমঃ

ক) জমহুর মুহাদ্দিসিনের মতে হাদীস জাল করা হারাম কবীরা গুনাহ। কারণ হাদীসে আছে

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

খ) আল্লামা আবু মুহাম্মদ আল জু'আঈনী বলেন تعمد الكذب على النبي كفر ইচ্ছাকৃতভাবে নবীজির নামে মিথ্যা বলা কুফরী, তবে এ মতটি সিদ্ধান্তকৃত মত নয়।

গ) কাররামিয়া ও জাহিল সুফিদের মতে তারগীব ও তারহীবের হাদীস জাল করা বৈধ। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এই মতের তীব্র সমালোচনা করে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাদীস জাল করণের কারণ (الحامل على الوضع)

১। عدم الدين ধর্মহীনতা, ইসলামের ক্ষতি সাধনের হীন উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেক ইহুদী বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে।

জাল হাদীসের সিংহভাগই এদের হাতে রচিত। হাম্মাদ বিন যাইদের বর্ণনা মতে এই নাস্তিকেরা ১৪ হাজার হাদীস জাল করেছে।

২। غلبة الجهل অতি মুর্খতা: অজ্ঞ সুফী দরবেশ এবং মুর্খ আবিদরা তারগীব ও তারহীবের হাদীস বানায়। যেমন শবে বরাআত সহ অন্যান্য রাতের বিশেষ নামায সম্পর্কীয় হাদীস সমূহ। এতে আবার তারা সওয়াবেরও আশা রাখে। ফলে তারা জাল হাদীস পরিহার করতে পারেনা। সাধারণ মানুষ তাদেরকে মান্যবর মনে করে। তাদের জাল হাদীসের জালে আবদ্ধ হয়ে যায়।

৩। فرط العصبية অন্ধ পক্ষপাতিত্ব: স্বীয় মাযহাব কিংবা ইমামের ফযীলত বর্ণনায় কখনও হাদীস জাল করা হয়েছে। এমন জালকারীদের একজন মামুন ইবনে আহমাদ হারুবী।

৪।إتباع هوى بعض الرؤساء শাসকের সন্তুষ্টি কামনা: যেমনটি করেছিল গিয়াস ইবনে ইব্রাহীম খলীফা মাহদীর সন্তুষ্টি কামনায়।

৫। الإغراب لقصد الاشتهار প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্য: কেউ কেউ প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে অভিনব হাদীস বর্ণনা করেছে।

হাদীস জাল করণের ধরণ:

১। يخترعه الواضع নিজেই তৈরি করে স্বরচিত সনদে বর্ণনা করা।

২। ياخذ من كلام غيره পূর্ববর্তী মনিষী, প্রাচীন দার্শনিক, কিংবা ইসরাঈলীদের জ্ঞানগর্ভ উক্তিকে নবীজির বাণী বলে চালিয়ে দেয়া।

৩। ياخذ ضعيفا ويركب له صحيحا দুর্বল সনদের হাদীসকে ব্যাপক প্রচলনের জন্য صحيح সহীহ সনদের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা।

মাতরূক متروك: আভিধানিক অর্থ- متروك শব্দটি باب نصر থেকেاسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ-পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত।

পারিভাষিক অর্থ- هو حديث راو متّهم بالكذب মিথ্যার অপবাদ আরোপিত রাউইর হাদীসকে মাতরূক বলে।

(অন্য প্রকার) মুনকার منكر أخر

আভিধানিক অর্থ- منكر শব্দটি باب سمع থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- অপরিচিত, মন্দ, অপছন্দনীয়।

পারিভাষিক অর্থ- هو حديث راوٍ مطعون بفحش غلط

أو كثرت غفلة أو فسق

যে হাদীসের কোন রাউই সীমাতিরিক্ত ভূল فحش غلط অথবা كثيرة غفلة অত্যাধিক অলসতা কিংবা فسق (পাপাচারে)র দোষে দোষী। হাদীসটি বিশ্বস্ত রাউইর বিপরীত হোক বা নাই হোক।

উভয় মুনকারের পার্থক্য: পূর্বে বর্ণিত মুনকারمنكر হওয়ার জন্য বিশ্বস্ত রাউইর বিরোধীতা শর্ত। কিন্তু উপরোল্লিখিত মুনকার হওয়ার জন্য কোন প্রকার বিরোধীতার প্রয়োজন নেই। শুধু উল্লিখিত তিন দোষের কোন একটি দোষ রাউইর মাঝে থাকলেই হাদীসটিকে মুনকার বলা হবে।

বিদ'আতীর বর্ণিত হাদীস حديث المبتدع

আভিধানিক অর্থ- مبتدع শব্দটি باب افتعال থেকে اسم فاعل এর সিগাহ। অর্থ- দ্বীনের নামে নতুন রীতির মনগড়া প্রচলনকারী।

পারিভাষিক অর্থ-

البدعة فالمراد به اعتقاد أمر محدث على خلاف ماعرف في الدين وماجاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنوع شبهة وتاويل لا بطريق جحود وإنكار فإن ذالك كفر

বিদ'আত এর মর্ম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবীদের থেকে বর্ণিত ও ধর্মীয় প্রসিদ্ধ বিধানের বিপরীত নতুন কোন মতবাদে বিশ্বাস করা, কোন প্রকার সংশয় ও ব্যাখ্যার সুযোগে, প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকারের ভিত্তিতে নয়, কারণ এমনটা করা কুফুরী।

বিদ'আতীর হাদীসের হুকুম حكم حديث المبتدع

১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে গ্রহণযোগ্য নয়।
২. কতিপয় মুহাদ্দিসীনের মতে সত্যভাষী ও সংযতবাক বিদআতির হাদীস গ্রহণযোগ্য।
৩. কেউ বলেন ধর্মীয় বিষয় হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও মুতাওয়াতির ভাবে বর্ণিত শরীয়তের কোন বিধান অস্বীকারকারী বিদ'আতীর হাদীস গ্রহণ

যোগ্য নয়। যদি অস্বীকারকারী না হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। সংরক্ষণ ক্ষমতা খোদাভীতি, পরহেজগারী, সতর্কতা, ত্রুটিমুক্ত থাকা সত্ত্বেও বিরোধিরা তাকে কাফির আখ্যা দিলেও তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে।

৪. নির্বাচিত মত হচ্ছে যদি সে বিদ'আতের দিকে আহবানকারী ও প্রচলনকারী হয়, তাহলে তার হাদীস প্রত্যাখাত হবে। এমনটি না হলে গ্রহণীয় হবে। তবে যদি তার বর্ণিত হাদিস তার বিদ'আতের সমর্থক হয়, তাহলে তার হাদীস নিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যাত হবে।

মোটকথা: বিদ'আতী, আত্মপুজারী, ভ্রান্তমতবাদে বিশ্বাসীদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণে আইম্মায়ে হাদীস বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

জামেউল উসূল গ্রন্থকার বলেন একদল আইম্মায়ে হাদীস খারেজী, কাদরিয়া, শিয়া, রাফেযীসহ সর্বপ্রকার বিদ'আতি ও আত্মপুজারীদের কাছ থেক হাদীস গ্রহণ করেছেন।

পক্ষান্তরে অন্য একদল মুহাদ্দিস এ সকল ফিরকার লোকদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং বিরত রয়েছেন। এতে তাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সকল ফিরকার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ কেবল অনুসন্ধান ও সত্যোদঘাটনের পরেই হয়ে থাকে।

এতদসত্ত্বেও তাদের থেকে হাদীস গ্রহণ না করার মধ্যে সতর্কতা নিহিত।

কারণ তারা নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাদীস জাল করতো বলে প্রমাণিত। তওবা করার পর তারা তা স্বীকার করত।

(৬) যবত বিনষ্টকারীর দোষ, বিশ্বস্ত রাউইর বিরোধীতা ও রাউইর অপরিচিতি হিসাবে সতের প্রকার:

১। معلل মুআ'ল্লাল ২। مدرج الإسناد মুদরাজুল ইসনাদ ৩। مدرج المتن মুদরাজুল মতন ৪। مقلوب মাক্বলূব ৫।مزيد في متصل الأسانيد মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ ৬। مضطرب মুযতারাব ৭। مصحّف মুসাহহাফ ৮। محرّف মুহাররাফ ৯। متفق ومفترق মুত্তাফিক্ব ও মুফতারিক্ব ১০। مؤتلف و مختلف মু'তালিফ ও মুখতালিফ ১১। متشابه মুতাশাবিহ ১২। حديث غير المسمى হাদীসু গায়রীল মুসাম্মা ১৩। حديث غير المعروف হাদীসু গায়রীল মারূফ ১৪। حديث المجهول হাদীসুল মাযহুল ১৫। حديث المستورا হাদীসুল মাসতুর ১৬। شاذ أخر অন্য প্রকার শায ১৭। مختلط মুখতালিত্ব

১) মুআল্লাল (معلل): আভিধানিক অর্থ- معلل শব্দটি تفعيلবাব থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ-ত্রুটিযুক্ত।

পারিভাষিক অর্থ-

هو الحديث الذي يروي على سبيل التوهم برفع موقوف أو فصل منقطع أو ادخال لفظ

যে হাদীসের রাউই ধারনার বশীভুত হয়ে হাদীসে কোন প্রকার পরিবর্তন করেছেন।

বিশ্বস্ত রাউইর বিরোধীতার ছয় প্রকার:

২) মুদরাজুল ইসনাদ (مدرج الإسناد)

আভিধানিক অর্থ- مدرج শব্দটি বাবে افعال থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- প্রবিষ্ট, প্রবেশকৃত, অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে অনুপ্রবেশকৃত।

পারিভাষিক অর্থ- هو الحديث الثابت فيه مخالفة الراوي للثقات أو الاوثق بسبب تغيير سياق الإسناد যে হাদীসের সনদের অগ্র পশ্চাদ বদলে যাওয়ার কারনে বিশ্বস্ত রাউইর বর্ণনার বিরোধীতা হয়ে যায়।

মুদরাজুল ইসনাদ চার প্রকার

১। একটি হাদীস একাধিক উস্তাদের কাছ থেকে একাধিক সনদে শুনে বর্ণনার সময় প্রত্যেক উস্তাদের পৃথক পৃথক সনদ বর্ণনা না করে সকল সনদ একত্র করে এক সনদে বর্ণনা করা।

২। উস্তাদ হাদীসের একাংশ এক সনদে এবং অপর অংশ অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রাউইর পূর্ণ হাদীস প্রথম সনদে বর্ণনা করে দেয়। অথবা হাদীসের একাংশ এক উস্তাদের কাছ থেকে শুনেছেন অপর অংশ উস্তাদের কোন ছাত্রের কাছ থেকে শুনেছেন। অথচ পূর্ন হাদীস উস্তাদের সনদে বর্ণনা করে দেন। ছাত্রের মাধ্যম ত্যাগ করে দেন।

৩। কোন রাউইর কাছে ভিন্ন সনদের দুই খানা হাদীস আছে। কিন্তু বর্ণনার সময় একই সনদে উভয়টি বর্ণনা করেছেন। অথবা এক হাদীস তাঁর নিজস্ব সনদেই বর্ণনা করেন কিন্তু তার সাথে অপর হাদীসের কিছু অংশ সংযুক্ত করে দেন।

৪। উস্তাদ কোন হাদীসের সনদ বর্ণনা করে মতন বর্ণনার আগে কোন কথা বলেছেন, ছাত্র ভূল বুঝে এই কথাকে হাদীসের মতন মনে করে উক্ত সনদে বর্ণনা করে দেন।

৩) মুদরাজুল মতন (مدرج المتن)

আভিধানিক অর্থ- مدرج শব্দটি বাবে إفعال থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- প্রবিষ্ট, প্রবেশকৃত, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুপ্রবেশকৃত।
পারিভাষিক অর্থ-

هو الحديث الذي يقع في متنه كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في أخره

যে হাদীসের মতনের শুরুতে বা মধ্যে বা শেষে রাসুল সা. ব্যতীত অন্যের কথা এমনভাবে ঢুকে যায় যে আসল মতনের সাথে তার পার্থক্য বাকী থাকেনা।

ইদরাজ (إدراج) জানার উপায়

১। بورود رواية مفصلة إدراج বিশিষ্ট হাদীস অন্য সনদে إدراج হীন অবস্থায় বর্নিত হওয়া। যেমন হাদীস

أبو قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صـ قال اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار

উক্ত হাদীসে اسبغوا الوضوء অংশটি হযরত আবু হুরায়রার উক্তি হতে প্রবিষ্ট। প্রমাণ ইমাম বুখারী হাদীসটি অন্য সনদে এভাবে বর্ণনা করেছেন -

أدم بن أبي أياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صـ قال اسبغوا الوضوء فان أبا القاسم صـ قال ويل للأعقاب من النار.

২। بالتنصيص من الراوى রাউইর ঘোষণার মাধ্যমে জানা যাবে যে হাদীসের এই অংশটি (مدرج) প্রবিষ্ট। যেমন ইবনে মাসউদ বলেন

سمعت رسول الله صـ يقول من جعل لله ندا دخل النار. ومن مات لايجعل لله ندا دخل الجنة

উক্ত হাদীসে من مات থেকে শেষ পর্যন্ত আমি নবীজি থেকে শুনিনি সুতরাং তার ঘোষণা অনুযায়ী এই অংশ (مدرج) মুদরাজ।

৩। بالتنصيص من بعض الأئمة المطلعين কোন অভিজ্ঞ হাদীস বিশারদের মাধ্যমে জানা যাবে যে হাদীসের এই অংশটি মুদরাজ। যেমন ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন

عن ابن مسعود رضـ قال قال رسول الله صـ الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل

অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন-

وقال محمد بن اسماعيل البخاري وما منا إلى أخره قول ابن مسعود

৪। بالاستحالة হাদীসের মতনই বলে দেবে যে রাসুল সা.-এর জন্য এমন কথা বলা অসম্ভব। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে আছে

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صـ للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبرامي لاحببت أن أموت وأنا مملوك

উক্ত হাদীসে والذي تفسي থেকে শেষ পর্যন্ত রাসুল সা.-এর কথা হতে পারেনা। কারণ একথা বলার সময় নবীজির মাতা জীবিত ছিলেন না। উপরন্ত বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে الذي نفس أبي هريرة অতএব এই অংশটি আবু হুরায়রার থেকে (مدرج) প্রবিষ্ট।

ইদরাজের হুকুম: হাদীসের দুর্লভ ও দুর্বোধ্য শব্দে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই শুধু ইদরাজ إدراج বৈধ। অন্য যে কোন উদ্দেশ্যেই ইদরাজ হারাম।

মাক্বলূব مقلوب : আভিধানিক অর্থ- مقلوب শব্দটি বাবে نصرথেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- পরিবর্তীত, পাল্টানো, বদলানো।

পারিভাষিক অর্থ-

هو الحديث الثابت فيه مخالفة الراوي للثقات أو الأوثق بتقديم أو تاخير في الاسماء من السند أو في المتن

যে হাদীসের সনদের নামের মাঝে অথবা মতনের মাঝে আগপিছ করার মাধ্যমে বিশ্বস্ত বা অধিক বিশ্বস্ত রাউইর বিরোধীতা হয় তাকে মাক্বলূব বলে।

৪) মাক্বলুব এর প্রকারভেদ

ইহা দুই প্রকার ঃ ১। مقلوب السند ২। مقلوب المتن

মাক্বলূবুস্সানাদ مقلوب السند সনদের নামের মধ্যে আগপিছ হওয়া যেমন مره بن كعب এর স্থলে كعب بن مره হওয়া।

মাক্বলূবুল মাতান مقلوب المتن হাদীসের মতনে আগপিছ হওয়া যেমন

حتي لا تعلم يمينه ما تنفق شماله এর স্থলে

حتي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه হওয়া।

৫) মাযীদ ফী মুত্তাসিলীন আসানীদ

আভিধানিক অর্থ- مزيد শব্দটি বাবে ضرب থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- সংযোজিত, সংযুক্ত।

পারিভাষিক অর্থ-

هو الحديث الذي ثبت فيه المخالفة للثقات بزيادة راوٍ

যে হাদীসের মুত্তাসিল সনদে কোন রাউই ধারনা বশীভূত হয়ে কোন রাউইর নাম বৃদ্ধি করে বিশ্বস্ত রাউইর বিরোধীতা করেন।

মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ এর উদাহরণ

عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي ادريس الخولاني عن واثلة بن الاسقع عن أبي مرثد الغنوى عن النبي ص قال لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন ইমাম বুখারী বলেছেন এই হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক একজন রাউই বৃদ্ধি করেছেন। যার নাম আবু ইদ্রিস আল খাওলানী।

মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ এর শর্ত

১। যিনি বৃদ্ধি করেননি তিনি বৃদ্ধিকারীর তুলনায় অধিক স্মৃতি শক্তির অধীকারী ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে। নতুবা উভয় সনদ সহীহ বলে গণ্য হবে।

২। বৃদ্ধির কোন নিদর্শন থাকতে হবে, না থাকলে উভয় হাদীস সহীহ বলে গণ্য হবে।

৩। যিনি বৃদ্ধি করেননি তিনি সনদের বৃদ্ধির স্থলে سماع শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যাতে সনদটি মুত্তাসিল হওয়া নিশ্চত হয়।

যদি عن শব্দ ব্যবহার করেন তাহলে যেহেতু তার সনদটি মুত্তাসিল হওয়া নিশ্চিত হয়না বরং এখান থেকে কোন রাউইর নাম ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই এই সনদ منقطع মুনকাতি’ বলে গন্য হবে। এবং বৃদ্ধি সম্বলিত সনদ متصل মুত্তাসিল বলে গণ্য হবে।

৬) মুযত্বারাব: مضطرب

আভিধানিক অর্থ- مضطرب শব্দটি বাবে افتعال থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- পরিবর্তীত, অস্থির, অশান্ত।

পারিভাষিক অর্থ-

هو الحديث الذي وقعت فيه المخالفة بإبدال السند أو بابدال المتن أو بابدالهما ولامرجح لإحدى الروايتين على الاخرى

যে হাদীসের সনদে বা মতনে বা উভয়ে পরিবর্তনের কারনে বিশ্বস্ত রাউইর বিরোধীতা হয়, উভয় হাদীসের কোন একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া যায়না।

মুযতারাব مضطرب এর প্রকারভেদ:

১। مضطرب في السند ২। مضطرب في المتن ৩। مضطرب فيهما

মুযতারাব ফিস্সানাদ (مضطرب في السند) শুধু সনদে পরিবর্তন হলে তাকে মুযতারাব ফিসসানাদ বলে।

মুযতারাব ফিস্সানাদ এর উদাহরণ:

إذا صلى احدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه فان لم يجد فلينصب عصا، فان لم يجد فليخطط خطا ثم لايضره مار بين يديه

উক্ত হাদীসের সনদে সীমাহীন পরিবর্তন নিম্নরূপ-

(১) إسماعيل بن علية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة (ابن ماجه باب ما يجد المصلي)

(২) إسماعيل بن أمية حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة (ابو داود باب الخط اذا لم يجد عصا)

(৩) إسماعيل بن عليه عن أبي محمد بن عمرو بن حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة (أبو داود)

উক্ত সনদগুলোতে ইসমাঈল থেকে আবু হুরায়রা পর্যন্ত রাউইদের নামে সীমাহীন পরিবর্তন এসেছে। এমন পরিবর্তনকেই ইযত্বিরাব বলে।

মুযতারাব ফিল মাতান مضطرب في المتن

শুধু মতনের পরিবর্তন হলে তাকে মুযত্বারাব ফিল মাতান বলে।

মুযতারাব ফিল মাতান এর উদাহরন:

شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله ﷺ إنّ في المال لحقا سوي الزكواة (ترمذي, ج١, صـ ٨٣)

একই সনদে ইবনে মাযাহ শরীফে আছে

ليس في المال حق سوي الزكوة (باب ما ادي زكواته فليس بكنز)

মুযতারাব ফী হিমা مضطرب فيهما

সনদ ও মতন উভয় পরিবর্তন হলে তাকে মুযতারাব ফীহিমা বলে।

মুযতারাব ফী হিমা এর উদাহরন:

عن ابن عمر رض عن النبي ﷺ قال إذا كان الماء قللتين لم يحمل الخبث

উক্ত হাদীসের সনদে اضطراب এভাবে যে

এ হাদীসের সনদের মূল স্থান مدار হল রাউই وليد بن كثير তিনি

ক) কখনও রিওয়ায়াত করেন محمد بن جعفر بن زبير থেকে।

খ) কখনও রিওয়ায়াত করেন محمد بن عباد بن جعفر থেকে।

গ) কখনও রিওয়ায়াত করেন عبيد الله بن جعفر থেকে।

ঘ) কখনও রিওয়ায়াত করেন عبد الله بن عبد الله থেকে।

এবং মতনে اضطراب এভাবে যে

ক) কোন সনদে قلتين শব্দ

খ) কোন সনদে قلتين أو ثلاثا শব্দ

গ) কোন সনদে أربعين قلة শব্দ

ঘ) কোন সনদে أربعين غربا শব্দ

ঙ) কোন সনদে أربعين دلوا শব্দ আছে।

মুযতারাব مضطرب এর শর্ত দুটি

ক) উভয় রিওয়ায়াতের মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হওয়া।

খ) একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়াও সম্ভব না হওয়া।

ইযতিরাব দূর করার উপায় দু'টি ১। সমন্বয় সাধন ২। প্রাধান্য দেওয়া

রাউই أحفظ কিংবা كثير الملازمة للشيخ হওয়ার ভিত্তিতে।

মুযতারাব এর হুকুম: ইযতিরাব اضطراب দূর হওয়া পর্যন্ত توقف বা স্থগিত বা আমলের ও দলিলে ব্যবহারের অযোগ্য। কোন রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দেওয়া গেলে প্রাধান্য প্রাপ্তটাকে মাকবূল مقبول বা আমলের যোগ্য বলে। এবং প্রাধান্য বঞ্চিতকে গায়রে মাকবূল غير مقبول বা আমলের

অযোগ্য বলে। হ্যাঁ পরীক্ষার জন্য পরিবর্তন اضطراب বৈধ। প্রয়োজন সারার পর মিটিয়ে ফেলার শর্তে। যেমনটি করা হয়েছিল ইমাম বুখারী ও ইমাম উকাইলীকে।

৭) মুসাহহাফ مصحف

আভিধানিক অর্থ- مصحف শব্দটি বাবে تفعيل থেকে اسم مفعول এর সীগাহ। অর্থ- বিকৃত লেখা বা পড়া, বিকৃত উচ্চারন।

পারিভাষিক অর্থ-

هو الحديث الذي ثبت فيه مخالفة الثقات بتغييرحرف أو حروف بالنسبة إلى النقط مع بقاء صورة الخط ويقع في السند والمتن

যে হাদীসের সনদে বা মতনে অক্ষরের আকৃতি বাকী থাকলেও নুকতা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বস্ত রাউইর বিরোধীতা হয়।

মুসাহহাফ দুই প্রকার:

১। مصحف السند । ২ مصحف المتن

মুসাহহাফুস সনদ مصحف السند হাদীসের সনদের মধ্যে যদি নুকতার পরিবর্তন হয় তাকে মুসাহহাফুস সনদ বলে। যেমন العوام بن مراجم এর স্থলে العوام بن مزاحم

মুসাহহাফুল মতন مصحف المتن যে হাদীসের মতনের মধ্যে নুকতার পরিবর্তন হয় যেমন من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

উক্ত হাদীসে ستا من شوال এর স্থলে شيئا من شوال রিওয়ায়াত করা হয়েছে।

৮) মুহাররাফ محرف

আভিধানিক অর্থ- محرف শব্দটি বাবে تفعيل থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- বিকৃত, পরিবর্তীত।

পারিভাষিক অর্থ-

هو الحديث الذى وقعت فيه مخالفة الثقات بتغير حرف أو حروف بالنسبة إلى الشكل

যে হাদীসের সনদে বা মতনে অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধীতা হয়।

মুহাররাফ দুই প্রকার:

১। محرّف السند । ২ محرّف المتن

মুহাররাফুস সনদ: যেমন عاصم الأحول এর স্থলে واصل الأحدب

মুহাররাফুল মতন: যেমন عن جابر قال رمى أبي يوم الاحزاب فى أكحله

রাউই গোন্দুর উক্ত হাদীসে তাহরীফ করে أبي উবাই কে أبي আবী বানিয়েছেন অথচ তা ভূল। কারণ হযরত জাবিরের পিতা আহযাব যুদ্ধের আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন।

৯) মুত্তাফিক্ব ও মুফতারিক্ব متفق و مفترق

আভিধানিক অর্থ- متفق ومفترق উভয় শব্দ বাবে افتعال থেকে

اسم مفعول এর সীগাহ। অর্থ- متفق অর্থ একত্রকারী مفترق অর্থ পৃথককারী।

পারিভাষিক অর্থ-

الرواة ان اتفقت اسماء أباءهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق

রাউইদের পিতার নাম যদি লিখতে ও বলতে এক রকম হয়, কিন্তু ব্যক্তি ভিন্ন হয় তাহলে নাম একরকম হওয়ার কারনে তাকে মুত্তাফিক্ব ও ব্যক্তি ভিন্ন হওয়ার কারনে তাকে মুফতারিক্ব বলে।

মুত্তাফিক্ব ও মুফতারিক এর কয়েকটি ছুরত

ক) রাউইদের নাম পিতার নাম সহ এক হওয়া। যেমন خليل ابن أحمد নামে ছয়জন রাবী ছিলেন।

খ) দাদা পর্যন্ত নাম এক হওয়া। যেমন أحمد بن جعفر ابن حمدان নামে একই স্তরে চারজন সাহাবী ছিলেন।

গ) উপনাম ও সম্বন্ধ এক হওয়া। যেমন أبو عمران جوفى انصارى নামে দুইজন রাউই ছিলেন।

ঘ) নাম, পিতার নাম, সম্বন্ধ এক হওয়া। যেমন محمد بن عبد الله انصاري নামে দুইজন রাউই ছিলেন।

ঙ) উপনাম ও পিতার নাম এক হওয়া। যেমন أبو بكر بن عياش নামে তিনজন রাউই ছিলেন।

মুত্তাফিক্ব ও মুফতারিক জানার ফায়দা

১। একাধিক ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি মনে করা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

২। একই নামে ثقه ও ضعيف রাউইর নামে পার্থক্য করা যায়।

মুত্তাফিক্ব ও মুফতারিক এবং মুহমাল এর পার্থক্য

একটি আরেকটির বিপরীত نسبة تباين (متفق ومفترق) মুত্তাফিক্ব ও মুফতারিক্ব এর মাঝে একাধিক রাউইকে একজন মনে করার আশংকা থাকে। আর মুহমাল এর মাঝে একজনকে কয়েকজন মনে করার সম্ভাবনা থাকে।

১০) মু'তালিফ ও মুখতালিফ مؤتلف ومختلف

আভিধানিক অর্থ- مؤتلف ومختلف উভয় শব্দ বাবে افتعال থেকেاسم فاعل এর সীগাহ। অর্থ- مؤتلف অর্থ সমন্বয়কারী, مختلف অর্থ পৃথককারী।

পারিভাষিক অর্থ-

إن اتفقت أسماء الرواة خطّا واختلفت نطقا باختلاف النقط أوالشكل

রাউইর নাম যদি লিখতে এক রকম হয় কিন্তু অক্ষরের নুকতা বা শব্দের আকৃতি পরিবর্তনের কারনে উচ্ছারণ ভিন্ন হয় তাহলে তাকে মু'তালিফ ও মুখতালিফ বলে। যেমন

ক) عُقَيْلٌ ও عَقِيْلٌ

খ) مُسَوِّر ও مِسوَرٌ

গ) سُلاَّمٌ ও سَلاَمٌ

১১) মুতাশাবিহ متشابه

আভিধানিক অর্থ- متشابه শব্দটি বাবে تفاعل থেকে اسم فاعل এর সীগাহ। অর্থ- সাদৃশ্য গ্রহণকারী।

পারিভাষিক অর্থ-

ان اتفقت اسماء الرواة خطا ونطقا واختلفت الاباء نطقا مع اختلافها خطا

রাউইদের নাম যদি লিখতে ও বলতে এক রকম হয় এবং পিতা বা দাদার নাম লিখতে এক রকম হলেও উচ্চারণটা ভিন্ন হয় অথবা পিতা দাদার নাম লিখতে বলতে এক রকম হয়। রাউইর নাম লিখতে একরকম হলেও উচ্চারণে ভিন্ন হয় তাহলে তাকে মুতাশাবিহ বলে।

মুতাশাবিহ এর সুরত উক্ত সংজ্ঞায় ইঙ্গিত করে যে মুতাশাবিহ এর তিনটি সুরত হতে পারে। ১। একনামীয় রাউইদের পিতার নাম লিখতে এক কিন্তু উচ্চারনে ভিন্ন। যেমন محمد بن عقيل ও محمد بن عُقَيْلُ প্রথমজন নিশাপুরী ও দ্বিতীয়জন ফিরয়াবী।

২। রাউইদের পিতার নাম লিখতে ও বলতে এক, রাউইর নাম লিখায় এক উচ্চারনে ভিন্ন। যেমন شريح بن نعمان ও شريح بن نعمان প্রথমজন তাবেঈ ও দ্বিতীয়জন ইমাম বুখারীর উস্তাদ।

৩। রাউইর পিতার নাম লিখতে বলতে এক কিন্তু নিসবত লিখতে এক হলেও বলতে ভিন্ন। যেমন محمد بن عبد الله مُخَرَّمِي ও محمد بن عبد الله مُخَرِّمِي প্রথমজন ইমাম বুখারী ও আবুদাউদ, নাসাঈ এর উস্তাদ। দ্বিতীয় জন ইমাম শাফেঈর ছাত্র।

নোট متشابهমুতাশাবিহ মুলত পুর্বোক্ত উভয় প্রকার (متفق ومتفترق এবং مؤتلف ومختلف) এর সমন্বয় গঠিত হয়। কেননা মুতাশাবিহ এর মাঝে কিছু নাম লিখতে পড়তে এক রকম হয়, যা হয়ে থাকে متفق ومفترق এ। এবং কিছু নাম লিখতে এক রকম পড়তে ভিন্ন হয়। যা

مؤتلف ومختلف এ হয়ে থাকে। যেমন محمد بن عَقيل ও محمد بن عُقَيْل হচ্ছে متشابه এতে محمد হল متفق ومفترق। অর্থাৎ নাম এক, ব্যক্তি ভিন্ন। এবং عُقَيْل ও عَقِيْل হল مؤتلف ومختلف। অর্থাৎ লিখতে এক উচ্চারণে ভিন্ন। উভয়টা হয়ে মুতাশাবিহ হয়েছে।

১২) হাদীসু গায়রিল মুসাম্মা (حديث غير المسمى)

مسمى শব্দটি বাবে تفعيل থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- নাম নির্ধারিত ব্যাক্তি। এ হিসাবে غير مسمى এর অর্থ হবে যার নাম নির্ধারিত নয়।

পারিভাষিক অর্থ- কোন কোন হাদীসে সনদে রাউইর নাম উল্লেখ না করে صاحب لنا - ثقة - رجل - شيخ ইত্যাদি অস্পষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা হয়। এরকম নাম বিহীন রাউইদেরকে মুবহাম مبهم বলা হয়। যাদের পরিচিতি বলার জন্য হাদীস বিশারদগন মুবহাম নামক গ্রন্থাবলী লিখেছেন।

غير المسمى রাউইর হাদীসের হুকুমঃ এমন রাউইর হাদীস গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ যার নামই জানা নেই সে বিশ্বস্ত নাকি অবিশ্বস্ত তা অজানা থেকে যায়।

تعديل مبهم এর হুকুমঃ নাম অস্পষ্টতাকারী যদি বিশ্বস্তবোধক শব্দ প্রয়োগ করেন। যেমন বলেন أخبرني ثقة তাহলে

ক) তবুও এ রিওয়ায়াত গ্রহনযোগ্য নয়। কারন হয়ত রাবী তার غير مسمى শায়খের تعديل করেছেন নিজ জানা মতে। অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত ও হতে পারে।

খ) হ্যাঁ যদি تعديل কারী কোন অভিজ্ঞ হাদীস বিশারদ হন। যেমন- ইমাম মালিক, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম তাহলে তাদের تعديل গ্রহনযোগ্য। তাই হাদীসও গ্রহনযোগ্য হবে।

১৩) হাদীসুন গাইরি মা'রুফিত তাসমিয়া (حديث غير معروف التسمية)

আভিধানিক অর্থ- معروف শব্দটি বাবে ضرب থেকে اسم مفعول এর সীগাহ। অর্থ- পরিচিত, অর্থ অপরিচিত, অপ্রসিদ্ধ।

পারিভাষিক অর্থ- কোন সময় হাদীসে রাউইর অপ্রসিদ্ধ নাম উল্লেখ করা হয় (অর্থাৎ রাউইকে বিভিন্ন শব্দে ডাকা হয়। যেমন- নাম ধরে, উপনামে, উপাধীতে, গুনে, পেশায়, সম্বন্ধে, পদবীতে, ইত্যাদি থেকে রাবী কোন একটি দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অথচ সনদে যখন তার অপ্রসিদ্ধ নামটি আসে তখন তাকে চেনা যায়না। যেমন হযরত আবু বকর রা. এর স্থলে আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান অথবা আবু হুরায়রা এর স্থলে আব্দুর রহমান ইবনে সখর বলা হলে অনেকেই চিনতে পারবেন না। মুহাদ্দিসিনে কেরাম এমন রাউইদের পরিচিতি প্রদানের জন্য موضحات নামক গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন।

হাদীসুন গাইরি মা'রুফিত তাসমিয়া (حديث غير معروف التسمية) এর হুকুম

ক) موضحات এর অধ্যয়নে বা গবেষণা দ্বারা যদি রাউই বিশ্বস্ত বলে প্রমানিত হয় তাহলে তার হাদীস গ্রহনযোগ্য।

খ) যদি এর মাধ্যমে রাউই অবিশ্বস্ত বলে প্রমানিত হয় তা হলে তার হাদীস অগ্রহনযোগ্য।

গ) যদি কোন কিছু জানা সম্ভব না হয় তাহলেও তার হাদীস অগ্রহনযোগ্য।

১৪) হাদীসুন মাজহুলিল আইন (حديث مجهول العين)

هو حديث من لم يرو عنه إلا واحد

ঐ কম বর্ণনাকারী রাউইর হাদীস, যার সূত্রে মাত্র একজন রাউই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসুন মাজহুলুল আইন এর হুকুম

ক) সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়

খ) জরাহ ও তা'দীলের কোন ইমাম যদি এই রাবীর বিশস্ততার ঘোষণা দেন তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে।

গ) তার কাছ থেকে বর্ণনাকারী যদি নিজে বিশ্বস্ত হন এবং একমাত্র বিশ্বস্তদের কাছে থেকে বর্ণনা করা তার অভ্যাস হয় তা হলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য।

১৫) হাদীসুন মাজহুলিল হাল ((حديث مجهول الحال

ঐ কম বর্ণনাকারী রাবীর হাদীস যার সূত্রের একাধিক রাবী বর্ণনা করেছেন বটে। কিন্তু কোন ইমামুল হাদীস তাকে বিশ্বস্ত বলে ঘোষণা দেননি। মাজহুলুল হাল কে মাসতুর ও বলা হয়।

হাদীসে মাজহুলুল হাল ((حديث مجهول الحال-এর হুকুম

ক) ইমাম আবু হানীফা (র.)ও তাঁর উস্তাদ হাম্মদ, ইবনে হিব্বান এর মতে মাসতুরের হাদীস গ্রহণযোগ্য, তারা বলেন আমরা আমাদের অজ্ঞতার দরুন মাসতুর এর হাদীসকে প্রত্যাখান করতে পারিনা। তার কোন ক্রুটি জানার আগে।

খ) জমহুর মুহাদ্দীসিনের মতে মাসতুরের হাদীস গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ তাঁরা রাউইর বিশ্বস্তা প্রমাণের পরই কেবল হাদীস গ্রহণ করেন। মাসতুরের তো তা প্রমাণ হয়নি।

১৬) আরেক শায ((شاذ أخر

আভিধানিক অর্থঃ বিরল, দুস্প্রাপ্য।

পারিভাষিক অর্থঃ هو حديث راو لزم سوء حفظه যে হাদীসের কোন রাউইর স্মৃতি শক্তি জন্মগতভাবে দুর্বল তাকে শায বলে।

১৭) মুখাতালিত্ব مختلط:

আভিধানিক অর্থ: مختلط শব্দটি বাবে افتعال থেকে اسم مفعول এর সীগাহ। অর্থ- মিশ্রিত।

পারিভাষিক অর্থ: هو حديث راو طار سوء حفظه যে হাদীসের কোন রাউইর স্মৃতি শক্তি এক সময় ভাল ছিল পরে দুর্বল হয়ে গেছে।

মুখতালিত্বের হাদীসের হুকুম: তার اختلاط। স্মৃতি বিস্মৃতির পূর্বের হাদীস مقبول গ্রহণযোগ্য। পরের হাদীস مردود অগ্রহণযোগ্য। যেগুলো আগের নাকি পরের চিহ্নিত করা যায়না সেগুলো চিহ্নিত হওয়া পর্যন্ত موقوف স্থগিত।

চতুর্থ বিভক্তি: হাদীসের সনদ থেকে রাউইর নাম লুপ্ত হওয়া না হওয়া অনুপাতে সাত প্রকার-

(১) মুত্তাসিল (متصل)

(২) মুসনাদ (مسند)

(৩) মুনক্বাতি' (منتقطع)

(৪) মুআ'ল্লাক্ব ((معلق

(৫) মুরসাল (مرسل)

(৬) মু'যাল (معضل)

(৭) মুদাল্লাস (مدلس)

মুত্তাসিল متصل

আভিধানিক অর্থ: متصل শব্দটি বাবে افتعال থেকে اسم فاعل এর সীগাহ। অর্থ- যুক্তকারী, মিলনকারী, সমন্বয়কারী।

পারিভাষিক অর্থ-

إن لم يسقط راو من الرواة من البين فالحديث متصل

যদি হাদীসের সনদের কোন দিক থেকে কোন রাউইর নাম বাদ না পড়ে তাহলে সেই হাদীসকে মুত্তাসিল বলে।

মুসনাদ (مسند)

আভিধানিক অর্থ: مسند শব্দটি বাবে إفعال থেকে اسم مفعول এর সীগাহ। অর্থ- সনদযুক্ত, সমন্বয়কৃত, মিলিত।

পারিভাষিক অর্থ- শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন

كل حديث مرفوع سنده متصل فهو مسند هذا هو المشهورالمعتمد عليه-وبعضهم يسمى كل متصل مسندا وإن كان موقوفا أو مقطوعا-وبعضهم يسمى المرفوع مسندا وإن كان مرسلا أو معضلا أو منقطعا

ক. যে সকল মারফূ' হাদীসের সনদ মুত্তাসিল তাকে হাদীসে মুসনাদ বলে। এটাই প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মত।

খ. কারো মতে মুত্তাসিল সনদের সকল হাদীসকেই মুসনাদ বলে, যদিও তা স্পষ্ট মাওকুফ কিংবা মাকতু' হয়।

গ. কেউ কেউ সকল মারফূ' হাদীসকেই মুসনাদ বলেন। যদিও তা মুরসাল অথবা মু'যাল কিংবা মুনক্বাত্বি' হয়।

মুনক্বাতি'((منقطع

আভিধানিক অর্থ: منقطع শব্দটি বাবে انفعال থেকে اسم فاعل এর সিগাহ। অর্থ- কর্তনকারী, খন্ডকারী, বিচ্ছিন্নকারী।

পারিভাষিক অর্থ-

ان سقط واحد أو اكثر من غير موضع واحد فالحديث منقطع

যদি হাদীসের সনদের একাধিক স্থান থেকে এক বা একাধিক রাউইর নাম বাদ পড়ে তাহলে সেই হাদীসকে 'মুনক্বাত্বি' বলে।

মুআ'ল্লাক্ব (معلق)

আভিধানিক অর্থ ঃ معلّق শব্দটি বাবে تفعيل থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- ঝুলন্ত, টানানো, লটকানো, সংযুক্ত, সম্পর্কযুক্ত।

পারিভাষিক অর্থ-

والسقوط إما أن يكون من أول السند ويسمى معلقا وهذا الإسقاط تعليقا

বাদপড়া যদি সনদের প্রথমদিক থেকে হয়। তাকে মুআ'ল্লাক্ব বলে এবং এমন বাদ দেওয়াকে তা'লীক্ব বলে।

মুআ'ল্লাক্বের হুকুম (حكم معلق)

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন: সহীহ বুখারীর শিরোনামগুলোতে প্রচুর মুআ'ল্লাক্ব রয়েছে। সেগুলো মুত্তাসিলের মতো (গ্রহণযোগ্য)। কারণ তিনি উক্ত কিতাবে একমাত্র সহীহ হাদীস গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করেছেন।

উক্ত মুআ'ল্লাক্বগুলো যদি তাঁর কিতাবে কোথাও সনদ সহকারে বর্ণিত না ও হয়ে থাকে তবুও (গ্রহণযোগ্য)। তবে সেগুলো তাঁর মুসনাদগুলির সমস্তরের হবে না। তবে যদি স্বীয় কিতাবের অন্যত্র মুসনাদ আকারে উল্লেখ থাকে, তাহলে এগুলোকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করা হয়। যেমন-

ক. দৃঢ়তার সাথে معروف সিগা দ্বারা বর্ণিত যেমন قال أو ذكر এগুলো প্রমাণ করে হাদীসটির সনদ তার নিকট গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এটা নিশ্চিত সহীহ।

খ. দুর্বলভাবে مجهول সীগাহ দ্বারা বর্ণিত যেমন قيل ويقال এগুলি প্রমাণ করে হাদীসটির সনদের বিশুদ্ধতায় তার মন্তব্য রয়েছে, তবে যেহেতু তিনি স্বীয় সহীহ বুখারী কিতাবে এটাকে স্থান দিয়েছেন তাই এর কোন না কোন ভিত্তি থাকবে। এজন্যই মুহাদ্দেসীনে কেরাম বলেন

تعليقات البخاري متصلة صحيحة বুখারী শরীফের মুআল্লাক্বগুলো গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ।

মুরসাল ((مرسل

আভিধানিক অর্থ: مرسل শব্দটি বাবে إفعال থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- প্রেরিত, বর্জনকৃত, পরিত্যক্ত।

পারিভাষিক অর্থ-

وإن كان السقوط من أخر السند فإن كان بعد التابعي فالحديث مرسل هذا الفعل إرسال كقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

যদি রাউইর পতন (বাদপড়া) সনদের শেষ থেকে (তাবেঈর পরে)হয় তাকে মুরসাল مرسل বলে এবং এ কাজ (তাবেঈর পরের কোন তাবেঈ / সাহাবীর নাম লুপ্ত) করাকে ইরসাল বলে। যেমন কোন তাবেঈ বললেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

মুরসালের হুকুম: এ ব্যাপারে চারটি মতামত রয়েছে, জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে স্থগিত রাখা (আমল করা ও দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা) কারণ পতিত রাউই বিশ্বস্থ কি না জানা নেই।

কেননা তাবঈ কখনো অন্য তাবেঈ থেকে বর্ণনা করেন আর তাবেঈদের মাঝে বিশ্বস্থ ও অবিশ্বস্থ উভয় প্রকার রাউই আছেন।

২। ইমাম আবু হানীফা (র.) ও মালিক (র.)-এর কাছে মুরসাল হাদীস নিঃশর্তে গ্রহণযোগ্য। তারা বলেন (কোন তাবেঈ) রাবীর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বস্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার কারণেই তার নাম লুপ্ত করেন।

কারণ কথাটাইতো বিশ্বস্থতায়, যদি তাবেঈর নিকট সনদটি বিশ্বস্থ না হতো (রাউই বিশ্বস্থ না হতেন) তাহলে তিনি ইরসাল (রাউইর নাম লুপ্ত) করে قال رسول الله ﷺ বলতেন না।

৩। ইমাম শাফেঈর (র.) নিকট মুরসালকে যদি অন্য কোন মুরসাল বা মুসনাদ (যদিও সেটা ضعيف দুর্বল হয়) দ্বারা শক্তিশালী করা হয় তাহলে উক্ত মুরসাল গ্রহণযোগ্য হবে।

৪। ইমাম আহমদ (র.)-এর দুটি মত রয়েছে।

(ক) توقف স্থগিত। (খ) مقبول مطلقا নিঃশর্তে গ্রহণযোগ্য।

মু'যাল (معضل)

আভিধানিক অর্থ ঃ .معضل শব্দটি বাবে إفعال থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- বিচ্যুত, দুর্বল, আটক, কষ্টকর।

পারিভাষিক অর্থ-

ان كان السقوط من أثناء الإسناد فإن كان الساقط اثنين متواليايسمى معضلا

যদি সনদের মধ্য থেকে ধারাবাহিকভাবে দু'জন রাউই পতিত হন তাহলে তাকে মু'যাল বলে।

মুদাল্লাস (مدلس)

আভিধানিক অর্থ ঃ مدلس শব্দটি বাবে تفعيل থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। অর্থ- গোপন, অন্ধকার।

تدليس তাদলীস এর আভিধানিক অর্থ

ক. ক্রয় বিক্রয়ের সময় পণ্যের ক্রটি গোপন করা।

খ. কেউ বলেন তাদলীস শব্দটি دلس থেকে নির্গত, যার অর্থ অন্ধকারের মিশ্রণ ও ঘনত্ব। অস্পষ্টতায় গোপন করা ও অন্ধকারের সাথে মিল থাকায় উপরোক্ত প্রকার হাদীসকে تدليس নাম করণ করা হয়।

পারিভাষিক অর্থ-

أن لا يسمى الراوي شيخه الذى سمع منه بل يروى عمن فوقه بلفظ يوهم السماع ولا يقطع كذبا كما يقول عن فلان وقال فلان

রাউই যে শায়খ থেকে হাদীসটি শুনেছেন তাঁকে সনদে উল্লেখ না করে তার উর্ধতন কোন শায়খ থেকে এমন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে যার দরুন তার কাছ থেকে সরাসরি শ্রবণের ধারণা হয় কিন্তু স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলে না যে তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শুনেছে যেমন বলে عن فلان অমুক থেকে বর্ণিতقال فلان অমুক বলেছেন।

তাদলীসের হুকুম حكم التدليس

মুদাল্লিস রাউইর হাদীস গ্রহণে উলামায়ে কেরাম বিভিন্নমত পোষণ করেছেন:

ক. মুহাদ্দেসীন ও ফুকাহাদের একাংশের মতে তাদলীস একটি দোষ ও এ দোষে যে দোষী হবে তার কোন হাদীসই গ্রহণযোগ্য হবে না।

খ. আরেকটি অংশের মতে গ্রহণযোগ্য হবে।

গ. জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে যারা শুধুমাত্র বিশ্বস্থ রাউইর নামই লোপ করেন যেমন ইবনে উয়াইনা, তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে, আর যারা দুর্বল ও সবল সকল প্রকার রাউইর নাম লোপ করেন তাদের হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে। হ্যাঁ যদি سمعت অথবা حدثنا অথবা أخبرنا শব্দের মাধ্যমে স্পষ্ট ভাবে শ্রবণের ঘোষণা দেন তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে।

তাদলীসের কারণ وجوه التدليس

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন

والباعث على التدليس قد يكون لبعض الناس غرض فاسد مثل اخفاء السماع من الشيخ لصغر سنه أو عدم شهرته وجاهه عند الناس والذى وقع من بعض أكابر ليس لمثل هذا بل من جهة وثوقهم لصحة الحديث والاستغناء بشهرة الحال-

১. তাদলীস করণে কোন কোন রাবীর মন্দ উদ্দেশ্য থাকে, যেমন উস্তাদের বয়সের স্বল্পতা, অপ্রসিদ্ধি, প্রতিপত্তিহীনতার কারণে এমন উস্তাদের কাছ থেকে শ্রবণকে (লজ্জাজনক মনে করে) গোপন করা।

২. কোন কোন আকাবিরদের থেকে যে তাদলীস সংঘটিত হয়েছে তা পূর্বোক্ত তাদলীসের মত নয় বরং হাদীসের বিশুদ্ধতায় আস্থা ও রাউইর অবস্থার প্রসিদ্ধির কারণে রাবীর নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করে তাদলীস করেছেন।

আল্লামা শুমুন্নী (র.) বলেন-

قال الشمني يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من جماعة من الثقات وعن ذالك الرجل فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم لتحققه بصحة الحديث فيه كما يفعل المرسل-

৩. হতে পারে তাদলীসকারী হাদীসখানা বিশ্বস্ত রাউইদের একদল থেকে এবং ঐ উস্তাদ থেকেও শুনেছেন। অতপর হাদীসটির বিশুদ্ধতা তাঁর কাছে প্রমাণিত হওয়ায় শুধু উস্তাদের নাম উল্লেখ করে অবশিষ্ট একজনের অথবা সকলের নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছেন। যেমনটি মুরসিল রাউই করে থাকেন।

তাদলীসের প্রকার أقسام التدليس

তাদলীসের অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রকার তিনটি।

১) তাদলীসুল ইসনাদ تدليس الإسناد

২) তাদলীসুস সুয়ুখ تدليس الشيوخ

৩) তাদলীসুত তাসবীয়াহ تدليس التسوية

তাদলীসুল ইসনাদ تدليس الإسناد

هوأن يسقط الراوي شيخه ويروي عن شيخ الشيخ أوعن معاصر آخر لم يلقه اولقى ولم يسمع أو سمع ولم يسمع هذا الحديث بلفظ يوهم اللسماع كعن

রাউই তার শায়খের নাম বিলুপ্ত করে নিজ শায়খের শায়খ থেকে, অথবা এমন শায়খ থেকে বর্ণণা করেন যিনি তার এমন সমসাময়িক যার সাথে তার স্বাক্ষাত হয়নি, বা স্বাক্ষাত হলেও হাদীস শুনেনি বা শুনলেও এই (বর্ণণাকৃত) হাদীসটি শুনেনি বরং এই বর্ণণাকৃত হাদীসটি শায়খের কোন দুর্বল বা সাধারন ছাত্রের কাছ থেকে শুনেছেন। বর্ণণার সময় এই দুর্বল মাধ্যমটিকে লুপ্ত করে শায়খের সূত্রে এমন শব্দে (যেমন-عن দ্বারা) বর্ণনা করেন যে ধারনা হয় তিনি শায়খ থেকে সরাসরি শুনেছেন।

যেমন- بقية بن الوليدবাক্বীয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ এবং وليد بن مسلمওয়ালীদ ইবনে মুসলিম এর তাদলীস।

তাদলীসুল ইসনাদ تدليس الإسناد **এর হুকুম**

তাদলীসের এ প্রকার অবৈধ ও ঘৃণিত।

তাদলীসুল সুয়ূখ تدليس الشيوخ

ان يذكر الشيخ باسم أو كنية أو نسبة أو صفة لا يعرف۔

মুহাদ্দিস তার শায়খ এর উল্লেখ, শায়খের নাম বা উপনাম বা সম্বন্ধ বা গুণ দ্বারা করেন। যাতে লোকেরা শায়খকে চিনতে না পারে। কারন শায়খ দুর্বল বা সাধারন স্তরের।

তাদলীসুল সুয়ূখ تدليس الشيوخ **এর হুকুম**

তাদীসের এ প্রকার অবৈধ না হলেও অনুচিত।

তাদলীসুত তাসবীয়্যাহ تدليس التسوية

لم يسقط المدلس شيخه بل فوقه ضعيفا أو صغيرا تحسيناللحديث

মুহাদ্দিস নিজ শায়খকে লুপ্ত না করলেও হাদীসকে উত্তম বানানোর লক্ষ্যে উপর থেকে কোন দুর্বল বা সাধারন রাউইর নাম লুপ্ত করে সেখানে এমন শব্দ (যেমন عن) রেখে দেন যাতে শ্রবনের ধারনা সৃষ্টি হয়।

তাদলীসুস তাসবীয়্যাহ এর হুকুমঃ তাদলীসের এ প্রকার হারাম ও নিকৃষ্টতম কাজ।

মুদাল্লাস ও মুরসালে খফীর মধ্যকার পার্থক্যঃ হাদীসে মুদাল্লাসে রাউই হাদীস খানাকে এমন শায়খের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন যার সাথে রাউইর সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্ত শ্রবণ অর্জন হয়নি, কিংবা শ্রবণ অর্জন হয়েছে কিন্ত এই হাদীস খানার শ্রবণ অর্জন হয়নি। আর মুরসালে খফীতে রাউই হাদীস খানাকে এমন শায়খের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন যার সাথে রাউই সাক্ষাৎই হয় নাই বরং রাউই শায়খের সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং মুখাযরামীন (যে সকল তাবেঈ নবীজীর যুগ পেয়েছেন কিন্ত তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। যেমন আবু উসমান নাহদী, ক্বায়স বিন হাযিম প্রমুখ) যদি قال رسول الله বলে হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে তাকে মুরসালে খফী বলা হবে, মাদাল্লাস নয়।

পঞ্চম বিভক্তি

সনদের واسطه **বা মাধ্যমের স্বল্পতা ও আধিক্য অনুপাতে হাদীস তিন প্রকার।**

১) আলী (عالي)

২) নাযিল نازل

৩) মুসাবি (مساوي)

আলী (عالي)

আভিধানিক অর্থঃ عالى শব্দটি বাবে نصر থেকে اسم فاعل এর সীগাহ। অর্থ- উচু, মহান, সম্মানিত।

পারিভাষিক অর্থঃ

هو الحديث الذي قل رجال سنده وقد روي بطريق غير واحد একাধিক সনদ ও কম মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসকে আলী عالي বলে।

নাযিল (نازل)

আভিধানিক অর্থঃ نازل শব্দটি বাবে ضرب থেকে اسم فاعل এর সীগাহ। অর্থ- অবতরনকারী, নিম্নগামী, নীচু।

পারিভাষিকঃ هو الحديث الذي ازداد رجال سنده وقد روي بطريق غير واحد একাধিক সনদ ও বেশী মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসকে নাযিল (نازل) বলে।

মুসাবি ((مساوي

আভিধানিক অর্থঃ مساوي শব্দটি বাবে مفاعلة থেকে اسم فاعل এর সিগাহ। অর্থ- সমকক্ষ, সমান।

পারিভাষিক অর্থঃ

هو الحديث الذي روي بطريق غير واحدوقد ساواى عدد وسائط إسناده

একাধিক সনদে ও সমান সমান মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসকে মুসাউই مساوي বলে।

আলী এবং নাযিল আবার দুই প্রকার. ১। মুত্বলাক্ব (مطلق) ২। নিসাউই (نساوي)

মুত্বলাক (مطلق) রাউইর কম বেশী হওয়াটা যদি প্রথম রাউই থেকে রাসূলুল্লাহ সা. পর্যন্ত হয় তাকে মুত্বলাক বলে।

নিসাউই (نساوي) রাউইর কমবেশী হওয়াটা যদি প্রথম রাউই থেকে কোন ইমামুল হাদীস পর্যন্ত হয় তা হলে তাকে নিসাভী বলে। অতএব আলী ও নাযিলের মোট প্রকার চারটি।

১। আলী মুত্বলাকান (عالى مطلقا)

২। আলী নিসাবিয়্যান (عالى نسبيا)

৩। নাযিল মুত্বলাকান (نازل مطلقا)

৪। নাযিল নিসাবিয়্যান (نازل نسبيا)

আলী মুত্বলাক্বান (عالى مطلقا)

هو ماانتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة قليلة بالنسبة إلى سند أخر يرد ذالك السند بواسطة كثيرة

একাধিক সনদে বর্ণিত হাদীসের যে সনদ অন্য সনদের তুলনায় কম মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সা. পর্যন্ত পৌছেছে তাকে আলী মুত্বলাক্বান বলে।

আলী নিসাবিয়্যান (عالى نسبيا)

هو ماانتهى سنده إلى إمام من ائمةالحديث بواسطة قليلة بالنسبة إلى سند أخر يرد ذالك السند بواسطة كثيرة

একাধিক সনদে বর্ণিত হাদীসের যে সনদ অন্য সনদের তুলনায় কম মাধ্যমে কোন ইমামুল হাদীস পর্যন্ত পৌছেছে তাকে আলী নিসাবিয়্যান عالى نسبيا বলে।

নাযিল মুত্বলাক্বান نازل مطلقا

هو ماانتهى سنده إلى النبي ﷺ بواسطة كثيرة بالنسبة إلى سند أخر يرد ذالك السند بواسطة قليلة

একাধিক সনদে বর্ণিত হাদীসের যে সনদ অন্য সনদের তুলনায় বেশী মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সা. পর্যন্ত পৌছেছে তাকে নাযিল মুত্বলাকান (نازل مطلقا বলে।

নাযিল নিসাবিয়্যান (نازل نسبيا)

هو ماانتهى سنده إلى امام من ائمةالحديث بواسطة كثيرة بالنسبة إلى سند أخر يرد ذالك السند بواسطة قليلة

একাধিক সনদে বর্ণিত হাদীসের যে সনদ অন্য সনদের তুলনায় বেশী মাধ্যমে কোন ইমামুল হাদীস পর্যন্ত পৌছেছে তাকে নাযিল নিসাবিয়্যান (عالي نسبيا) বলে।

কোন প্রকার সনদের হাদীস উত্তম সাধারনত আলী সনদের হাদীসই উত্তম বলে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কাছে গণ্য। বিশেষ করে পরবর্তী মুহাদ্দিসীনের আগ্রহ এর প্রতি বেশী। এমনকি তারা এর দ্বারা গর্ববোধ করেন। তবে শর্ত হল আলী সনদের কোন রাউই আদালত ও যবত বিনষ্টকারী কোন দোষে দোষী হতে পারবে না। যদি দোষী হয় আর নাযিল সনদে এমন দোষী রাউই না থাকে তাহলে নাযিল সনদই উত্তম।

আলী নিসাবিয়্যান আবার চার প্রকার।

১। মুয়াফাক্বাত (موافقت)

২। বদল (بدل)

৩। মুসাওয়াত (مساواة)

৪। মুসাফাহা (مصافحة)

১) মুয়াফাক্বাত (موافقت))

আভিধানিক অর্থ: موافقت শব্দটি বাবে مفاعلة এর মাসদার। অর্থ- অনুরুপ হওয়া, একমত হওয়া, মিলন হওয়া।

পারিভাষিক অর্থ: هو أن يصل الراوي إلى شيخ أحدمن المصنفين من غير طريقه مع علو الإسناد على إسناد المصنف

কোন রাউই কোন মুসন্নিফে কিতাবের মাধ্যম ছাড়া অন্য সনদে উক্ত মুসন্নিফে কিতাবের শায়খ পর্যন্ত পৌছে যান আর এই অন্য সনদের মাধ্যম মুসন্নিফে কিতাবের মাধ্যম এর তুলনায় কম হয় তা হলে তাকে মুসন্নিফে কিতাবের সাথে মুয়াফাক্বাত موافقة (বা মিলন) বলে।

২) বদল (بدل)

আভিধানিক অর্থ: بدل শব্দটি বাবে نصر এর মাসদার। অর্থ- পরিবর্তন করা, বদলানো।

পারিভাষিক:

هو ان يصل الراوى إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه مع علو الإسناد على إسناد المصنف

কোন রাউই কোন মুসন্নিফে কিতাবের মাধ্যম ছাড়া অন্য সনদে উক্ত মুসন্নিফে কিতাবের শায়খের শায়খ পর্যন্ত পৌছে যান আর এই অন্য সনদের মাধ্যম মুসন্নিফে কিতাবের মাধ্যম এর তুলনায় কম হয় তা হলে তাকে মুসন্নিফে কিতাব ও তার শায়খের بدل (বা পরিবর্তন) বলে।

মুয়াফাক্বাত (موافقة)ও(بدل) বদলের উদাহরন

যেমন ইমাম বুখারী কুতায়বা ইবনে সাঈদ থেকে এবং তিনি ইমাম মালিক থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখন যদি আমরা অন্য কোন সংক্ষেপ সনদে ইমাম বুখারীর মাধ্যম ছাড়া কুতায়বা ইবনে সাঈদ পর্যন্ত পৌছতে পারি তা হলে যেন ইমাম বুখারীর সাথে আমাদের মুয়াফাক্বাত موافقة (মিলন) হয়ে গেল। আর যদি ইমাম বুখারী ও কুতায়বা এর মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন সংক্ষেপ সনদে ইমাম মালিক পর্যন্ত পৌছতে পারি তা হলে আমরা যেন তাদেরকে বদল (পরিবর্তন) করলাম।

৩) মুসাওয়াত (مساوات)

আভিধানিক অর্থ ঃ (مساوات) শব্দটি বাবে مفاعلة এর মাসদার।। অর্থ- সমতা, সমান সমান হওয়া।

পারিভাষিক:

هوأن يستوي عدد رجال سند الراوي مع سند أحدمن المصنفين

আমাদের থেকে রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত কোন হাদীসের সনদের রাউইর সংখ্যা কোন মুসান্নিফে কিতাব থেকে রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত সনদের রাউইর সংখ্যার সমান হওয়া। অর্থাৎ আমাদের ও মুসান্নিফে কিতাবের وسائط (মাধ্যম) সংখ্যা সমান হওয়া।

মুসাওয়াত (مساوات) এর উদাহরন

যেমন ইমাম নাসাঈ (র.) এর একটি হাদীসের সনদ দশজন রাবীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌছিয়েছেন।

এখন যদি আমরা ইমাম নাসাঈ এর মাধ্যম ছাড়া দশজন রাবীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌছতে পারি তাহলে আমরা যেন ইমাম নাসাঈর মুসাওয়াত مساواة (সমান) হলাম।

৪) মুসাফাহা (مصافحة)

আভিধানিক অর্থ: مصافحة শব্দটি বাবে مفاعلة এর মাসদার। অর্থ- করমর্দন, হাত মিলানো।

পারিভাষিক অর্থ:

هي أن يستوي إسناد الراوي مع إسناد تلميذ أحدمن المصنفين

মুসন্নিফে কিতাবের ছাত্র কোন একটি হাদীস যত (وسائط) মাধ্যমে বর্ণনা করেন তত মাধ্যমে ঐ হাদীসটি অন্য কোন রাউইর রিওয়ায়াত করাকে মুসাফাহা বলে। যেন হাদীসটি বর্ণনায় অন্য রাউই মুসান্নিফের ছাত্রের সাথে (مصافحة) করমর্দন করল।

ষষ্ঠ বিভক্তি: হাদীস বর্ণনার ধরন (কোন স্তরের রাউইর কাছ থেকে কোন স্তরের রাউই বর্ণনা করেছেন) অনুপাতে হাদীস চার প্রকার:

১। রিওয়ায়াতুল আকরান (رواية الأقرآن)

২। রিওয়ায়াতুল মুদাব্বাজ (رواية المدبج)

৩। রিওয়ায়াতুল আকাবির আ'নিল আসাগির (رواية الأكابر عن الاصاغر)

৪। রিওয়ায়াতুল আসাগির আ'নিল আকাবির (رواية الأصاغر عن الأكابر)

১) রিওয়ায়াতুল আকরান (رواية الأقرآن)

আভিধানিক অর্থ: رواية শব্দটি باب ضرب এর মাসদার এবং اقرآن শব্দটি قرين এর বহুচবন, অর্থ সাথী, বন্ধু, সহপাটী, সহচর, জ্ঞান ও বিদ্যায় বা বয়সে সমতুল্য ব্যক্তি।

পারিভাষিক অর্থ:

هي أن يروي قرين عن قرينه كرواية الأعمش عن التيمي

সাথী, বন্ধু, সহপাঠী, সহচর, জ্ঞান ও বিদ্যায় বা বয়সে সমতুল্য ব্যক্তি থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা। যেমন হযরত আ'মাশ (র.) হযরত তাইমী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

রিওয়ায়াতুল মুদাব্বাজ (رواية المدبج

আভিধানিক অর্থ: المدبجশব্দটি التدبيج মাসদার থেকে নির্গত এবং التدبيج মাসদারটি আরব্যদের ভাষ্য ديباجتي الوجه (চেহারার উভয় পার্শ বা গাল) থেকে সংগৃহীত।

পারিভাষিক অর্থ:

هو أن يروى القرينان كل واحدمنهماعن الآخر

দুই সহপাঠী, সমবয়স্ক বা সমতুল্য ব্যক্তি প্রত্যেকেই অপর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা

মুদাব্বাজের উদাহরন

যেমন হযরত আয়শা ও হযরত আবু হুরায়রা একে অপর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনুরুপভাবে ইমাম মালিক ও আওযাঈ, ইমাম মালিক ও আলী ইবনুল মাদীনী একে অপর থেকে হাদীস বর্ণাণা করেছেন।

রিওয়ায়াতুল আকরান ও রিওয়ায়াতুল মুদাব্বাজ এর পার্থক্য

উভয়ের মাঝে আম খাস মুত্বলাক এর সম্পর্ক। আকরান আম বা ব্যাপক। কারণ এতে একদিক থেকে রেওয়ায়াত পাওয়াই যথেষ্ট।

পক্ষান্তরে মুদাব্বাজ খাস বা নির্দিষ্ট। কারণ এতে উভয়দিক থেকে রেওয়ায়াত প্রয়োজন।

৩) রিওয়ায়াতুল আকাবির আনিল আসাগির (رواية الأكابر عن الأصاغر)

আভিধানিক অর্থ: أكابر শব্দটি أكبر এর বহুবচন। অর্থ বড়, মহান, মহত্ব। أصاغر শব্দটি أصغر এর বহুবচন। অর্থ ছোট। সামষ্টিক অর্থ ছোটদের কাছ থেকে বড়দের বর্ণনা করা।

পারিভাষিক অর্থ:

هي رواية الشخص عمن هو أصغر منه فى السن أو في العلم أو في الحفظ

কোন রাউই তার চেয়ে বয়সে, ইলমে বা স্মরন শক্তিতে নিম্নে কারও সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা।

রিওয়ায়াতুল আকাবির আনিল আসাগির এর প্রকার ও উদাহরণ:

এটা কয়েক প্রকার হতে পারে।

১। مروي عنه (যার কাছ থেকে বর্ণিত) راوي (বর্ণনাকারী) এর বয়স ও মর্যাদায় ছোট হবে। যেমন ইবনে শিহাব যুহরী (র.)ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (র.) এর রেওয়ায়াত ইমাম মালিক (র.) থেকে।

২। শুধু মর্যাদাগত তথা মুখস্ত ও জ্ঞানগত দিক দিয়ে ছোট হবে। যেমন ইমাম মালিক (র.) এর রেওয়ায়াত আব্দুল্লাহ বিন দিনার (র.) থেকে। ও ইমাম আহমদ (র.) ও ইসহাক (র.) এর রিওয়ায়াত ইবনে মুসা (র.) থেকে।

৩। উভয় দিক থেকে ছোট হবে।

যেমন উ'বাদা (র.) এর রিওয়ায়াত ক্বা'ব (র.) থেকে। এছাড়াও

ক) رواية الاباء عن الابناء পিতা কর্তৃক পুত্র হতে রিওয়ায়াত।

খ) رواية الصحابي عن التابعين সাহাবীর রিওয়ায়াত তাবেঈ থেকে।

গ)رواية التابعين عن الاتباع তাবেইর রিওয়ায়াত তবে তাবেঈ থেকে।

ঘ) رواية الشيخ عن التلميذ উস্তাদের রিওয়ায়াত ছাত্র থেকে।

এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

৪। রিওয়ায়াতুল আসাগির আনিল আকাবির (رواية الأصاغر عن الأكابر)

আভিধানিক অর্থ: বড়দের থেকে ছোটরা হাদীস বর্ণনা করা।

পারিভাষিক অর্থ:

هي رواية الشخص عمن فوقه في السن أو في العلم أو في الحفظ

কোন রাউই তার চেয়ে বয়সে ইলমে, জ্ঞানে বা স্মরন শক্তিতে বড় কারও থেকে হাদীস বর্ণনা করা।

উল্লেখ্য যে হাদীসসহ সকল বিদ্যার্জনের এটাই সাধারন ও প্রচলিত নিয়ম। কারন ছোটরাই বড়দের কাছ থেকে শিখে থাকে। যেমন ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী থেকে।

رواية عن أبيه عن جده হচ্ছে এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এটা আবার দুই প্রকার। যথা

১। যার মধ্যে جده এর ضمير রাউইর দিকে ফিরে এবং এটাই সাধারন নিয়ম। যেমন: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ص

এখানে (بهز)বাহায এর দাদা মুআবিয়া বিন হায়দা নবীজি থেকে বর্ণনা করেছেন।

২। যার মধ্যে جده এর ضمير রাবীর পিতার দিকে ফিরে। এটা সাধারন নিয়ম বর্হিভূত একটি উদাহরন। যেমন-

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ص

এখানে আমর(عمرو) এর পিতার দাদা আব্দুল্লাহ বিন আমর (عبد الله بن عمرو)নবীজি থেকে বর্ণনা করেছেন, আমর এর দাদা মুহাম্মদ নয়। আমরের নসব এরকম। আমর বিন শুয়াইব বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা.

(عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عاص رض)

সাবিক্ব ও লাহিক্ব (سابق و لاحق)

আভিধানিক অর্থ: শব্দ দুটি اسم فاعل এর واحد مذكر এর সীগাহ। সাবিক্ব অর্থ সাবেক, অগ্রবর্তী, পূর্ববর্তী, বিজয়ী। আর লাহিক্ব অর্থ পরবর্তী, সম্পৃক্ত, মিলিত, যুক্ত।

পারিভাষিক অর্থ:

هو أن يشترك الراويان فى الرواية عن شيخ واحد فمات احدهما قبل الآخر فمن مات اولا فهو سابق ومن مات آخرا فهو لاحق

দু'জন রাউই যদি একজন শায়খ থেকে হাদীস আহরণ করেন এবং তাদের একজনের মৃত্যু অপরজনের পরে হয় তাহলে পূর্বে মৃত্যুবরণকারীকে সাবিক্ব এবং পরে মৃত্যুবরণকারীকে লাহিক্ব বলে।

সাবিক্ব ও লাহিক্ব এর উদাহরণ।

১। হাফিয আবু ত্বাহির সিলাফী (র.) থেকে তাঁর শায়খ আবু আলী বারদানী (র.)একটি হাদীস শুনেছিলেন। এবং তার সূত্রে তা বর্ণনা করতেন। বারদানী

ইন্তেকাল করেন পাঁচশত হিজরীতে। অতপর হাফিয সিলাফীর সর্বশেষ ছাত্র ছিলেন তার পৌত্র আবুল কাশেম আব্দুর রহমান বিন মাক্কী (র.)। তিনি ইন্তেকাল করেন ৬৫০ হিজরীতে। দেখা গেল উভয় রাউইর মৃত্যুতে ১৫০ বছরের ব্যবধান। আর এটি হচ্ছে দুই রাউইর মৃত্যুর সর্বোচ্চ ব্যবধান। এখানে আবু আলী বারদানী (র.) সাবিক্ব, আবুল কাশেম আব্দুর রহমান বিন মাক্কী (র.)লাহিক্ব।

২। ইমাম বুখারী (র.)তাঁর শিষ্য আবুল আব্বাস খাররাস থেকে ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কিছুই বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ইন্তেকাল করেছেন ২৫৬ হিজরীতে। এদিকে আবুল আব্বাস খাররাস এর সর্বশেষ ছাত্র ছিলেন আবুল হোসাইন খাফফাফ (র.)। তিনি ইন্তেকাল করেছেন ৩৯৩ হিজরী সনে। সুতরাং দুজনের মধ্যে ব্যবধান ১৩৭ বছরের। এখানে ইমাম বুখারী (র.) সাবিক্ব, আবুল হোসাইন খাফফাফ (র.)লাহিক।

৩। ইমাম মালিক (র.) থেকে ইমাম যুহরী রিওয়ায়াত করেছেন। যুহরী ইন্তেকাল করেন ১২৪ হিজরীতে। ইমাম মালিকের আরেকজন ছাত্র ইসমাইল আসসাহমী তিনি ইন্তেকাল করেন ২৫৯হিজরীতে। এখানে ইমাম যুহরী (র.) সাবিক্ব, ইসমাইল আসসাহমী (র.)লাহিক্ব। উভয়ের মধ্যখানে ব্যবধান ১৩৫ বছরের।

এত দীর্ঘকাল ব্যবধানের কারণ হল অনেক সময় শায়খ তাঁর শিষ্যদের কারও ইন্তেকালের পরেও অনেকদিন বেচে থাকেন। আর তার শেষ জীবনে অল্প বয়স্ক ছাত্ররা তার থেকে হাদীস অর্জন করেন। এবং তাদের কারও কারও মৃত্যু হয় দীর্ঘ হায়াত লাভের পর।

সাবিক্ব ও লাহেক্ব জানার উপকারীতা

১। লাহিক্ব থেকে উচ্চ সনদ লাভ করা যায়। কারণ সাবিক্ব থেকে রেওয়ায়াতে যত মাধ্যম লাগে লাহিক্ব থেকে রেওয়ায়াতে তার চেয়ে মাধ্যম লাগে কম।

২। লাহিক্ব এর সনদ হতে রাউইর পতনের ধারনা দূরীভূত হয়।

৩। তাদলীসের সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

মুহমাল (مهمل)

আভিধানিক অর্থ ঃ নিরর্থক, অর্থহীন, অকর্মন্য।

পারিভাষিক অর্থ ঃ

أن يروى الراوي عن شيخين متفقين في الاسم أو اسم الأب أو اسم الجد أو النسبة ولم يتميز أحدهما عن الاخر

কোন রাউই যদি এমন দু'জন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাদের নাম এক, অথবা বাবার নাম পর্যন্ত এক, অথবা দাদার নাম পর্যন্ত এক, অথবা বংশ, নিসবত পর্যন্ত এক, একজন থেকে অন্যজন পৃথক করার কোন চিহ্ন থাকেনা, ফলে প্রকৃত শায়খ চিহ্নিত করতে সন্দেহ হয়। তা হলে কোন ভাবে একজন চিহ্নিত হয়ে গেলে অবশিষ্টজনকে মুহমাল বলে।

মুহমাল জানার ফায়দা: এ প্রকার জানা থাকলে একই নামে দু শায়খের মধ্য থেকে কে উদ্দেশ্য তা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়।

রাবী নির্নয় পদ্ধতি:

১। (نسب)নসব বা বংশ দ্বারা.

২। (نسبة) নিসবত বা সম্বন্ধ দ্বারা

৩। (لقب) লক্বব বা উপাধি দ্বারা

৪। (كنيت) বা উপনাম দ্বারা

৫। (كثرة الملازمة) শায়খের সাথে দীর্ঘ সংশ্রব লাভ দ্বারা।

৬। (ظن غالب) বা প্রবল ধারনা দ্বারা দুজনের একজনকে রিওয়ায়াতকারী শায়খ বলে চিহ্নিত করা যায়।

মুহমালের হুকুম ও উদাহরন:

ক) উভয় শায়খ যদি ثقة বা বিশ্বস্ত হন তা হলে চিহ্নিত করা জরুরী নয়। এমনিতেই তাদের হাদীস গ্রহনযোগ্য হয়। যেমন ইমাম বুখারী একটি রেওয়ায়াত عن أحمد عن ابن وهب সূত্রে আহমদ নামীয় রাউইর বংশ পরিচয়হীনভাবে বর্ণনা করেছেন। যাতে আহমদ বিন সালেহ হতে পারে আবার আহমদ বিন ঈসাও হতে পারে কিন্তু যেহেতু ইমাম বুখারীর উক্ত উভয় শায়খই বিশ্বস্ত তাই কোনজন প্রকৃত শায়খ তা চিহ্নিত করা ছাড়াই এ হাদীসটি গ্রহনযোগ্য হবে।

খ) যদি কোন একজন (ضعيف) বা দুর্বলজন তাহলে উল্লিখিত ছয় পদ্ধতির কোন একটির মাধ্যমে প্রকৃত শায়খ চিহ্নিত করা জরুরী। দুর্বলজন শায়খ বলে চিহ্নিত হলে হাদীসের গ্রহনযোগ্যতা (توفق) স্থগিত থাকবে। আর বিশ্বস্তজন (ثقة) শায়খ বলে

চিহ্নিত হলে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন সুলায়মান ইবনে দাউদ খাওলানী ও সুলায়মান ইবনে দাউদ ইয়ামানী এদের প্রথমজন বিশ্বস্ত আর দ্বিতীয়জন (যঈফ) দুর্বল।

مهمل ও مبهم এর পার্থক্য

মুহমাল এর মধ্যে রাউইর নাম উল্লেখ থাকে যদিও তা চিহ্নিত করতে সন্দেহ হয়। পক্ষান্তরে মুবহামের মধ্যে রাউইর নামই উল্লেখ থাকেনা।

মানহাদ্দাসা ও নাসিয়া (من حدث ونسي

আভিধানিক অর্থ ঃ

১ حَدَثَ (ن) حُدُوْثاً স্থাপিত হওয়া, ঘটনা ঘটা।

২.أَحْدَثَ (اف) إِحْدَاثاً আবিস্কার করা, সৃষ্টি করা।

৩. الحديث (ج) أَحَادِيْثُ খবর

نسي শব্দটি বাবে سمع থেকে واحد مذكر এর সিগাহ। সামষ্টিক অর্থ: যিনি হাদীস বর্ণনার পর (বর্ণনা করাটা) ভূলে গেছেন।

পারিভাষিক অর্থ: أن يجحد الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه

শায়খ তার বরাত দিয়ে বর্ণিত স্বীয় ছাত্রের হাদীসকে বর্ণনা করেছেন বলে অস্বীকার করা।

মানহাদ্দাসা ও নাসিয়া এর হুকুম حكم من حدث ونسي

ক) শায়খ যদি দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেন যেমন বলেন كذب على আমার উপর মিথ্যারোপ করেছে। ما رويت له هذا আমি তাকে এই হাদীস বর্ণনা করিনি। ইত্যাদি তাহলে উক্ত হাদীস মারদুদ বলে গণ্য হবে।

খ) শায়খ যদি সন্দেহের সাথে অস্বীকার করেন। যেমন বলেন। ما اذكر هذا এ হাদীস আমি স্মরন করতে পারছিনা। لا اعرفه আমি এটা জানিনা ইত্যাদি তাহলে বিশুদ্ধভাবে উক্ত হাদীস গ্রহনযোগ্য। মনে করতে হবে শায়খ রিওয়ায়াত করেছেন ঠিকই তবে এটি ভূলে গেছেন। কারন সূত্র আছে المثبت الجازم مقدم على النافي المتردد ।

গ) শায়খের কোন প্রকার অস্বীকারই তাদের عدالت বা বিশ্বস্থতা ক্ষতি গ্রস্থ হবেনা কিংবা তাদের অন্য রেওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত হবে না।

কেননা দুজনের প্রত্যেকেই একে অপরকে মিথ্যা প্রতিপন্য করছেন। কোন একজনকে প্রাধান্য দেওয়ারও উপায় নেই। এমতাবস্থায় إذا تعارضا تساقطا নীতি অনুসরনে উভয়ের মিথ্যারোপ পরিত্যক্ত হয়ে উভয়ের বিশ্বস্থতা বহাল থাকবে।

من حدث ونسي এর উদাহরণ

عن أبي هريرة أن النبي صـ قضي باليمين مع الشاهد الواحد

হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে

سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة

সূত্রে বর্ণিত। আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মদ দারাওয়ার্দী বলেন, হাদীসটি সুহায়েলের সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন রবিয়া ইবনে আব্দুর রহমান। পরে একদিন সুহায়েলের সাথে আমার স্বাক্ষাত হয়। আমি তাকে হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন আমি জানিনা। আমি বললাম রবিয়াতো তোমার বরাত দিয়ে হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছে। পরবর্তীকালে সুহায়েল এই হাদীসটি বর্ণনা কালে এভাবে সনদ বলতেন

حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة بكذا

সপ্তম বিভক্তি

হাদীস বর্ণনার শব্দ প্রয়োগ ও রাউইর অবস্থা অনুপাতে হাদীস দুই প্রকার।

১। মুসালসাল (مسلسل)

২। মুআনআন (معنعن)

মুসালসাল:

আভিধানিক অর্থ: مسلسل শব্দটিالسلسلة মাসদার থেকে اسم مفعول এর সীগাহ। অর্থ: ধারাবাহিক, বিরতিহীন, ছেদহীন, পরম্পরাযুক্ত।

পারিভাষিক অর্থ:

أن يتفق الرواة في صيغ الآداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل

যে হাদীসের সনদের সকল রাউই শব্দ প্রয়োগে অথবা কথায় বা কাজে বা উভয়ে একই গুনে গুনান্বিত থাকেন তাকে হাদীসে মুসালসাল বলে।

এ হিসাবে مسلسل মুসালসালের চারটি প্রকার হয়।

১। وحدة صيغة সকলের শব্দ প্রয়োগ এক রকম। যেমন حدثنا فلان قال حدثنا فلان অথবা سمعت فلانا قال سمعت فلانا ইত্যাদি।

২। وحدة قولية সকলের কথা এক রকম। যেমন নবীজি হযরত معاذ রা. কে বলেছিলেন

إنى أحبك فقل في دبر كل صلواة اللّٰهُمَّ أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك

এই হাদীসটি বর্ণনার সময় প্রত্যেক শায়খ তার ছাত্রকে প্রথমে বলতেন।

إنى أحبك

৩। وحدة فعلية সকলের কাজ এক রকম। যেমন হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন

شبك بيدي أبو القاسم صـ وقال خلق الله الأرض يوم السبت

নবীজি আমার হাতের আঙ্গুলের ফাকে তার হস্ত মোবারকের আঙ্গুলগুলী ঢুকিয়ে (পাঞ্চা দিয়ে) বলেন আল্লাহ ভূমি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে। এভাবে প্রত্যেক শায়খ তার ছাত্রকে উক্ত হাদীস শিক্ষা দানের শুরুতে হাতে হাতে পাঞ্চা দিতেন।

৪। وحدة قولية وفعلية সকলের কথা ও কাজ এক রকম হওয়া। যেমন হযরত আনাস রা. বলেন নবীজি বলেছেন

لايجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره قال انس وقبض رسول الله صـ على لحيته وقال آمنت بالقدر

এভাবে প্রত্যেক শায়খ হাদীস বর্ণনা শেষে দাড়ি ধরে امنت بالقدر বলেন।

এ প্রকারেরই অন্তর্ভূক্ত

১। المسلسل بالأولية

২। المسلسل بأكل التمر

৩। المسلسل بأخذ اليد

৪। المسلسل بعيد الأضحى

৫। المسلسل بتحريك الشفتين

মুআনআন (معنعن)

আভিধানিক অর্থ: عن যুক্ত।

পারিভাষিক অর্থ:

والعنعنة رواية الحديث بلفظ عن فلان عن فلان والمعنعن حديث روى بطريق العنعنة-

অমুক থেকে অমুক থেকে এরূপ শব্দে হাদীস বর্ণনা করাকে আনআনা বলে। আর আনআনা পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীসকে হাদীসে মুআনআন বলে।

মুআনআন গ্রহনযোগ্য হওয়ার শর্ত

ويشترط فى العنعنة المعاصرةعند مسلم واللقي عند البخاري والأخذ عند قوم أخرين ومسلم رد على الفريقيين اشدالرد وبالغ فيه وعنعنة المدلس غير مقبولة

হাদীসে মুআনআন (মুত্তাসিলের মত গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে-

ক. ইমম মুসলিম (র.) এর মতে راوي ومروي عنه ছাত্র ও উস্তাদের মধ্যে সমসাময়িকতা।

খ. ইমাম বুখারীর (র.)এর মতে ছাত্র উস্তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ প্রমানিত হওয়া।

গ. অন্যান্য মুহাদ্দিসীনদের মতে ছাত্র কর্তৃক উস্তাদ থেকে হাদীস শ্রবণ গ্রহণ প্রমাণিত হওয়া।

ইমাম মুসলিম (র.) শেষোক্ত দুই মতের ঘোর বিরোধিতা করেছেন এবং এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। (তবে একথায় সকল একমত যে,) মুদাল্লিস রাউইর হাদীসে মুআনআন গ্রহণযোগ্য নয়।

ضروره تديوين الحديث

হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা

নবী সা. ও সাহাবাদের যুগে পৃথক পৃথক ও ব্যক্তিগতভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হলেও এর প্রধান ভিত্তি ছিল মুখস্থের উপর। এক এক জন সাহাবী হাদীসের এক এক খানা জীবন্ত কপি ছিলেন। এ অবস্থা হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ছিল। যখন দ্বিতীয় শতাব্দী শুরু হলো,

(ক) ইসলামের গন্ডি আরব অতিক্রম করে দুরদুরান্তের অনারবী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আরবীয়রা যে খোদা প্রদত্ত অভাবনীয় মুখস্থ শক্তির

অধিকারী ছিলেন অনারবীরা এথেকে বঞ্চিত থাকায় তারা পূর্ব থেকেই লেখাপড়ায় অভ্যস্থ ছিল। তাই তারা হাদীসকে সংকলনের মাধ্যমে সংরক্ষণের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

(খ) এর চাইতেও বড় প্রয়োজন যেটা ছিল তাহলো সাহাবায়ে কেরাম যারা হাদীসের জীবন্ত কপি স্বরূপ ছিলেন তারা দিন দিন দুনিয়া ত্যাগ করা শুরু করলেন। এমনিভাবে অধিকাংশ তাবেঈন যারা সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করেছিলেন তারা ও ক্রমশ ক্রমশ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে লাগলেন। তখন প্রবীণ তাবেঈনদের মধ্যে এই ভীতি সঞ্চার হলো যে, এ মুহূর্তে হাদীস সংকলিত না হলে দুনিয়া থেকে ইলমে হাদীস বিলুপ্ত হয়ে কবরে দাফন হয়ে যাবে, তাই তারা এ কাজে ব্রতী হন।

(গ) সর্বাধিক প্রনিধানযোগ্য বিষয় যেটা ছিল তাহলো বিদআতিদের সংখ্যাধিক্যতা ভ্রান্ত, মতাবদে বিশ্বাসী (বাতিল ফিরকা) শিয়া, খাওয়ারিজ, মু'তাজিলা, ক্বদরিয়া, জবরিয়া, মুসাব্বিহা, মুয়াত্তিলা ইত্যাদি দলগুলোর প্রাদূর্ভাব।

এ সকল ফিরকা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নিয়ে কোমরে গামছা বেধে মাঠে নেমেছিল। তাদের সাজ সারঞ্জামের প্রধান হাতিয়ার ছিল তাদের মতবাদের পক্ষে হাদীস রচনা করে নবীজির বাণী বলে চালিয়ে দেওয়া।

ফলে সাধারণ মুসলমানরা তাদের বানানো জাল হাদীসকে নবীজীর বাণী মনে করে তাদের দলের আনুগত্য করতে শুরু করেছিল। তখনকার দূরদর্শী মহল সঠিক হাদীসগুলো সংকলনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন যাতে করে মুকাবেলার সময় তাদের জাল হাদীসগুলো সঠিক হাদীস থেকে চিহ্নিত হয়ে যায়।

تدوين الحديث

হাদীস সংকলন

হাদীস সংকলনের চার যুগ: ১ম যুগ একত্রি করণের, ২য় যুগ শৃংখলিত করণের, ৩য় যুগ পৃথকি করণের, ৪র্থ যুগ যাচাই বাচাই করণের।

عصر جمع المنتشر

(১) একত্রি করণের যুগ: (৯৯ হি.-১৫১হি.)

প্রথম সারির তাবেয়ীগণ যখন হাদীস সংকলনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন তখন হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (র.) ৯৯ হিজরীতে খলীফা হওয়ার সাথে সাথে সকল ইসলামী জনপদে এই মর্মে সরকারী ঘোষণা প্রেরণ করেন যে যার কাছে যত হাদীস বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সকল

হাদীসগুলো লিখিতভাবে একত্র করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। যেমন বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারী ১ম খন্ডের ৫২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الافاق انظروا حديث النبي صـ فاجمعوه

এই সাধারণ ঘোষণা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের প্রতি খলীফা এ মর্মে পত্র লিখেন।

ইবনে আব্দুল বার (র.) এর ভাষ্যমতে সর্বপ্রথম বিশেষ চিঠি পান ইবনে শিহাব যুহরী (র.) চিঠি পাওয়া মাত্র তাঁর সংগ্রহের হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেন।

খলীফা তা পেয়ে তাঁর জীবদ্দশায়ই কপি করে তাঁর শাসিত জনপদ গুলোতে পাঠিয়ে দেন, যেমন 'জামেউ বয়ানিল ইলম' গ্রন্থের ৭৬ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে শিহাব (র.) এর বক্তব্য এভাবে উল্লেখ আছে- أمرنا عمروبن عبد العزيز يجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض عليها سلطان دفترا ইমাম আবু বকর ইবনে হাযম (র.)ও চিঠি পেয়ে হাদীস লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়ে ছিলেন কিন্তু তা রাজধানীতে পৌছেছিল খলীফার ইন্তেকালের পর। এ জন্যই ইমাম মালেক (র.) বলেন, হাদীস সংকলনে অগ্রগামিতার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (র.)। যেমন জামেউ বয়ানিল ইলম গ্রন্থের ৭৯ নং পৃষ্ঠায় ইমাম মালেক (র.) এর ভাষ্য উল্লেখ আছে এভাবে

أول من دون العلم (أي علم الحديث) ابن شهاب

রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীস সংকলনের প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে পরবর্তিতে বিভিন্ন ইসলামী শহরগুলোতে মুহাদ্দেসীনে কেরাম ও হাদীস সংকলনের কাজে ঝাপিয়ে পড়েন। মক্কায় ইবনে জুরাইজ, মদীনায় ইমাম মালেক ও ইবনে আবিযি'ব, কুফায় সুফিয়ান সাওরী, বসরায় হাম্মাদ বিন সালামা, সিরিয়ায় আউযাঈ, ইয়ামানে মা'মার বিন রাশিদ, খোরাসানে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক, ওয়াসিতে হায়ছাম, রায়তে জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ, একাজে নিয়োজিত হন। এ সকল কর্মপ্রচেষ্টা শুধু বিক্ষিপ্ত হাদীসগুলো একত্রিত করণের কাজে ব্যয় হয়েছে।

عصر الترتيب

(২) শৃংখলিত করনের যুগঃ (১৫১ হি.-২০০ হি.)

পূর্বের যুগে একত্রিত হাদীসগুলো থেকে সহজে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে এ যুগে কিছু উলামায়ে কেরাম হাদীসগুলোকে ফিকাহ শাস্ত্রের ধারাবাহিকতায় (যেমন প্রথমে কিতাবুত তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত ইত্যাদি) লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন।

এ যুগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ইমাম আবু হানিফা (র.)। তিনি এ নিয়মে

كتاب الاثار

(কিতাবুল আছার) নামে এক অমর গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর ইমাম মালিক (র.) 'মুওয়াত্তা' সুফিয়ান সওরী (র.) 'জামে' রচনা করেন।

عصر التميز

(৩) পৃথক করনের যুগঃ (২০০ হি.-২১৫ হি. প্রায়)

পূর্বের যুগে হাদীসগুলো সুন্দর শৃংখলায় সজ্জিত হলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সাথে সাহাবা ও তাবেঈদের উক্তি একত্রে বর্ণিত হতো। অথচ উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

তাই এ যুগে কিছু সংখ্যক মুহাদ্দেসীন সাহাবা ও তাবেঈদের উক্তিগুলোকে পৃথক করে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীগুলোকে (যাকে মারফু' বা মাসনাদ বলে) সাজিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

একাজে অগ্রজ ছিলেন উবাইদুল্লাহ ইবনে মুছা আবসী (র.)। তাঁর রচিত কিতাব মুসনাদে উবাইদুল্লাহ (র.)।

এ যুগের আরো কিছু কিতাব যেমন মুসনাদে আহমদ (র.) মুসনাদে ইসহাক (র.), মুসনাদে মুসাদ্দাদ (র.), মুসনাদে আসাদ (র.)।

عصر التنقيد

(৪) বাচাই করনের যুগ (প্রায় ২১৫ হি.-৩১৫ হি.)

পূর্বের যুগ গুলোতে হাদীসে সহীহ এবং গায়রে সহীহ যথা হাসান যঈফ, মুনকার ইত্যাদি সর্বপ্রকার হাদীস একত্রে বর্ণিত হয়েছে। অথচ আমলের ক্ষেত্রে হাদীসে গায়রে সহীহ এর তুলনায় হাদীসে সহীহ এর গুরুত্ব অপরিসীম।

তাই এ যুগে কিছু সংখ্যক মুহাদ্দেসীন সর্বপ্রকার হাদীসের বিপরীতে হাদীসে সহীহকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে কিতাব রচনা করেন। একাজে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ নিপুনতার পরিচয় দিয়েছেন ইমাম বুখারী (র.) তিনি তাঁর অমর গ্রন্থ সহীহ আল বুখারী রচনা করেন। অতঃপর ইমাম মুসলিম (র.), অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র.), ইমাম নাসাঈ (র.), ইমাম আবু দাউদ (র.), নিজ নিজ কিতাব রচনা করেন। এ যুগ ছিল হাদীস

সংকলনের সোনালী যুগ। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) একথা বোঝানোর জন্যই বলেছেন-

فإن ذالك العصر خلاصة العصور فى تحصيل هذا العلم (مقدمة فتح الباري)

علم الحديث فى شبه قارةالهند

ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের আগমন

ভারতবর্ষের সাথে ইসলাম ধর্মের সম্পর্ক হযরত উমর রা. শাসন আমলেই স্থাপিত হয়েছিল। তিনি উসমান ছাক্বফী ইবনে আবিল আস ছাক্বফীকে বাহরাইন এবং আম্মানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। উসমান ছক্বফখী তাঁর ভাই হিকামকে সিন্দু প্রদেশে এবং আরেক ভাই মুগিরাকে দিবেল প্রেরণ করেন। উভয়েই অমুসলিমদেরকে পরাজিত করে হিন্দুস্থানের মাটিতে ইসলামী হুকুমতের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাদের সেনা বাহিনীতে প্রচুর সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ ছিলেন। যাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ তাবেঈ রবী'বিন সুবাইহ সা'দী (মৃত ১৬০ হি.) ও ছিলেন। ভারতবর্ষেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। কিন্তু ইলমে হাদীসের আগমন কার মাধ্যমে কখন হয়েছিল?

এ ব্যাপারে সকলের একমত যে ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে ইলমে হাদীসকে পৌঁছানোর একান্ত প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)। তারপর এ কাজে অংশগ্রহণকারী ব্যাপারে ভিন্ন মত পাওয়া যায়। আল মুয়াসসাসাতুল ইসলামিয়া রজব-জিলক্বদ সংখ্যা ১৩৯৮ হিজরী এর বরাত দিয়ে মিফতাহুল উলূম ওয়াল ফুনুন গ্রন্থকারের ভাষ্যমতে।

(১) আল্লামা নুরুদ্দীন সিরাজী (র.), যিনি ইরান থেকে ইলমে হাদীসকে হিন্দুস্থানে নিয়ে এসেছিলেন। ফিরোজ শাহের আমলে। তার সহযোগী ছিলেন জালালুদ্দীন দাউয়ানী।

(২) শায়খ আব্দুল হালীম বুখারী (র.)র ভাষ্যমতে হিজরী দশম শতাব্দিতে ভারতবর্ষীয় উলামায়ে কেরাম থেকে কানযুল উম্মাল গ্রন্থকার শায়েখ হুসাম উদ্দীন আলী আল মুত্বাকী (মৃত ৯৭৫ হি.)

এবং তাঁর ছাত্র মজমাউল বিহার সংকলক শায়খ মুহাম্মাদ বিন ত্বাহির (মৃত ৯৮৬ হি.) ইলমে হাদীস অর্জনের জন্য মক্কা মদীনা ভ্রমণ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে ভারতবর্ষে ইলমে হাদীস প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। হিজরী ১১শতাব্দীতে আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) হেজাজ তথা মক্কা মদীনার উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করার পর হিন্দুস্থানে প্রচার করেন। অতঃপর এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন শেখ আহমদ সেরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানী।

তারপর শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (মৃত ১১৭৬ হি.) তারপর তার সুযোগ্য সন্তান শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী। তারপর শাহ ইসহাক ও শাহ ইসমাইল (র.) তারপর শাহ আব্দুল গনী এবং বুখারী শরীফের টীকাকার আহমদ আলী সাহারানপুরী।

তাদের পর ক্বাসেম নানুতুবী (র.) এবং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.), তাদের পর শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (র.) এবং শায়খ মাজেদ আলী। তাদের পর শাহ আনওয়ার কাশ্মীরী এবং হুসাইন আহমাদ মাদানী (র.) এবং শাব্বির আহদ উসমানী (র.)। তাদের পর ইয়াহইয়া সুহরানী (র.) কলকাতায়, শেখ সাঈদ আহমদ সাহেব. আল্লামা শাহ আহমদ শফী (র.) হাটহাজারীতে, ওজীহ উল্লাাহ (র.) সন্দীপে, মুফতী আমিমুল ইহসান ঢাকায়, আল্লামা মুশাহিদ আহমদ বায়ম পুরী. শায়েখ শরফুদ্দিন ভেড়াখালী, আল্লামা নুরুদ্দিন আহমদ গহরপুরী ও আল্লামা ইসহাক জালালাবাদী আল্লামা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী সিলেটে ইলমে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দেন।

علم الحديث في بنغلاديث

বাংলাদেশে ইলমে হাদীসের আগমন

হিজরী ৭ম শতাব্দীতে শাহওয়ালি উল্লাহ (মৃত ১১৭৬ হি.) এর বহু পূর্বে শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা আল হাম্বলী আল বুখারী ঢাকার সোনারগাঁয়ে ইলমে হাদীস নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং মাসনাদে আবীইয়ালার দারস দিতেন। তথায় তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার কারণে উলামা এবং মুহাদ্দিসীনদের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে তার জামাতা শেখ শরফুদ্দীন আহমদ বিন ইয়াহইয়া মীযী (মৃত ৭৭২ হি.) ছিলেন অন্যতম। সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ (মৃত ৯২৪ হি.) যিনি মুসলমানদের প্রথম শাসনকর্তা এবং বাংলা ভাষার অন্যতম প্রচারক ছিলেন তাঁর শাসন আমলে ইলমে হাদীসের শিক্ষা অত্যন্ত জোর সুরে চলছিল। তখন শায়খ ইয়াজদান বখশ ঢাকার একদালা নামক গ্রামে থাকতেন। তিনি বুখারী শরীফকে তিন খন্ডে কফি করে সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ এর দরবারে হাদিয়া হিসাবে উপস্থাপন করেন।

ইহা ৯১১ হিজরী মোতাবেক ১৫০৩ খৃ.-এর কথা। এই কফি আজও ভারতের পালকিপুরের কুতুবখানায় বিদ্যমান আছে। তথ্য সুত্র আল মুয়াসসাসাতুল ইলামিয়া, রজব-জিলক্বদ/১৩৯৮ হি.)

أنواع الكتب المصنفة فى الحديث

হাদীসের কিতাবের প্রকারভেদ

অনেক প্রকার হাদীসের কিতাব পাওয়া যায় তন্মধ্যে বত্রিশ প্রকার কিতাবের পরিচয় দেওয়া হলো।

১. জামে' الجامع। যে কিতাব হাদীসের আটটি বিষয়বস্তুই পাওয়া যায়। যেমন জামে' বুখারী জামে' তিরমিযী

تعريف المضامين الثمانية للحديث

হাদীসের আটটি বিষয়বস্তুর পরিচয়:

হাদীসের আটটি বিষয়বস্তু হচ্ছে ফার্সী কবিতায়

سير، وآداب وتفسير عقائد۔ فتن واشراط واحكام ومناقب

ইতিহাস, আচরণ, তাফসীর, ঈমান,: বিভ্রান্তি, গুণাবলী, লক্ষণ, বিধান।

১. (السير) সৃষ্টির সূচনার ইতিহাস, নবীজীবনের সকল ঘটনাবলী, বিশেষ করে যুদ্ধ, বিগ্রহ।

২. (الآدب) আচার আচরণ, উঠা-বসা, যেমন খানা পিনার আদব।

৩. (التفسير) (তাফসীর, কুরআন মজীদের ব্যাখ্যামূলক হাদীস সমূহ।

৪. (العقائد) (ঈমান আক্বীদা-বিশ্বাস তথা অন্তরে লালন করার মতো মতবাদ।

৫. (الفتن) বিভ্রান্তি, একারণে যে সকল দাঙ্গা হাঙ্গামা ভবিষ্যতে ঘটবে।

৬. (الأشراط) লক্ষণ কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশিতব্য কর্মকান্ড।

৭. (الأحكام) বিধান, আমলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি যেমন, নামাযা, রোযা ইত্যাদি।

৮. (المناقب) গুণাবলী, সাহাবী, সাহাবিয়্যাত ও তৎকালীন আরবীয় গোত্রসমূহের প্রশংসা বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী। আরো জানতে দেখূন আদদুররুল মানযুদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২৬

পবিত্র বুখারী শরীফে হাদীসের অষ্ট বিষয় যেখানে যা আছে বিষয় অধ্যায় পৃষ্ঠা

(১)السير ইতিহাস =কিতাবুল জিহাদ ৩৯০-৪৫২, ৫৬৩-৬৪১

আল মাগাযী ১০৯৬ - ১১২৮

(২) الأدب। আচার-আচরণ =কিতাবুল আতঈমা,নাফাকাত ৮০৫-৮০৯- ৮২১

(৩)التفسير।তাফসীর = কিতাবুত তাফসীর ৬৪২- ৭৪৪

(৪) العقائد। ঈমান আক্বীদা = কিতাবুল ঈমান ৫- ১৩

(৫) الفتن। বিভ্রান্তি =কিতাবুল ফিতান ১০৫৫- ১০৫৬

(৬) الأشراط। লক্ষণ= বাব খুরুজুন্নার, যিকরুদ্দাজ্জাল ১০৫৪- ১০৫৫

বাব যিকরু ইয়াজুয ওয়া মাজুয ১০৫৬

(৭) الأحكام। বিধান =কিতাবুল আহকাম ১০৫৭- ১০৭৩

(৮) المناقب। গুনাবলী = কিতাবুল মানাক্বিব ৪৯৬- ৫৩৪

২. মাসনাদ المسند। যে কিতাবে সাহাবায়ে কেরামের ধারাবাহিকতায় (যেমন প্রথমে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো, অতঃপর উমর রা. বর্ণিত হাদীসগুলো এভাবে) হাদীস বর্ণনা করা হয় তাকে মাসনাদ বলে। যেমন মাসনাদে আহমাদ, মাসনাদে আবী দাউদ ত্বায়ালিসী, মাসনাদে হুমায়দী।

এই ধারাবাহিকতাও বিভিন্ন প্রকারে হয়।

১. আরবী অক্ষরের ধারাবাহিকতায়,

২. শ্রেষ্ঠত্বের ধারাবাহিকতায়,

৩. ইসলাম গ্রহণের ধারাবাহিকতায়,

৪. হিজরতের ধারাবাহিকতায় ইত্যাদি।

৩. মা'জাম المعجم। যে কিতাবে নিজ শায়খ (হাদীসের উস্তাদ) এর ধারাবাহিকতায় হাদীস লিখা হয়। যেমন মা'জামে ইসমাঈলী।

এখানেও ধারাবাহিকতার উল্লেখিত প্রকারগুলো বিদ্যমান থাকে।

৪. সুনন السنن। যে কিতাব ফিকহ শাস্ত্রের ধারাবাহিকতায় (যেমন প্রথমে ত্বাহারাত, সালাত, সাওম ইত্যাদি) হাদীস লিখা হয়। যেমন সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ।

৫. মুসতাদরাক المستدرك যে কিতাব অন্য কিতাবের উপযোগী অথচ পরিত্যক্ত হাদীসগুলো লিখা হয়। যেমন মুসতাদরাকে হাকীম, ইমাম হাকীম (র.) উক্ত কিতাবে ঐ সকল হাদীস লিখেছেন যা বুখারী ও মুসলিম শরীফে লিখা হয় নাই, অথচ তার ধারণা অনুযায়ী হাদীসগুলি বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী কিতাবদ্বয়ে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

৬. মুসতাখরাজ المستخرج যে কিতাবে অন্য কিতাবের হাদীসগুলো ঐ কিতাবের সনদ ছাড়া নিজস্ব এমন সনদ দ্বারা বর্ণনা করা হয় যাতে ঐ কিতাবের লিখকের নাম আসে না। যেমন

মুস্তাখরাজে আবি আওয়ানাহ আলা সহীহ মুসলিম। এই কিতাবে হযরত আবু আওয়ানাহ সহীহ মুসলিমের হাদীসগুলো ইমাম মুসলিম (র.) এর সনদ ছাড়া তাঁর নিজস্ব এমন সনদে বর্ণনা করেছেন যে সনদে ইমাম মুসলিমের নাম আসেনি।

৭. জুয' الجزء যে কিতাবে এক বিষয়বস্তুর কিংবা এক রাউইর সকল হাদীস লিখা হয়। যেমন জুজউল ক্বিরাত লিল বুখারী।

৮. ফরদ فرد যে কিতাবে শুধু এক রাউইর বর্ণিত সকল হাদীস লিখা হয় যেমন কিতাবুল আফরাদ লিদদার কুতনী।

৯. রিসালাহ الرسالة যে কিতাবে শুধু এক বিষয়বস্তুর সকল হাদীস লিখা হয়।

১০. আত্বরাফ الأطراف যে কিতাবে হাদীসের শুধু প্রথমাংশ ও শেষাংশ উল্লেখ করে এই হাদীস কোন কোন কিতাবে? কোন কোন সনদে? কোন কোন শব্দে? বর্ণিত হয়েছে তা লিখা হয় যেমন তোহফাতুল আশরাফ ফী মারেফাতিল আতরাফ লিল মিয্যী।

১১. ইলাল العلل যে কিতাবে এমন হাদীসগুলো লিখা হয় যার সনদে তীক্ষ্ণ ত্রুটি রয়েছে যা এক মাত্র বিদগ্ধ হাদীস বিশারদ ধরতে পারেন, যেমন কিতাবুল ইলাল লিল বুখারী।

১২. মুশকালুল হাদীস مشكل الحديث যে কিতাবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্দী হাদীস উল্লেখ করে সামঞ্জস্য লিখা হয় এবং এমন হাদীসের মর্ম লিখা হয় যার মর্ম বুঝা কঠিন। এ রকম কিতাবকে مختلف الحديث ও شرح معانى الاثار বলা হয়। যেমন شرح معانى الاثارللطحاوى

১৩. মুসালসালাত المسلسلات যে কিতাবে ঐ সকল হাদীস লিখা হয়, যার সকল রাউইর মধ্যে হাদীস বর্ণনাকালীন বিশেষ গুণ পাওয়া। যায় যেমন বিশেষ স্থান, কাল, কাজ, শব্দ ইত্যাদি। সকল রাউই ঈদুল আযহার দিনে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে মুসালসাল বি ঈদিল আযহা বলে। সকল রাউই খেজুর খেয়ে বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে মুসালসাল বি আকলিত্তামার বলে। হাত ধরে বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে মুসালসালবি আখযিল ইয়াদ বলে।

১৪. যাওয়াইদ الزوائد যে কিতাবে ঐ সকল হাদীস লিখা হয় যা সহীহাইনে (বুখারী, মুসলিম) নেই। যেমন যাওয়াইদে হায়ছামী। আল্লামা নুরুদ্দীন হায়ছামী (র.) এক যাওয়াইদ লিখেন যাতে তিনি সহীহ ইবনে হিব্বানের ঐ হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন যা সহীহাইনে নেই।

১৫. গরীবুল হাদীস غريب الحديث যে কিতাবে হাদীসের শব্দাবলীর আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন আননেহায়া ফী গারীবিল হাদীস, ইবনে আছীর জাযরীকৃত।

১৬. তারাজিম التراجم যে কিতাবে বিশেষ সনদের বর্ণিত সকল হাদীস একত্রে লিখা হয়। যেমন একটি সনদ শাফেঈ আন মালিক আন নাফে' আন ইবনে উমার আন রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উক্ত সনদে বর্ণিত সকল হাদীস এক স্থানে লিখা।

১৭. তাখারীজ التخارج যে কিতাবে অন্য কিতাবের সনদবিহীন হাদীসগুলো সনদসহ লিখা হয়। যেমন নাসবুর রায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীসিল হেদায়া, ইমাম যালাঈকৃত। আদ্দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়াহ, ইমাম ইবনে হাজারকৃত।

১৮. উহদান الوحدان যে কিতাবে শুধু এক হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের হাদীস লিখা হয়।

১৯. মাউযুআত الموضوعات যে কিতাবে মাওযূ (নকল, জাল) হাদীস লিখা হয়, অথবা জালের অপবাদদুষ্ট হাদীসগুলোর বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন আযযুআফা আল্লামা উকায়লীকৃত।

২০. আরবাঈনাত الأربعينات যে কিতাবে মাত্র চল্লিশখানা হাদীস লিখা হয়। যেমন আল আরবাঈনাত, আবু নুআইমকৃত।

২১. মাসীখাহ المسيخة। যে কিতাবে এক বা একাধিক শায়খ (হাদীসের উস্তাদ) এর প্রদত্ত হাদীস ধারাবাহিকতাবিহীন লিখা হয়। যেমন মাসীখাহ, ইবনে বুখারীকৃত।

২২. তাজরীদ التجريد। যে কিতাবে এক বা একাধিক কিতাবের হাদীসগুলোর তাকরার (পুনরুক্তি) ও সনদলুপ্ত করে শুধু হাদীসের মতন বর্ণনাকারী সাহাবীর নামসহ উল্লেখ করা হয়। যেমন মিশকাতুল মাসাবীহ, তাজরীদুল বুখারী, আল্লামা যুবাইদীকৃত।

২৩. জাম" الجمع। যে কিতাবে একাধিক কিতাবের হাদীসগুলোর তাকরার লুপ্ত করে সনদসহ লিখা হয়। যেমন জাম'বাইনাস সাহীহাইন, আল্লামা হুমাইদীকৃত।

২৪. ফাহারিস الفهارس যে কিতাবে এক বা একাধিক কিতাবের হাদীসের সূচীপত্র উল্লেখ করা হয়। যেমন ফাহারিসুল বুখারী, আল্লামা যাহিদ কাওসারীকৃত। আল মু'জামুল মুফাহরিস, আল্লামা নববীকৃত।

২৫. মুশতাহারাহ المشتهرة। যে কিতাবে প্রসিদ্ধ হাদীসগুলোর সনদ ও মতনের বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন আত তাযকেরাহ ফী আহাদীসিল মুশতাহারাহ, আল্লামা যুরাকশীকৃত।

২৬. আসবাবুল হাদীস أسباب الحديث যে কিতাবে হাদীসের শানে উরূদ (কারণ বা প্রেক্ষাপট) লিখা হয়। যেমন আসবাবুল হাদীস আবু জাফর আবকারীকৃত।

২৭. তারতীব الترتيب। যে কিতাবে অন্য কিতাবের অবিন্যস্ত হাদীসগুলোকে বিশেষভাবে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন তারতীবে মুসনাদে আহমাদ ইবনে কাসীরকৃত। ইহা হরুফের ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত।

২৮. আমালী الأمالى। উস্তাদের মুখস্থ হাদীস থেকে শুনে শুনে স্বহস্তে লিখা কপি। যেমন আমালীয়ে ইবনে হাজার। তাঁর ছাত্রকৃত।

২৯. ছুলাছিয্যাত الثلاثيات। যে কিতাবে মাত্র তিনজন রাউই বিশিষ্ট সনদের হাদীস লিখা হয়। যেমন ছুলাছিয্যাতুল বুখারী।

৩০. আযকার الأزكار। যে কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দোআগুলো লেখা হয়। যেমন আল আযকার ইমাম নববীকৃত। আল হিসনুল হাসীন মিন কালামি সায়্যিদিল মুরসালিন, ইবনে জায্রীকৃত।

৩১. আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব الترغيب والترهيب। যে কিতাবে সৎ কাজের উৎসাহ ও অসৎ কাজে ভীতি সঞ্চারক হাদীস লিখা হয়। যেমন আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাফিয মুনযিরীকৃত।

৩২. মাসাহিফ المصاحف। যে কিতাবে মাসহাফ বা কুরআন মজীদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা যথা কুরআন সংকলনের কাহিনী, সুরা ও আয়াতের ধারাবাহিকতার রহস্য, কিরাআতের ভিন্নতা ও রহিত আয়াতের ইতিহাস ইত্যাদি লিখা হয় যেমন আলমাসাহিফ, ইবনে আমির কৃত।

طبقات كتب الحديث

হাদীসের কিতাবের স্তর বিন্যাস

বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার অনুপাতে হাদীসের কিতাবের স্তর পাঁচটি

الطبقة الأولى

১ম স্তর: যে সকল কিতাবের মুসান্নিফগন স্বীয় কিতাবে শুধু সহীহ হাদীসগুলোই সন্নিবেশিত করবেন বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যেমন বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মুয়াত্তা মালিক, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযাইমা, সহীহ ইবনে সাকান, মুসতাদরাকে হাকীম।

الطبقة الثانية

২য় স্তর: যে সকল কিতাবের মুসান্নিফগণ কিতাব লিখার সময় স্বীয় কিতাবে হাদীসে হাসান (সহীহ এর পরের স্তর) এর নীচের স্তরের হাদীস সন্নিবেশিত করবেন না বলে সচেষ্ট ছিলেন। যদিও প্রসঙ্গক্রমে নীচের স্তরের (যঈফ) হাদীস লিখেই ফেলেন তাহলে যঈফ বলে ঘোষণা করে সতর্ক করে দেন। যেমন সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবি দাউদ ,জামে' তিরমিযী।

الطبقة الثالثة

৩য় স্তর: যে সকল কিতাবের মুসান্নিফগণ নিজে জ্ঞানের গভীরতায়, মেধার প্রখরতায় আদর্শিক বিশ্বস্ততায় প্রসিদ্ধ। কিন্তু কিতাব লিখার সময় সহীহ বা হাসান হাদীসই লিখবেন বলে কোন প্রতিজ্ঞা করেননি। এসকল কিতাবে সহীহ, হাসান, মুনকার, যইফ, এমনকি মাওযু হাদীস পর্যন্ত পাওয়া যায়, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, সুনানে দারেকুতনী, সুনানে বায়হাকী, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, মুসান্নাফে ইবনে আবিশায়বা, মাসনাদে তায়ালিসী, মাসনাদে হুমায়দী, মা'আজিমে তাবরানী।

الطبقة الرابعة

৪র্থ স্তর: যে সকল কিতাবের মুসান্নিফগণ কিতাব লেখার সময় শুধু হাদীস বর্ণনার দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। যাচাই বাচাই করেননি। এ সকল কিতাবের অধিকাংশ হাদীসই, এমনকি শাহ আব্দুর রহমান এর ভাষ্যমতে সকল হাদীসই যইফ। যেমন আল কামিল, ইবনে আদীকৃত। নাওয়াদিরুল উসূল, মুহাম্মাদ বিন আলী কৃত। আয্যুআফা উকাইলীকৃত। মাসনাদুল ফিরদাউস, দায়লামীকৃত। তারীফুল খুলাফা, সুয়ূতীকৃত।

الطبقة الخامسة

৫ম স্তর: যে সকল কিতাবের মুসান্নিফগণ পাঠক মহলকে সতর্ক করার জন্য শুধু মাওযু হাদীসগুলো একত্র করে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন মাওযুআতে কুবরা, ইবনে জাওযীকৃত। আলমাওযুআত, সানআনীকৃত। আল লাআলিল মাসনুআ সিয়ুতীকৃত।

طبقات الرواة بناء على الرجحان

অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে রাউইদের স্তর পাঁচটি

রাউইর সংগৃহিত হাদীসগুলোর প্রতি তার নিয়ন্ত্রন ও সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং উস্তাদের সাথে সাহচর্য রাউইর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। যে রাউইর মধ্যে এ গুণগুলো বেশি থাকে তিনি অন্য রাবীদের তুলনায় অগ্রগণ্য হন।

আল্লামা আবু বকর হাযেমী তার শুরুতুল আইম্মাতিল খামসাহ নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে রাউইদেরকে পাঁচটি স্তরে বিন্যস্ত করেন।

الطبقة الأولى

كثير الضبط والإتقان مع كثير الملازمة للشيخ

১ম স্তর: যার নিয়ন্ত্রন ও সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং উস্তাদের সাহর্য উভয় গুণই বেশী। যেমন ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্য হতে ইমাম মালিক (র.), সুফিয়ান বিন উয়াইনা, শুআইব বিন আবী হামযাহ।

الطبقة الثانية

كثير الضبط والاتقان مع قليل الملازمة للشيخ

২য় স্তর: যার নিয়ন্ত্রন ও সংরক্ষন ক্ষমতা বেশি কিন্তু উস্তাদের সাহচর্য কম। যেমন লাইছ, ইবনে আবিযি'ব, আউযাঈ।

الطبقة الثالثة

قليل الضبط والاتقان مع كثير الملازمة للشيخ

৩য় স্তর: যার নিয়ন্ত্রন ও সংরক্ষণ ক্ষমতা কম কিন্তু উস্তাদের সাহচর্য বেশী। যেমন সুফিয়ান বিন হুসাইন, জাফর বিন বারক্বান।

الطبقة الرابعة

قليل فيهما

৪র্থ স্তর: উভয় গুনই কম।

যেমন ইসহাক বিন ইয়াহইয়া কলবী, মুআবিয়া বিন ইয়াহইয়া সুদাফী, মুসান্না বিন সাবাহ।

الطبقة الخامسة

قليل فيهما مع الجرح كا التدليس وغيره

৫ম স্তর: উভয় গুনে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তাদলীস ইত্যাদি দুষে দুষ্ট। যেমন বাহার বিন কাছীর,হিকাম বিন আব্দুল্লাহ আয়লী,মুহাম্মদ বিন সাঈদ মাসলূব।

تعارف الجرح والتعديل

যরাহ ও তা'দীলের ব্যাখ্যা

আভিধানিক অর্থ: جرحশব্দটি বাবে سمع ও فتح এর মাসদার অর্থ যখম করা, ক্ষত করা, দোষ বর্ণনা করা, সমালোচনা করা। تعديل শব্দটি বাবে تفعيل এর মাসদার অর্থ বিশ্বস্ত মনে করা।

পারিভাষিক অর্থ: মুহাদ্দিসগন হাদীস গ্রহনের সময় রাউইর চরিত্রের খুজ খবর নিতেন যাতে হাদীসে মন্দ লোকের বানুয়াট কথার অনুপ্রবেশ না ঘটে। এই লক্ষ্যে তারা কতিপয় রাউইর চরিত্রের যে মন্দ দিক তুলে ধরেছেন তাকেই جرح (যরাহ) বলে। এবং কিছু রাউইর চরিত্রের যে প্রশংসা করেছেন তাকে تعديل (তা'দীল) বলে।

جرح যরাহ এর তিন স্তর

১) নিকৃষ্টতম স্তর এই যে, কোন ইমামুল হাদীস কোন রাউইর ব্যাপারে اسم تفضيل তথা أفعل এর وزن বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করেন। যেমন-أكذب الناس أخدع الناس

২) মধ্যম স্তর এই যে, কোন অভিজ্ঞ ইমামুল হাদীস কোন রাউইর ব্যাপারে مبالغه তথা فَعَّالٌ এর وزن বিশিষ্ট দোষবোধক শব্দ প্রয়োগ করেন। যেমন دجال-كذاب-وضاع

৩) সাধারন স্তর এই যে, কোন অভিজ্ঞ ইমামুল হাদীস কোন রাউইর ব্যাপারে এমন সমালোচনা করা যা اسم تفضيل কিংবা مبالغه না হলেও তার চারিত্রিক ত্রুটির প্রমান বহন করে। যেমন-

لين- سيء الحفظ- فيه مقال - منكر الحديث-ساقط-متروك- لا يعتبر ضعيف جدا -ليس بثقة - ليس بالقوى -

تعديل তা'দীল এর তিন স্তর

১) উৎকৃষ্টতম স্তর এই যে, কোন অভিজ্ঞ ইমামুল হাদীস কোন রাউইর ব্যাপারে اسم تفضيل তথা أفعل এর وزن বিশিষ্ট গুনবোধক শব্দ প্রয়োগ করেন। যেমন فلان أوثق الناس (অমুক সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্ত) أثبت االناس (সবচেয়ে বেশী প্রামান্য)

২) মধ্যম স্তর এই যে, কোন ইমামুল হাদীস কোন অভিজ্ঞ রাউইর ব্যাপারে গুনবোধক একাধিক শব্দ প্রয়োগ করেন যেমন -فلان ثقة ثقة-فلان ثبت ثبت

فلان ثقة حافظ অমুক খুব বিশ্বস্ত।

৩) সাধারন স্তর এই যে, কোন ইমামুল হাদীস কোন অভিজ্ঞ রাউইর ব্যাপারে গুনবোধক এমন শব্দ প্রয়োগ করেন যা সাধারন جرح এর কিছু উপরের বা নিকটবর্তী হয়। যেমন فلان شيخ (অমুক হাদীসের জ্ঞানী) يرؤى حديثه (তার হাদীস বর্ণনা করা যায়) يعتبربه (তার হাদীস متابع ও شاهد হিসাবে) গ্রহনযোগ্য ইত্যাদি।

جرح ও تعديل এর বার স্তর

আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) স্বীয় تقريب التهذيب এর শুরুতে যরাহ ও তা'দীল উভয়ের সমন্বয়ে মোট বারটি স্তর নির্ধারণ করেছেন।

১ম স্তর: সাহাবী হওয়া। ইহা বিশ্বস্ততার সর্বোচ্চ স্তর। কারন সকল সাহাবায়ে কেরাম নিঃসন্দেহে বিশ্বস্ত ছিলেন।

২য় স্তর: যে সকল রাউইর تعديل (বিশ্বস্ততার ঘোষনা) আইম্মায়ে জরাহ ও তা'দীলগণ তাকীদ সহকারে করেছেন অর্থাৎ

ক) اسم تفضيل এর وزن ব্যবহার করেছেন। যেমন أوثق الناس

খ) কিংবা কোন গুনবোধক শব্দের تكرار দ্বিরুক্তি করেছেন শব্দগতভাবে যেমন ثقة ثقة অথবা

গ) অর্থগতভাবে যেমন ثقة حافظ

৩য় স্তর: যে সকল রাউইর تعديل বিশ্বস্ততার ঘোষনা আইম্মায়ে জরাহ ও তা'দীলগণ গুনবোধক এক শব্দে করেছেন। যেমন ثقة বা متقن বা ثبت বা عدل

৪র্থ স্তর: যে সকল রাউইর تعديل বিশ্বস্ততার ঘোষনা আইম্মায়ে জরাহ ও তা'দীলগণ ৩য় স্তরের চেয়ে কম গুনবোধক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে করেছেন। যেমন ليس به بأس-لا بأس به-صدوق

৫ম স্তর: যে সকল রাউইর ব্যাপারে আইম্মায়ে জরাহ ও তা'দীলগণ ৪র্থ স্তরের কম গুনবোধক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন صدوق سيء الحفظ - صدوق يخطئ- صدوق يهم –صدوق له أو هام

এছাড়া ঐ সকল রাউই ও ঐ সকল স্তরের অন্তর্ভূক্ত যাদের ব্যাপারে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপবাদ আরোপিত। যেমন শীয়া, ক্বদরীয়, সাবাঈ, মুরজিয়া, জাহমিয়া ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ স্তর: যে সকল রাউই থেকে খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণিত। যাদের ব্যাপারে এমন কোন সমালোচনা নেই যা তাদের হাদীস প্রত্যাখ্যানের কারন হতে পারে। যাদের ব্যাপারে তাদের কোন متابع থাকা অবস্থায় مقبول অন্যথায় لين الحديث শব্দ প্রয়োগ করা হয়।

৭ম স্তর: যে সকল রাউইর একাধিক ছাত্র আছে কিন্তু কোন অভিজ্ঞ ইমামুল হাদীস তার تعديل (বিশ্বস্ততার ঘোষণা) করেননি যাদের ব্যাপারে مستور অথবা مجهول الحال শব্দ প্রয়োগ করা হয়।

৮ম স্তর: যে সকল রাউইর গ্রহনযোগ্য কোন توثيق বিশ্বস্ততার ঘোষণা করা হয়নি বরং অস্পষ্টভাবে تضعيف দুর্বলতা ঘোষণা করা হয়েছে। যাদের ব্যাপারে ضعيف শব্দ প্রয়োগ করা হয়।

৯ম স্তর: যে সকল রাউইর মাত্র একজন ছাত্র। উপরন্ত কোন ইমাম তাকে توثيق বিশ্বস্ত ঘোষণা করেননি। যাদের ব্যাপারে مجهول শব্দ প্রয়োগ করা হয়।

১০ম স্তর: কোন ইমামই যে সকল রাউইর توثيق বিশ্বস্ততা ঘোষণা করেননি বরং কড়া ভাষায় تضعيف দুর্বলতা ঘোষণা করেছেন যাদের ব্যাপারে -واهي الحديث متروك الحديث-متروك-ساقط ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ হয়।

১১তম স্তর: যে সকল রাউইর মিথ্যার অপবাদ আরোপিত এ কারনে যে তাদের রিওয়ায়াত শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধানের বিপরীত অথবা কথা বার্তায় তাদের মিথ্যা বলা প্রমাণিত।

১২ তম স্তর: যে সকল রাউইর ব্যাপারে كذب বা وضع শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কারও মতে أكذب বা أوضع শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

কার تعديل গ্রহণযোগ্য?

تعديل ও جرح এর কারনসমুহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত ইমামুল হাদীসের جرح ও تعديل গ্রহণযোগ্য। সঠিক মতানুসারে শুধু এক অভিজ্ঞ হাদীসবিশারদের تعديل গ্রহণযোগ্য। যারা সাক্ষির সংখ্যানুপাতে দু'জনের শর্তারোপ করেছেন তাদের মত সঠিক নয়।

جرح অগ্রগণ্য নাকি تعديل?

ক) একই রাউইরجرح ও تعديل উভয় পাওয়া গেলে جرح অগ্রগণ্য দুই শর্তে।

১) جرح مبين বা দলিল সম্বলিত স্পষ্ট جرح হতে হবে, অস্পষ্ট হলে চলবে না।

২) অভিজ্ঞ কারও পক্ষ থেকে جرح হতে হবে অন্য কারো নয়।

খ) যদি রাউইর কোন تعديل না থাকে তাহলে جرح غير مبين অস্পষ্ট جرح ই গ্রহণযোগ্য।

গ) কেউ কেউ বলেন جرح غير مبين অস্পষ্ট গ্রহণযোগ্য নয় বরং স্থগিত।

أصول تصحيح الحديث و تضعيفه أي أخذ الحديث وتركه

হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই বা গ্রহন-বর্জনের মূলনীতি

১. হাদীসের নিজ সনদের বিশুদ্ধতা: হাদীসটি যে কোন কিতাবেই আসুক। সুতরাং শুধু বুখারী শরীফের হাদীসই বিশুদ্ধ এই ধারনা অমূলক।

২. হাদীস শাস্ত্রে ইজতেহাদেও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক যাচাই হওয়া: ব্যক্তি যে কোন যুগের হোক, সুতরাং পঞ্চম হিজরীর পরের কোন মুহাদ্দিসকে এ কাজের অযোগ্য মনে করা ভিত্তিহীন।

৩. হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই একটা ইজতেহাদী ব্যপার: এখানে মতপার্থক্য হতেই পারে যে কারণে এক মুজতাহিদের উক্তি অপরের বিরুদ্ধে দলীল হয় না, সুতরাং মতপার্থক্যের কারণে কাউকে দোষারূপ অসমীচীন।

৪. সনদের দূর্বলতা রাউইর দূষে হয়: এই দূর্বলতা পূর্ববর্তী রাউইদের তুলনায় পরবর্তীদের মাঝে বেশী পাওয়া যায়, এই কারণে দেখা যায় একই হাদীসের সনদের শুরুর দিকের রাউই অনুপাতে হাদীসটি সহীহ, শেষের দিকের রাউই অনুপাতে যঈফ।

সুতরাং ইমাম আবুহানীফা (র.)'র যুগে যে হাদীস সহীহ ছিল ইমাম বুখারী (র.)'র যুগে হাদীসের সনদে দোষী রাউই যুক্ত হওয়ার কারণে সে হাদীসই দূর্বল সাব্যস্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

৫. কোন হাদীসকে বিশুদ্ধ কিংবা দূর্বল ঘোষণার কারনে বাস্তবেই তা নিশ্চিত বিশুদ্ধ কিংবা দূর্বল হওয়াটা জরুরী নয়। এর ব্যতিক্রম ও হতে পারে। কারণ বিশ্বস্ত ও কখনও মিথ্যা বলতে পারে আবার অবিশ্বস্ত ও কখনও সত্য বলতে পারে।

৬. দূর্বল হাদীসেتعامل পাওয়া গেলে নিজস্ব দূর্বলতা সত্তেও দলীলে ব্যবহার উপযোগী হয়ে যায়

৭. হাদীসের পারস্পরিক দ্বন্দে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীন বিশুদ্ধতম হাদীসকে প্রাধান্য দেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) কোরআন মজীদ ও শরীয়তের সামগ্রিক মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হাদীসটিকেই প্রাধান্য দেন।

৮. একই হাদীসে আইম্মায়ে জরাহ ও তা'দীলের উভয় প্রকার মন্তব্য থাকলে মধ্যপন্থির মন্তব্য গ্রাহ্য কট্টরপন্থির মন্তব্য অগ্রাহ্য।

طبقات الرواة بناء على الزمان

যুগের ভিত্তিতে রাউইদের স্তর

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) স্বীয় গ্রন্থ তাক্বরীবুত্ তাহযীবে সর্ব প্রথম যুগের ভিত্তিতে বারটি স্তর নির্ণয় করেন।

طبقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين**এর বার স্তর**

১ম স্তর: সকল সাহাবায়ে কেরামের স্তর।

২য় স্তর: كبار التابعين প্রবীণ তাবেঈদের স্তর। যেমন সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.)

৩য় স্তর: أوسط من التابعين মধ্যম তাবেঈদের স্তর। যেমন হাসান বসরী, ইবনে সীরীন (র.)।

৪র্থ স্তর: قريب الأوسط من التابعين মধ্যম তাবেঈনদের নিকটতম স্তর। যারা খুব কম হাদীস সাহাবা থেকে এবং অধিকাংশ হাদীস প্রবীণ তাবেঈদের থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন: ইমাম যুহরী (র.), ক্বাতাদাহ (র.)।

৫ম স্তর: صغار التابعين কনিষ্ঠ তাবেঈদের স্তর। যারা এক দুই জন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কেউ কেউ সাহাবী থেকে হাদীসই বর্ণনা করেননি। যেমন ইমাম আবু হানিফা (র.)। সুলাইমান আ'মাশ (র.)।

৬ষ্ঠ স্তর: قريب الأصغر من التابعين কনিষ্ঠ তাবেঈনদের নিকটতমদের স্তর। মূলতঃ তারা কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ পাননি। কিন্তু তারা ৫ম স্তরের তাবেঈদের সমবয়স্ক হওয়ার কারণে তাবেঈনদের স্তরে গণ্য করা হয়। যেমন ইবনে জুরাইজ প্রমূখ।

৭ম স্তর: كبار تبع التابعين প্রবীণ তবেতাবেঈদের স্তর। যেমন ইমাম মালিক (র.), সুফিয়ান সওরী (র.) প্রমুখ।

أوسط تبع التابعين৮ম স্তর: মধ্যম তবেতাবেঈদের স্তর। যেমন সুফিয়ান বিন উয়াইনা, ইসমাইল বিন উলাইয়া প্রমুখ।

৯ম স্তর: أصغر تبع التابعين কনিষ্ঠ তবেতাবেঈনদের স্তর। যেমন ইমাম শাফেঈ (র.), ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সানআনী, আবু দাউদ, তায়ালিসী, ইয়াযীদ বিন হারুন প্রমুখ।

৯ম স্তর: أصغر تبع التابعين কনিষ্ঠ তবেতাবেঈনদের স্তর। যেমন ইমাম শাফেঈ (র.), ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সানআনী, আবু দাউদ, তায়ালিসী, ইয়াযীদ বিন হারুন প্রমুখ।

১০ম স্তর: كبار الأخذين من تبع التابعين

তাবেতাবেঈদের প্রবীণ শিক্ষার্থীদের স্তর। যেমন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)।

১১তম স্তর:اوسط الأخذين من تبع التابعين তাবেতাবেঈদের মধ্যম শিক্ষার্থীদের স্তর। যেমন ইমাম বুখারী (র.), যুহরী (র.) আলী ইবনুল মাদীনী (র.) প্রমুখ।

১২তম স্তর: أصغر الأخذين من تبع التابعين

তাবেতাবেঈদের কনিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের স্তর। যেমন ইমাম তিরমিযী রহ প্রমুখ।

নোট: সাহাবীদের ১ স্তর, তাবেঈতে ৫ স্তর, তাবেতাবেঈতের ৩ স্তর শিক্ষার্থীতে ৩ স্তর মোট ১২ স্তর।

হাদীস বর্ণনায় সনদের গুরুত্ব অপরিসীম: হযরত আলী রা. কারও কাছ থেকে ততক্ষন পর্যন্ত হাদীস গ্রহন করতেন না যতক্ষন না বর্ণনাকারী সরাসরি নবীজির কাছ থেকে শুনেছেন বলে হলফ না করতেন। ছাফাখানা/ প্রকাশনার বিকাশ ঘটার পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক মুহাদ্দিস কোন হাদীস গ্রহন করলে সাথে সাথে হাদীসটির সনদও সংগ্রহ করে মুখস্ত রাখা অপরিহার্য ছিল। এমনকি হাদীস বর্ণনার সময় হাদীসের সাথে সনদ বর্ণনাও ছিল অতীব জরুরী বিষয়। কিন্তু যখন হাদীসের সনদ ও মতন সম্বলিত কিতাব ছাপানোর ও প্রকাশনার নিয়ম চালু হল তখন থেকেই পূর্বের নিয়ম রহিত হয়ে মুদ্রিত বা ছাপানো হাদীসের কিতাবের বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনাই যথেষ্ট হয়ে গেল। কারণ প্রত্যেক কিতাবের সংকলকই নিজ

নিজ সনদ নবীজি পর্যন্ত স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এবং উক্ত কিতাবগুলী মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্তমানে আমাদের কাছে পৌছেছে। তাই কোন কিতাবের বরাতে হাদীস বর্ণনার মানেই নবীজির পক্ষ থেকে হাদীস বর্ননা করা। তথাপিও

ক) হাদীস ইলমে ওহী, যা যুগ যুগ ধরে বক্ষ থেকে বক্ষে সংরক্ষিত হয়ে আসছিল। আর এটাই ছিল সংরক্ষণের মূল ধারা, তাইতো কিতাব সংকলিত হওয়ার পর ও শুধু কিতাবের উপর নির্ভর না করে উস্তাদের মাধ্যমেই হাদীস বর্ণনার কাজ ছলছে। সুতরাং মূলধারা অব্যাহত রাখতে সনদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

খ) নবীজি (সা.) থেকে যতগুলো মাধ্যমে হাদীস আমাদের মাঝে পৌঁছেছে, প্রত্যেক মাধ্যম (রাউই) ই ছিলেন আধ্যাত্মিকতার মুর্ত প্রতিক। সুতরাং নবীজি থেকে চলমান রুহানী ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক বরকত লাভের জন্য সনদের বিকল্প নেই।

গ) কোরআন, হাদীস তথা গোটা ইসলামের সত্যতা যতগুলো দলিলের মাধ্যমে প্রমানিত তন্মধ্যে সনদ অন্যতম। অমুসলিমেরা বিশুদ্ধ সনদে তাদের নবী পর্যন্ত পৌছতে পারেনা। ইহুদিরা সামুন পর্যন্ত এবং খৃষ্টানরা মুলিস পর্যন্ত সনদ টেনেই আটকে যায়।

ঘ) কিতাবগুলী মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্তমানে আমাদের কাছে ব্যাপকভাবে পৌছলেও আমাদের নিজেদের সনদ সংরক্ষণের প্রয়োজনটা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সুতরাং সনদ উম্মতে

মুহাম্মদিয়ার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এই মর্মে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কয়েকটি উক্তি উল্লেখযোগ্য।

১। বিশিষ্ট তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বলেন,

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم

নিশ্চয় এ ইলমে হাদীস হচ্ছে দ্বীনের একটি বিরাট অংশ। সুতরাং কার কাছ থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহন করছ একটু যাঁচাই কর।

২। সুফিয়ান সাওরী বলেন,

الإسناد من سلاح المؤمن إن لم يكن معه السلاح فكيف يقاتل

সনদ হচ্ছে মুমিনের অস্ত্র। যদি তার কাছে অস্ত্র না থাকে তা হলে সে কি দিয়ে যুদ্ধ করবে। (অন্য ধর্মের মুকাবিলায় কি দিয়ে ইসলামের সত্যতা প্রমান করবে।)

৩। ইমাম শাফেঈ বলেন,

مثل الذى يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة الحطب فيها أفعى تلدغه وتنهسه هو لا يدري

সনদ ছাড়া হাদীস অন্বেষণকারী রাতের অন্ধকারে কাষ্ট আহরনকারীর মত। যে কাষ্টের মাঝে বিষধর সাপ বহন করে চলে যা তাকে তার অজান্তেই দংশন করবে।

৪। খতিব বাগদাদী বলেন,

مثل الذى يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذى يرتقي السطح بلا سلم

সনদবিহীন ধর্মীয় বিষয় গ্রহনকারী মইবিহীন ছাদে আরোহনকারীর মত।

৫। ইমাম মুসলিম তার মুকদ্দিমায় বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের দুটি উক্তি উল্লেখ করেছেন:

ক) الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

সনদ হচ্ছে দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। সনদ না থাকলে যে কোন ব্যক্তি যা ইচ্ছ বলে দ্বীনের নামে চালিয়ে দেয়ার প্রয়াস পেত।

খ) بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد

আমাদের ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে সনদ (আমাদের এটা আছে তাদের নেই)। আল লাআলিল মাসনুআহ, সুয়ূতীকৃত।

একটি সনদ ও একটি মতনের উদাহরন

حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحي بن سعيد الأنصاري قال اخبرني محمد بن إبراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

পবিত্র বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস। উল্লিখিত হাদীসে হুমাইদী থেকে রাসুলুল্লাহ পর্যন্ত ৭জন বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে। এবং إنما الأعمال থেকে ماهاجراليه পর্যন্ত অংশকে মতন বলে।

লেখক থেকে রাসূল সা. পর্যন্ত পবিত্র বুখারী শরীফের একটি সনদ

يقول أحقر العباد حسين أحمد حبيغنجى أخبرنا الشيخ إسحاق جلال أبادي قال أخبرنا الشيخ يوسف بالنوري حدثنا الشيخ الشاه أنورالكشميري حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي حدثنا الشيخ مولانا محمد قاسم النانوتوي حدثنا الشيخ شاه عبد الغني قال حدثنا الشيخ الدهلوي حدثنا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي حدثنا الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردى المدنى حدثنا الشيخ إبراهيم الكردي المدني حدثنا الشيخ أحمد القشاشي حدثنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي حدثنا الشيخ شمس الدين بن محمد بن أحمد بن محمد الرملي حدثنا الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري حدثنا الشيخ الحافظ أبو الفضل شهاب الملة والدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني حدثنا الشيخ إبراهيم أحمد التنوخي حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبو طالب الحجار حدثنا الشيخ سراج الحسين بن المبارك الزبيدي حدثنا الشيخ عبد الأول بن عيسى بن شعيب الشاجذي الهروي حدثنا الشيخ عبد الرحمن بن مظفرالداؤدي حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسى حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطار بن صالح بن بشار الفربرى حدثنا أميرالمؤمنين فى الحديث أبوعبد الله محمد بن إسمعيل إبراهيم بن المغيرة بن بردذبة بن بذذبة الجعفى البخاري حدثنا الحميد يقال حدثنا سفيان قال حدثنا يحي بن سعيد الأنصاري قال أخبرنى محمدبن إبراهيم التيمى أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب ﷺ على المنبر يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول إنما الأعمال بالنيات وانما لإمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرءة ينكحها فهجرته إلى ماهاجراليه

উক্ত সনদে লিখক ও রাসূরসা. এর মাঝে ২৯জন রাউইর সিলসিলা এসেছে।

লেখক থেকে রাসূল সা. পর্যন্ত পবিত্র আবুদাউদ শরীফের একটি সনদ

يقول أحقر العباد حسين أحمد حبيغنجى أخبرنا الشيخ المفتي شفيق الرحمن مولوي بازاري قال أخبرنا الشيخ نعمة الله الاعظمي حدثنا شيخ الأدب إعزاز على حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي حدثنا الشيخ مولانا محمد قاسم النانوتوي حدثنا الشيخ شاه عبد الغني قال حدثنا الشيخ إسحق الدهلوي حدثنا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي حدثنا الشيخ الشاه ولى الله الدهلوي حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني حدثنا الشيخ حسن بن على العجمي حدثنا الشيخ عيسي المغربى حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي حدثنا الشيخ بدرالدين الكرخي حدثنا الشيخ جلال الدين السيوطي حدثنا الشيخ محمد بن مقبل الحلبي حدثنا الشيخ صلاح الدين المقدسي حدثنا الشيخ أبو الحسن على الجناري حدثنا الشيخ أبو جعفر عمر بن طبرزد البغدادي حدثنا الشيخ أبو الوليد ابرهيم الكرخي أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي قال حدثنا الامام القاضى أبو عمرو جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللولوى قال حدثنا أبو داود سليمان بن الاشعث السجستاني حدثنا عبد الله بن مسلمة بن القعنب القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعنى بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد ـ

উক্ত সনদে লিখক ও রাসূলুল্লাহ সা. এর মাঝে ২৯জন রাউইর সিলসিলা এসেছে।

تحمل الحديث বা হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি ১০টি

১। مشافهة মৌখিত অনুমতি প্রাপ্তি।

২। مكاتبة লিখিত অনুমতি প্রাপ্তি।

৩। مناولة শায়খের পক্ষ থেকে হাদীসের কপি প্রাপ্তি।

৪। وجادة পরিচিত কারো হাদীসের কপি প্রাপ্তি।

৫। وصيت মুহাদ্দিস ইন্তেকালের সময় হাদীসের কপি কারো জন্য অসিয়ত করে যাওয়া।

৬। إعلام শায়খ ছাত্রকে একথা জানানো যে আমি অমুকের কাছ থেকে অমুক কিতাব রেওয়ায়েত করি।

৭। إجازة عامة শায়খ একথা ঘোষণা করা যে আমার সকল হাদীসের অথবা অমুক শহরের সকলকে অনুমতি দিলাম।

৮। إجازة للمجهول অজ্ঞাত কারো জন্য অনুমতি দেওয়া।

৯। إجازة بالمجهول অজ্ঞাত হাদীসের অনুমতি দেওয়া।

১০। إجازة للمعدوم অবর্তমান ব্যক্তি জন্য অনুমতি প্রদান।

صيغ الأداء বা হাদীস বর্ণনা পদ্ধতির স্তর ৮ টি

১। حدثني ও سمعت যদি শায়খের হাদীস পাঠের মাধ্যমে হাদীস গ্রহণ হয়ে থাকে।

২। اخبرني ও قرات عليه যদি ছাত্র হাদীস পাঠ করে থাকে।

৩। قرئ عليه وأنا أسمع যদি শায়েখের সামনে অন্য কেউ হাদীস পাঠ করে থাকে।

৪। انبانی যদি শায়খ ছাত্রকে শুধু স্বীয় হাদীস প্রাপ্তির উৎস সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন যেমন إعلام এর অবস্থায়।

৫। ناولني যদি ছাত্র শায়খের পক্ষ হতে হাদীসের কপি পেয়ে থাকে।

৬। شافهني যদি ছাত্র শায়েখের মৌখিক অনুমতি পেয়ে থাকেন।

৭। كتب الى যদি ছাত্র শায়খের লিখিত অনুমতি পেয়ে থাকেন।

৮। روى۔ ذكر۔ قال۔ عن

যদি ছাত্র শায়খের কাছ থেকে শোনা বা না শোনার সম্ভাবনা থাকে।

أقسام تحمل الحديث

হাদীস অর্জন ও বর্ণনার প্রকার সমূহের বিশ্লেষণ

শায়খ থেকে হাদীস অর্জন করাকে পরিভাষায় تحمل বলা হয়। এর প্রকার পাঁচটি।

১। السماع এর মর্ম হচ্ছে উস্তাদ হাদীস পড়বেন এবং ছাত্র শ্রবণ করবে। এভাবে অর্জিত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ছাত্র حدثني ۔ اخبرني ۔ سمعت فلانا يقول শব্দ প্রয়োগ বৈধ। ইহা হচ্ছে অর্জনকারী একজন হওয়ার ক্ষেত্রে। একাধিক অর্জনকারীরে ক্ষেত্রে বলবে حدثنا ۔ أخبرنا ۔ سمعت فلانا يقول শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে حدثني বলা উত্তম নাকি سمعت এতে এখতেলাফ আছে। কেউ বলেন حدثني উত্তম, কেউ বলেন سمعت উত্তম।

২। القراءة على الشيخ অর্থাৎ ছাত্র হাদীস পড়বে আর উস্তাদ শ্রবণ করবেন। এভাবে অর্জিত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অর্জনকারী একজন হলে أخبرني ۔ أنباني ۔ قرات عليه শব্দ প্রয়োগ করবে। বহুজন হলে أخبرنا ۔ انبانا বলবে।

কেউ বলেন পাঠকারী ছাত্র প্রয়োগ করবে أخبرنا আর শ্রবণকারী ছাত্র প্রয়োগ করবে انبانا এক্ষেত্রে قرئ عليه وأنا أسمع শব্দাবলী যুক্ত করা উত্তম, যেমনটি ইমাম নাসাঈ, তার উস্তাদ হারিস ইবনে মিসকিন থেকে বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

*ইমাম মালিক ও শাফেঈ (র.) এর মতে سماع পদ্ধতি উত্তম।

*ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মত এর উল্টো। তিনি قراءة على الشيخ পদ্ধতি উত্তম বলেন।

কারণ এ পদ্ধতিতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এভাবে যে, ছাত্র পড়ার সময় যদি কোন ভুল হয় উস্তাদ শুধরে দিতে পারেন, ফলে রেওয়ায়েত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

* হাফিজ সাখাভীর সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য এই যে, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভুলের সম্ভাবনা থেকে বাঁচা। এটা যে পদ্ধতিতে অর্জন হয় সে পদ্ধতিই উত্তম। অবস্থাভেদে কখনও سماع পদ্ধতিতে অর্জন হয় কখনো قرائة على الشيخ পদ্ধতিতে অর্জন হয়।

৩। المراسلة বা المكاتبة অর্থাৎ চিঠির মাধ্যমে হাদীস লিখে কারো কাছে পাঠানো।

এপদ্ধতি অর্জিত হাদীস বর্ণনা কখন বৈধ এতে এখতেলাফ আছে। কারো মতে শায়খের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য অনুমতি ছাড়া ছাত্রের জন্য এ হাদীস বর্ণনা বৈধ নয়। তবে সঠিক মত হল যদি ছাত্র চিনতে পারে চিঠিটি তার তাহলে বর্ণনা বৈধ। প্রকাশ্য অনুমতি ছাড়াও।

তবে এক্ষেত্রে حدثني - أخبرني শব্দ প্রয়োগ বৈধ নয়; বরং كتب إلى - كاتبني বা أرسلني إلى শব্দ ব্যবহার করবে।

تحويل السند

তাহউইলের ح ইহা একটি চিহ্ন, সনদ পরিবর্তনের। যার মর্ম হল, সনদের একাংশ বদলে যাওয়া।

তাহউইলের পঠন পদ্ধতি:-

পশ্চিমা উলামায়ে কেরাম ইহা পড়ার সময় تحويل প্রাচ্যের আলেমগণ ইহা পড়ার সময় শুধু ح শব্দ উচ্চারণ করেন। কেউ কেউ ح মাদবিহীন খাটো আওয়াজে ح অক্ষরে যবর দিয়ে পাঠ করেন। আবার কেউ ح তে মাদ বা দীর্ঘ স্বরে পড়েন। শাহ্ আনওয়ার কাশ্মীরী (র.)-এর মতে মাদবিহীন খাটো আওয়াজে পড়াই উত্তম।

تحويل এর প্রকার ঃ-

১। গ্রন্থকার থেকে পৃথক পৃথক সনদ চলমান হয়ে উপরে বা সামনে দিয়ে উভয় সনদ কোন রাউইর মাঝে একত্রিত হয়ে যায়। যে রাউইর মাঝে একত্রিত হয় তাকে مدار الإسناد বা مخرج الإسناد বলে। تحويل سند এর এই প্রকার সিহাহ্ সিত্তায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। গ্রন্থকার থেকে একটি সনদই চলমান হয়ে উপরে বা সামনে গিয়ে পৃথক হয়ে যায়। تحويل سند এর এই প্রকার সিহাহ্ সিত্তায় খুব কমই পাওয়া যায়।

স্মরন রাখা প্রয়োজন যে, তাহবীলে সনদের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারগণ ঐ সনদের পতন উল্লেখ করেন, যার মাধ্যম কম। যাকে عالي বা উচুমানের সনদ বলা হয়।

معرفة الصحابة والتابعي وتبعه والمخضرمين

সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও মুখাযরামীনের পরিচয়

সাহাবীর সংজ্ঞায় উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়।

১। কেউ কেউ বলেন,

من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي

যিনি ঈমানদার অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং ঈমান নিয়েই ইন্তেকাল করেছেন।

নোট: উক্ত সংজ্ঞা পূর্ণাঙ্গ নয়, কারণ দেখার শর্ত লাগানোর কারণে যে সকল সাহাবী অন্ধ হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেন নাই, যেমন আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রা. তারা সাহাবীর সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন অথচ তারা নিঃসন্দেহে সাহাবী ছিলেন।

২। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন-

هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة

যিনি ঈমানদার অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ঈমান নিয়ে ইন্তেকাল করেছেন, যদিও মধ্যখানে মুরতাদ হয়ে থাকেন এবং পুনরায় সাক্ষাৎ না করে থাকেন।

৩। ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (র.) এর মতে

هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فإن تخللت ردة فلقي قبل الموت

“যিনি ঈমানদার অবস্থায় রাসূলুল্লহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন

এবং উক্ত ঈমান নিয়ে ইন্তেকাল করেছেন, মধ্যখানে মুরতাদ হয়ে থাকলে ইন্তেকালের পূর্বে পুন:রায় সাক্ষাত করেছেন।

নোট: উল্লোখিত শর্তসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎকারী জিন বা মানুষ সকলই সাহাবী, স্বপ্নে তাঁর ইন্তেকালের পর দর্শনকারী সাহাবী নন। যদিও আল্লামা যুরাকশী (র.) ও ইবনে আব্দুল বার (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন।

তাবেঈ:

هو من لقي صحابيا مؤمنا بالنبي صلى الله لعيه وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت ردة ففيه خلاف

যিনি ঈমানদার অবস্থায় সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ঈমান নিয়ে ইন্তেকাল করেছেন। মধ্যখানে মুরতাদ হয়ে থাকলে ইমাম শাফেঈর মতে তাবেঈ হওয়ার জন্য পুনরায় সাহাবীর সাক্ষাৎ প্রয়োজন নেই। হানাফী ও মালেকীদের মতে পুনরায় সাক্ষাৎ প্রয়োজন।

তাবয়ে তাবেঈ:

هو من لقي تابعيا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت رده ففيه خلاف

যিনি ঈমানদার অবস্থায় তাবেঈর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ঈমান নিয়ে ইন্তেকাল করেছেন। মধ্যখানে মুরতাদ হয়ে থাকলে পূর্বের উভয় মত।

মুখাযরামীন:

الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم

যারা ইসলাম আগমনের পূর্ব ও পর উভয় যুগ পেয়েছেন। ঈমানদার অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেননি যেমন, উওয়াইছ আল ক্বারণী, আহনাফ বিন কায়ছ, আবু মুসলিম খাওলানী, আবু রাজা উত্বারিদী প্রমুখ।

(নোট) ক্বাযী ইয়ায (র.) মুখাযরামীনদেরকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত দাবী করেছেন। জমহুর উলামায়ে কেরাম তাদেরকে প্রবীণ তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু মুহাক্কিকীন বলেছেন তারা সাহাবীও নন তাবেঈও নন বরং উভয়ের মধ্যবর্তী একটি স্তরের।

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ

সকল সাহাবী ন্যায়পরায়ন, বিশ্বস্থ্বস্ত, নিষ্ঠাবান

عدول শব্দটি عدل এর বহুবচন। অর্থ-বন্টনে সমান করা। (মাকামে সাহাবা-৬৫ মিসবাহুল লোগাত - ৫৩৭)

পরিভাষায়: عادل এর কয়েকটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়

(١) أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من اسباب الفسق وخوارم العادات علوم الحديث لابن الصلاح

(১) সাবালক জ্ঞান সম্পন্ন ঐ মুসলমানকে عادل বা নিষ্ঠাবান বলে যে, পাপাচার ও নীচু স্বভাব মুক্ত।

(٢) ومن ارتكب صغيرة بلا إصرار إن اجتنب الكبائر كلها وغلب ثوابه على صغائره وهو معنى العدالة قال ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته (در المختاركتاب الشهادة'تفسير العدالة)

(২) ঐ ব্যাক্তি عادل বা নিষ্ঠাবান যার পক্ষ থেকে ছগীরা গুনাহ হঠাৎ প্রকাশ হয়ে গেলেও কবীরা গুনাহ কখনো প্রকাশ হয় না। যার মন্দকাজের তুলনায় ভাল কাজ বেশী। কবীরা গুনাহ করে ফেললে عدالت বা নিষ্ঠা, বিশস্ততা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

(٣) والعدالة ملكة فى الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروة (مقدمة الدهلوى)

(৩)মানুষের ঐ যোগ্যতাকে আদালত বলে যা তাকে তাকওয়া ও মানবীয় গুনাবলীর আকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ব করে।

কুরআনের আলোকে আদালতে সাহাবা ঃ-

(١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ (سورة البقرة: ١٣)

(১) الناس বলতে সাহাবা বুঝানো হয়েছে। কারণ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া আর কেউ মুসলমান ছিল না। সাহাবায়ে কেরামের মত ঈমানের অধিকারী হওয়ার আল্লাহর এই নির্দেশ প্রমাণ করে যে, তাঁহারা ন্যায়পরায়ন-নিষ্ঠাবান ছিলেন। কারণ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নীতিভ্রষ্ট-অনিষ্ঠাবানদের মত হওয়ার নির্দেশ আসার কল্পনাও করা যায় না।

(٢) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (سورة البقرة: ١٣٧)

(২) آمنتم শব্দে তোমাদের ঈমানের মত বলে সাহাবায়ে কেরামকেই সম্ভোধন করা হয়েছে। কারণ কুরআন নাযিলের সময় তারাই ছিলেন প্রথম শ্রেণীর مخاطب বা সম্বোধিত ব্যাক্তিবর্গ।

আয়াতে বিশ্ববাসীর হেদায়েত লাভের জন্য তাদের ঈমানকে সাহাবায়ে কেরামগণের ঈমানের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের শর্ত করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের মানদন্ডে তুলনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের বাটখারায় মাপার আদেশ করা হয়েছে। বাটখারায় ষোলআনা বা আশি তুলায় অপূর্ণতা থাকতে পারেনা। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের মানবীয় গুনাবলীতেও অপূর্ণতা থাকতে পারে না। তাই তাঁরা নিষ্ঠাবান বা عادل।

(৩) كُنتُمْ خَيْرَ أمة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (سورة آل عمران: ١١٠)

(৩) كنتم শব্দে তোমরা বলে সাহাবাগনই প্রথমত উদ্দেশ্য, আর তাদেরকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। মানবীয় গুনাবলীর পূর্ণতা ছাড়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায় না। তাই বলতে হয় সাহাবায়ে কেরাম মানবীয় গুণাবলীতে পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। ফলে তাঁরা عادل বা নিষ্ঠাবান বা বিশ্বস্ত।

(٤) لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. (سورة الفتح: ١٨)

(৪) আয়াতে বায়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবায়ে কেরামের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি, শান্তি বর্ষন ও বিজয় ঘোষনা করা হয়েছে। মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণতা লাভ না করে কেউ পূর্ণতা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনা। তাই বুঝা গেল তাঁরা ছিলেন মানবীয় গুণাবলীতে পূর্ণ عادل বা নিষ্ঠাবান।

(٥) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ (سورة الواقعة: ١٠-١٢)

(৫) سابقون বা অগ্রবর্তী দ্বারা মুফাস্‌সিরিনে কেরাম নেক কাজে অগ্রবর্তী সাহাবায়ে কেরাম অর্থ নিয়েছেন। যারা নিয়ামত সমৃদ্ধ জান্নাতে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হবেন। মানবীয় দূষমুক্তি ছাড়া কেউ জান্নাত লাভ করতে পারে না। তাই বুঝা গেল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন মানবীয় দূষমুক্ত عادل বা নিষ্ঠাবান।

(٦) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (سورة الحجرات: ٣)

(৬) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর মতে عدالت প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য দুটি শর্তের প্রধান শর্ত যে تقوى সে تقوى এর পরীক্ষায় সাহাবায়ে কেরাম উত্তির্ণ হয়ে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের অধিকারী হয়েছেন বলে উক্ত আয়াত ঘোষনা দিচ্ছে।

(٧) وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. (سورة الحجرات: ٧)

(৭) عدالت অর্জনের জন্য تقوى লাভ শর্ত। تقوى লাভের জন্য যে তিন মন্দ কাজ (কুফুর, পাপাচার, অবাধ্যতা) থেকে মুক্ত থাকা জরুরী। আয়াতের ঘোষনা অনুযায়ী সে তিন মন্দ কাজের প্রতি আল্লাহই ঘৃনা সৃষ্টি করেছেন সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে। আয়াতের মর্ম অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামর عدالت লাভে আল্লাহর সরাসরি সাহায্য বিদ্যমান।

(٨) مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (سورة الفتح: ٢٩)

(৮) আয়াতের তাফসীর মতে এখানে সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও আমল উভয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্বয়ং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ

عدالت বা নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য যে ঈমান,আমলের পূর্ণতা প্রয়োজন, তা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শতভাগ ছিল বলেই কুরআন তার বলিষ্ঠ ভাষায় দ্যর্থহীন কন্ঠে সাহাবায়ে কেরামের প্রসংশায় পঞ্চমুখ।

(٩) مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (سورة الفتح: ٢٩)

(৯) আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের জন্য তিনটি পুরস্কার ঘোষনা করেছেন। ১। আল্লাহর সন্তুষ্টি, ২। জান্নাত, ৩। মহাসাফল্য।

আদালত বা নিষ্ঠা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় تقوى (পরহেজগারী), مروة (মানবতায়) পূর্ণতা লাভ করা ব্যতীত উক্ত পুরস্কার ত্রয়ের অধিকারী হওয়া অসম্ভব।

(١٠) يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة التحريم: ٨)

(১০) আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে লজ্জিত করবেন না বলে আল্লাহ ঘোষনা দিচ্ছেন। তাদের জান্নাত লাভ, শাস্তি মুক্তির বাণি ছড়িয়ে আছে কোরআন হাদীসের বহু স্থানে। যা তাদের সার্বিক ত্রুটি মুক্তি ও সর্বাঙ্গীন বিশ্বস্ততার প্রমাণ বহন করে।

تلك عشرة كاملة

হাদীসের আলোকে আদালতে সাহাবা ঃ-

(١) عن جابر رضي الله عنه عن النبي ص قال لا تمس النار مسلما رٰاني أو رٰاى من رٰاني (رواه الترمذي، مشكوة: ٥٥)

(১) নবীজীর সাহায্যের বরকতে সাহাবাগন সকল মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণতা লাভ এবং সর্ববিদ ত্রুটিমুক্তি অর্জন করতে পেরেছিলেন, যা আদালত লাভের জন্য অপরিহার্য্য। এজন্যে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিঃশর্তভাবে মুক্ত ঘোষনা করা হয়েছে।

(٢) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله ص سالت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إليّ يا محمد أن أصحابک عندي بمنزلة النجوم فى السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشئ مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى وقال رسول الله ص أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم ـ (رواه رزين: مشكوة: ٥٥٤)

(২) ত্রুটিযুক্ত বা আদালত বিবর্জিত কোন ব্যক্তির অনুসরনে হেদায়েত প্রাপ্তির ঘোষনা আসতে পারেনা।

(٣) عن عبد الله عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله ص فى أخر الحديث وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلت وسبعين ملة كلهم فى

النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يارسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي (رواه الترمذى: مشكوة: ٣٠)

(৩) যাঁর আদর্শ অনুসরনীয় তাঁকে عادل না বলে উপায় নেই। হাদীসে নবীজীর আদর্শ যেভাবে অনুসরনীয় বলা হয়েছে, সেভাবেই সাহাবায়ে কেরামের আদর্শকেও অনুসরনীয় বলা হয়েছে। সুতরাং যেভাবে নবীজীকে عادل মানতে হয়, সেভাবে সাহাবায়ে কেরামকেও عادل মানতে হবে।

(٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تومن عليه إلفتنة ـ اولئک أصحاب محمد ص كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا واعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولاقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اٰثارهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. (رواه رزين: مشكوة: ٣٢)

(৪) হৃদয়ের স্বচ্চতা, জ্ঞানের গভীরতা লৌকিকতার স্বল্পতারই অপর নাম তাকওয়া ও মরওয়াত। যা আদালত প্রমাণের জন্য প্রয়োজন। হযরত ইবনে মাসউদ রা, বিনয় বশতঃ নিজেকে আড়াল করে হলেও সকল সাহাবায়ে কেরামের যে গুণাবলী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষনা করেছেন, তা তাঁদের আদালত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

(٥) عن سعيد بن زيد فى أخر الحديث والله لمشهد رجل منهم مع النبي ص يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح (رواه الترمذي وأبو داود، جمع الفوائد ج٢، ص٤٩٢، طبع مصر)

(৫) হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. সাহাবা সমালোচকের প্রতিবাদে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন সাহাবার তালিকা পেশ করার পর সমগ্র সাহাবার মূল্যায়নে বলেন, শপথ আল্লাহর! সাহাবাদের কোন একজন নবীজীর সাথে জিহাদে শরীক হয়ে শুধুমাত্র চেহারা ধূসরীত করা, পরবর্তীদের সমগ্র মানুষ হযরত নূহ আ.এর মত ৯৫০ বছরের দীর্ঘ হায়াত প্রাপ্ত হয়ে নেক কাজে ব্যয় করার চাইতেও শ্রেষ্ঠ। সাহাবাদের মাঝে আদালত প্রশ্নবিদ্ধ হয়, এমন কোন ত্রুটি থাকলে তাঁরা এ মর্যদার অধিকারী হতেন না।

(٦) عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر فى قلوب العباد فنظر قلب محمد ص فبعثه برسالته ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد ص فوجد قلوب

أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبه نبيه ونصرة دينه (شرح الدرة المفيئة للعلامة سفاريني، جـ ٢، صـ ٢٨٠)

(৬) গোটা বিশ্বের বান্দা সমগ্রের তুলনায় সাহাবায়ে কেরাম শ্রেষ্টঅন্তরের অধিকারী হওয়া স্বত্বেও আদিল বা নিষ্ঠাবান হতে পারেন না, এমনটি হতেই পারে না।

(٧) عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صـ إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي اربعة يعنى ابا بكر وعمر وعثمان وعليا۔ فجعلهم أصحابي وقال فى أصحابي كلهم خير (مسند بزار)

(৭) নবীজীর ঘোষনা অনুযায়ী সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কল্যাণ বিদ্যমান থাকাবস্থায় তাঁদের মাঝে আদালত বিনষ্টকারী কোন অকল্যাণ থাকতে পারেনা।

(٨) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صـ لا تسبوا أصحابي فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ أحدهم ولانصيفه ۔ (رواه الترمذي، مشكوة: ٥٥٤)

(৮) سب অর্থ গালমন্দ নয়। বরং ইবনে তাইমিয়া (র.) সহ অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসীনের মতে কারো মর্যাদাহানীকর কথাকে سب বলে। সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাহানীকর) কোন কিছু বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন আর আদালতে সাহাবা অস্বীকারে তাঁদের মর্যাদাহানী হয়, যা হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ।

(٩) عن عبد الله مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صـ الله فى أصحابي لاتتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم ومن اٰذاهم فقد اٰذاني ومن اٰذاني فقد اٰذى الله ومن اٰذى الله فيوشك ان يأخذه۔ (رواه الترمذي، مشكوة: ٥٥٤)

(৯) সাহাবাদের সমালোচনা হাদীসে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। আদালতে সাহাবা অস্বীকার করাই তাঁদের সর্বনিকৃষ্টতম সমালোচনা।

(١٠) عن عبد الله عمر رضي الله قال قال رسول الله صـ إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ (رواه الترمذي، مشكوة ٥٥٤)

(১০) সাহাবা সমালোচকদের উপর নবীজী আল্লাহর লা'নত অভিশম্পাত কামনা করেছেন এবং সমালোচনাকে অনিষ্ঠ সাব্যস্থ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম عادل বা নিষ্ঠাবান নন এমন মন্তব্য হচ্ছে তাঁদের শানে জগন্যতম সমালোচনা। হাদীসে যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

ইজমার আলোকে আদালতে সাহাবা ঃ-

الصحابة كهم عدول বাক্যটি আয়াতও নয় হাদীসও নয় বরং "সাহাবায়ে কেরাম নিষ্ঠাবান" বিশ্বস্ত এই মর্মে আইয়িম্মায়ে উম্মতে মুহাম্মদীর বিভিন্ন ভঙ্গিতে দেওয়া মতামতের সারমর্ম ঃ-

(١) الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به (قاله النبوي)

(১) ইমাম নববী বলেন, মতানৈক্যের ফিতনায় জড়িত হন আর নাই হন সকল সাহাবাই নিষ্ঠাবান, যাদের মতামত গ্রহণযোগ্য তাদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে।

(٢) والقول بالتعميم هو الذى صرح به الجمهور وهو المعتبر (قاله السيوطي فى تدريب الراوي)

(২) আল্লামা সুয়ূতী বলেন, সাহাবা বিশ্বস্ত, জমহুর (সংখ্যা গরিষ্ট) উলামায়ে কেরামের ঘোষনা মতে সকল সাহাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ইহাই গ্রহণযোগ্য মত।

(٣) واعتقاد أهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة وجوبا بإثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيه والثناء عليهم كما اثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ۔ (مسائرة فى عقائد الإسلام للعلامة كمال ابن همام صـ ١٣٢)

(৪) আল্লামা কামাল ইবনে হুমাম বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের মত (বিশ্বাস) হচ্ছে,

(ক) প্রত্যেক সাহাবীর জন্য আদালত বা নিষ্ঠা প্রমাণে সকল সাহাবীকেই গুণাহ মুক্ত مغفور মনে করা ওয়াজিব।

(খ) তাদের ব্যপারে সমালোচনা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

(গ) তাদের প্রসংশা, গুনকীর্তন করা জরুরী। যেভাবে মহান আল্লাহ তাঁদের প্রসংশা করেছেন।

(٤) ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صـ كما وصفهم الله تعالى فى قوله تعالى والذين جائوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا

ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنأ انك رئوف رحيم۔(شرح عقيدة واسطية لابن تيمية ص ٤٠٣، طبع مصر)

(৪) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্য থেকে একটি বিশ্বাস হচ্ছে, সাহাবাদের ব্যাপারে স্বস্ব অন্তর ও মুখ সংযত রাখা। যেভাবে মহান আল্লাহ তাঁদের প্রসংশা করেছেন।

(٥)لا يجوز لاحد ان يذكر شيئا من مساويهم ولا أن يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلک وجب تاديبه ۔ قال الميموني سمعت أحمد يقول ماهم ولمعاوية نسأل الله العافية وقال لي يا أبا الحسن اذا رأيت احدا يذكر أصحاب رسول الله ص بسوء فاتهمه على الإسلام۔(الصارم المسلول لابن التيمية)

(৫) ইমাম আহমদ (র.) কারো জন্য সাহাবাদের মন্দ আলোচনা করা এবং কোন দোষত্রুটি, অভিযোগ লেপন করা বৈধ নয়। যে এমনটি করবে তাকে শায়েস্তা করতে হবে। আবুল হাসান মায়মূনী বলেন আমি ইমাম আহমদ (র.) কে বলতে শুনেছি, মানুষের কি হল যে, তারা হযরত মুআবিয়া রা. এর সমালোচনা করে। আমরা এর থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করি। অতঃপর আমাকে বলেন, হে আবুল হাসান, যখন তুমি কাউকে দেখবে সাহাবাদের মন্দ আলোচনা করে, মনে করবে তার ইসলাম সন্দেহ যুক্ত।

(٦)فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس تثبت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسول الله ص ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته ولا تزكية أفضل من ذلک وتعديل أكمل منها قال تعالى محمد رسول الله والذين معه الآية۔(الاستيعاب تحت الاصابة لابن عبد البر ج ١، ص ٢)

(৬) হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (র.) বলেন, তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) সর্ব যুগের সকল ব্যক্তি থেকে উত্তম, তাঁরা শ্রেষ্ঠজাতি, তাঁদের মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁদের আদালত নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা প্রমাণ হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর প্রসংশার মাধ্যমে। তাঁদের চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত বা আদিলকে হতে পারে! যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছেন। কারো জন্য নিষ্ঠা ও বিশস্ততার সাক্ষী আল্লাহ ও রাসূলের এই স্বাক্ষীর উর্ধে হতে পারে না। আল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মাঝে সহানুভূতিতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষ্টি কামনায় আপনি তাঁদেরকে দেখবেন রুকু

ও সিজদাবনত, তাদের চেহারয় সিজদাহর চিহ্ন উদ্ভাসিত। এটা হচ্ছে তাওরাতে বর্ণিত তাঁদের উদাহরণ এবং ইঞ্জিলে বর্ণিত তাঁদের উদাহরন হচ্ছে, যেমন একটি চারা গাছ, যা থেকে অঙ্কুরিত হয় আরো কঁচি কঁচি চারা। অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাড়ায় দৃঢ়ভাবে এবং তা থেকে যা চাষিকে আনন্দে উদ্বেলিত করে। ফলে কাফেরেরা অন্তর্জ্বালায় পুড়ে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাঁদেরকে আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন। (সূরা- ফাতাহ্)।

(٧) للصحابة بأسرهم خاصية وهى أنه لا يسئل عن عدالة أحد منهم بل ذلک أمر مفروغ عنه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قيل اتفق المفسرون على انه وارد في أصحاب رسول الله ص (علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٦٤)

(৭) হাদীস ও উছুলে হাদীসের ইমাম ইবনে সালাহ বলেন, সকল সাহাবায়ে কেরামের একটি বৈশিষ্ট হল যে, তাঁদের আদালত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে প্রশ্নই অবান্তর। কারণ তাঁদের আদালত, বিশস্ততা কুরআন ও হাদীসের অকাট্য ঘোষনা ও উম্মতের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্থিরকৃত একটি বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা শ্রেষ্ঠজাতি, মানুষের কল্যানে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সমস্ত মুফাস্সিরীনের কেরামের ঐক্যমত্য একথার উপরে যে, আয়াতখানা সাহাবাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে।

(٨)والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة باثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم فقد اثنى الله سبحانه عليهم فى عدة اٰيات من كتابه العزيز على أنه لو لم يرد عن الله ولا عن رسوله فيهم شىء لاوجبت الحال اللتي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الدين وبذل المهج والأموال وقتل الاباء والأولاد والمناصحة فى الدين وقوة الإيمان واليقين القطعي لتعديلهم والإعتقاد لنزاهتهم وانهم أفضل جميع الأمة بعد نبيه هذا مذهب كافة الأمة ومن عليه موول من الأمة (لوامع أنوار البهية، شرح الدرة المفيئة للعلامة سفارنى ج ٢، ص ٣٢٨)

(৮) আল্লামা সাফারিনী (র.) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইজমা (ঐক্যমত্য) যে, প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব সমস্ত সাহাবাকেই তাঁদের বিশস্ততার

স্বীকারোক্তি দিয়ে দোষক্রটিমুক্ত মনে করা,তাদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা, তাঁদের প্রসংশা বর্ণনা করা। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিজয়ী গ্রন্থের বহু আয়াতে তাঁদের ভূঁয়সী প্রশংসা করেছেন। এমনকি যদি এব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর কোন ঘোষনা নাও থাকত, তথাপিও হিজরত, জিহাদ, দ্বীনি সাহায্য, জানমাল উৎসর্গ, মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততির কুরবানী, দ্বীনের ব্যপারে পরস্পরের কল্যান কামিতা, ঈমানের শক্তি ও অটুট বিশ্বাস (ইত্যাদি যে সকল অবস্থার স্বীকার তাঁরা হয়ে ছিলেন, শুধু সেদিকে তাকালে) ই তাঁদের আদালত -বিশ্বস্ততা, প্রবিত্রতা নবীর পরে সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ঠ। এটা গোটা উম্মতের ও উম্মতের কান্ডারী ইমামগণের মত ও পথ।

(৯) إذا رأيت الرجل ينقص أحدا من أصحاب رسول الله صـ فاعلم أنه زنديق وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى ذلک كله إلينا إلا الصحابة فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة فيكون الجرح به اليق والحكم عليه بالزندقة والضلال اقوم احق. (قاله الامام أبو زرعة استاذ الامام مسلم، لوامع انوار البهية شرح الدرة المفيئة لعلامة سفارنی جـ ۲و صـ ۳۳۸)

(৯) ইমাম মুসলিম (র.) এর উস্তাদ ইমাম আবু যুরআ (র.) বলেন, যদি তুমি কাউকে সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে কোন একজনের সমালোচনা করতে দেখ, তাহলে বুঝে নাও সে জিন্দিক-নাস্তিক। কারণ কুরআন সত্য, রাসূল সা. সত্য, যে শিক্ষা তিনি নিয়ে এসেছেন তাও সত্য এবং এসবকিছু আমাদের মাঝে পৌছিয়েছেন একমাত্র সাহাবায়ে কেরাম। যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামকে দোষি বলে, সে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসকে বাতিল সাব্যস্ত করতে চায়। তাই উচিৎ স্বয়ং সমালোচককেই দোষী সাভ্যস্থ করা এবং তার উপর নাস্তিকতা ও পথভ্রষ্টতার ফতোয়া অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ও অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

(১০) ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير (عقائد النسفية صـ ۱٤۹) وسائر الصحابة لا يذكرون إلا بخير (شرح العقائد صـ ۱٥۱)

(১০) বাংলাদেশের সরকারি (আলীয়) ও বেসরকারী (ক্বওমী) মাদ্রাসার সিলেবাসে যুগ যুগ ধরে অন্তর্ভূক্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদার কিতাব আকায়েদে নসফীতে আল্লামা উমর বিন নসফী লিখেন, সাহাবায়ে কেরামের আলোচনায় কল্যাণ ছাড়া (মন্দ বলা থেকে) বিরত থাকতে হবে। একথার ব্যাখ্যায় আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতাজানি বলেন, সকল সাহাবায়ে কেরামের কেবল মাত্র ভালই আলোচনা করতে হবে।

ক্বিয়াস বা যুক্তির নিরিখে আদালতে সাহাবা ঃ-

১। কুরআন, হাদীস তথা গোটা ইসলাম আমাদের মাঝে পৌছার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম, তাঁদেরকে পাশকাটিয়ে আমাদের মাঝে ইসলাম পৌছার কোন মাধ্যম নেই।

যদি সাহাবায়ে কেরামের ঈমান আমল, চরিত্র ও আমানতের দোষ প্রমাণিত হয়, তাহলে এই দোষী লোকেরা! (নাউযুবিল্লাহ) যে, কুরআন হাদীসে বা গোটা ইসলামে রদবদল করেন নাই, এমন নিশ্চিয়তা কেউ দিতে পারবে না। তাই মাধ্যম বা সাহাবা! দোষী হলে গোটা ইসলাম দোষী সাভ্যস্থ হয়। সুতরাং ইসলামকে কলঙ্কমুক্ত রাখতে হলে, ইসলামের মাধ্যম সাহাবাকেও কলঙ্কমুক্ত রাখতে হবে।

২। যদি কেউ বলে যাদের মাধ্যমে ইসলাম পৌঁছেছে, তাঁরাতো ভাল ছিলেন, দোষী ছিলেন অন্যরা, আমরা বলব-

(ক) وكلا وعد الله الحسنى - رضي الله عنهم ورضو عنه ইত্যাদি আয়াতগুলোতে আল্লাহ ত'আলা সাহাবাদের মাঝে দোষী, গুণীর কোন প্রকার করেননি তোমার মত। আমরা তোমার কথা মানব নাকি আল্লাহর কথা?

(খ) যাঁদের মাধ্যমে ইসলাম পৌছেছে তাঁরা যদি ভাল হন, তাহলে হযরত আমীরে মুয়াবীয়া রা. অন্যতম কাতিবে ওহী বা আয়াত লিখক ছিলেন। তাঁর সমালোচনা কর কেন? আর যদি সমালোচনাই করলে তাহলে মাধ্যম ভাল রাখলে কিভাবে?

৩। সাহাবাগণ দোষী সাভ্যস্থ হলে লাভ বেশী কার? মুসলমানদের নাকি অমুসলিমদের? নিশ্চয় অমুসলিদের। মুসলমানদের পোশাক পড়ে অমুসলিমদের লাভ করতে চাও? তোমার মুখোশটা একটু খোলবে কি?

৪। সাহাবায়ে কেরাম দোষী হলে ক্ষতি বেশী কার? অমুসলিমদের না কি মুসলিমদের? নিশ্চয় মুসলিমদের। মুসলমান হয়ে স্ব-জাতির ক্ষতি করতে চাও? তোমার ভেতরটা একটু দেখাবে কি?

৫। ভাষণ- বয়ান প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে ইসলামের খেদমত আমরাও করতে চাই, বিষয়টাও হবে সাহাবা সমালোচনা, যদি এর দ্বারা মুসলমানদের কিঞ্চিত হলেও উপকার হয়, সাহাবীদের সমালোচনা দ্বারা মুসলমানদের কোন বিভাগে বা কোন ক্ষেত্রে কল্যাণ সাধিত হয়, দু-একটা উদাহারণ উপস্থাপন করবেন কি?

৬। যদি সাহাবা সমালোচনা দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের কোন নযীর পেশ করতে পারেন না, তবেকি ইসলামের খেদমতের জন্য আলোচনার আর কোন বিষয় পাননা, কাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ মাঠে নেমেছেন, একটু খোলাসা করবেন কি?

৭। আল্লাহ আলেমুল গায়েব সমগ্র সৃষ্টিজগতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিশ্চিতভাবে জানেন। এতটুকু বিশ্বাস করেন? উত্তর যদি হ্যা হয়, তাহলে সেমতে সাহাবায়ে কেরামের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিনি জানেন? উত্তর যদি হ্যা হয়, তাহলে সেমতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে আমীরে মুয়াবীয়া রা. মাঈজে আসলামীসহ সকলের সার্বিক মতানৈক্য যুদ্ধ-বিগ্রহ সবকিছু জেনেই তাঁদের শানে

رضي الله عنهم ورضو عنه

ঘোষনা করেছেন না কি না জেনে? এবার শূধাই, আল্লাহ তাঁদের সকল দূর্বলতা নিশ্চিতভাবে জানার পরও তাদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন, আর আপনি সকল নয় গোটি কয়েক, নিশ্চিত নয়, অনিশ্চিতভাবে তাদের দূর্বলতা অবগত হয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন না, আপনার মতবলটা কি?

৮। সাহাবাদের প্রশংসা গুনকীর্তণের আবশ্যকীয়তা কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এর মোকাবেলায় তাদের দূষক্রুটির খবর এমন ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা প্রাপ্ত যার সিংহভাগই ডাহা মিথ্যা।

'বাহাঈ' আন্দোলনের চক্রান্ত, রাওয়াফিজ ও খাওয়ারিজদের সাজানো কাহিনী গুলোর কিছু ঘটনা যদিও বাহ্যিকভাবে শরীয়ত বিরোধী মনে হয়, কিন্তু মূলত এমন নয়, বরং শরীয়ত সম্মত আমলের এক বিশেষ সুরত। যা তাঁরা স্বীয় শরয়ী ইজতেহাদের ভিত্তিতে নির্ণয় করে ধর্মের জন্য জরুরী মনে করেছিলেন। যদি এতে তাঁদের ভূলও হয় তবুও গুনাহ হবে না, বরং হাদীসের ভাষ্যমতে এক সওয়াবের অধিকারী হবেন।

ইজতেহাদী ভূল ছাড়াও যদি কারো থেকে বাস্তবেই গুনার কাজ প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে প্রথমতঃ এ কাজ তাঁদের গোটা ইসলামী জিন্দিগীতে এমন বিরল যে তাঁদের লক্ষ লক্ষ নেক কাজও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী খেদমতের মোকাবেলায় উল্লেখেরই যোগ্য নয়।

তবুও তাঁদের নযীরবিহীন খোদভীতির কারণে এতে অটল থাকতে পারেননি। তাৎক্ষনিকভাবে তওবা করেছেনে এবং সন্তুষ্টির শিরোনামে তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তির ঘোষনাও পবিত্র কুরআনেই আছে। লক্ষ লক্ষ নেককাজের বিনিময়ে ছিটেফোটা গুনাহ গুলোর ক্ষমা ঘোষই যদি কুরআনে নাও থাকত, শুধু কুরআন-হাদীসে বর্ণিত তাঁদের গুণাবলীর মোকাবেলায় ইতিহাসে বর্ণিত দোষগুলোকে মুনাফেকদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা বলে প্রত্যাখ্যন করা কি বিবেকের তাড়না নয়?

আমরা কিসের আলোকে জীবন পরিচালনা করব? কুরআন হাদীসের আলোকে নাকি ইতিহাসের আলোকে? ইতিহাস যদি আপনার জীবন বিধান হয়, তাহলে মুসলমান দাবী কিসের ভিত্তিতে? আর কুরআন যদি জীবন বিধান হয়, তাহলে সাহাবায়ে কেরামের যে সকল দোষ নিয়ে সমালোচনার আমল! করে চলেছ, কুরআন থেকে এর প্রমাণ দেখাও? সময় কিয়ামত পর্যন্ত। উত্তর আছে কি আপনার সঞ্চয়ে?

১০। নবী হওয়া যেমন কারো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, তেমনিভাবে উম্মত হওয়া কারো ইচ্ছাধীন নয়, এটা একমাত্র আল্লাহর নির্বাচনের বিষয়। ঠিক তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামও নিজ নিজ ইচ্ছায় নবীজীর সহচর হতে পারেননি বরং

اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه

আল্লাহই তাদেরকে তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য এবং স্বীয় দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন করে নবীর যুগে জন্ম দিয়েছেন। তবে কি মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সহচরদেরও স্বীয় দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে দোষী কিছু লোক নির্বাচিত করলেন? আল্লাহর নির্বাচনে

দোষ? না কি আল্লাহর নির্বচনে ক্রুটি অন্বেষণে দোষ? বিবেক পলায়ন করেনিতো?

تعارف الصحاح الستة

সিহাহ সিত্তার পরিচয়

অসংখ্য হাদীসের কিতাব থেকে উপরে উল্লোখিত গুণের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ছয়খানা কিতাবকে বিশুদ্ধতম বলে ঘোষণা করেছেন।

কিতাবসমূহ হচ্ছে- বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, নাসাঈ শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ।

আল্লামা শাহ আনওয়ার কাশ্মিরী (র.) বলেন, ইবনে মাজার পরিবর্তে মুসনাদে দারেমী হবে।

আল্লামা আবুল হাসান (র.) বলেন ত্বহাবী শরীফ হবে।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.), শাহ আব্দুল আজীজ (র.) নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী, আল্লামা ইবনে আছীর, ও রযীন বিন মুাবিয়া সরক্বসত্বী (র.) বলেন মুআত্তা মালিক হবে।

مدار الترتيب للصحاح الستة

সিহাহ সিত্তার শ্রেণী বিন্যাসের মানদন্ড

পূর্বে উল্লেখিত রাউইদের স্তরের ভিত্তিতেই সিহাহ সিত্তার স্তর নির্ণয় করা হয়েছে।

১। ইমাম বুখারী (র.) শুধু প্রথম স্তরের রাউইদের কাছ থেকে সামগ্রিকভাবে তার কিতাবে হাদীস গ্রহণ করেছেন। কোন কোন অধ্যায়ে ১ম স্তরের রাউইর হাদীস না পাওয়া গেলে শুধু মাত্র দাবী প্রমাণের জন্য দলীল স্বরূপ ২য় স্তরের রাউইদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

এজন্য বিশুদ্ধতায় বুখারী শরীফের স্তর সর্বোচ্চ।

২। ইমাম মুসলিম (র.) ১ম ও ২য় স্তরের হাদীস নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। ৩য় স্তরের হাদীস শুধু দলীল স্বরূপ গ্রহণ করেছেন।

এজন্য মুসলিম শরীফের স্তর ২য়।

৩। ইমাম নাসাঈ (র.) প্রথম তিন স্তর থেকে পূর্ণভাবে এবং ৪র্থ স্তর থেকে দলীল স্বরূপ হাদীস গ্রহণ করেছেন।

এ জন্য তাঁর কিতাব ৩য় স্তরের।

৪। ইমাম আবু দাউদ (র.) প্রথম তিন স্তর থেকে নির্দ্বিধায় এবং ৪র্থস্তর থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এ জন্য তাঁর কিতাব ৪র্থ স্তরের।

৫। ইমাম তিরমিযী (র.) প্রথম চার স্তর থেকে নির্দ্বিধায় এবং ৫ম স্তর থেকে দলীল স্বরূপ হাদীস গ্রহণ করেছেন।

এজন্য তাঁর কিতাব ৫ম স্তরের।

৬। ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) সকল স্তর থেকেই নির্দ্বিধায় হাদীস গ্রহণ করেছেন এ জন্য তাঁর কিতাব ৬ষ্ঠ স্তরের।

ترتيب الصحاح الستة وكلام هام

সিহাহ সিত্তার শ্রেণী বিন্যাস ও কিছু কথা

উল্লেখিত মানদন্ডের ভিত্তিতে সিহাহ সিত্তার স্তর হচ্ছে নিম্নরূপ।

১ম বুখারী শরীফ, জুমহুর মুহাদ্দেসীনের বক্তব্য

إنه صحيح البخاري مقدم على سائر الكتب المصنفة

হাদীস বিষয়ে সংকলিত সকল গ্রন্থের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ হচ্ছে বুখারী শরীফ। এমনকি তারা বলেন

أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري

কুরআন মজীদের পর জগতের সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ বুখারী।

২য় মুসলিম শরীফ: আবু আলী নিশাপুরী (র.) বলেন

ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم

আসমানের নিচে মুসলিমের কিতাব ভিন্ন বিশুদ্ধ কিছু নেই। কিছু সংখ্যক পশ্চিমা উলামায়ে কেরাম মুসলিম শরীফকে বুখারী শরীফের উপর প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু জমহুর সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয়েছে এ প্রাধান্য বিশুদ্ধতার বিচারে নয়।

বরং সুন্দর বর্ণনা, উত্তম উপস্থাপনা, সুক্ষ ইঙ্গিতের গুরুত্বারোপ, সনদের রহস্যময় মাধুর্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে।

৩য় নাসাঈ শরীফ: ৩য় স্তরে আবু দাউদ শরীফ হওয়ার কথাটা বহুল প্রচলিত। কিন্তু শাহ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন, ইমাম নাসাঈ তার কিতাবে صحت সহীহ হাদীস গ্রহণের শর্তারোপ করেছেন আর ইমাম আবু দাউদ (র.) تعامل আমলকৃত হাদীস গ্রহণের শর্তারোপ করেছেন।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে আমলকৃত হাদীস সহীহ এর নীচের স্তরের হাসান ইত্যাদি ও হতে পারে, সুতরাং সহীহ হাদীসের সংখ্যা আবু দাউদ শরীফের তুলনায় নাসাঈ শরীফে বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। তাই নাসাঈ শরীফের স্থান আবু দাউদ শরীফের পূর্বে হওয়াই বাঞ্চনীয়।

৪র্থ আবু দাউদ শরীফ: উক্ত কিতাবে হাসান স্তরের হাদীস থাকলেও মারাত্মক দুর্বল রাউইদের বর্ণিত হাসান হাদীস নেই।

৫ম তিরমিযী শরীফ: কাশফুযযুনূনের গ্রন্থকার লিখেন তিরমিযী শরীফের সুন্দর তারতীবের দিকে লক্ষ করলে ৩য় স্তরের উপযোগী মনে হয়। কিন্তু কিতাবের কিছু কিছু রাউই যেমন কলবী প্রমুখ অত্যন্ত মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বল হওয়ার কারণে ৫ম স্তরে রাখা হয়েছে।

৬ষ্ঠ ইবনে মাজাহ: উপরোল্লোখিত গ্রন্থাবলির রাউইদের দুর্বলতা থাকলেও তার প্রতিষেধক বিদ্যমান ছিল যার কারণে হাদীস যঈফ থেকে হাসান স্তরে উন্নীত হত। কিন্তু উক্ত কিতাবের রাউইদের দুর্বলতার প্রতিষেধক নেই এমনকি উক্ত কিতাবকে যঈফ ও মুনকার হাদীসের ভান্ডার

বলা চলে। এছাড়াও উক্ত কিতাবে ১৭ বা ১৯ বা ২১ খানা মাওযূ' হাদীসের উপস্থিতিও এ কিতাবের স্তর নিম্নগামী করতে সহায়ক হয়েছে।

এ সকল কারণে কেউ কেউ সিহাহ সিত্তা ৬ষ্ঠ স্তরে অন্যান্য কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ কিতাব সুবিন্যস্ত হওয়ার কারণে জুমহুর তাকে ৬ষ্ঠ স্থানে গ্রহণ করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

مذاهب مؤلفي الصحاح الستة

সিহাহ সিত্তার মুসান্নিফদের মাযহাব

ইমাম বুখারী (র.)

ক. আবু আসীম (র.) এবং তুকী উদ্দীন সুবকী (র.) বলেন, তিনি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা প্রমাণ স্বরূপ বলেন তিনি আল্লামা যাফরানী (র.), হুসাইন কারাবিসী (র.) এবং আল্লামা হুমায়দী (র.)'র ছাত্র ছিলেন।

আর তাঁরা সকলেই শাফেঈ মাযহাবের ছিলেন সুতরাং তাদের ছাত্র হিসাবে ইমাম বুখারী (র.) উস্তাদদের মাযহাব-ই গ্রহণ করে থাকবেন।

খ. হাফিয ইবনে ক্বায়্যিম এবং আবুল হাসান ইরাকী (র.) বলেন তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ তারা বলেন ইমাম বুখারী (র.) তার উস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর সাক্ষাতের জন্য আট বার বাগদাদ গিয়েছিলেন। যে উস্তাদের সাথে এত সম্পর্ক তার মাযহাব-ই গ্রহণ করবেন বলে বিবেক সায় দেয়।

গ. শাহ আনওয়ার কাশ্মিরী (র.) বলেন, তাদের কথা যুক্তির কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হবার নয়। কেননা কারো কাছ থেকে ইলম অর্জন যদি তার মাযহাব গ্রহণের প্রমাণ হয়, তাহলে বলতে হবে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কারণ তাঁর উস্তাদ ইসহাক বিন রাহওয়ায়, তাঁর উস্তাদ আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, তাঁর উস্তাদ ইমাম আবু হানিফা (র.)। সুতরাং দেখা গেল ইমাম বুখারী (র.) ইমাম আবু হানিফা (র.) এর ছাত্রের ছাত্রের ছাত্র। ফলে তাকে হানাফী বলতে হয়। বরং বাস্তবতা হচ্ছে তিনি মুজতাহিদ ফিলমাযহাব ছিলেন। কোন মাসআলায় ইমাম শাফেঈ (র.) এর সাথে একমত পোষণ করেছেন কোন কোন মাসআলায় দ্বিমত করেছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য বাস্তব যে তিনি প্রসিদ্ধ মাসআলাগুলোতে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

ইমাম মুসলিম (র.)

ক। শ্রুতি আছে যে তিনি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু

খ। তাঁর কিতাব অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় তিনিও ইমাম বুখারী (র.)-এর মতো মুজতাহিদ ফিল মাযহাব ছিলেন।

ইমাম নাসাঈ ও আবু দাউদ (র.)

ক। শ্রুতি আছে যে তিনি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু

খ। ওয়ালিউল্লাহ জাযাইরী (র.) বলেন, তারাও মুজতাহিদ ফিল মাযহাব ছিলেন।

গ। শাহ আনওয়ার কাশ্মিরী (র.) বলেন, তারা উভয়ে হাম্বলী মাযহাবের ছিলেন।

ইমাম তিরমিযী (র.)

ক। শ্রুতি আছে যে, তিনি শাফেই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু

খ। শাহ আনওয়ার কাশ্মিরী (র.) এর মতে তিনি ইসহাক বিন রাহওয়ায়হের মুকাল্লিদ ছিলেন।

ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)

তিনি নিঃসন্দেহে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

ইমাম মালিক (র.)

তিনি মুজতাহিদ ফিল মাযহাব ছিলেন একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

ইমাম তুহাবী (র.)

ইমাম তহাবী (র.) জীবনের প্রথমার্ধে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ব্যাপক গবেষণার পর শাফেঈ মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করে এ মাযহাবে থেকেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

شروط الصحاح الستة সিহাহ সিত্তার শর্তাবলী

কোন মুসান্নিফই স্বীয় কিতাবে একথা উল্লোখ করেননি যে, আমি এই শর্ত মোতাবেক কিতাব লিখেছি। বরং তার কিতাব অধ্যয়ন করে একথা অনুধাবন করা গেছে যে, তিনি এই এই শর্তের আলোকে কিতাব লিখেছেন। ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যা জানা গেছে তা হলো নিম্নরূপ।

প্রত্যেক গ্রন্থকারই সাতটি শর্তের প্রতি লক্ষ রেখে কিতাব লিখেছেন-

রাউই (১) الاسلام (মুসলমান হওয়া)। (২) العقل (সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হওয়া) (৩) العدالة (বিশ্বস্ত হওয়া) (৪) غير مدلس (উস্তাদের নাম গোপনকারী না হওয়া) (৫) غير المتهم بالكذب (মিথ্যার অপবাদ আরোপিত না হওয়া) (৬) الشهرة بالرواية (হাদীস বর্ণনায় প্রসিদ্ধ হওয়া) (৭) أخذه من العلماء (রাউইর হাদীস গ্রহণ কোন আলেম থেকে হওয়া, কোন কিতাব থেকে না হওয়া) এছাড়াও ইমাম বুখারী (র.) আরো তিনটি অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেছেন।

১। রাউই كثير الضبط والاتقان বা অধিক মুখস্থ শক্তি ও নিয়ন্ত্রন ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।

২। كثير الملازمة للشيخ সে উস্তাদের দীর্ঘ সাহচর্য প্রাপ্ত হওয়া।

৩। تبوت اللقاء فى المعنعن হাদীসে মুআনআনে রাউই ও মারউই আনহুর মধ্যে সাক্ষাত প্রমানিত হওয়া।

ইমাম মুসলিম (র.) উল্লিখিত তিনটি শর্তের মধ্য হতে প্রথমটি এবং হাদীসে মুআনআনে রাউই ও মারউই আনহুর মাঝে المعاصرة (সমসাময়িকতা) প্রমাণিত হওয়ার শর্ত গ্রহণ করেছেন।

ইমাম নাসায়ী ও আবু দাউদ (র.) উল্লেখিত তিনটি থেকে প্রথমটি গ্রহণে উভয়ে একমত। অতপর ইমাম নাসায়ী الصحة বা বিশুদ্ধতার ও ইমাম আবু দাউদ التعامل বা আমলকৃত হওয়ার শর্তে পৃথক হয়েছেন।

ইমাম মালিক (র.) الصحة ও التعامل বা বিশুদ্ধতা ও আমলকৃত হওয়া উভয় শর্ত আরোপ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.) কোন শর্তারোপ করেননি তবে যথাসম্ভব হাদীসে সহীহ ও হাসান গ্রহণে সচেষ্ট ছিলেন।

সিহাহ সিত্তার বৈশিষ্ট্যাবলী

বুখারী শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী

১)ترجمة الباب 'বাবের শিরোনাম' প্রণয়নে তিনি এমন সুক্ষ্মও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রমাণ দিয়েছেন যা তাঁর পূর্বাপর কারোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেমনটি শাহ আনওয়ার কাশ্মীরী (র.) বলেছেন

هوسباق غايات وصاحب آيات فى وضع التراجم لم يسبق به أحد من المتقدمين ولم يستطع أن يحاكيه أحد من المتاخرين فكان هوالفاتح لهذالباب وصار هوالخاتم و

এজন্যই বলা হয় تراجم ابواب فقه البخاري في تراجمه তাঁর দক্ষতা ও মাযহাব তাঁর থেকেই বুঝা যায়। তার তীক্ষ্ণ ও জঠিল تراجم أبواب অনুধাবন করার জন্য শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (র.) প্রায় সত্তরটি সূত্র তৈরি করেছেন যা ছাড়া তাঁর শিরোনাম গুলোর মর্মোদঘাটন ও বাবের সাথে হাদীসের সমন্বয় সাধন করা সুকঠিন ব্যাপার।

২) التزام الصحة একমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যে কারণে তার অমর গ্রন্থ أصح الكتب بعد كتاب الله (কুরআন মজীদের পর সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতম কিতাব) উপাদিতে ভূষিত হয়েছে।

৩) استنباط المسائل অন্যান্য মুহাদ্দিসিনের মত হাদীস উপস্থাপন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। বরং একেক হাদীস থেকে একাধিক মাসআলা চয়ন করেছেন ফলে একই হাদীস বিভিন্ন বাবের অধীন করতে হয়েছে যা তাঁর কিতাবে হাদীস অতিরিক্ত تكرار দিরুক্তির কারণ।

৪) استخراج نكت غريبة হাদীসের বিরল নিগুঢ় রহস্য বর্ণণায় তাঁর উদাহরণ কেবল তিনিই।

৫) التزام صحة خاصة বিশেষ প্রকারের বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসের রেওয়ায়াত গ্রহনযোগ্য হওয়ার জন্য রাউইর মধ্যে যে সকল শর্ত থাকা জরুরী সেগুলো ছাড়াও তিনি অতিরিক্ত দুটি শর্ত كثيرالملازمة للشيخ এবং كثيرالضبط والإتقان আরোপ করার কারণে তাঁর কিতাবের বিশুদ্ধ হাদীসগুলো স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে।

৬) استيعاب المسائل দ্বীনের সকল বিষয় হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণের লক্ষ্যে হাদীসের

عبارةالنص-اشارةالنص-دلالةالنص- اقتضاءالنص দ্বারা এমনকি সাহাবা ও তাবেঈনদের اثر দ্বারা মাসাইল প্রমাণ করেছেন।

৭) اقتباس الحديث আল্লামা নববী ও ইবনে সালাহ (র.)'র ভাষ্যমতে ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে ৭২৭৫টি (তাকরার ছাড়া ৪০০০টি) হাদীস লিখেছেন।

৮) كثرة الثلاثيات তাঁর কিতাবে ২২টি ثلثيات (তিন মাধ্যম বিশিষ্ট) হাদীস আছে। তন্মধ্যে ২০টিই হানাফি শায়খদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৯) مقام التاليف আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.)'র ভাষ্যমতে সংকলন শুরু করেছেন মসজিদে হারামে এবং শিরোনামগুলো প্রনয়ন করেছেন রওজাতুমমিন রিয়াযিল জান্নাতে বসে। যেমনটি তিনি নিজে বলেন

صنفت كتابي الصحيح فى المسجد الحرام وحولت تراجم الجامع بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره

১০) طريق التاليف প্রতিটি শিরোনাম প্রণয়নের পুর্বে দু'রাকাত নামায পড়েছেন অতঃপর প্রত্যেকটি হাদীস লিখার পূর্বে ১) গোসল করে ২) দু'রাকাত নামাজ পড়ে ৩) ইসতেখারা করে ৪) রওজা শরীফের দিকে ধ্যানমগ্ন হয়ে ৫) নবীজির পক্ষ

থেকে হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়ার পরই কিতাবে লিখেছেন। এজন্যই উলামায়ে কেরাম বলেন

ইমাম বুখারী যেন সরাসরি রাসুল সা. থেকে শ্রবণ করেই হাদীস লিখেছেন। জনৈক কবি লিখেন-

كَأَنَّ الْبُخَارِيَّ فِيْ جَمْعِهِ * تَلَقَّى مِنَ الْمُصْطَفَى مَا اكْتَتَبَ

বুখারী শরীফ সংকলনের কারণ

ক) হাদীস সংকলনের প্রথম তিন যুগ (একত্রীকরণ, শৃংখলিত করণ, পৃথক করণ) এরপর হিজরী তৃতীয় শতাব্দির দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে (২১৭ হিজরীতে) বিশুদ্ধ হাদীসকে অন্যান্য সকল প্রকার হাদীস থেকে বাছাই করে, সহীহ হাদীসকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে যারা কিতাব লিখেছিলেন তন্মধ্যে ইমাম বুখারী-ই সর্বপ্রথম সর্বোচ্চ নিপুনতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নিজে বলেন বহুদিন থেকে আমার হৃদয়ে এ বাসনা ছিল যে শুধু বিশুদ্ধ হাদীসের একখানা ভান্ডার তৈরী করব। ইতিমধ্যে

খ) স্বপ্নে দেখলাম আমি নবীজির সামনে হাতে পাখা নিয়ে দন্ডায়মান আর তাঁর চেহারা মোবারক থেকে মাছি তাড়াচ্ছি। স্বপ্ন বিশারদগন ব্যাখ্যায় বললেন আপনি নবীজির হাদীস থেকে মিথ্যা প্রতিহত করবেন। এতে কিতাব লিখার প্রতি আমার আগ্রহ প্রচন্ড বেড়ে যায়। যেমন মুহাম্মদ বিন সুলায়মান (র.) বলেন

سمعت البخاري يقول رئيت النبي ﷺ كانى واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه فسئلت بعض المعبرين فقال لى انت تذب عنه الكذب فهو الذي حملنى على إخراج الجامع الصحيح (مقدمة فتح الباري ص٦ و مقدمة فتح الملهم ص٩٢)

গ) ইত্যবসরে আমরা কয়েকজন সাথী উসতাদ اسحق ابن راهويه এর মজলিসে বসা ছিলাম। হঠাৎ উস্তাদ আমাকে সম্বোধন করে বললেন "যদি তুমি নবীজির বিশুদ্ধ হাদীসের একখানা কিতাব রচনা করতে" উস্তাদের এতটুকু কথা আমার হৃদয়ে দাগ কাটতে শুরু করল। তখন আমি আর কিতাব শুরু না করে পারলামনা। যেমনটি তার ভাষ্য ছিল

كنا عند إسحاق ابن راهويه فقال لوجمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله ﷺ قال فوقع ذالك فى قلبى فاخذت فى جمع الجامع الصحيح (مقدمة فتح البارى ص٦ و مقدمة فتح الملهم ص٩٢

বুখারী শরীফের নুসখা বা কপি

ইমাম বুখারীর কাছ থেকে প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষার্থী বুখারী শরীফের দরস গ্রহন করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর ৫জন ছাত্রের ৫টি কপি পাওয়া যায়-

১) আবু তালহা মানসুর বিন মুহাম্মদ আল বযদভী (মৃত ৩২৯ হিজরী) এর কপি।

২) হাম্মাদ বিন শাকির (মৃত ২২৯হিজরী অথবা ৩১১হিজরী) এর কপি

৩) ইব্রাহীম আন নাসাফী (মৃত ৩৯৪ হিজরী) এর কপি

৪) কাজী হুসাইন বিন ইসমাইল এর কপি।

৫) মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী (মৃত ৩২০ হিজরী) এর কপি।

মুসলিম শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী

১) مقدمه তিনি তার কিতাবের শুরুতে উলুমে হাদীস বিষয়ক এক ভূমিকা লিখেছেন যাতে সংকলনের কারণ কিতাবের পরিভাষা, শর্তাবলী ছাড়াও হাদীস বর্ণনার নীতি সম্বলিত অতি উপকারী বিষয়াদী যেমন হাদীস সংক্ষেপ করণের বিধান ,রাউইর স্মৃতি শক্তির পরিমান, ত্রুটিযুক্ত রাউইর হুকুম ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

২) ضبط تفاوت اللفظ যদি একাধিক শায়খের কাছ থেকে একাধিক শব্দে কোন হাদীস বর্ণিত হয় তাহলে তিনি যে শায়খের শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যথাসম্ভব সেই শায়খকে চিহ্নিত করেছেন। যেমন حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان

৩) إزالة التباس সনদের মাঝে কোন নাম যদি অপরিচিত (مبهم) কিংবা (مشتبه) এক নামে একাধিক রাউই হয় তাহলে অধিকাংশ স্থানে يعني কিংবা هو শব্দ দ্বারা তাকে পরিচিত ও চিহ্নিত করেছেন। যাতে একই নামের অন্যান্য অংশীদারগন পৃথক হয়ে যান। যেমন باب منع النساء من الخروج إلى المساجد অধ্যায়ে حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحي وهو ابن سعيد (مسلم ج ١ص١٨٢)

৪) الفرق بين حدثنا وأخبرنا যে হাদীস শায়খের তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুনেছেন সে হাদীস বর্ণনায় حدثناএবং যে হাদীস শায়খের সামনে

৫) অন্যের তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুনেছেন সেই হাদীস বর্ণনায়اخبرنا শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমনটি করেছেন ইমাম শাফেঈ, নাসাঈ প্রমুখ। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী, যুহরী প্রমুখ পার্থক্য করেননি।

৬) جمع الطرق প্রত্যেক হাদীসকে স্ব স্ব স্থানে উল্লেখ করে উক্ত হাদীসের বিভিন্ন সনদ শব্দের ভিন্নতাসহ একই স্থানে উল্লেখ করে যেন মুতির মালা গেঁথেছেন।

৭) قلة الآثار والتعليقات তিনি হাদীসে মারফু বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকতে সচেষ্ট ছিলেন। তাই মারফু হাদীসের সাথে موقوف مقطوع ওتعليقات বেশী উল্লেখ করেননি।

৮) فذكر احاديث همام ابن منبه عن ابي هريرة সূত্রে বর্ণিত হাদীসের পুস্তিকা থেকে যে হাদীসগুলো তিনি বর্ণনা করেছেন এর শুরুতেفذكر أحاديث منها যোগ করেছেন।

৯) যেমন حدثنامحمدابن رافع قال حدثنا عبدالرزاق بن همام قال حدثنامعمر عن همام بن منبه قال هذا ماحدثنابه أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ فذكر احاديث ومنها قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضاء أحدكم فليستنشق الخ (مسلم ج١ ص١٢٤)

১০) الأحاديث المنتخبة: তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে আল্লামা ইরাক্বীর ভাষ্যমতে বার হাজার হাদীস দ্বিরুক্তিসহ (এবং দিরুক্তি ছাড়া চার হাজার হাদীস) পনের বছরে সংকলন করেছেন।

১১) كثرة الرباعيات তাঁর কিতাবে رباعيات (চার মাধ্যমে বর্ণিত) হাদীস সংখ্যা আশিরও বেশী।

১২) حسن الترتيب সুন্দর বিন্যাসে তাঁর সমমান নেই। যেমন বিশুদ্ধতায় বুখারীর জুড়ি নেই। হাফিজুল হাদীস আব্দুর রহমান ইয়ামানী শাফেঈ (র.) বলেন

تنازع القوم فى البخاري ومسلم * لدى فقال أي ذين يقدم-

فقلت لقد فاق البخاري صحة * كما فاق في حسن الصناعة مسلم

মুসলিম শরীফ সংকলনের কারণ

১) মুসলিম শরীফের রাউই আবু ইসহাক ইব্রাহীম অথবা আহমদ বিন সালামা কিংবা অন্য কোন ছাত্রের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি এই অমর গ্রন্থ রচনা করেন। আবেদনের ধরণটা ছিল নিম্নরুপ

ক) ঐ সকল হাদীস জানতে ও গবেষণা করতে চাই যা নবীজি থেকে ধর্মীয় বিধান, ভাল কাজের উৎসাহ বানী ও মন্দ কাজের ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপারে বর্ণিত।

খ) হাদীসগুলো সনদ সহকারে জানতে চাই।

গ) সংক্ষিপ্তভাবে হাদীসগুলো সজ্জিত ও বিন্যস্ত আকারে সংকলিত পেতে চাই।

ঘ) হাদীসগুলো সীমাতিরিক্ত দ্বিরুক্তি থেকে যেন মুক্ত হয়।

ইমাম মুসলিম (র.) আবেদনটিকে আবেদনকারী ছাত্রের জন্য এবং মুসলিম জাতির জন্য হিতকর মনে করে এই অমর গ্রন্থ রচনা করেন।

২) হিজরী তৃতীয় শতাব্দির দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে যখন সকল প্রকার হাদীস থেকে বিশুদ্ধ হাদীসকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে কিতাব সংকলনের জন্য কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসিন উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন যুগের দাবী পুরণে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন ইমাম বুখারী (র.)। এর পরই এগিয়ে আসেন ইমাম মুসলিম (র.)। অবশ্য জনৈক ছাত্রের আবেদন তাঁর এ কাজ ত্বরান্বিত করেছিল।

মুসলিম শরীফের নুসখা বা কপি

কাজী ইয়াজ (র.) থেকে দুটি নুসখার সন্ধান পাওয়া যায়।

১) নুসখায়ে জুলুদিঃ

ক) ইমাম মুসলিমের ছাত্র আবু ইসহাক ইব্রাহীম মারুজী (র.) বলেন

وهى النسخة المشهورة

খ) আল্লামা ড. ইয়াহইয়া ইসমাইল বর্ণনা করেন

هذه نسخة هى أوثق النسخ لصحيح مسلم لكون الجلودي رواه عن مسلم عن أبي إسحاق بن محمد بن سفيان فروايته هى المعتمدة المشهورة

২) নুসখায়ে ক্বালানিসীঃ এই কপি পশ্চিমা উলামাদের কাছে পাওয়া যায়।

নাসাঈ শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী

১। সুন্দর তারতীব, হাদীসের অন্যান্য কিতাবের তুলনায় নাসাঈ শরীফের বাব (অধ্যায়গুলোর ধারাবাহিকতা অত্যন্ত সজ্জিত।

২। একাধিক মাসআলা চয়নঃ ইমাম বুখারীর অনুকরণে একই রেওয়ায়াত থেকে বিভিন্ন মাসআলা বের করার লক্ষে রেওয়ায়াতটিকে বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন বাবের অধীন করেছেন।

৩। সনদ ও মতনের স্বচ্ছতা: ইমাম মুসলিমের অনুকরণে যে সকল হাদীসে সনদের ভিন্নতায় মতনের ভিন্নতা আছে, তা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন।

৪। ইলালে হাদীসের আলোচনা: হাফিয যাহাবীর ভাষ্যমতে ইলালে হাদীসে (হাদীসের তীক্ষ্ণ ত্রুটি নির্ণয়ে) ইমাম নাসাঈর দক্ষতা ইমাম বুখারী ও আবু যুরআর সমকক্ষ হওয়ায় স্থানে স্থানে তিনি এ প্রসঙ্গ ও টেনেছেন।

৫। সনদের ব্যাখ্যা: স্থানে স্থানে রাউইদের নাম, উপনাম ও উপাধীগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন।

৬। রিওয়ায়াতের অবস্থা: কোন রিওয়ায়াতকারী একাই বর্ণনা করেছেন, কোন রিওয়ায়াতের মুতাবী (সহযোগী অন্য হাদীস) আছে কোন রিওয়ায়াতের নেই তার তথ্য দিয়েছেন।

৭। রাউইর তথ্য: কোন রাউই স্বীয় উস্তাদ থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন, কোন রাউই করেননি তার তথ্য প্রকাশ করেছেন।

৮। রিওয়ায়াতের বিষয়ে সতর্ক করণ: হাদীসটি মুরসাল, যঈফ, মুনকার হলে চিহ্নিত করেছেন।

৯। শব্দের বিশ্লেষণ: দুর্বোধ্য শব্দাবলীর ব্যাখ্যা করে বোধগম্য করেছেন।

১০। কঠিন শর্তারোপ: আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফের এমনকি বুখারী শরীফের একদল রাউইর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা থেকে ইমাম নাসাঈ বিরত রয়েছেন। যে কারণে পশ্চিমা আলেমগণ নাসাঈ শরীফকে বুখারী শরীফের উপর প্রাধান্য দিতেন।

নাসাঈ শরীফ সংকলনের কারণ: আল্লামা সায়্যিদ জামালুদ্দীন (র.)'র ভাষ্যমতে ইমাম নাসাঈ (র.) আসসুনানুল কুবরা নামে একখান বৃহৎ কলেবরের কিতাব লিখেছিলেন। যাতে হাদীসের সাথে সনদ ও মাখরাজ উত্তমভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। কিতাবখানা সমাপ্তকরে তিনি ফিলিস্তীনের রামাল্লা অঞ্চলের আমীরকে একখানা কপি উপহার দেওয়ার জন্য নিয়ে গেলে আমীর তাকে প্রশ্ন করেন এই কিতাবের সকল হাদীসই কি সহীহ? উত্তরে তিনি বলেন, অধিকাংশই সহীহ। কিছু মা'লূলও আছে। আমীর আবেদন করলেন শুধু সহীহ হাদীস সন্নিবেশিত করে একখানা কিতাব উপস্থাপন করুন। ইমাম সুনানে কুবরা থেকে বাছাই করে ৫৭৬১ খানা সহীহ হাদীসের সমন্বয়ে একখানা কিতাব রচনা করেন। যার নাম আসসুনানুস সুগরা, আল মুজতাবা, যা বর্তমানে নাসাঈ শরীফ নামে প্রসিদ্ধ। আমীরে রামাল্লার দরবারে পেশ করলে আমীর তাকে জিজ্ঞাসা করেন এ কিতাবের হাদীসগুলি বিশুদ্ধ

তো? ইমাম উত্তরে বলেন المنتخب المجتبى صحيح كله। নির্বাচিত এ কিতাবের সকল হাদীসই সহীহ। আমীর কিতাবখানা সাদরে গ্রহণ করেন।

নাসাঈ শরীফের রাউই (বর্ণনাকারী) গণ

১। আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিননুরী (র.)।

২। আবুল করীম বিন নাসাঈ (র.)।

৩। আবু আলী হাসান বিন খিযির আসসুয়ূতী (র.)।

৪। হাসান বিন বুসাইক আল আসকরী (র.)।

৫। আবুল কাশিম হামযাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী কেনানী (র.)।

৬। আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন যাকারিয়া বিন হায়াত (র.)।

৭। মুহাম্মাদ বিন মুআবিয়া বিন আহমর (র.)।

আবু দাউদ শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী

১। قال أبو داود ইহা দ্বারা কখনো সনদ বা রাউইদের এখতেলাফের দিকে, কখনো সনদের আধিক্যের দিকে ইঙ্গিত করেন।

২। كاف للمجتهد ইমাম গাযযালী ও ইবনে আরাবীর ভাষ্য মতে বিধান ও সকল মাযহাবের দলীল সম্বলিত হাদীসগুলো একত্রিত হওয়ার কারণে মুজতাহিদের জন্য এই একটি কিতাবই যথেষ্ট।

৩। تقديم الإقدام لسند عال স্মরণশক্তিতে অগ্রগণ্য রাউইর হাদীসের উপর যুগের ভিত্তিতে অগ্রগণ্য রাউইর হাদীসকে প্রাধান্য দেন।

৪। ترك متروك তার নিকট পরিত্যক্ত রাউইর হাদীস এ কিতাবে স্থান পায়নি।

৫। سند أخرا হাদীসের অন্য সনদ শব্দের ভিন্নতাসহ উল্লেখ করে দেন।

৬। اختصار। দীর্ঘ হাদীসের শুধু বাবের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশই উল্লেখ করেন।

৭। أبو وادري স্বপ্নে দেখেন নবীজী সা. বলছেন

من أراد أن يتمسك بسنتي فليقرء سنن أبي داؤد

৮। أحاديث منتخبة ৫ লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচিত ৪৮০০ হাদীস লিখেছেন।

৯। ملكه اجتهاد পাঠকের মাঝে ইজতেহাদের যোগ্যতা সৃষ্টি করে।

১০। ما سكت عنه أبو داؤد যে হাদীসে তিনি মন্তব্য করেননি। তা

(ক) ইবনে মিন্দাহও ইবনে সাকান (র.) র মতে নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

(খ) আল্লামা নববীও ইবনে সালাহ (র.) র মতে হাদীসটি হাসান পর্যায়ের হবে।

(গ) ইবনে হাজার (র.) র মতে হাদীসটির (শাহিদ) সহযোগী অন্য হাদীস পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে শাহিদ পাওয়া গেলে দলীলের উপযোগী হবে।

ঘ) যদি হাফিয মুনযিরি (র.)ও নীরব থাকেন তাহলে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য, জরাহ করলে অগ্রহণযোগ্য

১১। ترجمة جامعة এমন বাব সৃষ্টি করেন যাতে বাবের অধীনস্থ বাহ্যত: পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলির মাঝে تطبيق (সামঞ্জস্য বিধান) হয়ে যায়।

১২। إثبات ترجمة এক হাদীসের মাধ্যমেই ترجمة الباب প্রমাণের চেষ্টা করেন। একাধিক হাদীস বিশেষ প্রয়োজনে (যেমন অন্য হাদীসে ভিন্ন শব্দ আছে) যুক্ত করেন।

১৩। باب في الحوض থেকে أبو برزه। سلمي হাদীস আছে ثلاثى টি ১ حديث ثلاثي অধ্যায়ে।

وجه تاليف سنن أبي داؤد

আবু দাউদ শরীফ সংকলনের কারণ

১। আল্লামা ইবনে কায়্যিম (র.)র ভাষ্যমতেঃ লা-মাযহাবীরা যখন মুজতাহিদ ইমামদের ব্যাপরে হাদীস অজ্ঞতার অপবাদ দিতে লাগল, তখন ইমাম আবু দাউদ (র.) সংকল্প করেন এমন একখানা কিতাব লিখার যাতে সকল মুজতাহিদের দলীলে ব্যবহৃত হাদীসগুলো থাকবে, ফলে মুজতাহিদদের হাদীসের পান্ডিত্য প্রমান হবে, বিদ্বেষীদের মুখবন্ধ হবে।

২। আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র.)র ভাষ্যমতেঃ প্রত্যেক মুকাল্লিদ মাযহাব অনুসারী যাতে সহজে হাদীসের দলীলগুলো পেয়ে যান সে লক্ষ্যেই ইমাম আবুদাউদ (র.) কিতাবখানা রচনা করেন।

نسخ أبي داود

আবু দাউদ শরীফের নুসখা বা কপি

প্রসিদ্ধ কপি ৫টি

১। আবু আলী লু'লুয়ীর কপি। আমাদের দেশ সহ সমগ্র প্রাচ্যে এটা প্রচলিত। ইহা সর্ব শেষে ২৭৫ হিজরীতে ইমাম আবু দাউদ (র.) এর ইন্তেকালের বছর লিখিত। তাই এটাই বিশুদ্ধতম কপি বলে গণ্য।

২। ইবনে দাসার কপিঃ পশ্চিমাঞ্চলে এটাই প্রসিদ্ধ।

৩। আবু ঈসা রমলীর কপি। এটা ২নং কপির সমমানের।

৪। ইবনে আরাবীর কপি। এটা ১টি অসম্পূর্ণ কপি।

৫। আবুল হাসান আব্দীর কপি। এটাতে কিছু রাউই ও সনদে বিশেষ আলোচনা আছে।

তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী

১) এই কিতাব জামে'ও সুনান'ও। জামে' এই কারণে যে এতে হাদীসের অষ্ট বিষয় বিদ্যমান। আর সুনান এই কারণে যে ইহা ফিকহী তারতীবে লিখা হয়েছে।

২) এই কিতাবে হাদীসের تكرار দ্বিরুক্তি নেই।

৩) এই কিতাবে তিনি ফুকাহায়ে কেরামের মৌলিক দলিল পেশ করেছেন।

৪) প্রত্যেক বাবে ফুকাহাদের মাযহাব গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন যে কারণে কিতাবখানা হাদীসেরতো বটেই ফিকহেরও ভান্ডার।

৫) প্রত্যেক হাদীসের সাথে তার সনদীয় স্তর যেমন সহীহুন, হাসানুন, গরীবুন ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন এবং সনদের বিশদ আলোচনা করেছেন।

৬) প্রত্যেক বাবে একটি অথবা দু তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বাছাই করে সাধারনত ঐ হাদীসগুলী বর্ণনা করেছেন যেগুলো অন্যান্য মুসান্নিফগন বর্ণনা করেননি।

৭) وفى الباب عن فلان وفلان দ্বারা ঐ সকল হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেন যা এই অধ্যায়ের অধীনে আসতে পারত কিন্তু তিনি বিভিন্ন কারনে আনেননি। কোন কোন উলামায়ে কেরাম وفى الباب عن فلان وفلان দ্বারা ইঙ্গিতকৃত হাদীসের স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করে ফেলেছেন।

৮) দীর্ঘ হাদীসের শুধু বাব সংশ্লিষ্ট অংশই তিনি উল্লেখ করেছেন। যে কারণে এই কিতাবের হাদীস সংক্ষিপ্ত ও ছোট আকারে যা মুখস্ত করা সহজ।

৯) কোন হাদীসে علة সুক্ষ্ম ক্রটি বা إضطراب (পারস্পরিক দ্বন্দ) থাকলে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

১০) এক নামের একাধিক রাউই থাকলে প্রকৃত রাউই চিহ্নিত করেছেন। বিশেষ করে নামে প্রসিদ্ধ রউইর উপনাম। এবং উপনামে প্রসিদ্ধ রাউইর নাম বর্ণনা করেছেন। মাঝে মধ্যে রাউইর مروي عنه থেকেسماع প্রমাণিত করেছেন।

১১) الترجمة بالألفاظ الحديث অধ্যায়ের শিরোনাম সরাসরি হাদীসের শব্দ দ্বারা প্রণয়ন করেছেন। যে কারণে বাব বুঝা খুবই সহজ। এছাড়া বাবের ধারাবাহিকতাও সুবিন্যস্ত।

১২) معمول به এই কিতাবের প্রত্যেকটি হাদীসই কোন না কোন মুজতাহিদের معمول به (ব্যবহৃত) শুধু দুটি হাদীসের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযি বলেন হাদীস দুটি কারও কাছে معمول به নয়।

১) الجمع بين الصلواتين بغير عذر এর হাদীস।

২) قتل شارب الخمر এর হাদীস।

আমরা বলি হাদীস দুটি হানাফীদের নিকট معمول به।

প্রথমটি جمع صوري তে এবং দ্বিতীয়টি سياست বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৩) যদিও সাধারণ ভাবে তিরমিযী শরীফের স্থান বিশুদ্ধতায় আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফের পরে গণ্য করা হয় তবুও হাজী খলিফা (র.) 'কাশফুয যুনুন' গ্রন্থে তিরমিযী শরীফকে সহীহাইনের পরে স্থান দিয়েছেন। কারণ এতে দুর্বল রাউইদের হাদীস এসে গেলেও তিনি এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

১৪) সিহাহ সিত্তার দারসে তিরমিযী শরীফের স্থান আপন মহিমায় উজ্জ্বল। আকাবিরে উলামা বিশেষ করে উলামায়ে দেওবন্দ ফিকহ ও হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই কিতাবকে কেন্দ্র করেই করে থাকেন। এই বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টি ভঙ্গিতে তিরমিযী শরীফ বুখারী শরীফের সমকক্ষ। কোন শায়খুল হাদীস দারসে হাদীসে তিরমিযী শরীফকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। নিঃসন্দেহে এসকল বৈশিষ্ট্যের কারণে কোন হাদীসের কিতাবই তিরমিযী শরীফের সমান নয়।

১৫) তিরমিযি শরীফ সংকলনের পর প্রকাশের পূর্বে তিনি ইহা খুরাসান, মিশর, সিরিয়া, হেজাযের উলামাদের কাছে উপস্থাপন করে তাদের মন্তব্য কামনা করেন। সকল উলামায়ে কেরাম ইহাকে পছন্দ করে প্রশংসা করার পর জনসাধারনের সামনে প্রকাশ করেন।

১৬) তার কিতাবে হাদীসের বিশুদ্ধতা সনদের ধারাবাহিকতা এতই মজবুত যা তিনি নিজের ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছেন

من كان عنده هذاالكتاب الجامع فكان عنده نبى يتكلم

১৭) অসংখ্য হাদীস থেকে বাছাই করে ৩৯৬৫ মতান্তরে ৩৮১৬/২৯৮৩ হাদীস এতে সন্নিবেশিত করেছেন।

তিরমিযী শরীফ সংকলনের কারণ

হিজরী তৃতীয় শতাব্দির দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে সর্বপ্রকার হাদীস থেকে বাছাই করে শুধু মাত্র সহীহ হাদীসগুলোকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে কিতাব রচনায় যারা উদ্যোগি হয়েছিলেন ইমাম তিরমিযী ছিলেন এঁদের মধ্যে তৃতীয় ব্যাক্তিত্ব। যুগের চাহিদা পুরণে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) এর পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি তাঁর এই অমর গ্রন্থ রচনা করেন।

ইবনে মাজাহ শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী

১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ঐ সকল হাদীসগুলী বর্ণণা করেন যা সিহাহ সিত্তাহর অন্যান্য কিতাবে নেই। আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী বলেন তার এই পদ্ধতি হযরত মা'য বিন জাবাল (রা.) এর অনুরূপ। তিনি এমন হাদীসই বর্ণনা করতেন যা অন্য সাহাবীরা করতেন না। যেভাবে হযরত মা'য বিন জাবাল (রা.)-এর পদ্ধতি ছিল বেশী উপকার পৌছানোর উদ্দেশ্যে। সে ভাবেই ইমাম ইবনে মাযার পদ্ধতি ছিল অধিক কল্যাণের লক্ষ্যে। তার এই পদ্ধতি রক্ষার নিমিত্তে তিনি সনদের বিশুদ্ধতার দিকে তেমন ভ্রুক্ষেপ করতে পারেননি। ফলে এই কিতাবে অধিক হারে যঈফ (দূর্বল) হাদীস এসে গেছে।

২) এই কিতাবের হাদীসগুলী تكرار দ্বিরুক্তিমুক্ত যা সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবে সম্ভব হয়নি।

৩) অতিসংক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের সকল জরুরী বিধানাবলী এতে সামগ্রিকভাবে সন্নিবেশিত। পক্ষান্তরে সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবগুলী এমন সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিন্যস্ত নয়।

৪) এই কিতাবের অধিকাংশ হাদীস বিধান ও মাসাঈল সংশ্লিষ্ট। ফাযাইল ও مناقب সম্বলিত হাদীস এতে স্থান পায়নি।

৫) স্থানে স্থানে তিনি উসূলে হাদীসের বিষয় ভিত্তিক আলোচনাও করেছেন।

৬) কোন হাদীসের ব্যাপারে জনমনে সন্দেহ থাকলে তা নিরসনের লক্ষ্যে তিনি তাঁর তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেছেন।

৭) কোন হাদীস কোন শহর বাসীর বিশেষ বর্ণনা হলে তিনি তাও গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন।

৮) এই কিতাবে ৫টি ثلاثيات (তিন মাধ্যম বিশিষ্ট) হাদীস আছে। যা ইবনে মাজাহ'র গৌরবের বিষয় ছিল। কিন্তু ৫টি হাদীসই একই সনদে বর্ণিত। এবং সনদের তিন রাউইর মধ্যে

كثيرابن سليم ও جبارةابن المغلس উভয় রাউইর দুর্বলতা মারাত্মক পর্যায়ের হওয়ায় তাঁর এ গৌরব ম্লান হয়ে গেছে।

৯) শায়খ আব্দুল বাক্বী তা'লীকে ইবনে মাজাহ'য় লিখেন এই কিতাবের মোট হাদীস সংখ্যা ৪৩৪১টি তন্মধ্যে ৩০০২টি হাদীস সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবে আছে। এবং ১৩৩৯টি হাদীস বর্ণনায় তিনি একক। এসব হাদীসের মধ্যে ৪২৮টি সূত্রগতভাবে সহীহ, ১১৯টি হাসান, ৬১৩টি যঈফ এবং ৯৯টি মুনকার হাদীস রয়েছে।

১০) এই কিতাবের প্রায় এক হাজার হাদীস দলীল হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য। তন্মধ্যে মাওযু বা জাল হাদীস আছে। ইবনুল যাওযীর মতে ৩৪টি। তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থকারের মতে ৩০টি। সুয়ূতীর মতে ২২টি।

১১) ইমাম ইবনে মাজাহ কিতাবখানা রচনা করে যখন ইমাম আবু যুরআর সামনে পেশ করেন তখন তিনি কিতাবের সুবিন্যস্ত উপস্থাপনা, স্বচ্ছ-নির্মল অধ্যায়, বিধানাবলীর সামগ্রিকতা ইত্যাদির দিকে নজর দিয়ে আনন্দের অতিশয্যে হঠাৎ বলে ওঠেন

أظن أن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع واكثرها

আমার মনে হয় কিতাবখানা যখন মানুষের হাতে পৌছবে তখন جامع-سنن ইত্যাদি আকারে সংকলিত অনেক কিতাবই মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

১২) কোন কিতাবের অধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হওয়া উক্ত কিতাবের مقبوليت গ্রহণযোগ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত। বিশুদ্ধতার বিচারে সুনানে দারেমী, দারাতনী, সহীহইবনে হিব্বান ইত্যাদি কিতাবগুলো বহু উর্ধ্বের। এমনকি নাসাঈ শরীফের স্থান সিহাহ সিত্তায় তৃতীয়। কোন কোন পশ্চিমা আলিমের মতে বুখারী শরীফের উর্ধ্বে স্থান পাওয়া সত্ত্বেও সুনানে ইবনে মাজার যে পরিমান খেদমত ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখার মাধ্যমে করা হয়েছে তা অন্য কিতাব এমনকি নাসাঈ শরীফের পর্যন্ত হয়নি।

১৩) সুনানে ইবনে মাযার প্রসিদ্ধি-গ্রহনযোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম দেওয়া হল।

১। 'শরহে সুনানে ইবনে মাযা' মুগলতাঈকৃত।

২। 'মা তামাস্‌সু ইলাইহীল হাযাহ আলা সুনানে ইবনে মাজাহ' সিরাজ উদ্দীনকৃত।

৩। 'আদ্দীবাযাহ আলা সুনানে ইবনে মাজাহ' দিমইয়ারীকৃত।

৪। 'শরহু ইবনে মাজাহ' হুলবীকৃত।

৫। 'মিছবাহুয যুজা-জাহ' সুয়ূতীকৃত।

৬। 'শরহে ইবনে মাজাহ' সিন্ধীকৃত।

৭। 'ইনজাহুল হাজাহ' দেহলভীকৃত।

৮। 'কাশফুল হাজাহ' শাহ আনযার কাশ্মীরীকৃত।

৯। 'মিছবাহুয যুজাজাহ' সাম্ভলীকৃত।

১০।'ইরশাদুল হাজাহ ফী হল্লে ইবনি মাজাহ' রাহমানীকৃত।

১১। 'তাকমীলুল হাজাহ শরহে উর্দূ ইবনে মাজাহ' গোলাম রসূল কাশেমীকৃত।

সুনানে ইবনে মাজাহ সংকলনের কারণ

হিজরী তৃতীয় শতাব্দির ষষ্ঠ দশকে যখন হাদীস সংকলনের চতুর্থ যুগ চলছিল তখন ফিকহী তরতীবে বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব রচনায় যে ক'জন মনীষী আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের মাঝে ইমাম ইবনে মাজাহ ছিলেন অন্যতম। সময়ের দাবী পুরণে অন্যান্য আইম্মায়ে হাদীস মুসান্নিফদের পদাঙ্ক অনুসরণে ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর এই অমর গ্রন্থ সংকলন করেন।

সুনানে ইবনে মাজাহ'র বর্ণনাকারীগণ:

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) র মতে সুনানে ইবনে মাজাহ'র রাউই ছিলেন ৬জন।

১। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান (র.)।

২। সুলায়মান ইবনে ইয়াযীদ (র.)।

৩। আবু যাফর মুহাম্মদ বিন ঈসা (র.)।

৪। আবু বকর হামিদ আল আবহারী (র.)।

৫। সাওদান (র.)।

৬। ইব্রাহীম বিন দীনার (র.)।

মুওয়াত্তা ইমাম মালিক এর বৈশিষ্ট্যাবলী:

১) الأحاديث الأربعة এই কিতাবে চারখানা হাদীস এমন যা অন্য কোন কিতাবে নেই।

২) الأقوال الفقهية বাবের অধীনে ফিকহী আলোচনা করে তার নিজস্ব ইজতেহাদী সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেন।

৩) إجماع أهل المدينة মদিনা বাসীর ইজমা সামগ্রিকভাবে উল্লেখ করেছেন যার শিরোনাম

السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كذاوكذا

৪) اختلاف أهل المدينة যে মাসআলায় মদীনাবাসীর এখতেলাফ আছে সে বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের শব্দ প্রয়োগ করেন هذا احسن ما سمعنا

৫) بلغني তাঁর কাছে সংগৃহীত অসংখ্য হাদীসের ভান্ডার থেকে বিশেষ হাদীসগুলোর শুরুতে بلغني শব্দ প্রয়োগ করেন যা মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় بلاغات مالك বলে সমধিক পরিচিত।

৬) الأحاديث المنتخبة তাঁর সংগৃহীত বহু হাদীস থেকে ১৭২০ খানা হাদীস এতে স্থান দিয়েছেন। যার মধ্যে মুরসাল ২২২টি, মাসনাদ ও মারফু ৬০০টি, মাওকুফ ৬১৩টি, তাবেঈদের ফাতাওয়া ২৮৫টি।

৭) أم الصحيحين শারেহে মুওয়াত্তা আল্লামা আবু বকর ইবনুল আরাবীর ভাষ্যমতে 'মুওয়াত্তা'ই ভিত্তি ও বুনিয়াদী নমুনা বুখারী ও মুসলিমের জন্য। এমনকি পরবর্তী সকল বিশুদ্ধ কিতাবের জন্যও 'মুওয়াত্তা'ই ভিত্তিপ্রস্থর। কারণ বিশুদ্ধ হাদীসের সংকলিত প্রথম কিতাবই হচ্ছে 'মুওয়াত্তা'। এবং এরই অনুকরণে অন্যান্যরা স্বীয় কিতাব রচনা করেছেন।

৮) قرة العيون:مرتب و مبوب গ্রন্থকার বলেন ইসলামে কুতুবখানার দ্বিতীয় কিতাব হচ্ছে 'মুওয়াত্তা'। কারণ প্রথম কিতাব ইমাম আবূ হানিফাকৃত কিতাবুল আসার। ইমাম শাফেঈ বলেন প্রথম কিতাব কুরআন মজীদ, দ্বিতীয় কিতাব মুয়াত্তা।

৯) أصح وأفضل শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর ভাষ্যমতে 'মুওয়াত্তা' সকল হাদীসের কিতাবের তুলনায় বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। কারণ বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে নির্ণয়কৃত হাদীসের কিতাবের ৫টি স্তরে 'মুয়াত্তা'র স্থান প্রথম।

১০) ثالث الستة গ্রন্থকারের ভাষ্যমতে 'মুওয়াত্তা' শুধু সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভূক্ত-ই নয় বরং সহীহাইনের পরে তৃতীয় স্থান-ই হচ্ছে 'মুওয়াত্তা'র।

মুওয়াত্তা ইমাম মালিক সংকলনের কারণ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দির শেষের দশকে একত্রিত হাদীসগুলো থেকে সহজে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে ফিকহী তারতীবে কিতাব রচনার জন্য যে ক'জন মনীষী ব্রতী হন তন্মধ্যে ইমাম মালিক (র.) ছিলেন দ্বিতীয়। যুগের চাহিদা পুরণে ইমাম আবু হানিফার কিতাবুল আসার রচনার পরেই তাঁর এ বিখ্যাত কিতাবখান রচনা করেন।

মওুয়াত্তা ইমাম মালিকের নুসখা বা কপি

মুওয়াত্তা সংকলনের পর প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত তাঁর দরসে হাদীসে প্রায় ১০০০ শিক্ষার্থী মুওয়াত্তা শুনে কপি করেন। তা থেকে أحوال المصنفين গ্রন্থকার ৩০টির بستان المحدثين গ্রন্থকার ২১টির ও أوجز المسالك গ্রন্থকার ১৬টির পরিচিতি দিয়েছেন। তবে আমাদের দেশে মাত্র দুটির কপি পাওয়া যায়।

১। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া উন্দুলুসীর কপি। তিনি মূল মুওয়াত্তায় কোন প্রকার সংযোজন বিয়োজন করেননি বিধায় বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মূল সংকলকের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে এ কপির নাম রাখেন المؤطا للإمام مالك। যা বর্তমানে মুওয়াত্তা মালিক নামে সমধিক পরিচিত।

২। মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানীর কপি। যাকে বর্তমানে মুওয়াত্তা মুহাম্মদ বলা হয়। যেহেতু তিনি মূল সংকলকের কপিতে যথেষ্ট সংযোজন বিয়োজন করেছেন তাই নিজ নামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে المؤطا للإمام محمد নাম রেখেছেন।

মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর বৈশিষ্ট্যাবলী

১। ইহাতে কোন হাদীস মওযু'(জাল) নেই। তবে কিছু হাদীস ضعيف থাকলেও (বহু সনদের) কারণে সেগুলো حسن لغيره এর স্তরে উন্নীত।

২। বাবের অধিনস্থ হাদীস উপস্থাপনের পর নিজ ফিকহী মতও পেশ করেন।

৩। মাঝে মধ্যে ইব্রাহীম নাখঈর মাযহাবও বর্ণনা করেন।

৪। কিতাবখানার বিন্যাস অত্যন্ত সজ্জিত।

৫। তাঁর কিতাবে হাদীসের তাকরার বা দ্বিরুক্তি নেই।

৬। অধিকাংশ স্থানে ইমাম আবু হানিফা (র.)'র নামের পর والعامة من فقهائنا বাক্য সংযোজন করেছেন।

৭। কোথাও কোথাও ইমাম মালিক (র.) এর মাযহাবও উল্লেখ করেছেন।

৮। হাদীস বর্ণনায় أخبرنا শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

৯। ينبغي শব্দ বলে কখনও ওয়াজিব কখনও সুন্নতে মুয়াক্কাদা বুঝিয়েছেন।

১০। هذا حسن এবং لا يجب শব্দদ্বয় বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন।

১১। ইহাতে মারফূ', মওকুফ, মুরসাল, মুসনাদ সর্বপ্রকার হাদীস সংখ্যা ১১৮০টি, তন্মধ্যে ১০০৫টি ইমাম মালিক থেকে ১৭৫টি অন্যান্যদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। ১৭৫টি থেকে ১৩টি ইমাম আবূ হানিফা থেকে, ৪টি আবূ ইউসুফ থেকে অবশিষ্টগুলো অন্যান্যদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।

ত্বাহাবী শরীফের বৈশিষ্ট্যাবলী

১। نظر الطحاوي তিনি প্রায় সকলباب অধ্যায়ে ও মাসআলায় হাদীস ও আসার ছাড়াও باب অধ্যায় শেষে হানাফী মাযহাবের পক্ষে অকাট্য যুক্তি দ্বারা এমন ফায়সালা দেন যা জানার পর হৃদয়ে কোন সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না।

২। شرح معاني الأحاديث হাদীসের মর্ম, ব্যাখ্যা, রহস্য উদঘাটনে প্রশ্নোত্তর আকারে এমন পর্যালোচনা করেন যাতে হাদীসের উদ্দেশ্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

৩। جمع المواد সকল বিষয়বস্তু ও মাসআলায় যত প্রকারের যত হাদীসে মরফু মাওকুফ, মাক্বতু', আসার, সলফে সালেহীনের উক্তি পাওয়া যায় সবকটি-ই পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। যাতে দলীলের ভান্ডার থেকে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যাক্তি এ সকল দলীলে মুক্ত গবেষণার মাধ্যমে নির্ঘাত সত্যটা পুর্ণ অভিজ্ঞতার আলোকে স্বচ্ছভাবে উদঘাটন করতে পারে।

৪। موافقة الصحاح الستة এই কিতাবের সিংহভাগ হাদীস সনদ মতনসহ সিহাহ সিত্তাহ মুসান্নফে ইবনে আবি শায়বাসহ অন্যান্য হাফিযুল হাদীসদের কিতাব থেকে আহরিত।

৫। الأحاديث المختصة এই কিতাবে বহু হাদীস এমন আছে যা অন্য কিতাবে নেই।

৬। اتصال المرسل و رفع الموقوف অনেক হাদীস অন্য কিতাবে মুরসাল, মুনকাতি' বা মাওকুফ রূপে বর্ণিত। খুশির বিষয় হল ঐ গুলী এই কিতাবে মুত্তাসিল মারফূরূপে পাওয়া যায়।

৭। تعددالأسانيد এক হাদীসের বহু সনদ একত্রে করে ফেলেন। এতে হাদীসের শক্তি বৃদ্ধি ছাড়াও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বিভিন্ন শব্দাবলী একত্রে পাঠকের সামনে আসার ফলে হাদীসের মর্মোদঘাটন সহজ হয়ে যায়।

৮। تصريح سماع المدلس কোন কোন হাদীস অন্য কিতাবে মুদাল্লাস রূপে বর্ণিত। যাতে রাউইর শ্রবণ অস্পষ্ট থাকে। ঐ হাদীসগুলো এই কিতাবে স্পষ্ট শ্রবণসহকারে উল্লেখ করেন।

৯।نسبة غير المنسوب সম্বন্ধহীন রাউইকে সম্বন্ধযুক্ত করা, অপরিচিত রাউইর নামকে পরিচিত করা, এক নামে একাধিক রাউইর মধ্য থেকে প্রকৃত রাউই চিহ্নিত করণ, জঠিল বাক্যের ব্যাখ্যা اضطراب ও شك راوي এর কারণ চিহ্নিতকরণ এ সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

১০। إتيان الأثار مع الجرح والتعديل সাহাবা ও তাবেঈদের আসার ও ফাতাওয়া, ফুকহাদের উক্তি, আইম্মাদের জরাহ ও তাদীলসহ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

১১। مذاهب الائمة সকল মুজতাহিদ ইমামের মাযহাব বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

১২। أدلة الائمة যেভাবে হানাফী মাযহাবসমূহের সমুহ দলীল দ্বারা কিতাবকে সমৃদ্ধ করেছেন সেভাবেই অন্যান্য মাযহাবের দলীলসমূহও পূর্ণ উদারতার সাথে সন্নিবেশিত করেছেন।

১৩। محاكمة بين الأدلة এখতেলাফী মাসাঈলের দালাইলে ফায়সালা প্রদান এই কিতাবের মূল লক্ষ্য। তাই তিনি নিজ সনদে ঐ সকল হাদীসগুলো পেশ করেন যেগুলো মুজতাহিদ ইমামগণ দলীলে ব্যবহার করেন। অতঃপর সনদ ও মতনের সকল দিক নিয়ে আকলী ও নকলী সর্বপ্রকার আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দী হাদীসগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান, প্রাধান্য দান, রহিত করণ, বিশুদ্ধ কিংবা দুর্বল চিহ্নিত করণ, রাউইদের দোষ গুনের চুলচেরা বিশ্লেষণ ইত্যাদি ব্যাপারে এমন ন্যায়সংগত ও মধ্য পন্থায় আলোচনা করেছেন যা যে কোন সত্যান্বেষীকে তৃপ্ত করতে ও ফিকহে হানাফীকে হাদীসের নিকটতম মাযহাব হওয়ার স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম।

ত্বাহাবী শরীফ সংকলনের কারণ

তিনি ত্বাহাবী শরীফের ভূমিকায় নিজের ভাষায় বলেন,

ক) এখতেলাফী মাসাইল ও বিধানাবলীতে দলীল হিসাবে ব্যবহৃত হাদীসগুলোকে কিছু নাস্তিক ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা পরস্পর বিরোধী মনে করে।

নাসিখ মনসূখ, গ্রহণীয় ও বর্জনীয় হাদীসের জ্ঞানের স্বল্পতার দরূণ

যা হাদীসের ব্যাপারে তাদের প্রচন্ড ভূল ধারনা।

খ) আমার কিছু ছাত্র বন্ধুগণ আমার কাছে আবেদন করলেন

১। এই ধরনের প্রতিদ্বন্দি হদীসগুলীকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে

২। প্রত্যেক অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলীকে নাসিখ মনসূখ, ফুকাহাদের উক্তি, সকল মুজতাহিদ ইমামের দলীল সহকারে, হানাফী মাযহাবের প্রাধান্যের কারণ

৩। কুরআন হাদীস, ইজমা, সাহাবা তাবেঈদের উক্তির আলোকে একটি সংকলন তৈরি করে দেওয়ার জন্য। আমি ভূল ধারনা খন্ডন ও বন্ধুদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের প্রত্যাশিত পন্থায়-ই কিতাব রচনা করেছি।

ত্বাহাবী শরীফের নুসখা বা কপি দুইটি

১। رواية المغاربة আবুল কাশেম হিসাম বিন মুহাম্মদ রাঈনী (র.)'র কপি যা পশ্চিমা আলেমদের কাছে প্রসিদ্ধ।

২। رواية المشارقة হাফিজ আবু বকর মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম মুকিররী হাম্বলী (র.) ও আবুল ফজল মুহাম্মদ বিন উমর তিরমিযী (র.)'র কপি যা প্রাচ্যের উলামাদের কাছে প্রসিদ্ধ।

এক নজরে দাওরায়ে হাদীসের কিতাবগুলো

১। সহীহ বুখারী শরীফঃ

প্রকৃত নামঃ

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه

সংকলকঃ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (র.)।

জন্মঃ **১৩** শাওয়াল **১৯৪** হিজরী।

মৃত্যুঃ **১**লা শাওয়াল ২৫৬ হিজরী।

মোট হাদীস সংখ্যাঃ ৭২৭৫ টি (পুনরাবৃত্তিসহ), ৪০০০ পুনরাবৃত্তি ছাড়া।

প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ তরজমাতুল বাব।

২. সহীহ মুসলিম শরীফ

প্রকৃত নামঃ

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول الله ﷺ

সংকলকঃ- ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.)।

জন্মঃ ২০৬ হিজরী।

মৃত্যুঃ ২৬১ হিজরী।

মোট হাদীস সংখ্যাঃ **১**২,০০০ (পুনরাবৃত্তি ছাড়া ৩০৩৩)

প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ মুকাদ্দিমা ও চমৎকার বিন্যাস।

৩. সুনান আবু দাউদ শরীফ

প্রকৃত নামঃ السنن

সংকলকঃ- ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসআছ (র.)।

জন্মঃ ২০২ হিজরী।

মৃত্যুঃ ২৭৫ হিজরী।

মোট হাদীস সংখ্যাঃ ৪৮০০

প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ ক্বালা আবু দাউদ।

৪. সুনান নাসাঈ শরীফ

প্রকৃত নামঃ السنن

সংকলকঃ- আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন শুআইব (র.)।

জন্মঃ ২১৫ হিজরী।

মৃত্যুঃ ৩০৩ হিজরী।

মোট হাদীস সংখ্যাঃ **৫৭৬১**

প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ বিভিন্ন শিরোনামে একই রেওয়াত পুনরাবৃত্তি।

৫. জামে' তিরমিযী শরীফ

প্রকৃত নামঃ

الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صـ ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل

সংকলকঃ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা (র.)।

জন্মঃ ২০৯ হিজরী।

মৃত্যুঃ ২৭৯ হিজরী।

মোট হাদীস সংখ্যাঃ ৩,৯৬৫ মতান্তরে ২৯৮৩

প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ প্রতিটি হাদীসের সাথে ফিকহী আলোচনা সংযুক্ত মুকাদ্দিমা, কিতাবু ইলাল।

৬. ইবনে মাজাহ শরীফ

প্রকৃত নামঃ السنن

সংকলকঃ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ (র.)।

জন্মঃ ২০৯ হিজরী।

মৃত্যুঃ ২৭৩ হিজরী।

মোট হাদীস সংখ্যাঃ ৪৩৪১

প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ মুকাদ্দমার হাদীস সমূহ পুনরাবৃত্তি মুক্ত।

৭. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক

প্রকৃত নাম: الموطا للإمام مالك

সংকলক: ইমাম মালিক বিন আনাস (র.)।

জন্ম: ৯৩ হিজরী।

মৃত্যু: ১৭৯ হিজরী।

মোট হাদীস সংখ্যা: ১৭২০

প্রধান বৈশিষ্ট্য: উম্মুসসাহীহাইন, হিজাযী রাউই, মদীনাবাসীর ইজমা।

৮. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ

প্রকৃত নাম: الموطا للإمام محمد

সংকলক:- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (র.)

জন্ম: ১৩২ হিজরী।

মৃত্যু: ১৮৯ হিজরী।

মোট হাদীস সংখ্যা: ১১৮০

প্রধান বৈশিষ্ট্য: প্রতিটি বিষয়ে হাদীসের সাথে হানাফী সিদ্ধান্ত প্রমাণসহ বর্ণনা করেছেন।

৯. ত্বাহাউই শরীফ

প্রকৃত নাম:

شرح معانى الآثار المختلفة المروية عن رسول الله ص فى الاحكام

সংকলক: ইমাম আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ (র.)।

জন্ম: ২৩৯ হিজরী।

মৃত্যু: ৩২১ হিজরী।

মোট হাদীস সংখ্যা: ৪৩৪১

প্রধান বৈশিষ্ট্য: নযরে ত্বহাউই। বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহের মাঝে নক্বলী দলীলে সাথে আক্বলী দলীলের সমন্বয়ে ফিকহে হানাফীর সিদ্ধান্ত বিষয়ক চমৎকার কিতাব।

সিহাহ সিত্তাহ সংকলকদের জীবনী

ইমাম বুখারী (র.)

নাম: মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল

উপনাম: আবু আব্দুল্লাহ

পদবী: আল ইমাম, আল হাফিজ, আল হুজ্জাহ আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস।

আকৃতি: তিনি হালকা গঠন, মধ্যম উচ্চতার ছিলেন, বেশি লম্বাও ছিলেন না বেশি বেটেও ছিলেন না। যেমন ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

জন্ম: ১৩ শাওয়াল শুক্রবার জুমআর পর: ১৯৪ হিজরী।

মৃত্যু: শনিবার ঈদুল ফিতরের রাত, ২৫৬ হিজরী।

বয়স: ১৩ দিন কম ৬২ বছর।

কোন কবি বলেছেন-

كان البخاري حافظا ومحدثا * جمع الصحيح مكمل التحريري ميلاده صدق (١٩٤)

(ومده عمره: فيها حميد (٦٢) ونفضى فى نور (٢٥٦

বংশ পরম্পরা:

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিযবা ইবনে বাযিযবা আল জুফী আল ইয়মানী আল বুখারী।

'বারদিযবা এবং বাযিযবা'র ব্যাপারে ইতিহাস সম্পূর্ণ নিরব। তবে নামের রূপ দেখে মনে হচ্ছে তারা ফরাসী বংশভোদ হবেন। কারণ বারদিযবা ফারসি শব্দ এর অর্থ হচ্ছে 'কৃষক'। ধারণা করা হয় তারা মজুসী অগ্নীপূজক ছিলেন এবং এই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। মুগীরা বুখারার তৎকালীন শাসনকর্তা ইয়ামান আল জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বুখারাতেই অবস্থান গ্রহণ করেন। প্রাচীনকাল থেকেই এই রীতি চলে আসছে যে কেউ কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর সাথে ইসলাম গ্রহণের সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আবু দাউদ শরীফে হযরত তামীম দারী রা. থেকে বর্ণিত একখানা হাদীসও আছে-

إنه قال يا رسول الله مالنسبة فى الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياة وبمماته

তামীম দারী রা. প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল সা. ঐ ব্যক্তি কেমন সম্পর্কের অধিকারী হবে যার হাতে সে কেউ ইসলাম গ্রহণ করল? উত্তরে নবীজী বললেন, সে

তার জীবনে মরণে ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। এই ইসলামী সম্বন্ধের কারণে-ই ইমাম বুখারী (র.) কে জু'ফী বলা হয়। নতুবা জু'ফী বংশের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ইমাম বুখারীকে জু'ফী বলার বিধানটা ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মাযহাব অনুসারে হয়েছে। কারণ একমাত্র তাঁর নিকটে-ই ইসলামী সম্বন্ধটা স্বীকৃত। নতুবা ইমাম বুখারী এমন ইসলামী সম্বন্ধ সমর্থন করেন না।

ইমাম সাহেবের দাদা ইব্রাহীমের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু পওয়া যায় না। সংক্ষেপে শুধু এতটুকুই পাওয়া যায় যে, তিনি উচু মাপের মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ ছিলেন।

ইমাম সাহেবের পিতা ইসমাঈল এর ব্যাপারে রিজাল শাস্ত্রের কিতাবাদিতে পাওয়া যায় তিনি চতুর্থ স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ইমাম মালিক, হাম্মাদ বিন যায়েদ, আবু মুয়াবিয়া প্রমুখ এর কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) তাঁর হাদীসের শিক্ষক ছিলেন। (মুকাদ্দামায়ে ফতহুল বারী)

আল্লামা যাহাবী (র.) বলেন তাঁর পিতা পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। পরহেযগারী ও খোদাভীরুতায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন।

তাঁর ছাত্র আহমদ বিন হাফস বলেন, আমি তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, আমি অনেক সম্পদ রেখে যাচ্ছি এর মধ্যে একটি দিরহামও সন্দেহযুক্ত দেখি না। এই হালাল সম্পদের রং ইমাম বুখারীর জীবনে ছড়িয়ে ছিল। বুযুর্গী ও খোদাভীরুতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

বাল্যকালঃ শৈশবেই ইমাম সাহেবের পিতা ইন্তেকাল করেন। তাঁর লালন পালনের ভার তাঁর মাতার উপর পড়ে। এর উপর অতিরিক্ত মুসিবত এসেছিল যে, কোন কারণে ইমাম সাহেবের দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল। তাঁর মাতা এবাদত গোজার আল্লাহ প্রাপ্তা মহিলা ছিলেন। বাচ্চার দৃষ্টিশক্তির জন্য তাহাজ্জুদের নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্না কাটি করতেন।

এক দিন শেষ রাতে এমন কান্না কাটি করে ঘুমের কুলে ঢলে পড়লেন। আল্লাহর দয়ার সাগরে তরঙ্গ দেখা দিল, তিনি স্বপ্নে হযরত ইব্রাহিম আ. কে দেখলেন, তিনি বলছেন, “আল্লাহ তোমার কান্নাকাটি ও অত্যধিক দোআর বিনিময়ে তোমার পুত্রের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।” ঐ দিন সকালে যখন ইমাম সাহেব ঘুম থেকে জাগলেন তখন তাঁর চক্ষু জ্যোতিতে ঝলমল করছিল।

আল্লামা তাজউদ্দিন সুবকী (র.)‘ত্ববকাতুল কুবরা’ নামক গ্রন্থে লিখেন প্রচন্ড রোদে এবং গরমে ইলিম অন্বেষনের সফরের কারণে দ্বিতীয়বার তার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিলো। কোন চিকিৎসক বলেছিল মাতার চুল মুন্ডিয়ে খিৎমী ফুলের প্রলেপ দিলে ভাল হওয়ার আশা করা যায়। তাই করা হলো। এবং তিনি সুস্থও হলেন।

চোখের জ্যোতি এত-ই বেড়ে গেল যে, চাঁদনী রাতে তিনি লেখতে পড়তে পারতেন। বিখ্যাত তারীখে কবীরের পান্ডুলিপি তিনি চাঁদনী রাতেই লিখেছেন।

শৈশবের পর তাঁকে মক্তবে ভর্তি করা হলো। ১০ বছর বয়সের পূর্বেই তিনি মক্তবের সকল বিদ্যা অর্জন করে অবসর গ্রহণ করেন। সেই সময় থেকেই গায়েবীভাবে তাঁর অন্তরে হাদীস মুখস্থ করনের আগ্রহ ঢেলে দেয়া হয়। যেমন তিনি নিজে বলেন-

ألقى علي حفظ الحديث وأنا في المكتب

আমি মক্তবে থাকতেই আমার অন্তরে হাদীস মুখস্ত করণের আগ্রহ ঢেলে দেয়া হয়। (মুকাদ্দিমায়ে ফতহুল বারী)

হাদীসের জন্য তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টাঃ তিনি ১০ বছর বয়সে ইলমে হাদীসের জন্য চুড়ান্ত মেহনত শুরু করে দেন। হাদীসের মতন মুখস্থ করতেন এবং প্রত্যেক রাউইর জীবনীও মুখস্থ করতেন। সর্বপ্রথম তিনি তার দেশ বুখারার সকল শায়খদের কাছ থেকে হাদীসের ভান্ডার জমা করা শুরু করেন। যারা সময়ের নির্বাচিত মুহাদ্দিস হিসাবে পরিগণিত হতেন, যাদের পাঠশালা ছাত্রদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল, তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন সালাম বায়কান্দী, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ মাছনাদী এবং ইব্রাহিম ইবনে আসআছ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ সময়ের ভিতরেই বুখারায় হানাফী মাযহাবের যত কিতাব ছিল তিনি সবগুলো মুখস্থ করে ফেলেন। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং ওকী’ ইবনুল জাররাহ যাদের কিতাবাদী তৎকালীন খুরাসানে প্রসিদ্ধ ছিল মুখস্ত করে ফেলেন। এমনকি এই সময় সনদ ও মতনের ব্যাপারে তাঁর এমন যোগ্যতা অর্জন হয়েছিল যে বড় বড় মুহাদ্দিসীনেরও ভুল ধরে ফেলতেন। অনেক সময় তার উস্তাদবৃন্দও তার মাধ্যমে তাদের কিতাবগুলো তাসহীহ(সংশোধন) করাতেন।

উস্তাদ দাখিলীর দরসে এক দিনঃ একদিন তিনি তাঁর এক উস্তাদ মুহাদ্দিস দাখিলীর হাদীসের দরসে বসা ছিলেন, মুহাদ্দিস দাখিলী একটা সনদ এভাবে বয়ান করেন, سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم

(সুফইয়ান আন আবি যুবায়ের আন ইব্রাহীম(তখন ইমাম বুখারী বলে উঠলেন হযরত সনদ এমন হবে না। কারণ আবু যুবায়ের ইব্রাহীম থেকে কোন রিওয়ায়াত করেননি। দাখিলী তাঁকে শিশু মনে করে ধমকালেন। কিন্তু ইমাম বুখারী ছিলেন নাছোড় বান্দা। তিনি দ্বিতীয়বারও অত্যন্ত আদব ও নম্রতার সাথে বিনীত আবদেন জানালেন, যদি আপনার কাছে মূল কপি থাকে তাহলে দয়া করে একটু দেখে

নিন। এটা যুক্তিসংগত আবেদন ছিল। তাই দাখিলী ক্লাস থেকে উঠলেন এবং মূল কপি বের করলেন। এতে ইমাম বুখারীর কথা-ই সঠিক প্রমাণিত হলো। এবার দাখিলী বুখারীকে পরীক্ষার নিমিত্তে প্রশ্ন করলেন, তাহলে বলতো সঠিক সনদটা কেমন হবে? ইমাম বললেন,

سفيان عن الزبير هو ابن عدى عن إبراهيم

(সুফইয়ান আনিয যুবায়র হুয়া ইবনু আদিয়িন আন ইব্রাহীম(তখন দাখিলী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং ভরপুর মজলিসে তাঁর কৃতিত্তের স্বীকৃতি দেন এবং তাঁর সামনে যে কপি ছিল তাও শুধরে নেন।

উস্তাদ বায়কান্দীর সম্বোধন: একদিন তাঁর উস্তাদ আল্লামা বায়কান্দী (র.) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমি একবার আমার কিতাবখানা অধ্যায়ন করবে এবং এতে যত ভুল হয় তা সংশোধন করে দিবে।" কেউ অবাক হয়ে বললো এতো একটা বালক, আর আপনি হচ্ছেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম সে বুঝি আপনার কিতাব সংশোধন করবে? তখন বায়কান্দী বলেছিলেন, "সে বালক ঠিক, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় ও প্রতিদ্বন্দী কোন বালক নেই"। হাদীসে তার এতই পান্ডিত্ব ও ছিল যে, তাঁর শিক্ষকরা ক্লাস দানের সময় নিজকে অত্যন্ত সামলে কথা বলতেন। সে আবার না ভুল ধরে ফেলে। আল্লামা বয়কন্দী বলেন, 'সে যখন সবকে আসত তখন আমার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হতো। এবং তার সামনে হাদীস বর্ণনা করতে ভয় লাগত।

মোটকথা, বয়সপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই তাঁর দেশে যত হাদীস প্রচলিত ছিল সবগুলি মুখস্ত করে ফেলেন। ৭০ হাজারেরও বেশী হাদীস মুখস্থ করে ফেলেন।

আল্লামা বায়কান্দী একবার সুলায়ম ইবনে মুজায়দকে বলেছিলেন, "তুমি যদি একটু আগে আসতে তাহলে এমন এক বালক দেখতে, যার ৭০ হাজার হাদীস মুখস্থ আছে। সুলায়ম তা শুনে অবাক হলেন এবং ঐ বালকের খুজে বের হয়ে গেলেন। পেয়েও গেলেন।

জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি ৭০ হাজার হাদীস মুখস্থ করার দাবী কর? তিনি বললেন অবশ্যই। বরং এর চেয়ে আরো বেশি। শুধু হাদীসই নয় ঐ সকল হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতায় যত রাউই আছেন তাঁদের অধিকাংশের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ এবং অবস্থানের বর্ণনা সম্পর্কে যদি আমাকে প্রশ্ন কর তাহলে আমি ঝটপট উত্তর দিতে পারব।

ইলমে হাদীসের জন্য ইমাম সাহেবের সফরসমূহ

যখন তাঁর বয়স ১৬ বছর অতিক্রম করল তখন তাঁর মনে সাধারণ মুহাদ্দিসীনের প্রাচীন অভ্যাস অনুযায়ী বহির্বিশ্বের মুহাদ্দিসীনের কাছ থেকে হাদীস অর্জনের জন্য ভ্রমণ ও সফরের প্রচন্ড ইচ্ছা জাগল। যেহেতু মক্কা মদীনা ওহী অবতরণের স্থল হওয়ার কারণে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল তাই তিনি সর্বপ্রথম সেখানে গেলেন। তার বড় ভাই আহমদ ইবনে ইসমাইল ও মায়ের সাথে ২১০ হিজরীতে হজ্বের উদ্দেশ্যে গমণ করেন। হজ্ব শেষে মা ও ভাই বুখারায় ফিরে আসলেন। আর তিনি ইলম অণ্বেষণের জন্য থেকে গেলেন। সেই সুযোগে তিনি বিভিন্ন শহর সফর করেন। সর্বপ্রথম মক্কা মুকাররমার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবুল ওলীদ আহমদ ইবনে আযরাকী, আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র হুমায়দী প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস অর্জন করেন।

অতঃপর মদীনায় গমণ করেন। সেখানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইব্রাহীম বিন মুনযির, মুতাররাফ বিন আব্দুল্লাহ, ইব্রাহীম বিন হামযাহ প্রমুখ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। অতঃপর বসরায় পরপর চার বার যান। মিশরে দু'বার। সিরিয়ায় দু'বার এবং বাগদাদে আট বার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর কাছে যান। প্রত্যেক বারই ইমাম আহমদ তাকে বেশি দিন থাকার জন্য পিড়াপীড়ি করতেন এবং কুফার ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেন,

لا أحصى كم مرة دخلت الكوفة আমি কুফায় কতবার গিয়েছি তার সীমা নেই। এতে যেভাবে ইমাম বুখারীর ইলম অন্বেষণের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে তেমনি কুফার বৈশিষ্ট্যও অস্পষ্ট থাকে না। কারণ যেখানে ইমাম বুখারীর মতো ব্যক্তিত্ব হাদীস অর্জনের জন্য বার বার যেতে হয়েছিলো।

মোটকথা কয়েক বছরের ভেতরেই তিনি ইসলামী বিশ্বের মুহাদ্দিসীনদের কাছ থেকে হাদীস অণ্বেষণনের কাজ সমাপ্ত করেন। এতে আকাবির, আমাছিল, আছাগির বড়, সমবয়স্ক ও ছোটদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি বরং যার কাছে হাদীস পেতেন তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করতেন।

এক হাজারেরও বেশি উস্তাদ ও শায়খের কাছ থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেন। যে কারণে আনাচে কানাচে তাঁর প্রসিদ্ধি পৌছে গিয়েছিলো। যখন হাদীস গ্রহণ থেকে অবসর হয়ে আপন শহর বুখারায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন পূর্ণ শহরবাসী তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ঢল নামিয়েছিলো। শহরের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকেরা বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তার উপর স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রা ছিটাচ্ছিলো।

ইমাম মুসলিম এর ভাষ্যমতে যখন তিনি নিশাপুর গমণ করেন তখন শহরবাসীরা তিন তিন মঞ্জিল অতিক্রম করে অভ্যর্থনা দিয়েছিলো। আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সর্বস্তরের জনতা এতে অংশ গ্রহণ করেছিল।

অনেকেই ঘরের চাদ, বাড়ীর দেয়াল, গাছের ডালে অবস্থান নিয়েছিল তাকে এক দৃষ্টি দেখার জন্য। আমার জীবনে এমন জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা কোন আলেমকে দিতে দেখিনি। কোন প্রশাসককেও দিতে দেখিনি।

মুহাম্মাদ বিন মানসূর বলেন সে অভ্যর্থনায় শুধু অশ্বারোহী ছিল চার হাজার। গাধা ও খচ্ছর আরোহী আর পদাতিক জনসংখ্যা কেমন ছিল তার হিসাব রাখা যায়নি।

পাঠদানঃ অতঃপর তিনি পাঠদানের মসনদে আসীন হন। তাঁর ইলমী প্রসিদ্ধির কারণে যেখানে তিনি হাদীসের দরস শুরু করতেন সকল ছাত্র সেখানে ভিড় জমাতেন। অন্যান্য মুহাদ্দিসীনের পাঠশালা শূণ্য হয়ে যেত।

এমনকি তাঁর উস্তাদবৃন্দের পাঠশালাও খালি হয়ে যেত। অবশ্য তার উস্তাদবৃন্দই নিজ ছাত্রদেরকে ইমাম বুখারীর দরসে বসার জন্য বলতেন। কারণ তার কাছে অনেক দুষ্পাপ্য হাদীস পাওয়া যেত।

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলী তাঁর এক বড় উস্তাদ ছিলেন। তিনিও তার ছাত্রদেরকে বুখারীর দারসে বসার নির্দেশ দিতেন। যে কারণে তার ছাত্র সংখ্যা ছিল গণণার বাহিরে। শুধু বুখারী শরীফের দারস গ্রহণ করেছেন তার এমন ছাত্র সংখ্যা ৯০ হাজর। ইমাম মুসলিম,ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ তাঁর ছাত্র ছিলেন।

তাঁর মেধার প্রখরতা

ইমাম বুখারী শৈশবেই মেধার প্রখরতা, সীমাহীন বুদ্ধিমত্তা, প্রচুর মুখস্ত শক্তিতে তার উদাহরণ তিনি নিজেই ছিলেন। তিনি কলম খাতায় এতুকু বিশ্বাসী ছিলেন না, যতটুকু বিশ্বাসী ছিলেন স্বীয় স্মরণ শক্তিতে। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

১। হাশিদ বিন ইসমাইল এর ভাষ্যমতে ইমাম বুখারী আমাদের সাথে বসরার এক শায়খের কাছে হাদীস শিক্ষার জন্য যেতেন। আমরা সকলে শুনে শুনে লিখতাম কিন্তু তিনি লিখতেন না। এভাবে ১৬ দিন অতিক্রম হওয়ার পর ধমকের সুরে তাকে বললাম মিয়া! অযথা সময় নষ্ট করছ কিছু লিখছনা।

তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন 'আপনারা বেশ বলেছেন, আপনাদের লিখিত পান্ডুলিপিগুলো নিয়ে আসেন' যেগুলোতে ১৫ হাজারেরও বেশি হাদীস লিখিত ছিল। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সবগুলো হাদীস মুখস্থ ও ঝটপট

বলে ফেললেন। উল্টো আমাদের লিখিত কপিগুলিতে যে সকল ভুল ছিল তার কাছ থেকে শুধরে নিচ্ছিলাম।

২। মুহাম্মাদ বিন আসগর ফিলিস্তীনী (র.) বলেন, "আমি সুলায়মান বিন হারব এর দারসে ছিলাম। বুখারী ও আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা সকলে লিখতাম আর তিনি শুধু শুনতেন। কাউকে তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম এই বালকের কি হলো? সে লিখছে না কেন? আমাকে উত্তরে বলা হলো সে বুখারা গিয়ে নিজ স্মৃতি থেকে লিখে নিবে।

তাঁর স্মৃতিশক্তি ও মেধার প্রখরতার পরীক্ষা লোকেরা বারবার তাঁর মুখস্থ শক্তি ও হাদীস বিষয়ে যোগ্যতার পরীক্ষা নিয়েছে। কিন্তু তিনি বারবারই খোদা প্রদত্ত মেধা এবং নজীরবিহীন স্মরণশক্তির মাধ্যমে বিজয়ী হয়েছেন।

১। তিনি যখন সমরকন্দ গমণ করেন তখন সেখানে চারশত বড় বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর আগমণে সকলে একত্রিত হয়ে গেলেন এবং ইমাম সাহেবকে পরীক্ষার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করলেন যে, অনেক হাদীসের সনদ ও মতনের পরিবর্তন সাধন করলেন। ইরাকীকে সামী এবং সামীকে ইরাকী এবং মক্কা মদীনার সনদকে ইয়ামানে প্রবেশ করালেন। অতঃপর তাকে এগুলোর সত্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো। তিনি সকল হাদীস তার স্বীয় সঠিক সনদে বলে দিলেন। তাঁরা অবাক হলেন।

২। যখন তিনি বাগদাদ গমন করলেন সেখানে তিনি আগে থেকে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেখানের মুহাদ্দিসীনে কেরাম তার পরীক্ষার জন্য একশত হাদীস সনদে ও মতনে রদ বদল করেন এবং ১০জন মেধাবী ছাত্রকে বাছাই করলেন। প্রত্যেককে ১০টি করে পাল্টানো হাদীস দিলেন যাতে তারা ইমাম বুখারীর সামনে ঐগুলি পেশ করে। শহরের অনেক লোক এ দৃশ্য দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিল। সকল এসে গেলে সকলে বৈঠকে বসল, এবং প্রত্যেক ছাত্র তার দশ দশ হাদীস বর্ণনা করলো। ইমাম সাহেব প্রত্যেক হাদীস শুনে বললেন, لا أعرفه এটা আমি জানি না। এ জবাব শুনে সাধারণ লোকেরা মনে করল ইমাম বুখারী মুহাদ্দিসীনের কাছে পরাজিত হয়ে গেছেন। কিন্তু যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল, তারা ঘটনার বাস্তবতা আঁচ করে ফেলল। তারা যখন একশত হাদীস বলে শেষ করল, তখন তিনি প্রথম ছাত্রের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং বললেন "তুমি প্রথমে এই এই হাদীসগুলো বর্ণনা করেছিলে। এগুলো ঠিক নয়। এগুলোর বিশুদ্ধ হাদীস হচ্ছে এই এই ভাবে" এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় থেকে দশম ব্যক্তি পর্যন্ত প্রত্যেকের ভুল হাদীসগুলোও

বললেন এবং তার শুদ্ধটা কি হবে তাও বললেন। তারা আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারল না। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন "সহী শুদ্ধ একশত হাদীস বলে দেয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ এগুলিতো তাঁর আগে থেকে মুখস্থ ছিল বরং বিস্ময়তো সেখানে যে তিনি ভুল হাদীসগুলো যেভাবে শুনলেন সেভাবেই মুখস্থ করে ফেললেন। আবার ধারাবাহিক সকলের সামনে বলেও ফেললেন। সুবহানাল্লাহ!

ইলালে হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (র.) এর একক বৈশিষ্ট্য

উলুমে হাদীসের সবচেয়ে কঠিনতম বিষয় হচ্ছে ইলালে হাদীস। এর জন্য সীমাহীন ধীশক্তি, প্রখর মেধাশক্তি, যাচাই বাচাইয়ের পূর্ণ দক্ষতার প্রয়োজন এছাড়া ও যেটা প্রয়োজন তাহলো রাউইদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ইতিহাস অবগত থাকা। এটা সকল ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র খোদা প্রদত্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই তা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা ইমাম বুখারী (র.)কে এ অভিজ্ঞতা দান করেছিলেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলতেন আমি যতটুকু ইল্লতে হাদীস বর্ণনা করেছি এর অধিকাংশই ইমাম বুখারীর কাছ থেকে পেয়েছি। হাফিয আহমদ বিন হামদুন (র.) বলেন একদিন তাঁর উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া যুহলী আসমায়ে রিজাল এবং ইলালে হাদীস সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি কুলহু আল্লাহ সুরাহ পরার মত অনর্গলভাবে বলে শেষ করলেন। এভাবে ইমাম মুসলিমও প্রশ্ন করেছিলেন তখনও তিনি ঝটপট উত্তর দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও রাউইদের দোষ বর্ণনায় তিনি ছিলেন অতিশয় সতর্ক।

পরিস্কার ভাষায় কাউকে মিথ্যাবাদী, জালকারী, দাজ্জাল বলতেন না। বরং অধিকাংশ সময়ে একথা বলতেন "তাঁরা একে ত্যাগ করেছে, লোকেরা তাকে অপছন্দ করেছে, পরিত্যক্ত, হাদীসের অনুপযুক্ত" ইত্যাদি।

হাদীস গ্রহণে ইমাম বুখারীর সতর্কতা

তিনি সকল যোগ্য অযোগ্যের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন না। যার উপর তাদলীস বা উস্তাদের নাম গোপনের সন্দেহ থাকত তার কাছ থেকে কখনোই হাদীস গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন এক শায়খের কাছ থেকে দশ হাজার হাদীস এজন্যই গ্রহণ করিনি যে তিনি তাদলীস করতেন।

এমনিভাবে একদিন এক শায়খের কাছে গিয়ে দেখেন শূন্য খাঁচা দেখিয়ে ঘোড়াকে ডাকছেন। তিনি এই বলে হাদীস গ্রহণ না করে তিনি ফিরে আসলেন। যে ব্যক্তি ঘোড়াকে ধোঁকা দিতে পারে সে মানুষকেও হাদীসের ব্যাপারে ধোঁকা দিতে পারে।

আমলী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা

অধিকাংশ আলেমই পরনিন্দার রোগে ভোগেন। ইমাম বুখারী (র.) এই রোগ থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন ماغبت مذ علمت ان الغيبة حرام আমি যখন থেকে জেনে ছিলাম পরনিন্দা করা হারাম সে দিন থেকে আর কখনো পরনিন্দা করিনি।

খোদাভীতি ও পরহেযগারী

যেহেতু ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাইল খোদাভীতি ও পরহেযগারীতে মডেল ছিলেন এবং পরহেজগারীর মধ্যে হালাল খাদ্যের বিরাট প্রভাব থাকে এবং তা সন্তান পর্যন্ত পৌছে। এ কারণে ইমাম বুখারীর জীবনে তা প্রতিফলিত হয়েছিল।

আবু হাফস একদিন তাঁর কাছে কিছু কাপড় প্রেরণ করেন। বিকালে তাঁর কাছে এক ব্যবসায়ী দল আসল। তারা এগুলির দাম পাঁচ হাজার দিরহাম বলল। তিনি বললেন, আমি রাতে চিন্তা করব। সকালে আরেক ব্যবসায়ী দল এসে এগুলোর দাম দশ হাজার দিরহাম বলল। তিনি শুধু একথা বলে তাদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করলেন না যে, গত রাতে আমি এগুলো পাঁচ হাজার দিরহামে বিক্রি করার ইচ্ছা করে ফেলেছিলাম।

এখন আমার নিয়ত ভঙ্গ করা পছন্দ করছি না। হযরত থানবী (র.) বলেন এ হচ্ছে অত্যন্ত সুক্ষ্ম তাকওয়া যা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

অপবাদ থেকে তাঁর আত্মরক্ষা

তিনি সর্ব প্রকার অপবাদ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন। তাঁর ছাত্র যমানায় একবার সামুদ্রিক ভ্রমণে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে তিনি জাহাজে আরোহণ করেন এবং সেখানে এক সফর সাথীও মিলে গেল। সে যে কোন উপায়ে ইমাম সাহেবের কাছে বিশ্বস্থ হয়ে গেল। তিনি তাঁর কাছে এই স্বর্ণ মুদ্রাগুলোর সন্ধান দিয়ে দিলেন।

সেই প্রতারক একদিন সকালে চিৎকারে করে বলতে লাগল হায়! আমার এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা হারিয়ে গেছে। তার এমন অস্থিরতা দেখে জাহাজের লোকেরা তল্লাশীর ব্যবস্থা করল। তিনি তা দেখে মুদ্রার থলেটি সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন। লোকেরা সকলের তল্লাশী নেওয়ার পর ইমাম সাহেবের তল্লাশী নিল। যখন কোথাও সন্ধান মিলল না তখন লোকেরা তাকে লজ্জা দিল। সমুদ্র ভ্রমণ শেষে যখন সকল জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন তখন প্রতারকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা

করল মুদ্রাগুলো কোথায় উধাও হয়ে গেল? তিনি বললেন সমুদ্রে ছেড়ে দিয়েছি। সে আবারো প্রশ্ন করল, এতগুলো মূল্যবান মুদ্রা হাতছাড়া করা আপনি কিভাবে সহ্য করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, অতিশয় মূল্যবান জীবন ব্যয় করে বিশ্বস্থতা নামক যে সম্পদ অর্জন করেছি তা তো কয়েকটি কড়ির জন্য প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি না।

বিনয় ও নম্রতা

জ্ঞান গরিমার ভারে আত্মঅহমিকায় আক্রান্ত হওয়া যেখানে স্বাভাবিক, ইমাম সাহেব এই রোগ থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর সর্বাঙ্গ ছিল বিনয়ে ভরা। এর অনেক কাহিনী রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি তুলে ধরছি।

১. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ সায়রফী বলেন, একদিন আমি তাঁর মজলিসে ছিলাম হঠাৎ তাঁর দাসী পার্শ দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে কালির দোওয়াতে পা লাগিয়ে পূর্ণ গালিচা লেপ্টে দিল। তিনি কিছু রাগত স্বরে বললেন,

-অন্য দিকে যেতে পার না?

-অন্য দিকে রাস্তা না পেয়েই তো এ দিকে এসেছি।

-যাও তোমাকে আযাদ করে দিলাম।

কেউ তখন প্রশ্ন করেছিল সে তো অসন্তুষ্টিই বাড়াচ্ছিল মাত্র?

-মনটাকে রাগ করার মজা বুঝিয়ে দিলাম, তার অসন্তুষ্টি দিয়ে নিজকে সন্তুষ্ট করে নিলাম।

২. অন্ধ মুহাদ্দিস আবু মা'শারকে একদিন বলেন,

-আমাকে ক্ষমা করে দাও।

- আমি আপনাকে ক্ষমা করার কি আছে?

- একদিন আপনি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে অস্বাভাবিকভাবে হাত ও মাথা নাড়ছিলেন, আমার হাসি এসে গিয়েছিল।

-হে ইমাম! আপনার সাথে কি কোন ধড় পাকড় আছে?

৩. একদিন তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন, একটা তীর লক্ষচ্যুত হয়ে একটা পুলে গিয়ে পড়ল। সাথে সাথে তিনি পুলের মালিকের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

৪. একদা বুখারা শহরের বাহিরে তিনি একটি মেহমান খানা নির্মাণ করাচ্ছিলেন। শ্রমিকদের সাথে তিনিও ইট বহনে অংশ নিয়েছিলেন। কোন ছাত্র প্রশ্ন করল আপনি কেন একাজে আসলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আসল কাজই তো হচ্ছে এটা। কিন্তু এ সকল বিষয় তিনি তখনই প্রকাশ করতেন যখন এই বিনয় তার

ইলমের মর্যাদা ক্ষুন্নের কারণ না হয়, নিজ আত্মসম্মান বোধের খেলাফ না হয়। নতুবা নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য কখনোই তিনি কারো কাছে মাথা নত করতেন না।

প্রসিদ্ধ কাহিনী: ইলমের মর্যাদা রক্ষায় তার ভূমিকা:

১. বুখারার শাসনকর্তা একবার তাঁর সন্তানদের কে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তালীম ও তরবীয়ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন জানালেন। তিনি উত্তরে বললেন-

العلم يؤتي إليه ولا ياتي إلى أحد

ইলমের কাছে যেতে হয়, ইলম কারো কাছে যায় না। তখন বাদশা বললেন, -তাহলে আমার সন্তানরা আপনার কাছেই যাবে। আপনি তাদের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবেন।

তিনি উত্তর দিলেন নবুওয়াতের মীরাস ব্যাপক, কারো জন্য সংকীর্ণ করা যাবে না।

২. এক ব্যক্তি তাঁর পঁচিশ হাজার মুদ্রা আত্মসাৎ করে ফেললে কেউ তাঁকে পরামর্শ দিল প্রশাসনকে অবহিত করুন। উত্তরে তিনি বললেন, আমার ব্যক্তি স্বার্থে প্রশাসনকে নাক গলানোর সুযোগ দেওয়া আমি আমার আত্মসম্মানবোধের বিপরীত মনে করি।

তাঁর অনাহার সহ বদান্যতা: তিনি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি অনেক পেয়েছিলেন। কিন্তু এগুলো নিয়ে তিনি কখনো সরাসরি ব্যবসায় নামেননি। বরং মুযারাবা(এক জনের পুজি অন্য জনের শ্রম) হিসেবে লভ্যাংশ বন্টনের ভিত্তিতেই কোন ব্যসায়ী কে পুজি দিতেন। লাভের যে অংশটা তিনি পেতেন তা নিজে ব্যবহার না করে অনাথদের মাঝে বন্টন করে দিতেন।

আল্লামা কিরমানীর ভাষ্যমতে তিনি অনাহারে কয়েকদিন কাটিয়ে দিতেন। কোন কোন সময় দুই তিনটি বাদাম খেয়েই দিন কাটিয়ে দিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি খাদ্যের সাথে তরকারী গ্রহণ করতেন না।

একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন ডাক্তার তাঁর মল পরীক্ষা করে বলল এই মল তো সন্ন্যাসীদের মলের মত মনে হয়, যারা খাদ্যের সাথে তরকারী গ্রহণ করেন না। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত একাধারে চল্লিশ বছর ধরে তরকারী গ্রহণ করছি না। চিকিৎসার সার্থে তরকারী গ্রহণ করার আবেদন করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বেশ পিড়াপিড়ীর পর খাদ্যের সাথে শুধু চিনি মিশাতে সম্মত হয়েছিলেন।

নিজ আমদানি থেকে প্রতিমাসে গরীব মিসকীন, ছাত্র ও মুহাদ্দিসীনের জন্য পাঁচশত দিরহাম ব্যয় করতেন। বুখারী শরীফের কপিকার মুহাম্মাদ বিন হাতিম বলেন, একবার তিনি কিছু দিনের জন্য ইমাম আদাম বিন আবি আয়াছের কাছে গিয়েছিলেন। অগত্যা তাঁর পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি ঘাস ও ঘাসের পাতা খেতে শুরু

করলেন। এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এক অপরিচিত আগন্তুক এসে একটা থলে দিয়ে গিয়েছিল যাতে অনেক গুলো স্বর্ণমুদ্রা ছিল।

এমনিভাবে হযরত হাফস ইবনুল আসকর বলেন, ইমাম বুখারী সহ আমরা কয়েক জন সাথী বসরার এক দরসে,হাদীসে হাদীস লিখছিলাম। হঠাৎ কয়েক দিন হয়ে গেল ইমাম বুখারী দরসে আসেন না। খোঁজ নিয়ে দেখলাম তাঁর পাথেয় শেষ হয়ে যাওয়ার পর গায়ের জামা বিক্রি করে অচল হয়ে বসে আছেন। আমরা ব্যতিত হলাম ভাবলাম যার সম্পত্তি অসহায়ের আশ্রয়স্থল তিনি আজ অসহায়। অবশেষে চাদা করে তার জন্য জামার ব্যবস্থা করলে তিনি ক্লাসে আসেন।

কুরআন তিলাওয়াত ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ

তিনি কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত বেশি ভালবাসতেন। অধিকাংশ সময় তিনি তিলাওয়াতে কাটিয়ে দিতেন। রমযান মাসে এর হার আরো বাড়িয়ে দিতেন।

প্রত্যেক রমযানে ৪১ খতম পড়তেন।

১. তারাবীহতে সকলের সাথে ১ খতম

২. ৩০ রাতে ১০ খতম।(প্রতি তিন রাতে ১ খতম)

৩. ৩০ দিনে ৩০ খতম।

মোট - ৪১ খতম।

এবাদতে এতটাই মনযোগী হতেন যে দুনিয়া কোন দিকে আসল গেল এর খবরই থাকত না।

বুখারী শরীফের টীকাকার বলেন এক বাগানে তার দাওয়াত ছিল। ফরজ নামায শেষে তিনি নফলে এমনভাবে নিমগ্ন হলেন যে, নমায শেষে বললেন, দেখতো আমার জামার নীচে কোন বিষাক্ত কীট থাকতে পারে!

জামা উঠিয়ে দেখাগেল যে তাঁর পিঠে ১৭ স্থানে ভিমরুল দংশন করে ফুলিয়ে দিয়েছে। কেউ তাঁকে প্রশ্ন করল আপনি প্রথম বারেই নামায ভেঙ্গে দিলেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন আমি এমন একটি প্রিয় সূরাহ পড়ছিলাম যার মধ্যখানে থেমে যাওয়া মেনে নিতে পারছিলাম না।

ইমাম বুখারী (র.)-এর ব্যাপারে তাঁর শিক্ষক ও সহকর্মীদের প্রশংসা বাণী

তাঁর গুণ বর্ণনায় এতই প্রশংসা বাণী ব্যক্ত হয়েছে যে সবগুলো একত্র করণ প্রায় অসম্ভব। সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলা যায় তার শায়খ ও উস্তাদগণ তাঁর প্রতি এতই

ভাল ধারণা পোষণ করতেন যে ইলমি মুনাযারায় তাঁকে বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত করতেন। স্বরচিত কিতাবগুলো সংশোধনের জন্য তাঁর কাছে দিতেন।

১. ইমাম আহমদ (র.) বলেন- ما أخرجت خراسان مثل محمد ابن إسماعيل

মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল-এর মতো কাউকে খোরাসান জন্ম দিতে পারেনি।

২. তাঁর সব চাইতে বড় উস্তাদ শেখ আলী ইবনুল মদীনী, যার ব্যাপারে তিনি নিজেই বলতেন আমি আলী ইবনুল মদীনীর কাছে নিজেকে যত ছোট মনে করতাম অন্য কারো কাছে এতটুকু ছোট মনে করতে পারতাম না। তিনি বলেন لم يرى البخاري مثل نفسه বুখারী তার তুলনা সে নিজেই।

৩. ইসহাক বিন রাহওয়াইহি বলেন-

يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه فإنه لوكان فى زمن الحسن البصري لإحتاج الناس إليه

হে হাদীসের ছাত্ররা এই যুবকের দিক মনোনিবেশ করো এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস লিখো, কারণ তিনি যদি হাসান বসরীর যুগেও জন্মগ্রহণ করতেন তবুও লোকেরা তাঁকে ছেড়ে বুখারীর শরণাপন্ন হতো। অথচ এই ইসহাক সাহেবের কাছ থেকেই ইমাম বুখারী (র.) ফিকহ শাস্ত্র অর্জন করেছেন এবং তাঁর ইঙ্গিতেই পবিত্র বুখারী শরীফ সংকলন করেছেন।

৪. তাঁর শায়খ আবু বকর বিন শায়বা ও মুহাম্মাদ বিন নমীর বলেন

ما رئينا مثله (আমরা তাঁর মত কেউ দেখিনি।)

৫. আলী বিন হাজার আসকালানী বলেন ما أعلم مثله (তাঁর মতো কেউ আছে বলে আমি জানি না।

৬. মাহমুদ বিন নযর শাফেঈ বলেন আমি বসরা, কুফা, সিরিয়া ভ্রমণ করেছি। ইমাম বুখারীর ব্যাপারে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি। সকলেই বলেছে

هو أعلم منا (তিনি আমাদের চাইতে বেশি জ্ঞানী)

৭. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান দাগুলী বলেন বাগদাদ বাসী তাঁর কাছে লিখেছিল

المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير ما تفتقد

(মুসলমানগণ কল্যাণে থাকবেন, যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে জীবিত থাকবেন এবং তাদের জন্য কোন কল্যাণ থাকবে না যখন তারা আপনাকে হারাবে)

৮. নুআইম বিন হাম্মাদ বলেন هو فقيه هذه الأمة (তিনি এই উম্মতের ধর্মীয় বিধান বিশেষজ্ঞ)

৯. কুতায়বা বিন সাঈদ বলেন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অনেক মনীষী আমার কাছে এসেছেন কিন্তু তার মতো কেউ আসেননি।

১০. রাবা বিন মারজা বলেন

هو آية من آيات الله تمشى على الأرض وفضله على العلماء وكفضل الرجال على النساء

তিনি হচ্ছেন ভুমিতে বিচরণকারী আল্লাহর নির্দেশাবলীর অন্যতম নিদর্শন। নারীর উপর পুরুষের যেমন প্রাধান্য, উলামাদের উপর তাঁর তেমনই প্রাধান্য।

১১. মুসা বিন হারুন বলেন-

لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن يطلبوامثل البخاري لماقدروا عليه

যদি মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে বুখারীর সমকক্ষ খোঁজেন তবুও পাবেন না।

১২. দারেমী ও ওয়াক্বেদী বলেন

هو أفقهنا وأعلمنا وأغوضنا وأكثرنا طلبا للحديث

তিনি আমাদের চেয়ে বেশী অনুধাবনকারী, জ্ঞানী, ও মনোনিবশকারী এবং হাদীস অন্বেষণে বেশি অগ্রগামী।

১৩. ইমাম মুসলিম একবার তাঁর কাছে এসে তার ললাটে চুমু খেয়ে বললেন-

دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأساتذة ويا سيد المحدثين وطبيب الحديث فى علله

হে উস্তাজুল আসাতিজা, মুহাদ্দিসীনদের সর্দার, ইলালে হাদীসের চিকিৎসক, আমাকে ছাড়ুন আমি আপনার পদযুগলে চুম্বন করব।

১৪. ইয়াহইয়া বায়কন্দী বলেন যদি আমার জীবন থেকে কিছু দিন বুখারীকে দেওয়া যেত তাহলে দিয়ে দিতাম।

১৫. মুহাম্মাদ বিন খুযাইমা (র.) বলেন

ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث امام محمد بن إسماعيل

আসমানের নীচে বুখারী (র.)র চাইতে বড় হাদীস বিশারদ নেই।

১৬. মুহাম্মাদ বিন বাশশার (র.) বলেন

قدم اليوم سيد الفقهاء

ফুকাহাদের সর্দার শুভাগমন করেছেন।

১৭. কুতায়বা বিন সাঈদ বলেন

جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رايت مثل البخاري هو في زمانه كعمر فى الصحابة

আমি ফুকাহা, যাহিদ, আবিদদের সাথে বৈঠক করেছি কিন্তু বুখারীর মত কাউকে দেখিনি, সাহাবার যুগে উমর যেমন ছিলেন, তাঁর যুগে তিনি তেমন ছিলেন।

এ সকল পূর্ণতা ও মর্যাদার কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে সালাম প্রেরণ করেছিলেন।

পবিত্র বুখারী শরীফের কপিকার ফিরাবরী বলেন, একদা আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, ইমাম বুখারীর কাছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তাঁকে আমার সালাম বলিও। (মুকাদ্দিমায়ে ফতহুল বারী)

কঠিন পরীক্ষা ও মৃত্যুর কারণ: ইমাম বুখারী কয়েকটি ফেৎনার সম্মুখিন হয়েছিলেন। যার কারণে তার কাছে পৃথিবীটা সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল এবং এই দুঃখ ও বেদনার কারণে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

প্রথম কারণ: খলকে কুরআন বা কুরআন সৃষ্ট নাকি সৃষ্ট নয় এই প্রশ্ন নিয়ে। এই মাসআলাটি একটি মাপকাঠিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত যাদের মধ্যে ইমাম আহমদ ও তাঁর সাথীরা ছিলেন তাঁরা বলতেন, কালামুল্লাহ সৃষ্ট নয়। দ্বিতীয় দল ছিল মু'তাযিলাদের। তারা বলত কালামুল্লাহ সৃষ্ট। তৃতীয় দলটি ছিল লফযিয়াদের। তাঁরা বলতেন কুরআনের যে শব্দ আমরা উচ্চারণ করি তা হচ্ছে সৃষ্ট। মুহাদ্দিসীনগণ এ ব্যাপারে কোন আপোষ মেনে নিতেন না। ইরাক, হেজায এবং খোরাসানে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, ইমাম বুখারী লফযিয়া দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হুসাইন বিন আলী কারাবিসী এ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেঈ থেকেও এই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। কিন্তু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পতাকাবাহীগণ কোন তাউইল ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে পছন্দ করেননি। যে কারণে ইমাম আহমদ (র.)-এর উপর মুসীবত এসেছিল। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী একটি ঘটনার সম্মুখীন হন। তিনি যখন নিশাপুর গমন করেছিলেন। সেখানে তাঁর উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া যুহলী অবস্থান করেছিলেন। তিনি সেখানকার শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর প্রচন্ড ইলমী প্রভাব ছিল। তিনিও ইমাম বুখারীকে প্রচুর সম্মান করতেন। তিনি

ঘোষণা করলেন যারা স্বাগতম জানাতে চাও তাঁরা আমার সাথে গমন করো। ফলে নজীর বিহীন বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হলো।

এদিকে যুহলী ছিলেন উঁচু শ্রেণীর লোক। প্রশাসনের সাথে তাঁর ছিল গভীর সম্পর্ক। আবার ইমাম বুখারী লফযিয়া দলের অন্তর্বর্তী হয়েছিলেন বলে অভিযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এ জন্য যুহলী চেয়েছিলেন লফযিয়া দলের ভিত্তি এখানে স্থাপিত না হয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পথ ও পন্থা ব্যতীত অন্য কোন মতবাদ এখানে প্রচলিত না হয়। এজন্য বুখারীকে সংবাদ পাঠালেন যে কেউ যদি খলকে কুরআনের ব্যাপারে তোমাকে প্রশ্ন করে তাহলে জবাব না দিয়ে নিরব থাকবে।

যুহলী যেহেতু ইমাম বুখারীর উস্তাদ ছিলেন তাই উস্তাদের সম্মান রক্ষার্থে নিরবে চললেন। কিন্তু মানব শয়তান সবখানে থাকে। কেউ তাঁকে খলকে কুরআনের ব্যাপারে প্রশ্ন করে বসল। তিনি উস্তাদের আদেশ পালনার্থে নীরবতা অবলম্বন করলেন। কিন্তু যখন ডান-বাম, সামন-পিছন থেকে গণপ্রশ্নের সম্মুখীন হলেন, এমতাবস্থায় একজন আলেম নীরবে বসে থাকা বাস্তবে কঠিন। তিনি বলেন-

كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ وَاَفْعَالُنَا مَخْلُوْقَةٌ وَقِرَائَتُنَا بِالْقرآن مِنْ اَفْعَالِنَا

আল্লাহর কালাম সৃষ্ট নয়, আমাদের কর্ম সৃষ্ট এবং আমাদের কুরআন তিলাওয়াত আমাদের কর্ম। ফলাফল এই দাড়াল কুরআনের যে, যে শব্দ আমরা উচ্চরণ করি তা সৃষ্ট। সুতরাং খবর ছড়িয়ে পড়ল ইমাম বুখারী লফযিয়া আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। এতদশ্রবণে ইমাম যুহলী ঘোষণা করলেন বুখারী এ শহরে আর থাকতে পারবে না।

প্রশাসন ও জনগণকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিশাপুর থেকে বের করে দেওয়া হলো।

দ্বিতীয় কারণ

বুখারার প্রশাসক খালিদ বিন আহমদ যুহলী একবার সংবাদ প্রেরণ করল যে, শাহী মহলে এসে আমার সন্তানদেরকে সহীহ বুখারী এবং তারীখে কবীর পড়াতে হবে। তিনি জবাবে বললেন, اَلْعِلْمُ يُؤْتَى اِلَيْهِ وَلَا يَأْتِىْ اِلى اَحَدٍ ইলমের কাছে আসতে হয়, ইলম কারো কাছে যায় না। আমি শাহী দরবারে এসে তোষামোদ কারীদের লিষ্টে নাম লিখাতে চাই না এবং ইলমে নবুওয়াতের মান ক্ষুণ্ন করতে চাই না।

তখন প্রশাসক দ্বিতীয়বার খবর পাঠাল যদি আপনি তাই চান তাহলে এমন বিশেষ কোন সময় নির্ধারণ করে দিন যাতে শুধু শাহজাদাগণই পড়বে অন্য কেউ অংশগ্রহণ করবে না। এতে আমার সন্তানদের বিশেষ মর্যাদা রক্ষা হবে। তদুত্তরে তিনি বললেন, ইলমে ওহী এবং মিরাসে নবুওয়াত সকলের জন্য উন্মুক্ত। এটা

কারো জন্য সীমাবদ্ধ নয়। যদি আপনার ছেলেদের পড়তেই হয় তবে সকলের সাথে বসে পড়তে হবে। আর যদি আপনি এটা পছন্দ না করেন তাহলে যেহেতু আপনি বাদশাহ জোর পূর্বক আমার দরস বন্ধ করে দিতে পারেন। এতে আমি আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করার সুযোগ পাব। এ উত্তরে প্রশাসক অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। তাকে অযথা অভিযুক্ত করে বুখারা থেকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র আঁটল। কিন্তু এতে সফল হওয়া তার জন্য সহজ ছিল না। কারণ ইমাম বুখারী পূর্ণ বুখারা এবং সমগ্র ইসলামী জাহানে অভুতপূর্ণ মর্যাদার ও প্রভাব বিস্তারকারী ইলমের অধিকারী ছিলেন। এজন্য প্রশাসক শুধু নিজে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। অতঃপর কিছু দুষ্ট আলেমের সহযোগিতা নিল। তাকে ধর্মীয় ও আকীদাগত বিষয়াদিতে অভিযুক্ত করল। খলকে কুরআন ও অন্যান্য মাসআলাগুলোর মাধ্যমে তার প্রতি জনরোষ সৃষ্টি করল। অত:পর তাঁর বিরুদ্ধে বহিস্কারের পরোয়ানা জারী করল। তখন তিনি চলে যেতে লাগলেন এবং এই বদদোয়া করে গিয়েছিলেন।

اَللّٰهُمَّ اَرِهِمْ مَا قَصَدُوْنِىْ بِهِ فِىْ اَنْفُسِهِمْ وَاَوْلَادِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ

ফলে কিছু দিনের মধ্যেই প্রশাসককে অপদস্থ করা হলো। তাকে গাধার উপর বসিয়ে প্রদক্ষিণ করিয়ে হেনস্থা করা হলো। যে সকল দুষ্ট আলেমরা ষড়যন্ত্র করেছিল চরম নিকৃষ্টতমভাবে তাদের মৃত্যু হল।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَادَى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

যে আমার ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। এ হাদীসের বস্তবতা প্রকাশ হলো। যখন ইমাম বুখারী বুখারা থেকে চলে যাচ্ছিলেন তখন বায়কন্দবাসী তাঁকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ করলেন। তিনি যাত্রা শুরুও করেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে শুনতে পেলেন দুশমনেরা তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলো দূর দূরান্তের শহরগুলো এমনকি বায়কান্দ পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। সেখানের লোকেরাও ইমামের আগমনের ব্যাপারে দু শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদল তাঁর আগমন প্রত্যাশী ছিল আর একদল তাঁর আগমন প্রতিহত করতে সচেষ্ট ছিল।

এমতাবস্থায় তিনি সেখানে গমন পছন্দ করেননি। ইত্যবসরে সমরকন্দবাসী তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন, তিনি দাওয়াত গ্রহণ করে যাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু সমরকন্দ থেকে তিন ফরসখ দুরে খরতং নামক স্থানে পৌছার পর তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং সেখানেই অবস্থান করলেন। অসুস্থ অবস্থায় সমরকন্দ পৌছার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেখান থেকেও জানতে পারলেন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো বুখারা, বয়কন্দ অতিক্রম করে সমরকন্দ পর্যন্ত এসে পৌছে গেছে। সেখানের লোকেরাও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।

তাঁর ইন্তেকাল

তাই তিনি তাহাজ্জুদের নামাযে এই দোয়া পড়লেন-

اللّٰهُمَّ ضاقت علی الأرض بما رحبت فاقبضني اليك غير مفتون

আল্লাহ আমার জন্য বিশাল পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমাকে বিভ্রান্তির পূর্বেই আপনার কাছে নিয়ে নিন। এ সময় সমরকন্দবাসী ঘটনার বাস্তবতা যাচাইয়ের পর তাঁর আগমনে একমত পোষণ করল। তিনি বাহনের ব্যবস্থা করলেন। মোজা পরিধান করলেন পাগড়ী বাঁধলেন এবং দু'জনের কাঁধে ভর করে বাহনের দিকে চলতে শুরু করলেন। কয়েক কদম চলার পরই দুর্বল হয়ে গেলেন। বললেন আমাকে ছেড়ে দাও। কয়েকটি দোয়া পড়লেন শনিবার ইদুল ফিতরের রাত ২৫৬ হিজরী ১৩ দিন কম ৬২ বছর বয়সে ইলমে হাদীসের এ সূর্য অস্তগামী হন।

إنا لله وإنا إليه راجعون

১লা শাওয়াল বাদ জোহর খরতং নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

তাঁর কবরের মাটির বরকত

দাফনের পর কবর থেকে মেশকে আম্বরের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা কবর থেকে মাটি নিতে লাগল। তাঁর হেফাজতের জন্য কবরের চতুর্পাশে দেয়াল দেওয়া হল। তবুও লোকেরা সুঘ্রাণে বিমোহিত হয়ে কবরের মাটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নিজ নিজ দেহে মাখতে শুরু করল। প্রত্যেকের উদ্দেশ্যও পূরণ হতে লাগল। এভাবে কবরের মাটি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। ইমাম বুখারীর পরিবার পুনরায় মাটি ভরতে ভরতে অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে স্থানীয় উলামায়ে কেরাম বুখারী শরীফের খতমকে ওসীলা করে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তাঁর কবরের মাটির বরকত তাঁর কিতাবে দিয়ে দাও যাতে তাঁর পরিবারের লোকদের পরিশ্রমও লাঘব হয় এবং কিতাবের বরকতও বিশ্ববাসির জন্য ব্যাপক হয়। দোয়া কবুল হওয়ার ফলে দেখা গেল মাটিতে আর আগের সুঘ্রাণ নেই, তদুপরি মাটি ব্যবহারে আর কাজ হচ্ছেনা বরং কিতাব খতম করে দোয়া করলে কবুল হয়।

খতীব আব্দুল ওয়াহীদ বিন আদাম বলেন একদা ঈদুল ফিতরের রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম কোন এক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাসহ কার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হুজুর কার জন্য অপেক্ষা করছেন? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারীর জন্য অপেক্ষায় আছি। তাঁর সংবর্ধনার জন্য অপেক্ষা করছি। অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে, রাত যতটার সময় তিনি এই স্বপ্ন দেখেছিলেন ঐ রাতে ঐ সময়েই ইমাম বুখারীর ইন্তেকাল হয়েছিল।

তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী

(১) আল আদাবুল মুফরাদ (২) কাযায়াস সাহাবা ও তাবেঈন (৩) আত তারীখুল কাবীর (৪) আততারীখুল আওসত্ব (৫) আততারীখুস সগীর, (৬) আল জামিউল কাবীর, (৭) আল মাসনাদুল কাবীর (৮) কিতাবুযযুয়াফা আস সগীর (৯) কিতাবুল মাবসূত (১০) বীররুল

ওয়ালীদাইন (১১) কিতাবুল আসরিবা (১২) কিতাবুল হিবা, (১৩) কিতাবুল ইলাল (১৪) আসামিস সাহাবা (১৫) কিতুবল ফাওয়াইদ (১৬) আল জামিউস সগীর (১৭) কিতাবুল রেক্বাক্ব (১৮) কিতাবুল কুনা (১৯) আত তাফসীরুল কবীর। (২০) জুযউল কিরাআতি খালফাল ইমাম (২১) রফউল ইয়াদাইন ফিসসালাত (২২) খুলুক আফআলিল ইবাদ।

ইমাম মুসলিম (র.)

নাম: মুসলিম

উপনাম: আবুল হুসাইন

উপাধি: আসাকিরুদ্দীন

নসব: মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মুসলিম বিন ওয়ারদ বিন কারসাদ আল কুসায়রী আন নিশাপুরী।

জন্ম: তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে ভিন্নমত পাওয়া যায়। এক মতানুসারে ২০৪ হিজরী রজব মাসের শেষের দিকে বাদ জুমআ তাঁর জন্ম হয়। আরেক মতানুসারে ২০২ হিজরী। আবদুল্লাহ নিশাপুরী, হাকীম, ইবনুল আছির এর মতানুসারে ২০৬ হিজরী।

মৃত্যু: ২৫ রজব ২৬১ অথবা ২৫৯ হিজরী। রোববার দিনে নিশাপুর শহরে। সোমবারে নিশাপুর শহরের বাহিরে নসিরাবাদে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইলম অন্বেষনের জন্য ভ্রমণ

আল্লামা যাহাবী বলেন তিনি ২১৮ হিজরী থেকেই হাদীস শ্রবণের মহান কাজ শুরু করেন। এজন্য ইরাক, হেজায, সিরিয়া, মিশর, বাগদাদ ভ্রমণ করে সেখানকার বড় বড় মুহাদ্দিসীনের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। তখনকার খুরাসান ও নিশাপুরে ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়ায়ে এবং ইমাম যুহলীর মতো হাদীস বিশারদগণ অবস্থান করেছিলেন।

তাঁর উস্তাদবৃন্দ

১। ইসহাক বিন রাহওয়াইহি ২। ইমাম জুহলী ৩। ইমাম বুখারী

তাঁর ছাত্র বৃন্দ

১। ইমাম তিরিমিযী, ২। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল। ৩। আবু হাতীম রাযী। ৪। আবু বকর বিন হুযায়মা তাঁর ছাত্র ছিলেন।

তাঁর স্বভাব চরিত্র

তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারী ছিলেন। পবিত্রমনা, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সারা জীবন কারো গীবত করেননি। কাউকে প্রহার করেননি। এমনকি কাউকে গালি পর্যন্ত

দেননি। উস্তাদ ও শায়খদেরকে সীমাহীন ভক্তি করতেন। ইমাম বুখারী যখন নিশাপুরে হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন তখন সেখানকার অন্যান্য দরসগুলো এমনকি তাঁর উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন যুহলীর দারসও প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল। তখন সকলেই এমনকি ইমাম যুহলী পর্যন্ত ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দারসে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন-

الأمن وافق البخاري فى مسئلة خلق القرآن فليقم من درسي

সাবধান! খলকে কুরআনের মাসআলায় যারা ইমাম বুখারীর অনুসারী তারা আমার দারস থেকে সরে যাও। তখন ইমাম মুসলিম (র.) তৎক্ষণাৎ দারস থেকে উঠে গিয়েছিলেন। এবং তাঁর কাছ থেকে শ্রুত হাদীসের পান্ডুলিপি ফেরত দিয়ে তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনায় সম্পূর্ণ বিরত থাকেন।

তাঁর মৃত্যুর কারণ হাদীস অন্বেষণ

তিনি পূর্ণ জীবন হাদীস অন্বেষণে কাটিয়েছেন। এমনকি একটি হাদীসের অণ্বেষণ এমনভাবেই নিমগ্ন হয়েছিলেন যে, হাদীসটি খুঁজছেন আর কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছেন এমন সময় পেটে ক্ষুধা পেয়ে বসল। পাশেই খেজুর বা আঙ্গুরের খাঁচা রাখা ছিল। সেখানে থেকে পৃষ্ঠা উল্টানোর ফাঁকে ফাঁকে একটা করে মুখে পুরতে লাগলেন। এদিকে খাঁচা শূন্য হয়ে গেল, কিন্তু হাদীস অণ্বেষণের ধ্যানে থাকার কারণে সেটা অনুভবই করতে পারেননি এবং এই অধিক ভক্ষণই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

তাঁর গ্রন্থাবলী

১। আল মুসনাদুল কাবীর ২। কিতাবুল ইলাল ৩। কিতাবুল উহদান ৪। কিতাবুল আসমা ওয়ালকুনা ৫। কিতাবুত তমীয ৬। কিতাবু আউহামিল মুহাদ্দিসীন ৭। জামে' কাবীর ৮। সহীহ মুসলিম।

ইমাম নাসায়ী (র.)

নাম: আহমদ

উপনাম: আবু আবদির রহমান

নছব: আহমদ বিন শুআইব বিন আলী বিন বাহার বিন সিনান বিন দীনার আন নাসাঈ

জন্ম: ২১৪/২১৫ হিজরী খুরাসানের নাসা শহর।

বয়স: ৮৮ বছর

মৃত্যু: ১৩ সফর সোমবার ৩০৩ হিজরী মক্কা অথবা ফিলিস্তীনে।

ইলম অন্বেষনে ভ্রমণ

প্রাথমিক শিক্ষা নিজ শহরের মাশায়েখগণের কাছ থেকে গ্রহণ করে ১৫ বছর বয়সে বলখে কুতায়বা বিন সাঈদ বাগলানীর কাছে যান। সেখানে ১৪ মাস অবস্থানের পর বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র সফর করেন।

তাঁর উস্তাদ বৃন্দ

১। ইসহাক বিন রাহওয়াইহ ২। ইমাম আবু দাউদ ৩। মুহাম্মাদ বিন নসর বিন বাশ্বার। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানীর ভাষ্যমতে ইমাম বুখারীও তাঁর উস্তাদ ছিলেন।

তাঁর ছাত্র

১। তাঁর সাহেবজাদা আব্দুল করীম ২। আবু বকর বিন আহমদ বিন সুন্নি ৩। আবু আলী সুয়ূতী ৪। আলী বিন আবু জাফর ত্বাহাবী

তাঁর আকৃতি

তিনি সুউচ্চ অবয়ব, প্রশস্থ চেহারা ও ফর্সা রংগের ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তার সৌন্দর্যে কোন ভাটা পড়েনি।

তাঁর স্বভাব চরিত্র

খোদাভীতি ও পরহেজগারীতে তিনি যুগের অনন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। আজীবন সওমে দাউদে (একদিন পরপর রোযায়) অভ্যস্থ ছিলেন। তথাপিও তার বিবাহ বন্ধনে ৪জন স্বাধীন স্ত্রী ও কয়েকজন বাদী ছিলেন। মোরগের গোশত তাঁর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল। তিনি বীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। জেহাদের অদম্য স্পৃহা ছিল তাঁর অন্তর জুড়ে। মিশরের বাদশাহর সাথে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। ঘন ঘন

হজ্ব করতেন। আজীবন সুন্নতে নববীর উপর অটল ছিলেন। বিদআতকে প্রচন্ড ঘৃণা করতেন।

তাঁর মৃত্যুর বাহ্যিক কারণ

শেষ বয়সে হজ্বের জন্য বের হয়ে যখন দামেস্ক শহরে পৌঁছেন তখন দেখলেন তথাকার বহু লোক হযরত আলী রা. উপর মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাই তাদের ধারণা সংশোধনের লক্ষ্যে খাসাইসে আলী নামে হযরত আলী রা.-এর গুণাবলী সম্বলিত একখানা কিতাব রচনা করেন। বুস্তানুল মুহাদ্দিসীনের ভাষ্যমতে তিনি কিতাবখানা দামেশকের জামে মসজিদে জনসম্মুখে পড়তে লাগলেন। অল্প কিছু পড়তেই একজন লোক তাঁকে প্রশ্ন করল আপনি আমিরুল

মুমিনীন হযরত মুআবিয়া রা.-এর গুণাবলী সম্বলিত কোন গ্রন্থ রচনা করেছেন কি?

জবাবে তিনি বলেন তাঁর জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তিনি সোজা মুক্তি পেয়ে যাবেন। কারো কারো মতে জবাবে একথাও বলেছিলেন, তাঁর ব্যাপারে হাদীস لااشبع الله بطنه ছাড়া কোন সহীহ হাদীস আমার জানা নেই। একথা বলার সাথে লোকেরা শিয়া শিয়া বলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রচন্ড প্রহার ও অন্ডকোষে অস্বাভাবিক আঘাতের ফলে তিনি মরণাপন্ন হয়ে যান। তাঁর খাদিম তাঁকে উঠিয়ে ঘরে আনলেন। তিনি খাদিমকে নির্দেশ দিলেন আমাকে মক্কায় নিয়ে চল। যাতে আমার মত্যু মক্কায় অথবা মক্কার রাস্তায় হয়। মক্কায় পৌছার পর কারো কারো মতে মক্কার পথে ফিলিস্তীনের রামাল্লা নামক স্থানে তাঁর ইন্তেকাল হয়। ইন্নালিল্লাহি...।

তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী

১। আসসনানুল কুবরা ২। কিতাবুযযুয়াফা ওয়াল মাতরুকীন ৩। কিতাবুল জুমআ ৪। আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ ৫। কিতাবুল মুদাল্লিসীন ৬। মাসনাদে আলী ৭। খাসাইসে আলী ৮। কিতাবুল আসমাউ ওয়াল কুনা ৯। আসসুনানুস সুগরা যার অপর নাম আল মুজতাবা। যা বর্তমানে সুনানে নাসাঈ নামে প্রসিদ্ধ।

ইমাম আবু দাউদ (র.)

নাম: সুলায়মান

উপনাম: আবু দাউদ

নসব: সুলায়মান বিন আসআস বিন ইসহাক বিন বশীর বিন সাদ্দান বিন আমর বিন ইমরান আল আযদী সিজিস্তানী

জন্ম: ২০২ হিজরী

বয়স: ৭৩ বছর

মৃত্যু: ২৭৫ হিজরী ১৬ই শাওয়াল শুক্রবার, বসরায় সুফিয়ান সওরীর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইলমান্বেষণে ভ্রমণ: তিনি তাঁর জীবনের বড় অংশ বাগদাদে কাটান। ইলমান্বেষণের জন্য তিনি হেজায, মিশর, খুরাসান, বসরা, সিরিয়া, আরব উপদ্বীপে বিশেষত সফর করেন। তখন প্রসিদ্ধ উস্তাদ ও মুহাদ্দিসীনের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন।

তাঁর উস্তাদ

১। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), ২। ইয়াহইয়া ইবন মাঈন, ৩। কা'নাবীসহ তার প্রায় ৩শত উস্তাদ ছিলেন।

তাঁর ছাত্র: তাঁর ছাত্রদের সঠিক সংখ্যা বলা মুশকিল। তাঁর দরসের হালকায় হাজারও ছাত্রের ঢল নামত।

১। ইমাম তিরমিযী ২। ইমাম নাসায়ী তাঁর ছাত্র ছিলেন ৩। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) (হাদীসে আতিরা) তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন।

তাঁর গুণাবলী: হাদীস বিষয়ে তাঁর সীমাহীন পান্ডিত্য ছিল। তখনতার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইব্রাহীম হাযনী যখন সুনানে আবু দাউদ দেখেছিলেন তখন বলেছিলেন হযরত দাউদ আ.-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা লোহাকে যেভাবে নরম করে দিয়েছিলেন তদ্রুপ আবু দাউদের জন্য হাদীস শাস্ত্রকে সহজ করে দিয়েছেন। অন্যান্য সিহাহ সিত্তার ইমামদের তুলনায় তাঁর ফিকহী অভিজ্ঞতা বেশী ছিল। আল্লামা শেখ আবু ইসহাক সিরাজী তবকাতুল ফুকাহায় একমাত্র তাঁর নামই উল্লেখ করেছেন। যার ফলাফল এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে তিনি তাঁর সুনানে আবু দাউদে শুধু ঐ সকল হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যেগুলি ফিকাহ বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর কিতাবে উল্লেখিত ফেকহী হাদীসের ভান্ডারের মতো সিহাহ সিত্তার অন্য কিতাবে নেই।

তাঁর ব্যাপারে সমবয়স্কদের প্রশংসাবাণী

১. হাফিয মুসা ইবনে হারুন বলেন-

خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة وما رأيت أعلم بالحديث منه

ইমাম আবু দাউদকে দুনিয়ায় হাদীসের জন্য এবং পরকালে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি তাঁর চেয়ে হাদীস বিষয়ে অগ্রগণ্য কাউকে দেখিনি।

২. ইমাম হাকীম বলেন, ইমাম আবু দাউদ নিঃসন্দেহে তাঁর সময়কার মুহাদ্দিসীনের ইমাম ছিলেন।

৩. আরিফ বিল্লাহ সহল তুসতুরী একদিন ইমাম আবু দাউদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইমাম আবু দাউদের জিহ্বা বের করার জন্য আবেদন করেন। আবেদন মঞ্জুর হলে তিনি তার জিহবায় চুমু খান।

৪. ইবনু মুনযির বলেন, মা'লুল হাদীস থেকে সাবিত হাদীসগুলো, ভুল হাদীস থেকে সঠিক হাদীসগুলো যারা পৃথক করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ৪ জন। ১। ইমাম বুখারী ২। ইমাম মুসলিম ৩. ইমাম আবু দাউদ ৪। ইমাম নাসায়ী। ৫. ইমাম ইব্রাহীম হারবী (র.) আবু দাউদ শরীফ দেখে বলেছিলেন

الين لأبي داؤدالحديث كما الين لدؤدعليه السلام الحديد

হযরত দাউদ আ.-এর জন্য যেভাবে লোহাকে নরম করে দেওয়া হয়েছিল, ইমাম আবু দাউদ (র.)এর জন্য সেভাবে হাদীসকে সহজ করে দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী

তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে ১। আলমারাসিল ২। আররদ আলাল কদরীয়া ৩। ফাযাইলুল আনসার। ৪। মুসনদে মালিক বিন আনাস। ৫। আল মাসাইল, ৬। আননাসিখু ওয়াল মানসুখ ৭। মা তাফাররাদা বিহি আহলুল আমসার ৮। মা'রিফাতুল আওক্বাত ৯। কিতাবু বাদইল ওহী ১০। সুনানে আবী দাউদ।

ইমাম তিরমিযী (র.)

নাম: মুহাম্মাদ

উপনাম: আবু ইসহাক

নসব: মুহাম্মাদ বিন ঈসা ইবনে সাওরা বিন মুসা বিন যাহহাদ আসসালমী আল বুগী আত্‌তিরমিযী

জন্ম: ২০৯/২১০ হিজরী

বয়স: ৬৬/৭০

মৃত্যু: ২৭৫/২৭৯ হিজরী, ১৩ রজব, সোমবার রাতে তিরমিয শহরে।

ইলমান্বেষণের জন্য ভ্রমণ

শৈশবেই তিনি ইলমে হাদীস অর্জনের লালায়িত ছিলেন। যে কারণে ইলমে হাদীস অর্জনের

জন্য তিনি বসরা, কুফা, ওয়াসিত, রায়, খুরাসান এবং হেজাযে অনেক বছর কাটিয়েছেন এবং এই শাস্ত্রের অভিজ্ঞ শায়খদের কাছ থেকে উপকৃত হয়েছেন।

তাঁর উস্তাদ

১। ইমাম বুখারী ২। ইমাম মুসলিম ৩। আলী বিন হাজার মারুযী ৪। হান্নাদ বিন সারী ৫। কুতায়বা বিন সায়িদ ৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্বার শুধু যে সকল শায়খদের কাছ থেকে তিনি তিরমিযী শরীফে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্যা ১৯৪ জন। তন্মধ্যে ৪১ জন বাগদাদের, যদিও ইমাম বুখারী তাঁর উস্তাদ ছিলেন তথাপি আবয়াবুল মানাক্বিবের একখানা হাদীস

يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك

এর ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী স্বয়ং বলেন

وقد سمع محمد بن اسماعيل بخاري مني هذا الحديث

অনুরূপভাবে আবয়াবুত তাফসীরে সূরাতুল হাশরে

একটি হাদীস

حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن عن هارون

এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন এই হাদীসটিও বুখারী আমার কাছ থেকে শুনেছেন।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম বুখারীর ইন্তেকালের পর সমগ্র খুরাসানে ইমাম তিরমিযীর সমকক্ষ কোন মুহাদ্দিস ছিলেন না। ফলে তিনিই ছিলেন সর্বস্তরের জনগণের আশ্রয়স্থল। খুরাসান, তুর্কিস্থান ছাড়াও ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইলম পিপাসুগণ তাঁর কাছে এসে তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। যাদের মধ্যে উল্লোখযোগ্য হচ্ছেন- ১। আবু হামিদ আহমদ বিন আব্দুল্লাহ মারুযী ২। হায়সাম বিন কুলায়ব শাশী ৩। আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন আহমদ মারুযী।

তাঁর স্মরণ শক্তি তাঁর স্মরণ শক্তি এতই প্রখর ছিল যে, তিনি সুদীর্ঘ কোন হাদীস মাত্র একবার শুনেই মুখস্থ বলতে পারতেন। শুধু তাই নয় দীর্ঘদিন পর্যন্ত হুবহু স্মরণ রাখতে পারতেন।

তাঁর খোদাভীতি: তার খোদাভীতি এতই প্রবল ছিল যে, সার্বক্ষণিক তিনি ক্রন্দনরত থাকতেন। যার ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর গ্রন্থাবলী

১। আশশামাইল ২। আল ইলালুস সুগরা ওয়াল কুবরা ৩। আল মুফরাদ ৪। আযযুহদ ৫। আল আসমা ওয়াল কুনা ৬। কিতাবুত তারীখ ৭। জামে' তিরমিযী।

ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)

নাম: মুহাম্মাদ

উপনাম: আবু আব্দুল্লাহ (প্রসিদ্ধ ইবনে মাজাহ)

নসব: মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ আররীবঈ আল কাযউইনি

জন্ম: ২০৯ হি.

বয়স: ৬৪ বছর

মৃত্যু: ২২ রামাযান সোমবার ২৭৩ হি.

ইলমান্বেষণের জন্য ভ্রমণ

তিনি তাঁর জীবনের প্রাথমিক ২২ বছর কাযউইন শহরেই বিদ্যার্জনের জন্য কাটিয়ে দেন। এখানের উলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে ইলমে হাদীসের বিরাট ভান্ডার আয়ত্ব করার পর এ শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জনের জন্য ইসলামী বিশ্বে ভ্রমণ শুরু করেন। ঐতিহাসিকদের ভাষ্যমতে তিনি হাদীস অণ্বেষণে মক্কা, মদীনা, ইরাকের কুফা, বাগদাদ, সিরিয়ার দামেস্ক, মিশর, রায়, ওয়াসিত ভ্রমণ করেন।

তাঁর উস্তাদ বৃন্দ

১। আবু মুসআব আহমদ বিন আবু বকর যুহরী ২। আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন মুনযির ৩। হাফিজ আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ৫। আবু সাদ আব্দুল্লাহ আল আসাজ ৬। আবু আলী হাসান বিন মুদরীক ৭। আব্বাস আম্বরী ৮। আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন ইব্রাহীম বিন নিকরী ৯। আবু জাফর বগবী ১০। আহমদ বিন হিব্বান ওয়াছিতী ১১। আবু ইয়াকুব ইসহাক বিন ওহাব।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। ১। আলী বিন সাঈদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আসকরী ২। ইব্রাহীম বিন দীনার হামদানী ৩। আহমদ বিন ইব্রাহীম কাযউইনী ৪। আহমদ বিন রাওহ শা'রানী।

তাঁর ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনের মূল্যায়ন

হাদীস শাস্ত্রে তার পান্ডিত্য, প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি, হাদীস মুখস্থ করণ এবং বিশ্বস্ততা সকল মুহাদ্দিসীন অকপটে স্বীকার করেন। সকল যুগের ঐতিহাসিকগণ তাঁর এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলীকে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১। আবু ইয়ালা খলিলী লিখেন ইবনে মাজাহ অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রমাণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হাদীস এবং হিফজে হাদীসে তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসীম।

২। হাফিজ ইবনে জাওযী, আল্লামা যাহাবী এবং ইবনে খাল্লিকান ও অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয়ে তাঁর প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন।

ইমাম মালিক (র.)

নাম: মালিক

উপনাম: আবু আব্দুল্লাহ

উপাধি: ইমামু দরিল হিজরাহ ও ইমামুল মদীনা

নসব: মালিক বিন আনাস বিন মালিক বিন আবি আমির বিন আমর বিন হারিছ বিন গায়মান

বিন খাসীল আল আসবাহী। তিনি ইয়ামানী বংশদ্ভোত ছিলেন। সর্বপ্রথম তাঁর দাদা আবু আমির ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। তারপর দাদা হারিস এর উপাধি ছিল যু আসবাহ। এজন্য তাঁকে আসবাহী বলা হত।

জন্ম: ৯৩/৯৪/৯৫ হিজরীতে মদীনায়। তিনি দুই/তিন বছর মায়ের পেটে ছিলেন।

বয়স: ৮৬ বছর

মৃত্যু: ১১ রবিউল আউয়াল ১৫৯ হিজরী

কবর: জান্নাতুল বাকীতে।

তাঁর আকার আকৃতি

তিনি সুউচ্চ দেহী, প্রশস্ত চেহারা, বড় শরীর, হলুদ মিশ্রিত সাদা রংয়ের ছিলেন। মাথা কিছুটা বড় ছিল। উচু নাক, প্রসস্থ ললাট, ঘন ও বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। গোফের যে অংশ টোটের সাথে মিলিত থাকত তা কেটে ফেলতেন। গোফ মুন্ডানোকে তিনি মাকরূহ মনে করতেন।

তাঁর শিক্ষা জীবন তাঁর মেধা অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি নিজেই বলতেন আমি যা মুখস্থ করে ফেলতাম তা জীবনেও ভুলতাম না। তিনি কুরআন শরীফের ক্বেরাতের সনদ মদীনার ইমাম নাফে বিন আব্দুর রহমানের কাছ থেকে অর্জন করেন। প্রাথমিকভাবে তিনি ইলমান্বেষনে অসামান্য আগ্রহী ছিলেন। দারিদ্রতার কারণে ঘরের ছাদের কাঠ খুলে খুলে বিক্রি করে কিতাব ক্রয় করতেন, আল্লাহর ফজলে পরবর্তীতে ধনভান্ডারের দরজা এমনভাবে খুলে গেল যে, তখনকার অত্যন্ত মূল্যবান আদনী উত্তম উত্তম পোষাক ব্যবহার করতেন। তিনি অধিকাংশ সময়

সাদা পোষাক ব্যবহার করতেন, আতর ব্যবহার করতেন। আল্লামা যুরকানী তাঁর উস্তাদদের সংখ্যা নয়শত বা এর চেয়েও বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। নাফে মাওলা ইবনে ওমর ছিলেন তাঁর খাস উস্তাদ।

তাঁর অধ্যাপনা

তিনি ১৭ বছর বয়সেই দারসে হাদীসে মসনদে সমাসীন হন। প্রায় ৬২ বছর ধারাবাহিকভাবে পাঠদান ও ফাতাওয়া প্রদানে মগ্ন ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত ইবনে উমরের পর তাঁর ইলমী সিংহাসনের স্থলাভিষিক্ত হন হযরত নাফে'। তাঁর পর ইমাম মালিক (র.)।

হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

তিনি হাদীসের প্রতি সীমাহীন ভক্তি প্রকাশ করতেন। দারস শুরুর আগে ওযু গোসল সেরে নিতেন। অতঃপর ভাবগম্ভীরতার সাথে আসনে সমাসীন হতেন। তাঁর দরস রুম সর্বদা দামি দামি বিছানা ও গালিচা দ্বারা সুসজ্জিত থাকত এবং এই পরিমাণ শ্রদ্ধাবোধ বিরাজ করত যে কেউ হল্লা চিৎকার করবে দূরের কথা উচ্চ আওয়াজে কথা বলারই সাহস পেত না। হাদীসে নববীর সম্মানার্থে ক্লাস চালাকালীন সময়ে দাড়ী কাপড়, নড়া-চড়া করা এদিক সেদিক তাকানো থেকে সম্পূর্ণ রুপে বিরত থাকতেন।

তাঁর ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (র.) বলেন, আমরা একদিন দারসে ছিলাম এমন সময় একটা বিচ্ছু তাকে ১০ বার দংশন করল, প্রতিবারই তাঁর চেহারার রং হলুদ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর কথায় কোন ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়নি, এবং তিনি দারসও বন্ধ করেননি। যথা সময়ে দারস শেষে যখন সকলে চলে গেলে তখন আমি তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে বলেন, এটা আমার স্বভাবজাত ধৈর্য নয়, বরং হাদীসে নববীর সম্মানার্থে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছি।

তাঁর ছাত্র

আল্লামা যাহাবী বলেন তাঁর ছাত্র সংখ্যার সীমা নেই। কেউ কেউ বলেন, এক হাজার তিন শত এর চাইতেও বেশি। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

১। ইমাম মুহাম্মাদ (র.) ২। ইমাম শাফেঈ (র.) ৩। সুফিয়ান সওরী (র.) ৪। ইবনে মুবারক (র.) ৫। ইবনে উয়াইনা ৬। ইবনে মাহদী। কোন কোন সময় তাঁর শায়খগণও তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন যেমন- ১। আবু আইয়ুব সিজিসতানী ২। রবীআতুর রায় ৩। যুহরী ৪। ইবনে জুরাইজ।

ইমাম মুহাম্মাদ (র.)

নাম: মুহাম্মাদ

উপনাম: আবু আব্দুল্লাহ

নসব: মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন ফারক্বাদ আশশায়বানী আল কুফী

জন্ম: ১৩২/১৩৫ হিজরী স্থান: ইরাকের ওয়াসীত্বে

বয়স: ৫৪ বছর

মৃত্যু: ১৮৯ হিজরী,

স্থান: রায় শহর

পূর্ব পুরুষদের আবাস: তাঁর পিতা হাসান সিরিয়ার খুরিস্তা/জাযযা নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন। সেখান থেকে হিজরত করে ইরাকের ওয়াসিত্ব নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। এখানে থাকাবস্থায় মুহাম্মাদ (র.) জন্মগ্রহণ করেন।

অতঃপর সেখান থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হন।

তাঁর ছাত্র জীবন

কৈশোরেই ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে একাধারে চার বছর পর্যন্ত ইলমান্বেষণে মগ্ন ছিলেন। এছাড়াও কুফার বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফুকাহাদের সান্নিধ্য অর্জন করেন।

তাঁর উস্তাদ

১। ইমাম আবু হানিফা (র.) ২। মিসআর বিন কুদ্দাম ৩। সুফিয়ান সওরী ৪। আওযাঈ ৫। উমর বিন দীনার ৬। মালিক বিন আনাস

তাঁর ব্যক্তিত্ব

ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর দরবারে দীর্ঘ তিন বছর যাবত ইলমে হাদীস অর্জন করেন। যৌবনের সুচনা থেকেই তাঁর যশ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তৎকালীন উলামায়ে কেরাম এক বাক্যে তাঁকে ফকীহ, মুফাসসির, সাহিত্যিক শায়খুল হাদীস, অভিধান পারদর্শী, যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কাযী নিযুক্ত করেন এবং তাকে যথাসম্ভব নিজের কাছে রাখতেন।

তাঁর দারস দান

মাত্র বিশ বৎসর বয়সে অধ্যাপনা শুরু করেন। হাজারো জ্ঞান পিপাসু তাঁর বক্তব্যে তৃপ্ত হতো। কুফায় মুওয়াত্তার দরসদান কালে ছাত্রদের আধিক্যের কারণে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যেতো।

তাঁর ছাত্র বৃন্দ

তাঁর ছাত্র সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, এর সঠিক হিসাব কেউ মিলাতে পারবে না। এর মধ্যে ধর্মীয় বড় বড় পন্ডিতও ছিলেন। যেমন- (১) ইমাম শাফেঈ (র.) (২) আবু হাফস কবীর (র.) (৩) আহমদ বিন হাফ আজলী (র.) (যিনি ইমাম বুখারী (র.)'র উস্তাদ ছিলেন)। (৪) আবু সুলায়মান মুসা কাওয়াজানী (র.) (সিহাহ সিত্তার প্রচারক) (৫) আলী বিন মা'বাদ (র.) (সিহাহ সিত্তার মুসান্নিফদের উস্তাদ।) (৬) আসাদ ইবনুল ফুরাত (র.)।

তাঁর স্বভাব চরিত্র

তিনি নিয়মিত ৮ঘণ্টা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। রাতে এক তৃতীয়াংশে দারস দান এক তৃতীয়াংশে নাময এক তৃতীয়াংশে ঘুমানো তার দৈনিক রুটিন। স্বল্প ঘুমের ব্যাপারে কাউকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন 'মুসলমানদের চক্ষুগুলো যখন আমাদের উপর ভরসা করে ঘুমিয়ে গেছে তখন আমরা কিভাবে ঘুমাতে পারি?' তিনি ছিলেন উদার হৃদয়ের দানবীর প্রকৃতির লোক। বিশেষ করে ছাত্রদেরকে অকাতরে দান করতেন। ইবনুল ফুরাত, ইমাম শাফেঈ (র.)সহ কিছু ছাত্রদের পূর্ণাঙ্গ আর্থিক সহযোগিতা তো তিনিই করতেন। স্বয়ং ইমাম শাফেঈ (র.)-এর ভাষ্য হচ্ছে 'ইলম এবং পার্থিব উপকরণ দানের বেলায় আমার উপর ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর চাইতে বড় এহসানকারী নেই।

তাঁর গ্রন্থাবলী

তাঁর লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার হবে বলে বর্ণিত আছে। তিনি তাঁর কক্ষে কিতাবের স্তুপের মধ্যে বসে কিতাব লিখতেন। দশজন লোক শুধু কিতাব সরানোর কাজে নিয়োজিত ছিল। হানাফী মাযহাবে বুনিয়াদী গ্রন্থ বলে স্বীকৃত তাঁর লিখিত কিতবগুলো হচ্ছে (১) মাবসূত যাকে আসলও বলা হয়। এতে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর সংগৃহীত মাসায়েলগুলো প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেন। এটি তাঁর রচিত প্রথম কিতাব।

২। جامع صغير এতে তিনি আবু ইউসুফ (র.)-এর বরাতে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ৫৩২টি ফতোয়া সংকলন করেন।

৩। جامع كبير এতে ইমাম আবু হানীফা (র.), আবু ইউসুফ (র.) ও যুফার (র.) ইমামত্রয়ের ফাতাওয়া উসুল ও দলীল সহকারে সংগ্রহ করেন।

৪। الزيادات এতে জামে' সগীর লিখার পর যে সকল শাখাগত মাসআলা তাঁর স্মরণে আসত তা লিখতেন।

৫। السير الصغير

৬। السير الكبير ইতিহাস বিষয়ক ৬০ খন্ড। এ কিতাব লিখার পর খলীফা হারুনুর রশীদ-এর দরবারে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলে খলীফা অবগত হয়ে তাঁর শাহজাদাদেরকে অভ্যর্থনার জন্য পাঠালেন এবং ইমাম সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে সনদ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য ইমাম মুহাম্মাদ (র.) লিখিত উক্ত ছয় কিতাবের মাসআলাগুলোকে ফিক্বাহ শাস্ত্রের কিতাবগুলোতে ظاهرالروايات যাহিরুর রিওয়ায়াত বলা হয়।

৭। كتاب الحج কিতাবুল হজ্জ এতে হাদীস, আসার, মদীনা বাসীর ভাষ্য ও যুক্তির নিরিখে হানাফী মযাহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন।

৮। مؤطأ محمد ইহা হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব। মালিক (র.)-এর অন্যান্য মুয়াত্তার তুলনায় ইলম ও বিষয়ের আলোকে উচ্চস্তরের কিতাব। এতে মারফু, মাওকুফ, মুসনাদ, মুরসাল, হাদীসের সংখ্যা ১১৮৫। তার মধ্যে ১০০৫ ইমাম মালিক (র.) থেকে ১৮০ অন্য মাধ্যম থেকে পেয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে ১৩, আবু ইউসুফ থেকে ৪, অন্যান্যদের থেকে অবশিষ্ট বর্ণনা করেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র.) কর্তৃক

মুয়াত্তা মালিকে উল্লোখযোগ্য সংখ্যাক হাদীস, আসার, মাসায়েল সংযোজনের কারণে ইহাকে মুয়াত্তা মুহাম্মাদ নাম করণ করা হয়।

ইমাম ত্বাহাবী (র.)

নাম: আহমাদ

উপনাম: আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সালামা বিন সালিম আযদী, হুজরী, মিশরী, ত্বাহাবী।

ইয়ামানের আয্‌দ্ গোত্রের হুজর শাখার সাথে বংশীয় সম্পর্ক থাকায় তাঁকে আযদী হুজরী বলা হতো। মিশর বিজয়ের পর তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ইয়ামান থেকে হিজরত করে মিশরে স্থানান্তরিত হন। এজন্য তাকে মিশরী বলা হয়। মিশরের উঁচু অঞ্চল 'ত্বাহা'র বাসিন্দা হওয়ায় তাঁকে তাহাবী বলা হত। মু'জামুল বুলদান গ্রন্থকারের ভাষ্যমতে তিনি ত্বাহার বাসিন্দা ছিলেন না বরং নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র বসতি তুহত্বুত্বীর বাসিন্দা ছিলেন। এ হিসাবে তাকে তুহত্বুত্বী ডাকা তাঁর অপছন্দ হওয়ায় নিকটতম গ্রাম 'ত্বাহা'র দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে তাঁকে ত্বাহাবী বলা হতো।

জন্ম: তাঁর জন্ম সনের ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

(ক) ২২৯ হিজরী - আইনী, লৌক্ষ্ণোভী, ইবনে কাসীর, ইবনে নুকতার মতে।

(খ) ২৩৮ হিজরী - দশম রবিউল আউয়াল রবিবার রাত।

(গ) ২৩৯ হিজরী - যাহাবী, সুয়ূতী, ইবনে আসাকির, ইবনে হাজারসহ জমহুর মুতাক্বাদ্দিমীন, জিবনী লেখক ও ঐতিহাসিকগণের মতে। এ মতটি অগ্রগণ্য। কারণ ইমাম ত্বাহাবী (র.)-এর ইন্তেকাল সকল ঐতিহাসিকের ঐক্যমতে **৩২১** হিজরীতে হয়েছিল। তাঁর বয়স ৮২ বছর হলে হিসাব অনুযায়ী তাঁর জন্ম তৃতীয় মতের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

ইন্তেকাল: ৩২১ হিজরী **১**লা জ্বিলক্বাদ বৃহস্পতিবার চাঁদনী রাতে। মুতাবেক ৯৩৪ খৃস্টাব্দ।

বয়স: ৮২ বছর।

তাঁর মাযার ইমাম শাফেঈ (র.) এর মাযারের সামনে মিশরের প্রসিদ্ধ কবরস্থান কারাফাহ এ তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মাযারে সর্বস্তরের মানব মন্ডলীর যাতায়াত আজও অব্যাহত।

ইলমান্বেষণ: তিনি প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর মামা আবু ইব্রাহীম ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া মযনীর কাছ থেকে পান। মাত্র **১৩** বৎসর বয়সে মযনীর কাছ থেকে মাসনাদে শাফেঈর দরস গ্রহণ করেন। এছাড়াও মিশরের অন্যান্য মুহাদ্দিসীন যেমন তাঁর পিতা মুহাম্মাদ বিন সুলামার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। এমন কি মিশরে আগমনকারী সকল মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইলম অর্জনের পর ৩০ বছর বয়সে ইসলামী বিশ্বে ইলমী সফর করেন। সিরিয়ার ফিলিস্তীন, বায়তুল মুকাদ্দাস, গাজা, আসকালান সফর ছিল এরই অংশ। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের প্রধান বিচাপতি আবু খাযিম আব্দুল হামিদ হানাফী এবং মিশরের প্রদান বিচারপতি আবু জাফর আহমদ বিন আবি ইমরান হানাফী (মৃত ২২৮ হি.) এর কাছ থেকে ফিকহে হানাফী গ্রহণ করেন। মোটকথা তিনি সুদীর্ঘ বিশ বছর যাবত ইলমান্বেষণে নিমগ্ন থেকে মাসাইলের ব্যাখ্যা ও দালাইলের বিশ্লেষণে যুগের অনন্য ইমামে পরিণত হন।

মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমাম কর্তৃক তাঁর প্রশংসা বাণী

১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (র.) বলেন একথা নিশ্চিত যে ইমাম তাহাবী ছিলেন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমসহ অন্যান্য সিহাহ সিত্তার ইমামদের মতো হাদীসের পন্ডিত অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব। (নুখাবুল আফকার)

২. আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ূত্বী শাফেঈ (র.) বলেন তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত অভিজ্ঞ ফকীহ তাঁর পর তাঁর শূন্যতা কেউ পূরণ করতে পরেননি। (হুসনুল মুহাযারাহ ফি আখবারি মিশরি ওয়াল কাহেরাহ)

৩. আল্লামা ইবনে আব্দুলবার মালিকী (র.) বলেন, তিনি আরব্য গোত্রীয় ইতিহাসও ঐতিহ্য সম্পর্কে সমসাময়ীকদের তুলনায় অধিক জ্ঞাত ছিলেন।

৪. আল্লামা ইবনে ইমাদ হাম্বলী (র.) বলেন তিনি হানাফীদের বিশ্বস্ত, অভিজ্ঞ শায়খ, একই সাথে ইলমে ফিকহ ও ইলমে হাদীস, উভয়ের উপর সমান দক্ষতার অধিকারী। (শাজারাতুযযাহাব)

এছাড়াও হাফিয যাহাবী, ইবনে আসাকির, আল্লামা সামআনী, আবু ইসহাক সিরাজী, আল্লামা ইয়াফেঈসহ অসংখ্য উলামায়ে কেরাম তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। যেমন

আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী বলেন, ইমাম দারে কুতনী, বাইহাক্বী, খতীব বাগদাদী ইমামত্রয় মিলে ইমাম তাহাবীর সাথে ইলমে হাদীসে সমপাল্লার হতে পারেন কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতায় ইমাম তাহাবীর পাল্লাই ভারী হবে।

তাঁর উস্তাদবর্গ

তিনি প্রায় **১৪২**জন উস্তাদ থেকে ইলম অর্জন করেন। যারা মিশরী, বসরী, কুফী, হেজাযী, শামী, ইয়ামানী, পশ্চিমা সর্ব দেশ ও অঞ্চলের ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১০ জন হচ্ছেন- ১. তাঁর পিতা মুহাম্মাদ বিন সুলামা তাহাবী ২. ইসমাইল বিন ইয়াহইয়া মযনী শাফেঈ ৩. আবু খাযিম আব্দুল হামিদ হানাফী ৪. আবু জাফর আহমদ বিন আবি ইমরান হানাফী ৫. আহমদ বিন শুআইব নাসাই ৬. ইব্রাহীম বিন আবিদাউদ ৭. জুরাইয বরলেসী ৮. ইব্রাহীম বিন

মারযুক বসরী ৯. ক্বারী বাক্কার বিন কুতায়বা ১০. সুলায়মান কায়সানী প্রমুখ।

তাঁর ছাত্র বৃন্দ

তাঁর ইলমী পান্ডিত্য তাঁকে ছাত্রদের আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছিল। ফলে ছাত্র সংখ্যার সঠিক হিসাব মিলানো কঠিন, উল্লোখযোগ্য ১০ জনের নাম নিম্নে দেয়া হলো-

১. আবুল হাসান আলী বনি আহমাদ ত্বাহাবী (তাঁর সাহেবজাদা)

২. সাহেবে মু'জাম সুলায়মান বিন আহমদ তারবানী

৩. ক্বাযী ইবনে আবিল আওয়াম

৪. আহমাদ বিন কাসিম বাগদাদী

৫. আহমদ বিন মুহাম্মাদ দামগানী

৬. হাসান বিন কাসিম মিশরী

৭. হুসাইন বিন আহমদ সুমাখী

৮. ক্বাযী আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ তামীমী

৯. হিশাম বিন মুহাম্মাদ (তাহাবী শরীফের রাউই)

১০. মাসলামা বিন কাসিম

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি

তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে তার লিখিত কিতাবের সংখ্যা প্রায় ৮০ খানা। নিম্নে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলো-

১। আহকামুল কুরআন (২০ খন্ড) ২। এখতেলাফুল উলামা ৩। তারীখে কবীর ৪। রদ্দ আলা আবী উবাইদ ৫। সুনানে শাফেই ৬। শরহে জামে কবীর ৭। শরহে জামে সগীর ৮। শরহে মাআনিল আছার (ত্বাহাবী শরীফ) ইহা হানাফী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ দলীল সম্বলিত কিতাব, এতে এখতেলাফী মাসাইলগুলির প্রমাণাদি পেশ করে হানাফী মাযহাবকে ঐশী ও যৌক্তিক দলীলাদির মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও অগ্রগণ্য করা হয়েছে। ৯। শরহে মুগনী ১০। শরুতে কবীর ১১। আওসত্ব সগীর ১২। আক্বীদাতুতাহাবী ১৩। কিতাবুন ফিন্নাহল ১৪। কিতাবুল ফরাইজ ১৫। কিতাবুল ক্বিরান ১৬। কিতাবুল ওয়াসায়া ১৭। মুখতাসারুত্বাহাবী। ১৮। রয়ানুমুশকালির আছার ১৯। মানাক্বিবে আবী হানিফা ২০। নক্বযু কিতাবিল মুদাল্লিসীন ২১। নাওয়াদিরে ফিকহিয়্যা।

তাঁর মাযহাব পরিবর্তনের পাঁচ কারণ

১। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের ভাষ্যমতে- মুহাম্মাদ বিন আহমদ শুরতী একদিন ত্বাহাবীকে প্রশ্ন করলেন, আপনি স্বীয় মামা ও উস্তাদ মযনীর সমর্থিত মাযহাব 'শাফেঈ মাযহাব' ত্যাগ করে এর বিপরীতে হানাফী মাযহাব কেন গ্রহণ করলেন? জবাবে ত্বাহাবী বললেন, আমার মামা ও উস্তাদ মযনী শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ সময় তিনি হানাফী মাযহাবের কিতাবাদী (যেমন জামে' কবীর, জামে' সগীর ইত্যাদি) মুতালাআ করতে দেখতাম। আমিও ঐ সকল কিতাব মুতালার প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। এ সকল কিতাবের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা আমাকে হানাফী মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে। (ওয়াফিয়্যাতুল আ-ইয়ান ২/৫৩) যেহেতু এই কারণটি স্বয়ং ত্বাহাবী নিজে বর্ণনা করেছেন তাই এটিই হবে যুক্তিসঙ্গত আসল কারণ, অন্যান্যগুলো হবে সহায়ক মাত্র।

২। শাফেঈ মাযহাবের উপর লিখিত ইমাম মযনীর একখানা কিতাবের জবাবে তাঁর আরেক উস্তাদ কাজী বাক্কার বিন তুতায়বা (র.) এমন প্রমাণ্য, বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিসংগত কিতাব রচনা করেছেন যা অধ্যায়ন করে ইমাম ত্বাহাবীর কাছে

শাফেঈ মাযহাবের দালীলিক শক্তিশূন্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে বিবেকে তাড়ানায় তিনি এক উস্তাদের মাযহাব ত্যাগ করে অন্য

উস্তাদের মাযহাব গ্রহণ করেন

৩। ইমাম ত্বাহাবী (র.) প্রখর মেধাবী ও বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তদুপরি হানাফী মাযহাবের কিতাবাদি অধিক অধ্যায়ন ছিল সোনার উপর সোহাগার শামিল। ফলে মযনীর দারসে বসে হানাফীদের পক্ষ থেকে শাফেঈদের উপর আনীত প্রশ্নগুলি মযনীর কাছে পেশ করতেন। মযনী এ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক ও তৃপ্তিদায়ক জবাব দিতে পারতেন না। এতে হানাফী মাযহাবের গভীরতা ও শাফেঈ মাযহাবের স্থুলতা তার কাছে প্রকাশ হতে থাকে। এক সময় অমিমাংশিত প্রশ্নগুলির জবাবে অতৃপ্তি ও সঠিক ইলমান্বেষণের এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে মযনীর দারস ত্যাগ করে ইবনে আবী ইমরান হানাফীর দরসে অংশ গ্রহণ করেন এবং হানাফী মযাহাব গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে ছাত্র উস্তাদের বিতর্ক বাহাসে মযনী ভীষণ চটেও যেতেন গতানুগতিকভবে। একদিনতো উত্তেজিত হয়ে বলেই ফেললেন

والله لاجاء منك شيئ আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে কোন কাজ হবে না। এই ঘটনার পর ত্বাহাবী যখন مختصرالمزني এর নমুনায় স্বীয় গ্রন্থ

مختصر الطحاوي রচনা করেন তখন মযনীর কসমের জবাবটা এভাবে দিয়েছিলেন

رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيا لكفر عن يمينه

আল্লাহ আবু ইব্রাহিম মযনীকে রহম করুন যদি আজ তিনি জীবিত থাকতেন, তাহলে অবশ্যই তাঁকে তাঁর কসমের কাফফারা দিতে হতো। (কারণ مختصر الطحاوي এর মতো একখানা কিতাব লেখার কাজ তো তাঁর দ্বারা হয়েছে।)

৪। তার দুই বিশেষ উস্তাদ-এর একজন সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের প্রধান বিচারপতি আবু খাযিম আব্দুল হামীদ হানাফী যিনি ঈসা বিন আবানের মাধ্যমে ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর ছাত্র ছিলেন।

আরেকজন মিশরের প্রধান বিচারপতি আবু জাফর আহমদ বিন আবী ইমরান হানাফী যিনি মুহাম্মাদ বিন সিমাআ-এর মাধ্যমে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর ছাত্র ছিলেন। হানাফী মাযহাবে অসামান্য পান্ডিত্যের অধিকারী এই দুই উস্তাদের জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দিয়ে ত্বাহাবী তাঁর হৃদয়ে হানাফী শীতলতা নিয়ে ভেসে উঠেন।

তৃপ্তি সহকারে মিটিয়ে নেয় তাঁর জ্ঞান তৃষ্ণা, ধুয়ে মুছে সাফ করে নেন অন্যান্য মাযহাব থেকে পাওয়া সকল সন্দেহ সংশয়। তাই অন্তরে অনুভব করেন একরাশ প্রাপ্তির শান্ত্বনা, ৩৩ বছর বয়সে ঘোষণা করেন হানাফী মাযহাব গ্রহণের কথা।

৫। রসিকতার ছলে আল্লামা আব্দুল আজিজ পাহারোউই বলেন, ইমাম ত্বাহাবী একদিন শাফেই মাযহাবের এক কিতাবে দেখেন, যদি কোন গর্ভবর্তী মহিলার মৃত্যু হয় আর তার পেটের সন্তান জীবিত থাকে তাহলে ঐ জীবিত সন্তানকে মায়ের পেট চিরে বের করা হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবেই বৈধ নয়। স্বয়ং তাহাবীকেই যেহেতু মৃত মায়ের পেট চিরে বের করা হয়েছে তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন لا أرضي لمذهب رجل ترضي بهلاكي যার মাযহাব আমার ধ্বংস ডেকে আনে আমি তা মেনে চলতে পারি না। অতঃপর শাফেঈ মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। (নিবরাসঃ ১১০) শুধু কি গ্রহণই করেছেন? বরং স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে বুঝে শুনে কট্টর হানাফীতে পরিণত হয়েছেন। যেমন তার ছাত্র মাসলামা বিন কাসিম উন্দুলুসী বলেন

وكان يذهب مذهب أبي حنيفة وكان شديد العصبية فيه

তিনি আবু হানিফা (র.) এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং তিনি এতে কঠোর পন্থাই অবলম্বন করতেন। আর কেনইবা করবেন না কারণ সুশীতল ছায়ার পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তি তো সেই অনুভব করবে প্রখর রৌদ্রের খড়তাপ যাকে দহন করেছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযহাব পরিবর্তন

সাধারণ অনুসারী, যার শরয়ী বিধান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা নেই, শুধু আত্মপূজারী হিসাবে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এমনটি করা অবৈধ ও প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। ইহ ও পরজগতে শাস্তিযোগ্য হবে।

পক্ষান্তরে যার মুজতাহিদ পর্যায়ের যোগ্যতা তাঁর অন্তর্চক্ষু খুলে দিয়েছে। কোন মাযহাবের অগ্রহণযোগ্যতা হৃদয়ে আসন নিয়ে ফেলেছে, এমন ব্যক্তির জন্য বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি ও স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের নির্মল পথ অবলম্বনের লক্ষ্যে মাযহাব পরিবর্তন শুধু বৈধই নয় বরং সত্য ও বাস্তবতার সন্ধানে নিজস্ব গন্ডি ও আপনজন ছাড়ার কষ্ট স্বীকার করে ভিন্ন মতাদর্শ গ্রহণ করার সাহসিকতা তাঁর নিয়তের বিশুদ্ধতারই প্রমাণ বহন করে। ফলে এমন ব্যক্তি প্রতিদান ও প্রশংসার যোগ্য। যেমন শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) হানাফী মাযহাব ত্যাগ করে হাম্বলী মাযহাব গ্রহণ করেছিলেন।

ফুকাহাদের স্তরে ইমাম ত্বাহাবীর স্থান

ফুকাহাদের প্রসিদ্ধ স্তর সাতটি

১ম স্তর : সাহেবে মাযহাব মুজতাহিদ ফিশশর' বা মুতলাক যেমন চার প্রসিদ্ধ ইমাম ১. ইমাম আবু হানিফা (র.), ২. ইমাম শাফেঈ (র.), ৩. ইমাম মালিক (র.), ৪. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)। যারা কারো অনুসরণ ছাড়াই নিজেই সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে সুত্র বের করে ঐ সুত্রের মাধ্যমে মাসআলা-মাসাইল, আইন-বিধান চয়ন করার যোগ্যতা রাখেন। মুজতাহিদ ফিশশার' আবার দু ধরনের-

১. متبوع যাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক অনুসারী আছেন। যেমন চার প্রসিদ্ধ ইমাম। ১. ইমাম আবু হানিফা (র.), ২. ইমাম শাফেঈ (র.), ৩. ইমাম মালিক (র.), ৪. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)।

২. غير متبوع যাদের উল্লেখযোগ্য অনুসারী নেই। যেমন- ইমাম বুখারী (র.), মুসলিম (র.), আবু দাউদ (র.), ইসহাক বিন রাহওয়াইহ (র.)।

২য় স্তরঃ মুজতাহিদ ফিলমাযহাব যেমন ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম মুহাম্মাদ (র.) অর্থাৎ যারা মুজতাহিদে মুতলাক কর্তৃক নির্ধারিত সূত্রের অধীনে থেকে সূত্রের অনুকূলে কুরআন হাদীস থেকে মাসাইল চয়ন করার ব্যাপারে স্বাধীন কোন কোন মাসাইলে মুজতাহিদে মুতলাকের সাথে দ্বিমতও পোষণ করতে পারেন। সূত্রে দ্বিমত করতে পারেন না।

৩য় স্তরঃ মুজতাহিদ ফিল মাসাইল যেমন খাসসাফ, কারখী হালওয়ানী, সুরুখসী, বগউই, কাযীখান, তাহাউই। অর্থাৎ সূত্র ও মাসাইল কোনটাতেই সাহেবে মাযহাবের বিরোধিতা করতে পারেন না তবে যে সকল বিষয়ে সাহেবে মাযহাব থেকে মাসআলা বর্ণিত হয়নি সূত্রের আলোকে সেগুলো বর্ণনা করতে পারেন মাত্র।

৪র্থ স্তরঃ আসহাবে তাখরীজ যেমন আহমদ আলী রাযী প্রসিদ্ধ জাসসাস, অর্থাৎ যারা সূত্র ও মাসাইল কিছুই বের করতে পারেন না। এমনকি যে মাসআলা সাহেবে মাযহাব থেকে বর্ণিত হয়নি সেটাও না। বরং তাদের কাছ থেকে বর্ণিত যে সংক্ষিপ্ত কথায় একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে ব্যাখার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য অর্থটা বের করেন। যেমন হেদায়ার বিভিন্ন স্থানে আছে

كذا في تخريج الرازي - كذا في تخريج الكرخي

৫ম স্তরঃ আসহাবে তারজীহ কুদুরী, সাহেবে হেদায়া, যারা সাহেবে মাযহাব থেকে বর্ণিত স্পষ্ট একাধিক রেওয়াত মধ্য থেকে কোন একটিকে

هذا أولى. هذا أصح رواية. هذا أوضح. هذا أوفق للقياس- هذا أرفق للناس

ইত্যাদি বাক্যের মাধমে প্রাধান্য দেন।

৬ষ্ঠ স্তরঃ আসহাবে তামীয তাঁরা হচ্ছেন ফিকহ শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য মতন রচনাকারীগণ। যেমন সাহেবে কান্‌য, সাহেবে দুররুল মুখতার, সাহেবে বেকায়া, সাহেবে মাজমা, অর্থাৎ যারা

ضعيف، قوى، أقوى (দুর্বল, শক্তিশালীর অধিক শক্তিশালী)

ظاهر الرواية- غير ظاهر الرواية (রিওয়াতগুলোর মধ্যে পার্থক্য করে দুর্বল ও গায়রে জাহির রিওয়াত ত্যাগ করে শুধু শক্তিশালী, অধিক শক্তিশালী -قوي -أقوى

ظاهر الرواية রিওয়াতগুলো স্বীয় কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন।

৭ম স্তরঃ মুকাল্লিদীনের। যেমন বর্তমান সময়ের মুফতি-ফিকহবিদগণ, অর্থাৎ যারা শুধু পূর্বে উল্লেখিত ব্যক্তি বর্গের চয়নকৃত বিধিবিধান নিজ নিজ মুতালাআয় যেমন পাচ্ছেন তেমনই অনুসরণ করে চলবেন, চালাবেন। কোন প্রকার সংযোজন বিয়োজনের অধিকার তাঁদের নেই।

উল্লেখ্য, এখানে ১ম ও ২য় স্তরের মধ্যবর্তী অপ্রসিদ্ধ একটি স্তর রয়েছে, যাকে মুজতাহিদে মুনতাসাব বলা হয়। অর্থাৎ যারা যদিও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের থেকে কোন একজন প্রসিদ্ধ ইমামে ইজতেহাদের পক্ষে, দলীল পেশ বরার রীতি নীতি অবলম্বন করার কারণে প্রসিদ্ধ ইমামের দিকে তাঁকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, তথাপিও ইজতেহাদের শর্ত, গুণ, সরঞ্জামের অধিকারী হওয়ার কারণে কোন কোন বিষয়ে মাসাইল এমনকি সূত্রে ও সাহেবে মাযহাবে অকাট্য দালাইলের ভিত্তিতে অন্যান্য ইমামদের বিরোধিতা করতে পারেন।

উল্লেখিত স্তর সমূহে ইমাম ত্বাহাবীর স্থানঃ এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি রয়েছে-

১. তাঁর স্তর ৩য় অর্থাৎ মুজতাহিদ ফীল মাসাইলে, যেমনটি বলেছেন মোল্লা আলী ক্বারী (র.) আব্দুল হাই লৌক্ষউই (র.), আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (র.).।

২. তাঁর স্তর ২য় অর্থাৎ মুজতাহিদ ফীল মাযহাব এ যেমনটি বলেছেন আল্লমা আব্দুল হক লৌক্ষভী (র.)।

৩। তাঁর স্তর ২য় স্তরের উপর ১ম স্তরের নীচে অর্থাৎ মুজতাহিদে মুনতাসাব এ যেমনটি বলেছেন শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)।

ত্বাহাবীর চরিত্র থেকে শিক্ষণীয় কাহিনীঃ ক্বাযী আবু উবাইদ। তৎকালীন সময়ের জেলা প্রশাসক। প্রত্যহ বিকেলে একজন প্রাজ্ঞ আলেমের সাথে তাঁর বৈঠক হতো। এজন্য সাপ্তাহিক রুটিন করা ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় একদিন ইমাম ত্বহাবীর সাথে বৈঠক হয়। আলোচনার ফাঁকে তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পেশ করলেন এবং তাদেরকে বিচারের সম্মুখিন করার অনুরোধ জানালেন। জবাবে কাযী বললেন ইসমাইল বিন ইসহাক তো এটা করেন না।

আমি কিভাবে করি?

ত্বাহাবীঃ ক্বাযী বাক্কারতো এটা করতেন।

কাযীঃ তবুও এই ঝামেলা কাঁধে নিতে চাই না।

ত্বাহাবীঃ তবে তো আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঝামেলা কাধে নিয়েছেন। বনী সুলাইম ও বনী যবইয়ান গোত্রদ্বয়ের যাকাত উসূলের জন্য আব্দুল্লাহ বিন লুতাবিয়্যাহকে নিযুক্ত করেছিলেন। একদা তিনি যাকাত বহির্ভুত কিছু ব্যক্তিগত হাদিয়া তুহফাও নিয়ে এসে বললেন, এগুলো যাকাতের আর ঐ গুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। নবীজী মিম্বরে আরোহণ করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে-এর কড়া সমালোচনা করে বলেন, যে সকল কর্মকর্তা এসে বলে যে এগুলো আমাকে দেওয়া হয়েছে তাঁরা কেন তাদের মায়ের ঘরে বসে থাকে না? দেখুক এখানে কেউ হাদিয়া নিয়ে আসে কি না?

দু'কান চার কান হয়ে এ আলোচনা কর্মকর্তাদেরও কর্ণ গোচর হলো। এরই সূত্র ধরে কাযী ও ত্বাহাবীর মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকলে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের কারসাজিতে এ দূরত্ব সংঘাতে রূপ নিল। ইত্যবসরে রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে কাযী আবী উবাইদের বরখাস্তের ঘোষণাপত্র এসে গেল। দ্বিতীয় কাযী শত্রু বধে তৃপ্তির হাসিতে অংশীদার করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা পত্রটি ত্বাহাবীর নিকট প্রেরণ করল। ত্বাহাবীর সাহেবজাদা আলীর ভাষ্য 'আমি আবু উবাইদের বরখাস্থে আনন্দিত হয়ে আব্বাজানকে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম, আল্লাহর শোকর তিনি আপনার শত্রু নিপাত করেছেন। এতে আব্বাজান আফসোসের সুরে বলতে লাগলেন, তোমার ধ্বংস হোক। এতে আনন্দের কি আছে। আমি তো নীতির বিরোধী ছিলাম, নেতার নয়। সুতরাং নেতার পরিবর্তনে আমার খুশি হওয়ার কিছু নেই বরং অপেক্ষা করো দেখ নীতির পরিবর্তন হয় কি না?

শিক্ষা: এক. প্রশাসনের সাথে বিরোধিতা হলে জাতীয় স্বার্থে হবে। ব্যক্তি স্বার্থে নয়। দুই. আবু মনসুর মিশরের আমীর ত্বাহাবীর দরবারে উপস্থিত। ত্বাহাবীর প্রতি আমীরের দৃষ্টি পড়তেই

এক পাহাড় শ্রদ্ধা তাঁকে নুইয়ে দিল। তাঁর হৃদয় মনে ত্বাহাবীর প্রভাব জেঁকে বসল অত্যন্ত ভক্তি সহকারে সাক্ষাৎ করে তিনটি আবেদন করলেন।

আমীর: মহামান্য ইমাম, আমার মন চায় আমার কলিজার টুকরা মেয়েটিকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেই।

ত্বাহাবী: আমার প্রয়োজন নেই।

আমীর: আপনার আর্থিক কোন প্রয়োজন আছে?

তাহাবী: না।

আমীর: আপনার নামে কিছু জমি বরাদ্দ দিয়ে দেই!

তহাবী: না।

আমীর: আপনার কোন দাবী আছে কি?

তাহাবী: আপনি সেটা পূরণ করবেন?

আমীর: অবশ্যই।

ত্বাহাবী: জুলুম বন্ধ করে দিন। রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহারের সতর্ক হোন। মৃত্যুর পূর্বে নিজের মুক্তির আমলে মগ্ন হোন।

শিক্ষা: ত্বাহাবী (র.) চরিত্রের এ দিকটি হচ্ছে শিক্ষণীয় যে, তিনি আমীরের কাছে শশুর জামাতার সম্পর্ক, আর্থিক উপঢৌকন ও জমিদারীর প্রস্তাব প্রত্যখ্যান করে হিতোপদেশ গ্রহণের জাতীয় দাবীটাই বেছে নিলেন। ফলে মিশরীরা প্রত্যক্ষ করেছে ত্বাহাবীর সাথে আমীরের উক্ত বৈঠকের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শাসনের পার্থক্য কতটুকু।

অন্যান্য ইমাম ও হাদীস গ্রন্থকারগণ

ইমাম শাফেঈ (র.)

নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস বিন আব্বাস আল কারশী, আশশাফেঈ। তাঁর বংশ পরম্পরা নবীজীর দাদা আব্দুল মুত্তালিব পর্যন্ত পৌছে। ১৫০ হিজরীতে গাজা/ইয়ামান / আসকালান /মদীনায় মায়ের পেটে দুই বছর অবস্থান করে ইমাম আবুহানিফা (র.) এর

ইন্তেকালের দিন জন্ম গ্রহণ করেন। ৭ বছর বয়সে কুরআন শরীফ ও মুওয়াত্তা মালিক মুখস্থ করেন। এর পর ইলমান্বেষণের জন্য ইসলামী বিশ্ব সফর করেন। ১৫

বছর বয়সে ফতওয়া প্রদানের ইজাযত প্রাপ্ত হন। শরীয়তের মৌলিক বিষয়ে ১৪খানা কিতাব রচনা করেছিলেন এবং শাখাগত বিষয়ে রচনা করেছিলেন আরো বেশি। বড় কবি ও রিক্ত হস্ত ছিলেন। ২০২/২০৪ হিজরীতে মিশরে ইন্তেকাল করেন , মিশরেই তাঁকে দাফন করা হয়।

মিশকাতুল মাসাবীহ –এর সংকলন: এ কিতাব মূলত দু'জন সংকলকের পরিশ্রমের ফসল। প্রথম জন কিছু হাদীস সংকলন করে এর নাম দিয়েছেন 'মাসাবীহ' দ্বিতীয়জন মাসাবীহ গ্রন্থে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে এর নাম দিয়েছন 'মিশকাতুল মাসাবীহ।'

আল মাসাবীহ -এর সংকলক

নাম: হুসাইন

উপনাম: আবু মুহাম্মাদ

উপাধী: মুহিউস সুন্নাহ

নসব: হুসাইন বিন মাসউদ বিন মুহাম্মাদ ফাররা বগউই।

মুহিউস সুন্নাহ বলার কারণ: তিনি শরহুস সুন্নাহ নামক একখানা হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার পর এক রাতে স্বপ্নের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বলেন

أحياك الله كما أحييت سنتي আমার হাদীসের ব্যাখ্যা করে তুমি যেভাবে আমার সুন্নত জিন্দা করেছো আল্লাহ পৃথিবীতে তোমার নাম জিন্দা রাখুন।

ফাররাহ বলার কারণ: ফারউন অর্থ চামড়া। চামড়া নির্মিত পোষাক বিক্রেতা। এটা মূলত তাঁর পিতার পেশা ছিল।

বগউই বলার কারণ: এটা তাঁর জন্মস্থানের দিকে সম্বন্ধযুক্ত উপাধি। তাঁর জন্মস্থান

আফগানিস্তানের হেরাত ও মুড়-এর মধ্যবর্তী বগকুর নামক স্থান। যা আরবীতে রূপান্তরিত হয়ে বগশুর রূপধারণ করেছে। উক্ত শব্দের প্রথম অংশের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে (بغي) বগী বলা হলে এর অর্থ হতো ব্যভিচারী। তাই কিছুটা পরিবর্তন করে (و) যুক্ত করে বগউই বলা হয়।

জন্ম: ৪৩৫ হিজরী

বয়স: ৮১ বৎসর

ইন্তেকাল: ৫১৬ হিজরী মাহে শাওয়ালে মুড়ু শহরে।

দাফনঃ মুড়ু শহরের তালক্বানী নামক কবরস্থানে তাঁর উস্তাদ কাজী হুসাইন-এর পাশে তাঁকে দাফন করাহয়।

ইলমান্বেষণঃ তাঁর ছাত্র জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে জীবনী গ্রন্থকারগণ নীরব। তবে তাঁর পরবর্তী কর্মময় জীবনের দিকে তাকালে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি ছাত্র জীবন বড় বড় উলামা ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের কাছে সফর ও যাতায়াতে কার্পণ্য করেননি। তাইতো তাঁর উস্তাদের তালিকায় বিখ্যাত আলেমদের নাম পাওয়া যায়। আর নিজেকেও গড়ে তুলেছিলেন যুগের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন, অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস, প্রাজ্ঞ মুফাসসির, দক্ষ মুফতী ও মশ্‌শাক্ব ক্বারী রুপে। তিনি ছিলেন শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী।

তাঁর উস্তাদ

১। ফিক্বহ শাস্ত্রে কাজী হুসাইন বিন মুহাম্মাদ শাফেঈ (র.)।

২। হাদীসে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবুল হাসান আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ দাউদ (র.)।

৩। আলী বিন ইউসুফ জুয়াইনী। ৪। আব্দুল ওয়াহিদ যিয়াদ বিন ইয়াকুব (র.) প্রমুখ।

তাঁর ছাত্র

শায়খ আবুননুযাইব সুহরাওয়ার্দীসহ অসংখ্য উলামা মাশায়েখ।

তাঁর স্বভাব চরিত্র

তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ দারিদ্র বান্ধব এক বিরল ব্যক্তিত্ব। রাতে জাগরণ, রোযা ও উযু সহকারে দারস দান ও কিতাব লিখনে সারা দিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় শুকনো রুটি দিয়ে ইফতার করতেন। লোকেরা আরজ করল হুজুর শুধু শুকনো রুটি খেতে থাকলে মস্তিষ্ক শুকিয়ে যাবে। অনেক পীড়াপীড়ির পর রুটির সাথে অল্প জয়তুনের তেল মিশিয়ে খাবেন বলে সম্মত হলেন। অল্পে তুষ্টি ছিল তার চরিত্রের প্রধান অবলম্বন। গোটা জীবন তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ এর দারস দানে ও কিতাব লিখনে কাটিয়ে দেন।

তাঁর লিখিত গ্রন্থঃ

১। আল মাসাবীহ, ২। শরহুস সুন্নাহ, ৩। আত্‌তাহযীব (ফিকহ শাস্ত্র), ৪। মাআলিমুত তানযীল (তাফসীর)

মিশকাতুল মাসাবীহ এর সংকলক

নামঃ মুহাম্মাদ

উপনামঃ আবু আব্দুল্লাহ

উপাধীঃ ওলীউদ্দীন, খত্বীবে তিবরিযী

নসবঃ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ উমরী

তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, ছাত্র জীবন, কর্ম জীবনের ইতিহাস কোন কিতাবে পাওয়া যায় না, কারণ তাঁর সময়ে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ তার বিশাল তাতারী বাহিনী দ্বারা বিশ্বময় বিশেষ করে মুলিম অধ্যুষিত জনপদ (বাগদাদ, বসরা, বোখারা, সমরকন্দ) গুলোতে যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল, সেই ধ্বংস যজ্ঞের তান্ডবে মুসলিম বিশ্বের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা চরম ভাবে ব্যহত হয়েছিল। ফলে প্রাণ রক্ষা করা যেখানে দায় ছিল সেখানে জীবনের ইতিহাস সংরক্ষণের তো কোন বালাই ছিল না।

তবে তাঁর রচিত কিতাবাদি থেকে অনুমান করা যায় তিনি ৮ম শতাব্দীর অনন্য প্রসিদ্ধ আলমে দ্বীন, অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস, ফাসাহাত, বালাগাতের বরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তারীখে হাদীস নামক গ্রন্থে তাঁর ইন্তেকাল ৭৪০ হিজরী দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তিনি মিশকাতের সংকলন থেকে ৭৩৭ হিজরীতে অবসর হলেও 'ইকমাল ফি আসমাইর রিজাল' (মিসকাতের উল্লেখিত হাদীসের রাবীদের জীবনী গ্রন্থ) এর রচনা থেকে অবসর হন ৭৪০ হিজরীতে।

কিতাবুল আছার-এর সংকলক

ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)

নামঃ নোমান

উপনামঃ আবু হানীফা

উপাধীঃ ইমাম আযম

নসবঃ নোমান বিন সাবিত বিন যওতা কুফী

তাঁর পূর্বপুরুষগণ তৎকালীন পারস্য (বর্তমানে ইরান) এর অধিবাসী ছিলেন। পিতামহ যওতা হিজরত করে তৎকালীন ইরাকের প্রসিদ্ধ নগরী কুফায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আর এখানেই ইমাম আযম (র.) শুভ জন্ম গ্রহণ করেন।

জন্মঃ ৮০ হিজরী ৭০২ ঈ.

বয়সঃ ৭০

মৃত্যুঃ ১৫০ হিজরী মাহে রজব, সৈরাচার মনসুরের জেলখানায়।

তাঁর জন্মের সময় আনাস বিন মালিক, আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা, সাহল বিন সাদ সাঈদী, আবু তোফাইল আদ বিন ওয়াসিলা সহ প্রায় ৪০জন সাহাবী জীবিত ছিলেন। তবে কারো মতে কোন সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়নি। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) স্বীয় গ্রন্থ তাকরীবুত তাহযীবে রাউইদের বারটি স্তরে, তাবেইদের পাঁচটি স্তর নির্ণয় করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আযম (র.) কে ৪র্থ স্তর তথা কনিষ্ঠ তাবেঈদের স্তরে গন্য করেছেন। তাঁর গবেষণামতে ইমাম আযম (র.) ১০২ হিজরীতে মদীনা গমন করেন। ২জন সাহাবী- সুলাইমান ও সালেম বিন সুলাইমান এর সাক্ষাৎ লাভ করেন।

তাঁর ইলমান্বেষণ: তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে লেখাপড়া বিমুখ অবস্থায়। একদিকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর উলামা নিধন কর্মসূচীর ফলে ধর্মীয় শিক্ষালয়গুলোর অবস্থা ছিল নিভু নিভু। অপরদিকে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ব্যবসায়ী মনোভাব তাঁকে ইলমান্বেষণে থেকে আড়াল করে রেখেছিল। একদিন বাজারে যাওয়ার পথে তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা শা'বীর সাথে সাক্ষাত হলে শাবী তাকে শুধালেন।

-তুমি কি কোথাও লেখাপাড়া করো?

-জ্বি না।

-আমি তো তোমার মাঝে অসম্ভব প্রতিভার ঝলক দেখতে পাচ্ছি। লেখাপড়া করলে তুমি একজন বড় আলেম হওয়ার আশা করা যায়।

আল্লামা শাবীর উৎসাহ প্রদানে অনুপ্রাণিত হয়ে বাজার থেকে ফিরেই মাতা পিতার অনুমতি নিয়ে উলামাদের দারসে যাতায়াত শুরু করেন। স্বল্প সময়েই ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, আকাইদ, আদবসহ তৎকালনি প্রচলিত সকল বিদ্যায় পরদর্শী হয়ে উঠেন।

তাঁর উস্তাদ

১. হাম্মাদ বিন সুলায়মান ২. আতা বিন রুবিয়া ৩. ইমাম জাফর সাদিক ৪. ইমাম মালিক সহ হাজার চারেক যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম।

তাঁর ছাত্র:

১. ইমাম আবু ইউসুফ ২. ইমাম মুহাম্মাদ ৩. ইমাম যুফার ৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ৫. ওকী' বিন যাররাহ।

তাঁর আকৃতি: তিনি মধ্যম গড়ন, মানানসই স্বাস্থ্য, উচ্চ অথচ সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন।

তাঁর স্বভাব চরিত্র: উস্তাদ ভক্তি ছিল তার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন উস্তাদের বাড়ির দিক পা লম্বা করে বসাও তিনি চরম বেয়াদবী গণ্য করতেন। তাই নিজে তা থেকে সযত্নে বিরত থাকতেন। কথিত আছে তার কোন উস্তাদ স্বীয় পুরাতন (কাপড়ের) জুতা দুই দিরহামসহ তাঁকে দিয়েছিলেন মেরামত করিয় পায়ে দেওয়ার জন্য। তিনি কাপড় খুলে ধৌত করে তা দিয়ে টুপি বানিয়ে মাথায় দিতে শুরু করেন। তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী, খোদাভীরু কামেল ওলী ছিলেন। একাধারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার নামাযের ওযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন। রাতের প্রথম অংশে গবেষণা শেষাংশে উপাসনা এই ছিল তাঁর জীবন সাধনা।

ফিকহ্ শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর পরিশ্রম: ফিক্বহ্ শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি ৪০ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড গঠন করেছিলেন। তিনি ছিলেন বোর্ড প্রধান। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মাদ (র.), ইউসুফ বিন খালিদ, ইয়াহইয়া বিন আবি যায়েদা, হাব্বান, ইমাম জাফর সাদিক অন্যতম। এ বোর্ডে কুরআন হাদীস ইজমা কিয়াসের আলোকে মানব জীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্যা গুলোর সমাধান নির্ণয় কল্পে এর একটি বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা চলতো। কোন কোন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ দিন আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্ত গৃহিত হতো তা লিপিবদ্ধ করা হতো। তাঁর এ প্রচেষ্টা সুদীর্ঘ ৩১ বছর কাল অব্যাহত ছিল। তাঁর মাসআলা আহরণে শরীয়তের গন্ডির ভিতর থেকে মানবীয় চাহিদা পুরনের দিকটা প্রাধান্য পেত। বাহ্যত পরস্পর বিরোধী আয়াত ও হাদীসগুলোতে সামঞ্জস্যপূর্ণ পথ অবলম্বন করতেন। ফলে সংগৃহীত বিধানটিতে আমল করে আমলকারী অন্তরে প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করতেন। এ কারণেই মুসলিম বিশ্বের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মুসলিমই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তিনি দানশীল,ধনী, সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন। কর্মচারী দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করতেন। মালে কম দেওয়া, ধোকা দেওয়া, কোন প্রকার হারাম, সন্দেহযুক্ত মাল তাঁর সম্পদে মিশ্রণ থেকে সর্বদা কর্মচারীদেরকে সতর্ক রাখতেন।

একদা কোন কর্মচারীকে কিছু কাপড় দেখিয়ে বললেন, এতে খুত আছে ক্রেতাকে ইহা অবগত করে কিছু কম মূল্যে বিক্রি করবে। কর্মচারী ভুলে গিয়ে পূর্ণ মূল্য বিক্রি করায় তাকে শাসিয়ে উক্ত কাপড় বিক্রির সমুদয় টাকা সদকা করে দেন।

প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান: সরকারী কোন অনুদান গ্রহণকে তার ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করতেন।

তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক ময়দানে উমাইয়া ও আব্বাসীয় এ দুটি ধারাই ছিল প্রধান। উমাইয়া শাসক মারওয়ানের আমলে দুর্নীতি, দুঃসহ নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রময় তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিশেষভাবে প্রধান বিরোধী ধারা আব্বাসীয় খেলাফতের দাবীদারদের যুগপৎ কর্মসূচীর কারণে এ আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। উমাইয়া শাসক মারওয়ানের সিংহাসনের ভিত কাপিয়ে তুলেছিল। ১২৯ হিজরীতে মারওয়ান তার দূরদর্শী আমলা ইবনে হুবাইরাকে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করে। ইবনে হুবাইরা তৃণমূল পর্যায়ের আপামর জনসাধারণের সমর্থন স্থায়ী করার লক্ষে শাসন কার্যে উলামায়ে কেরামের উপস্থিতি তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাই অর্থের লোভ দেখিয়ে কতিপয় আলেমদেরকে বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদ দান করে। গোটা ইরাক এমনকি সমগ্র মুসলিম জাহানে ইমাম আবু হানিফার সুনাম সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ছিল শীর্ষে। তাই বিচক্ষণ ইবনে হুবাইরার অনুসন্ধানী দৃষ্টি ইমাম আবু হানিফার মাঝে আটকে পড়ে। তাঁকে কাযীর পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তিনি উপলব্ধি করলেন যে,এটা উমায়ই দুঃশাসন দীর্ঘায়িত করার একটি সুগভীর ষড়যন্ত্র, তাঁর একথা বুঝতেও বাকী রইল না যে, জালিম প্রাদেশিক গভর্ণরদের অধীনে কাযীর পদ গ্রহণ করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়। বরং বিচার কার্যে উমাইয়া শাসকদের প্রভাব থাকবে। সুতরাং এহেন অবস্থায় কাযী হওয়ার মানেই হচ্ছে ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে অর্থ ও ক্ষমতার মোহে উমাইয়া শাসক গোষ্ঠীর গোলামী করা। তাই তিনি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে ইবনে হুবাইরা স্বীয় টার্গেট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধক মনে করে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে কারগারে বন্দি করে। এখানেও তাঁকে নানা রকম প্রলোভন দেখানো হয়। এতেও কার্য সিদ্ধি না হওয়ায় প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য প্রতিদিন তাঁকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বেত্রাঘাত করা হতো। তবুও তিনি জালিম সরকারের কাছে নতি স্বীকার করেননি। ইমাম সাহেবের সাথে এই নির্মম আচরণের খবর জনমনে বিদ্রোহের দানা পুঞ্জিভুত হতে থাকে। অবশেষে ইবনে হুবাইরা জনরোষের স্বীকার হয়ে আম ও ছালা উভয় হারানোর ভয়ে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তিনি মুক্তি পেয়ে মক্কায় চলে যান। ১৩১ হিজরীতে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটলে আব্বাসীয় খেলাফতের সূচনা হয়। ইমাম আবু হানিফা মক্কা ছেড়ে কুফায় ফিরে আসেন।

আব্বাসীয়গণ ইতোপূর্বে আহলে বাইয়াতদের পক্ষে আন্দোলন করলেও ক্ষমতার লোভে পড়ে আহলে বাইয়াতদের প্রতি খড়গহস্থ হয়ে উঠেন এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রতি নিষ্ঠুর অমানবিক নির্যাতন শুরু করেন। আব্বসীয়গণ তাদের প্রতিদ্বন্ধী উমাইয়া বংশীয়দের প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। এমনকি উমাইয়া খলীফাদের কবর খুড়ে তাদের অস্থিপাজর তুলে এনে জ্বালিয়ে ফেলেছিল। তখন আব্বাসীয় খেলাফতের সিংহাসনে বসা ছিল খলীফা মনসুর। ১৪৫ হিজরী মুহাম্মাদ

নফসে যাকিয়্যাহ খলীফা মনসুরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে শহীদ হন। তৎকালীন সকল উলামায়ে কেরাম নফসে যাকিয্যার পক্ষে ছিলেন। তাঁর শাহাদাত বরণের পর তাঁর ভ্রাতা ইব্রাহীম বিদ্রোহের পতাকা স্বহস্তে তুলে নেন। তৎকালীন দ্বীনদার মুসলমান ও আলেম সমাজ ইব্রাহীমের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগলেন। শুধু কুফা নগরেই মনসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বিশলক্ষ মুসলমান প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) ইব্রাহীমকে গোপনে সমর্থন দিয়েছিলেন। এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন। এবার মনসুরও বহু উপঢৌকনের বিনিময়ে ইমাম সাহেবকে বশে আনার চেষ্টা চালায়। ইমাম সাহেব স্বাভাবিক ভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করেন। শুরু হলো দ্বিতীয় তদবীর। খলীফা মনসুর তাঁকে বাগদাদে স্বীয় দরবারে তলব করল। তিনি উপস্থিত হলে তাঁকে প্রধান বিচারপতি পদ গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। তিনি সৈরাচারীর অধীনে এ পদ গ্রহণে সম্মত হননি। তিনি এবারও বুঝতে পারলেন এটা মনসুরের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার এক সূক্ষ ষড়যন্ত্র। এ পদ তাঁকে ইনসাফচ্যুত হয়ে অন্যায় পুজারী হতে বাধ্য করবে। তাই মনসুরকে জবাব দিলেন, আমি এ পদের উপযুক্ত নই। মনসুর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, আপনি অযথাই মিথ্যা বলছেন। প্রতিউত্তরে তিনি বললেন আপনার কথা সত্য হলে আমার কথাই সঠিক। কারণ একজন মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি হওয়ার যোগ্য নয়। মনসুর কোন জবাব না দিতে পেরে ক্ষুব্দ্ধ হয়ে তাকে কারাগারে বন্দি করে।

সেখানে বসেও তিনি ফিক্বহ্ শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিভিন্ন মহল থেকে আগত কঠিন প্রশ্নগুলোর জবাব দিতেন এ জন্য কারাগারেও তাঁর কাছে শত সহস্র জনতার যাতায়াত অব্যাহত ছিল। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর ভাষ্যমতে শুধু কারাগরে বসে তিনি ১২ লক্ষ মাসআলা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কারাগারে ইমাম সাহেবের অবস্থান যতই দীর্ঘায়িত হচ্ছে জনতার সমাগম ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতে মনসুর গণঅভ্যুত্থানের আশংকায় ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়েন। তাই এক রাতে খানার সাথে বিশ মিশিয়ে দিল। তিনি বিষক্রিয়া বুঝতে পেরে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এই মুবারক অবস্থায় তিনি শাহাদতের অমীয় শুধা পান করে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে হাজিরা দেন। তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্বময় শোকের ছায়া নামল। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবস্তরের বনি আদম শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তাঁর জানাযায় ৫০ হাজারেরও বেশি লোক অংশগ্রহণ করেছিল। লোকজন আসতে থাকায় ছয়বার জানাযা পড়া হয়। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী বাগদাদের বিজরান নামক গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। সেলজুকি সুলতান আলফ আরসালান সেখানে এক বিরাট মাযার নির্মাণ করে। এর পাশে একটি মাদরাসারও ভিত্তি স্থাপন করেন। যার নাম মাশহাদে আবি হানীফা।

শিক্ষা: একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইমাম আবু হানীফা (র.) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম জাহানের উলামায়ে কেরামকে সত্য ও ন্যায়ের পথ আকড়িয়ে ধরতে হবে। যেমন বাম ভয়ংকর তেমন ডানও কম বিপদজনক নয়।

নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থকারের জীবনী: নাম: আহমদ, উপনাম আবুল ফজল, উপাধি শিহাবুদ্দীন, শিহাবুল মিল্লাত, নিসবত আসকালানী। মিশরের আসকালানে জন্মগ্রহন করেন বলে তাঁকে আসকালানী বলা হয়।

বংশ: আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজার কিনআ'নী, আসকালানী, মিশরী শাফেঈ। তাঁর পিতার কোন সন্তান জীবিত থাকত না, তাই তৎকালীন বুযুর্গ সানাক্বরীর কাছে দোয়া চাইলে তিনি তাঁকে বলেন ইনশা আল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে এমন সন্তান দান করবেন যার ইলম গোটা জগৎবাসীকে আলোকিত করবে।

তাঁর জন্ম: ৭৭৩ হিজরী ২৩শে শাবান মিশরের আতীকাহ নামক গ্রামে।

তাঁর ইন্তেকাল: ৮৫২হিজরী ২৮শে জিলহজ্জ, শানিবার, মাগরিবের পর।

তাঁর দাদা মুহাম্মদ আলেকজান্দ্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বস্ত্র উৎপাদন কারী ছিলেন এবং তাঁর পিতা ছিলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও সাহিত্যিক।

তাঁর শৈশব: পিতার ইন্তেকলের পূর্বেই তিনি যাকিউদ্দীন নামক এক বিদ্যান ব্যক্তিকে তাঁর অভিভাবক মনোনীত করে যান। কারণ পিতার ইন্তেকালের পূর্বেই তিনি মা হারিয়েছিলেন। তবে তাঁর মাতা ছিলেন অঢেল সম্পত্তির মালিক। যা রেখে গিয়েছিলেন ছেলের জন্য। তাঁর মেধা ছিল প্রখর। ৯বছর বয়সেই কোরআন মজীদ হিফজ করেন। বর্ণিত আছে তিনি আল্লামা হাফিয যাহাবীর মতো মেধাবী হওয়ার নিয়তে যমযমের পানি পান করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর নিয়ত কবুল করেছিলেন, এর প্রমাণ ছিল এই মেধা শক্তি।

তাঁর শিক্ষাজীবন: তিনি শৈশবেই

الحاوي الصغير- العمدة – مختصر ابن الحاجب

ইত্যাদি কিতাব মুখস্ত করে নেন।

উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর সফর: ইলমান্বেষণের প্রবল আগ্রহ নিয়ে তিনি মিশর, ইসকান্দারিয়া, সিরিয়া, হলব, হিযায, নাবলুস, রামাল্লা, গাজা, ইয়ামান ইত্যাদি দূর-দূরান্তের ইসলামী বিশ্ব সফর করেন তাঁর উস্তাদের সংখ্যা যেমন সীমাহীন, তেমনি ভাবে তাঁর ছাত্র সংখ্যাও ছিল গুনার বাহিরে। মক্কায় সফর কালে তাঁর প্রথম উস্তাদ ছিলেন

শায়খ আফীফুদ্দীন নিশাপুরী। তাঁর কাছ থেকে তিনি বুখারী শরীফের দারস নেন। এবৎসরই তিনি মসজিদে হারামে তারাবীহ পড়ান। ৭৯২ হিজরী সালে হাফিয যয়নুদ্দীন ইরাকীর কাছে হাদীসের কোর্স সমাপ্ত করেন। এ কোর্সে তিনি এমন যোগ্যতা অর্জন করেন যে যাহাবী তাঁকে হাদীস পড়ানোর ইযাজত দিয়ে দেন। এমনকি লোকেরা তাঁকে হাফিযুল হাদীস উপাধিতে ভূষিত করে।

তাঁর কারামত: হাদীস পাঠে তাঁর দ্রুত গতি ছিল অবাক করার মতো। যা বর্তমানে বিশ্বাস করাই কঠিন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যটি মুতাওয়াতির রুপে প্রচার লাভ

করায় বিষয়টি সন্দেহ মুক্ত। হাফিয ইবনে ফাহাদ মাক্কী বলেন তিনি যোহর আসর মধ্যবর্তী সময়ের দশ বৈঠকে বুখারী শরীফ খতম করে ফেলতেন। আড়াই দিনের পাঁচ বৈঠকে মুসলিম শরীফ খতম করতেন। নাসাঈ শরীফ দশ বৈঠকে, ইবনে মাজাহ শরীফ চার বৈঠকে খতম করতেন। এমনিভাবে দামেস্কের নাসিরুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন জুহাইলকে শুনানোর জন্য মসজিদে নববীতে নবীজি সা., এর কদম মোবারকের কাছে তিন দিনে মুসলিম শরীফ খতম করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে কবিতা বলেছিলেন।

وتم بتوفيق الإله وفضله * قراءة ضبط فى ثلاثة أيام

তাঁর দৈনিক রুটিন: তিনি সর্বদা তিন কাজের কোন এক কাজে ব্যস্তথাকতেন। তা হল:

১.অধ্যায়ন

২.সংকলন

৩.এবাদত

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী:

تعليق التعليق – تقريب التهذيب-تهذيب التهذيب- فتح البخاري شرح البخاري- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر –نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر – لسان الميزان وغيرها

তাঁর লিখিত কিতাব গুলি বিশ্ববাসী গ্রহণ করে নিয়েছে হৃদয়ের গভীরে। ফতহুল বারী লেখা সমাপ্ত হওয়ার পর তৎকালীন ৫০০ দিনার ব্যয় করে এক মোড়ক উন্মোচনও আনন্দ ভোজের আয়োজন করেন। যেখানে গোটা শহরের সুশীল সমাজ অংশ গ্রহণ করেছিল।

তাঁর দাফনের সময় সর্ব প্রথম মিশরের বাদশাহ লাশ কাঁধে তুলেন। অতঃপর মন্ত্রী পরিষদ, অতঃপর অন্যান্য উচ্ছ পদস্ত কর্মকর্তাবৃন্দ।

মিশরেরক্বুরাফাতুস্‌সুগরা নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

নুখবাতুল ফিকারের নামকরণের কারণ:

نخبة الفكر فى مصطلح أهل الاثر

অর্থ হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় নির্বাচিত চিন্তামালা, যেহেতু তাঁর এই কিতাবে হাদীসবিশারদদের ব্যবহৃত ঐ সকল নীতিমালা উল্লেখ করেছেন যা তাঁর চিন্তা ও গবেষণার ফসল, তাই এর নাম দিয়েছেন

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

বা হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় নির্বাচিত চিন্তামালা।

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر

নুখবাতুল ফিকারের দৃষ্টনন্দন ব্যাখ্যা, যেহেতু তাঁর স্বহস্তে লেখা নুখবাতুল ফিকারের এই ব্যাখ্যা গ্রন্থখানা দেখতে আকর্ষণীয় তাই এর নাম দিয়েছেন

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر

বা নুখবাতুল ফিকারের দৃষ্টনন্দন ব্যাখ্যা।

নুখবাতুল ফিকারের বৈশিষ্টাবলী

১) উসুলে হাদীসের গ্রহণযোগ্য মতন সংশ্লিষ্ট।

২) কলবের ছোট হলেও বেশি উপকারী।

৩) সংক্ষিপ্ত হলেও বিষয়বস্তুতে স্বয়ং সম্পূর্ণ।

৪) ভাষা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ।

৫) উসূলে হাদীসের সর্ব বিষয় সন্নিবেশিত।

৬) তাঁর পূর্বে রচিত কিতাবসমূহের মধ্য হতে কোনটি আগের কোনটি পরের কোনটি পূর্ণাঙ্গ কোনটি অপূর্ণাঙ্গ তা চিহ্নিত করেছেন।

৭) উসূলে হাদীস বহির্ভূত কোন বিষয়বস্তু এ কিতাবে নেই বরং যে কিতাবে তা আছে সেটা চিহ্নিত করেছেন।

৮) লেখক জীবনে অনেক কিতাব রচনা করেছেন কিন্তু নুখবাতুল ফিকার ঐ কিতাব যা লিখতে পারার কারণে নিজে গর্ববোধ করতেন।

৯) কিতাব খানাকে বিশ্ব মুসলিম বিনা বাক্য ব্যয়ে গহণ করেছেন।

১০) কিতাবের বিষয়বস্তু পাথরের মতো এমন মজবুত যে তা খন্ডন করার মতো কেউ নেই।

فتنة إنكار الحديث

হাদীস অস্বীকারের বিভ্রান্‌ড়ি : ইসলামের শুরু লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের উপর ঘরোয়া ও বাহিরের আক্রমণ ধারাবাহিক হয়ে আসছে। এ সকল হামলাকারীগণ আল্লাহ তাআ'লার ঘোষণা-

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون- يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المجرمون

আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী এবং তারা নিজ ফুৎকারে আল্লাহর আলোকে নিভিয়ে দিতে চায় অথচ আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণ করবেন। যদিও অবিশ্বাসীদের কাছে তা অপছন্দ হয়'

এর চ্যালেঞ্জের সামনে যেমন পরাজিত হওয়ার কথা ছিল তেমনি পরাজিত হয়ে আসছে। বর্তমান সময়ের ঘরোয়া আক্রমণগুলোর একটি বড় আক্রমণ হচ্ছে হাদীস অস্বীকারের বিভ্রান্তি।

অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এমন একটি দলের উদ্ভব হয়েছে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হাদীসকে অস্বীকার করে আসছে। তাদের ধরণ দিন দিন পরিবর্তিত হয়ে আসছে। সর্বপ্রথম এই বিভ্রান্তির চাদর উন্মোচন করেছিল খাওয়ারিজ সম্প্রদায়। অতঃপর শিয়া সম্প্রদায় অতঃপর মুতাযিলা সম্প্রদায়। হিন্দুস্থানে এ দলের নেতৃত্বে ছিল স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং মিশরে তোয়াহা হুসাইন এবং তুর্কীস্থানে জিয়াগুক আলপ। বিংশ শতাব্দির শুরুতে মুসলমানদের উপর যখন পশ্চিমা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি চেপে বসল, তখন স্বল্প জ্ঞানী মুসলমানদের একটি দলের উদ্ভব ঘটল যারা পশ্চিমা চিন্তা ধারার অসম্ভব ভক্ত।

তাদের অন্তরে একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে, পশ্চিমাদের আনুগত্য ছাড়া পার্থিব উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু ইসলামের অনেক বিধি বিধান পশ্চিমাদের আনুগত্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য তারা ইসলামে বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। যাতে করে ইসলামকে পশ্চিমা চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়।

এই দলকে প্রগতিবাদী বলে। তাদের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত হাদীসকে সামনা থেকে না সরানো হবে। কেননা হাদীসের মধ্যে জীবনের প্রতিটি লগ্নের ব্যাপারে এমন বিশদ দিক নির্দেশনা আছে যা পশ্চাত্য চিন্তাধারার

সরাসরি বিপরীত। ফলে এই দলের কিছু সংখ্যক সদস্যরা হাদীসকে শরীয়তের দলীল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে বসে।

হিন্দুস্থানে এই আওয়াজ স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং তার সাথী মৌলভী চেরাগ আলীই তুলেছিল। কিন্তু তারা হাদীসকে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করাকে বিপদ মনে করে এই পথ অবলম্বন করল যে, যে হাদীসটি তাদের উদ্দেশ্যের বিরোধী মনে করতে সে হাদীসটির বিশুদ্ধতা অস্বীকার করে বসত। যদিও হাদীসটির সনদ শক্তিশালী হয়।

কোন কোন স্থানে প্রকাশ করা হয় যে, এ হাদীসটি বর্তমান যুগে আমলের উপযোগী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এরুপ স্থলে উদ্দেশ্যের পক্ষের হাদীস দিয়ে দলীলও দেওয়া হয়। উল্লেখিত কারণ ও মাধ্যমে ব্যবসায়ী সুদকে তারা হালাল ঘোষণা করে। হিজাব বা পর্দাকে নিস্প্রয়োজন ঘোষণা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাগুলোকে অস্বীকার করে এবং অসংখ্য পশ্চিমা চিন্তাধারাকে বৈধতার দলীল দেওয়া হয়। এই দলের নেতাদের মধ্যে আব্দুল্লাাহ চাকরালোভী, আসলাম জিরাজপুরী ও গোলাম আহমদ পারভেজ এর নাম প্রসিদ্ধ। এ সকল লোকেরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধণের লক্ষে দলীলের নামে কয়েকটি প্রতারনার আশ্রয় নিয়েছে।

তাদের ছয়টি প্রতারণা

(১) হাদীস লিখনের নিষেধ সম্বলিত হাদীস

عن أبي سعيد رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن فمن كتب عني غير القرآن فليمحه (رواه مسلم صـ٢١٤)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তোমরা আমার কাছ থেকে কুরআন ছাড়া কোন কিছু লিখবে না। যে আমার কাছ থেকে কুরআন ছাড়া কোন কিছু লিখেছে সে যেন তা মিটিয়ে দেয়। (মুসলিমঃ ১/২১৪) তাদের বক্তব্য হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিষেধের কারণে সাহাবায়ে কেরাম হাদীস লিখেননি। এছাড়াও তাঁরা লেখা পড়ায় অভ্যস্থ ছিলেন না। হাতে গোনা যে কয়েকজন লেখা-পড়া জানতেন তারা কুরআন লিপিবদ্ধ করার কাজে ব্যস্থ ছিলেন। এ কারণে রাসূল ও সাহাবার যুগে হাদীস সংকলিত হয়নি।

২। হাদীসের ভিত্তি স্মরণের উপর ছিল। এক শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস শুধু বক্ষ থেকে বক্ষে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে সুতরাং এত দীর্ঘ সময়ে এত অধিক সংখ্যক হাদীস

বক্ষে বক্ষে থেকে কিভাবে সংরক্ষিত থাকতে পারে। এটা বিবেকের কাছে কঠিন বরং অসম্ভব মনে হয়।

৩। নবীজির যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত হাদীস পৌছতে অসংখ্য রাউইদের মাধ্যম লেগেছে তাঁদের মধ্যে ভাল মন্দ সর্বপ্রকারের লোকই ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে যে কেউই হাদীসে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেননি এর কি প্রমাণ আছে?

৪। হাদীস সাহাবায়ে কেরামের জন্য দলীল ছিল। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের আমীর ছিলেন। এবং আমীরের কথা মানা অত্যাবশ্যকীয়। যেহেতু বর্তমানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আমীর নন সুতরাং তাঁর কথা আমাদের উপর প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে না।

৫। আনুগত্য তো একমাত্র কুরআনেরই হবে যাকে وحى متلو বা পঠিত ওহী বলে وحى غير متلو বা অপঠিত ওহী বলতে কিছুই নেই।

৬। হাদীসকে ظني বা ধারণা প্রসূত বলা হয় এবং ধারণা প্রসূত বিষয়ে আনুগত্য কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন وإن الظن لايغني من الحق شيئا তারা ধারণার আনুগত্য করে অথচ ধারণা সত্যের কষ্টিপাথরের উত্তীর্ণ হয় না।

তাদের বাহানাগুলীর (প্রতারণার) খন্ডন

১ম বাহানার খন্ডন আপনারা কি ইলমে হাদীসের ইতিহাস সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ? এজন্যই বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হাদীস লেখা হয়নি।

ইলমে হাদীস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যদিও নবীজির নিষেধের কারণে সম্মিলিতভাবে হাদীস লেখা হয় নি কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে এমন সংখ্যক হাদীস লেখা হয়েছিল যা বর্তমান যুগে পাওয়া যায় না।

১। আসসাদেক্বা লি ইবনে উমর রা.।

২। সহীফায়ে আলী রা.।

৩। কুতুবে আবু হুরায়রা রা.।

৪। সুহুফে আনাস রা.।

৫। সহীফায়ে আমর ইবনে হাযাম (র.)।

৬। সহীফায়ে ইবনে আব্বাস রা.।

৭। সহীফায়ে ইবনে মাসউদ রা.।

৮। সহীফায়ে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.।

৯। সহীফায়ে সামুরা ইবনে জুনদাব রা.।

১০। সহীফায়ে সা'দ ইবনে উবাদা রা.।

১১। সহীফায়ে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান রা.।

১২। সহীফায়ে হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ রা.।

১৩। মুআল্লাফে বশীর বিন নুহায়ক রা.।

১৪। মুসনাদে আবি হুরায়রা রা. লি আব্দুল আজীজ বিন মারওয়ান রা. ইত্যাদি হাদীসের পুস্তিকাগুলী।

আপনারা শুধু হাদীস লিখতে নিষেধ সম্বলিত হাদীসগুলো জানেন? হাদীস লিখনের আদশে সম্বলিত হাদীস জানেন না? অসংখ্যা হাদীসে হাদীস লিখনের নির্দেশ ও উৎসাহ বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

(١) عن أنس رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب

অর্থ: হযরত আনাছ রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তোমরা ইলমে হাদীসকে লিখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ কর।

(٢) عن رافع بن خديج رضـ قال قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتها قال اكتبوها ولاحرج

অর্থ: হযরত রাফে বিন খাদিজ রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা প্রশ্ন করলাম হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছুই শুনি সে গুলো কি লিখে রাখতে পারব? উত্তরে তিনি বললেন, লিখে রাখ, কোন অসুবিধা নেই।

(٣) عن أبي هريرة رضـ قال ان رجلا من الأنصار كان يشهد حديث النبي صـ فلا يحفظه فيسئل أبا هريرة فيحدثه ثم شكى قلة حفظه إلى النبي صـ فقال استعن بيمينك واومأ بيده إلى الخط

হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাদীস শিখার জন্য বসতেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে পারতেন না। ফলে আবু হুরাইরাকে জিজ্ঞাসা করতেন। আবু হুরাইরা তাঁকে বলে দিতেন। অতঃপর তিনি একদিন রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মুখস্থ শক্তির স্বল্পতার অভিযোগ করলেন। সমাধানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে লেখার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, হাতের সাহায্য নিতে পার।

হাদীস লিখনে রাসূলুল≠াহ সাল≠াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল≠াম-এর নিষেধ সম্বলিত হাদীসের সাত জবাব

১। ইমাম বুখারী আল্লামা ইবনে হাজার, আল্লামা নববী এবং আল্লামা সিয়ূত্বী (র.)-এর ভাষ্যমতে নিষেধ সম্বলিত হাদীসটি হচ্ছে মাওকুফ। আর আদেশ সম্বলিত হাদীসগুলো হচ্ছে মারফু'। যা মাওকুফের উপরের স্তরের। সুতরাং মাওকুফ হাদীস দ্বারা মারফু হাদীসের বিরোধিতা করা যাবে না।

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধটি ঐই সময় প্রযোজ্য ছিল যখন ওহী এবং হাদীসের মধ্যে মিশ্রণের সম্ভাবনা ছিল। যখন সাহাবায়ে কেরাম উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করণের যোগ্যতা অর্জন করলেন তখন নির্দেশ সম্বলিত হাদীসের মাধ্যমে নিষেধ সম্বলিত হাদীসকে রহিত করে দিলেন।

৩। হাদীস না লেখার অর্থ হচ্ছে কুরআনের আয়াতের সাথে একই চিরকুটে না লিখা। পৃথকভাবে লিখতে কোন নিষেধ ছিল না। যে কারণে তাঁরা অনেক কপি লিখেছিলেন।

৪। নিষেধ ঐ সকল লোকের জন্য ছিল যাদের মুখস্ত শক্তি প্রখর ছিল। যাতে হাদীসের মত মহান বিদ্যা পুথিগত না করে বক্ষে ধারণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।

৫। নিষেধ ঐ সকল লোকের জন্য প্রযোজ্য ছিল যাদের লিখনী ভুলের উর্ধ্বে ছিল না।

৬। আমার শায়খ ইসহাক জালালাবাদী এর ভাষ্যমতে সম্মিলিতভাবে লিখতে নিষেধ ছিল। ব্যক্তিগত ও পৃথকভাবে লিখতে নিষেধ ছিল না। এজন্যই তো অনেক সাহাবায়ে কেরাম পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ সহীফা রচনা করেছিলেন।

৭। আমার শায়খের শায়েখ আল্লামা ইউসুফ বিননুরী (র.) এর ভাষ্যমতে প্রাথমিকভাবে উম্মতের উপর অনুগ্রহ করার জন্য লিখতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ যদি আয়াতের মতো হাদীসও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনেই লেখা হতো তাহলে আয়াত ও হাদীস এর মান সমান হতো। উভয়ের উপর আমল করা ফরজ হতো। অথচ উভয়ের উপর সমানভাবে আমল করা কতটুকু দুঃসাধ্য ব্যাপার তা জ্ঞানীরাই জানেন।

২য় বাহানার (প্রতারণার) খন্ডন: আপনারা নিজেদের দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত মুখস্থ শক্তির উপর সাহাবায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীনে এজামের উজ্জল মেধা এবং

অকল্পনীয় মেধাশক্তিকে তুলনা করেন? যা আকাশ কুসুম ভাবনা। আল্লাহ তাআ'লার এক আশ্চর্য নিয়ম হচ্ছে যখন কাউকে কোন বস্তু থেকে বঞ্চিত করেন তখন তাঁকে অন্য এক বস্তু প্রদান করে ক্ষতি পূরণ করে দেন। এই নিয়মের ধারাবাহিকতায়ই আরববাসীকে শিক্ষা দীক্ষায় বঞ্চিত করার বিনিময়ে এমন তীক্ষ্ণ মেধা প্রদান করেছিলেন যা লেখনীকেও হার মানাত। বর্ণিত আছে মানুষের বংশ পরম্পরাতো বটেই, এমনকি নিজেদের গৃহপালিত উটগুলোর বংশ পরম্পরা একশত পর্যন্ত তারা স্মরণ রাখতে পারতো। নিম্নে বর্ণিত একটি কাহিনীর মাধ্যমে তাঁদের স্মরণ শক্তির একটা অনুমান পাওয়া যাবে।

কাহিনী ১)

হযরত জাফর বিন আমর আয্যামুরী (র.) বলেন, একদা আমি এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার এক সাথে হযরত ওহশী রা. কাছে গিয়েছিলাম। কথার ফাকে উবায়দুল্লাহ ওহশী রা. কে প্রশ্ন করলেন- চাচা আপনি আমাকে চিনেন?

উত্তরে ওহশী রা. বললেন না। তবে এতটুকু মনে পড়ে কয়েক বছর পূর্বে আমি আদী ইবনে খিয়ার নামক এক ব্যক্তির কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে তার একটা সন্তান জন্ম নিয়েছিল। ঐ সন্তানটিকে ধাত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় তার সমস্ত শরীর চাদরে মুড়ানো ছিল। শুধু পা যোগল বাহিরে ছিল। ঐ শিশু আর তোমার পা আমার কাছে এক রকম মনে হচ্ছে।

উবায়দুল্লাহ বললেন, চাচা! আমিই ছিলাম আদী ইবনে খিয়ারের সেই শিশুটি।

কাহিনী ২)

খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান একবার হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর মুখস্থ শক্তির পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাঁকে দাওয়াত দিলেন। তিনি তাশরীফ আনলে কিছু হাদীস বর্ণনা করার অনুরোধ জানালেন। এদিকে পর্দার ওপারে একজন লিখক নিযুক্ত করলেন। আবু হুরাইরা রা. অনেক হাদীস শুনালেন আর লেখক তা হুবহু লেখল।

আবু হুরাইরা রা. তখনকার মত চলে আসলেন। এক বছর পর খলীফা তাঁকে আবার আমন্ত্র করলেন। আহার বিহারের পর আরজ করলেন, আপনি বিগত বছর এই মজলিসে যতগুলি হাদীস যে ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেছিলেন সেগুলো কি আজও পারবেন?

আবু হুরাইরা রা. উত্তরে বললেন, অবশ্যই। খলীফার নির্দেশে তিনি হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। আর পর্দার ওপারে লেখক বর্ণনার সাথে লিখিত কপি মিলাতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত একটা শব্দ এমনকি একটা নুকতারও পরিবর্তন পাওয়া গেল না। সুবহানাল্লাহ!

হযরত ক্বাতাদাহ রা. বলতেন لا أنسى شيئا حفظته فى عمري' আমি যা মুখস্থ করি জীবনেও ভুলি না।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রত্যেকটা নড়াচড়া এমনকি চুল মোবারক, নখ মোবারক, ঘাম মোবারক এমনকি প্রস্রাব, রক্ত, ওযুর পানি পর্যন্ত বিনষ্ট হতে দিতেন না। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ সব জিনিষ সংরক্ষণ করতে পারেন, যার উপর দ্বীনের ভিত্তি নয়। তাঁরা যে হাদীসের উপর দ্বীনের ভিত্তি এবং নিজ দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত আছে বলে জানতেন ঐ হাদীস কিভাবে মুখস্ত করে আবার ভুলে যেতে পারেন। বিশেষ করে যখন তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ সকল হাদীসগুলো শুনেছিলেন যেগুলোতে হাদীস প্রচারের উৎসাহ বাণী ছিল। যেমন-

نضر الله مرأ سمع منا شيئا فلبغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع

অর্থ: আল্লাহ আলোকিত করে দিন ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে কোন কিছু শুনে, হুবহু অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় ইত্যাদি।

এখানে এই ধারণা করার সুযোগ নেই এই অভাবনীয় মুখস্থ শক্তি শুধু সাহাবায়ে কেরামরেই ছিল। পরবর্তীদের ছিল না। কারণ খাতিমাতুল মুহাদ্দিসীন হযরত শাহ আনওয়ার কাশ্মিরী (র.) এর বাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি যদি মুখস্থ করার ইচ্ছা ছাড়াই শুধু স্থুলভাবে কোন কিতাবের দিকে তাকাতেন তাহলে পনের বছর পর্যন্ত তা স্মরণে থাকত। আর যদি মুখস্থ করার ইচ্ছায় তাকাতেন তাহলে আজীবন স্মরণ রাখতে পারতেন।

মিশরের এক লাইব্রেরীতে নুরুল ইজাহ নামক ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাবখানা দেখে ভাল লাগলে তিনি দেশে আনতে চাইলেন। লাইব্রেরীর দায়িত্বশীল না মানলে তিনি কিতাবখানা একবার মুতালাআ করার অনুমতি চান। মুতালাআ করে দেশে এসে হুবহু কিতাব লিখে ফেলেন। তিনি যদি কিতাবের এক পৃষ্ঠায় নজর দিতেন তখন অন্য পৃষ্ঠায় হাত রাখতেন যাতে উভয় পৃষ্ঠা একত্রে এলোমেলো হয়ে স্মৃতিপটে স্থান না পায়।

বর্ণিত আছে তাকে একবার কেউ একটা বিষয়ে প্রমাণ চেয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন- অমুক লাইব্রেরীর অমুক তাকে অমুক কিতাবে অমুক পৃষ্ঠায় দেখে নিও।

মূলতঃ এ সকল ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি করা হাদীস সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলার কুদরতী ফয়সালা ছিল। এর পরেও কি আপনারা বলবেন স্মরণের উপর ভিত্তি করে আসা হাদীসগুলো দলীল হতে পারে না?

৩য় বাহানার (প্রতারণার) খন্ডন

হাদীস বর্ণনা কারীদের যোগ্যতা যাচাই বাছাই এর দায়িত্ব হাদীসের ইমামগণ আপনাদের জন্য ছেড়ে যাননি। মিথ্যুকদের হাদীস গ্রহণ তো দূরের কথা মিথ্যার অপবাদে স্বল্প দুষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকেও তাঁরা হাদীস গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। ইমাম তিরমিযী (র.) এক ব্যক্তির কাছে পনের হাজার হাদীস আছে শুনে দীর্ঘদিন সফর করে তার কাছে পৌছলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, ঐ ব্যক্তি তার ঘোড়াটিকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য গাছের পাতা দেখাচ্ছে। ঘোড়াটি অগ্রসর হলে লোকটি পাতা সরিয়ে নিচ্ছে। ইমাম তিরমিযী (র.) মনে মনে ভাবলেন যে ব্যক্তি একটি অবলা ঘোড়াকে ধোঁকা দিতে পারে সে জাল হাদীসের মাধ্যমে মানুষকেও ধোঁকা দিতে পারে। তিনি তার কাছ থেকে একটা হাদীসও গ্রহণ করেননি। অথচ ঐ ব্যক্তির ধোঁকা দেওয়াটা নিশ্চিত ছিল না। মোটকথা হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে যে পরিমান যাচাই বাছাই করা হয়েছে তা অন্য কোন বিষয়ে করা হয়নি। যদি মেনে নেই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ অগ্রহণযোগ্য তা হলে এই বর্ণনাকারীগণের মাধ্যমেই তো আমাদের কাছে কুরআন পৌছেছে। তাহলে কি কুরআনকে অস্বীকার করে ফেলতে হবে?

যদি আপনারা বলেন إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন।

উত্তরে আমরা বলব এই আয়াতটাওতো উপরোল্লেখিত বর্ণনাকারীগণের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যে এসে পৌছেছে। যদি বর্ণনা কারীগণ অগ্রহণযোগ্য হন তা হলে উক্ত আয়াতটিকে যে তাদের কেউ মন থেকে বানিয়ে ফেলেনি। তার কি প্রমাণ আছে?

এছাড়াও যে কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেছেন, সে কুরআন তো শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। আর এই অর্থই হচ্ছে হাদীস। সুতরাং যদি আল্লাহর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের কারণে কুরআনের শব্দ সংরক্ষিত হতে পারে তা হলে কুরআনের অর্থ বা হাদীস কেন সংরক্ষিত হবে না? যদি আপনারা বলেন এই আয়াতটি যে কেউ বানায়নি তার প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। যেমন আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- 'যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর কুরআনে যা আছে তা ঐশী নয় বলে

তাহলে কুরআনের সূরার মত একটি ছোট সূরা বানিয়ে নিয়ে আস'। আর বাস্তবে এ পর্যন্ত কেউ কুরআনের সুরার মত কোন সুরা বানাতে সক্ষম হয়নি।

আমরা বলবো কুরআনের চ্যালেঞ্জ সম্বলিত আয়াত এবং তাদের অক্ষমতা তো হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীস যদি অগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে

কুরআনের চ্যালেঞ্জও অগ্রহণযোগ্য হবে। যদি চ্যালেঞ্জ অগ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে আয়াতটিকে যে কেউ বানায়নি তার প্রমাণ রইল কোথায়?

চতুর্থ বাহানার (প্রতারণার) খন্ডন

আপনাদের এ দাবী কুরআনের আয়াতের সরাসরি বিরোধী। যেমন আল্লাহ বলেন-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

'তোমরা আল্লাহ-রাসূল ও তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীলদের আনুগত্য কর'। উক্ত আয়াতে রাসূল এবং দায়িত্বশীল উভয়ের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। এবং আনুগত্যের সম্বোধন সাহাবা এবং পরবর্তীদের বেলায় সমানহারে প্রযোজ্য।

একটি স্বীকৃত সূত্র হচ্ছে اسم مشتق এর উপর যদি কোন حكم লাগানো হয়, তাহলে ماخذ اشتاق সেই حكم কারণ হয়। যেমন- أكرم العالم অর্থ আলেমকে সম্মান করো। এখানে عالم-اسم مشتق এর উপর সম্মান করার حكم লাগানো হয়েছে। عالم এর ماخذ اشتقاق ইলম। সুতরাং উল্লেখিত সূত্রের আলোকে সম্মানের কারণ দাঁড়াল ইলম। ঠিক তেমনিভাবে আয়াতে أَطِيعُوا الرَّسُولَ এ রাসূলের সাথে আনুগত্যের হুকুম লাগানো হয়েছে। আর রাসুলের মাদ্দা হচ্ছে রেসালাত। সুতরাং আনুগত্যের কারণ হবে রাসূল হওয়া। নেতা হওয়া নয়। রাসূলকে মানা এবং তাঁর আনুগত্য করা সাহাবী হোক বা পরবর্তী কেউ হোক রাসূল হওয়ার কারণে, নেতা হওয়ার কারণে নয়। সুতরাং আপনাদের দাবী সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের আনুগত্য করতেন নেতা হওয়ার কারণে এটা ভিত্তিহীন দাবী। এছাড়াও রাসূলের আনুগত্য যদি নেতা হওয়ার কারণে হয়, তাহলে দায়িত্বশীলের আনুগত্য কোন কারণে হবে? মূলত দায়িত্বশীল বলতে পৃথকভাবে নেতাই বোঝানো হয়েছে। যারা হবেন রাসূল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৫ম বাহানার (প্রতারণার) খন্ডন

যদি আপনারা কুরআন মানেন তাহলে অবশ্যই অপঠিত ওহী মানতে হবে। কারণ কুরআন শরীফের অসংখ্য আয়াতে অপঠিত ওহীর উল্লেখ আছে। তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে-

(১) وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরানোর হুকুম এ কারণে দিলাম যাতে পরীক্ষা করে নিতে পারি। বায়তুল্লার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেওয়ার সময়

কে রাসূলের আনুগত্য করে কে অবাধ্যতা করে’। উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন, আমি বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে মুখ করে

নামায পড়ার হুকুম পুর্বেই দিয়েছিলাম। অথচ কুরআন কারীমের কোন আয়াতেই এই নির্দেশের উল্লেখ নেই। তাহলে আল্লাহ কিভাবে রাসূলকে এ নির্দেশ জানালেন? বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হবে অপঠিত ওহীর মাধ্যমে, যাকে ইলহাম বলে।

(২) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُم (سورة الانفال-٧)

‘যখন আল্লাহ তোমাদেরকে অঙ্গীকার দিয়েছিলেন (বদরে সুগরা এবং বদরে কুবরার) দুই দল থেকে একটি তোমাদের করতলগত হবে, যে, দলের উপরই তোমরা হামলা করবে, বিজয়ী হবে। উক্ত অঙ্গীকারের আলোচনা কুরআনের কোন আয়াতে উল্লেখ নেই। সুতরাং এই অঙ্গীকার আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কিভাবে জানালেন? অবশ্যই অপঠিত ওহী (ইলহামের) মাধ্যমে।

(৩) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (حشر: ٥)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বারের বৃক্ষ কাটালেন তখন মুনাফিকরা সমালোচনা করতে শুরু করলে আল্লাহ বললেন- ‘যা হয়েছে আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে’।

উক্ত নির্দেশের আলোচনা কুরআনের কোন আয়াতে উল্লেখ নেই। তা হলে নির্দেশ কিভাবে দিলেন? মানতে হবে অপঠিত ওহীর মাধ্যমে।

(٤) عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (بقرة: ١٨٧)

‘আল্লাহ জানেন রমযানের রাতে তোমরা নিজেদের নফসের উপর কি কি খেয়ানত কর। তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন। এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে তোমরা স্ত্রী সহবাস কর। এবং সন্তান কামনা কর’।

আয়াতে উল্লেখিত তওবা কবুল ও ক্ষমার ঘোষণার উল্লেখ কুরআনের আয়াতে নেই। তাহলে তওবা কবুল করা এবং ক্ষমা ঘোষণা রাসূলকে কিভাবে জানালেন? অবশ্যই অপঠিত ওহীর মাধ্যমে।

(৫) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَو يُرْسِلَ رَسُولا(شورى٥١)

‘কোন মানুষের জন্য ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাথে কথা বলার, তবে ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা বাহক প্রেরণ কও’।

বুঝা গেল আল্লাহ তাঁর রাসূলের সাথে দু’ভাবে কথা বলেন। এক বাহক বা জিব্রীল প্রেরণের মাধ্যমে। এই কথাগুলোকে কুরআন বলে। আর দুই, বাহক ছাড়া, পর্দার আড়াল থেকে বা ওহীর মাধ্যমে। এই দুই নম্বর প্রকারটিই হচ্ছে অপঠিত ওহী বা ইলহাম।

(٦) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِي إِلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (تحريم: ٣)

‘যখন নবী তাঁর কোন সহধর্মিনীর কাছে কোন কথা গোপন রেখেছিলেন আর ঐ সহধর্মিনী তা ফাঁস করে দিলেন আর আল্লাহও রাসূলকে তা জানিয়ে দিলেন।

তখন রাসূল কোন সহধর্মিনীকে কাছে টানলেন এবং কারো থেকে মুখ ফিরালেন। রাসূল যখন ঁতার সহধর্মিনীকে ফাঁস করে দেওয়ার কথা অবগত করলেন তখন ঐ সহধর্মিনী প্রশ্ন করলেন একথা আপনাকে কে জানালো? উত্তরে নবী বললেন, আমাকে সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত মহান আল্লাহই জানিয়েছেন’।

আয়াতে উল্লেখিত ঘটনা ফাঁসের কথা রাসূলকে জানানোর আলোচনা কুরআনের কোন আয়াতে উল্লেখ নেই। তাহলে কিভাবে জানালেন? অবশ্যই অপঠিত ওহীর মাধ্যমে।

মোটকথা অপঠিত ওহীর অস্তিত্ব ও এর গ্রহণযোগ্যতা পঠিত ওহী বা কুরআনের আয়াতের মাধ্যমেই প্রমাণিত।

৬ষ্ঠ বাহানার (প্রতারণার) খন্ডন

ظن শব্দটি আরবী ভাষায় তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) التخمين বা অনুমান।

(২) الظن الغالب বা প্রবল ধারণা।

(৩) العلم اليقيني الاستدلالي বা অর্জিত দৃঢ় জ্ঞান এবং হাদীসকে যে ظنى বলা হয় তা শেষোক্ত অর্থে। সুতরাং ظنى বলে ধারণা অনুবাদ করা বোকামী বৈ কিছু নয়।

আয়াতের মাধ্যমে দলীল গ্রহণে তাদের অপচেষ্টা

(এক)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقرآن لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (القمر: ١٧)

'আমি কুরআনকে স্মরণ কারীর জন্য সহজ করে দিয়েছি। আছ কি কোন স্মরণকারী?' সুতরাং বুঝা গেল কুরআন একেবারেই সহজ। হাদীসের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

আমাদের জবাব

কুরআনের বিষয়বস্তু দুই প্রকার:

(১) الوعظ বা উপদেশ মূলক।

(২) الأحكام বিধিবিধান মূলক।

উল্লেখিত আয়াতে কুরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ বোঝানো হয়েছে। বিধিবিধান চয়নের জন্য সহজ নয়। এর জন্য হাদীসের প্রয়োজন। তার প্রমাণ আয়াতে للذكر শব্দ উল্লেখ আছে। للاجتهاد বা للاستنباط বলা হয়নি।

(দুই)

কুরআনের স্থানে স্থানে আয়াতগুলোকে বায়্যিনাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ প্রকাশ্য। সুতরাং আয়াত যদি প্রকাশ্য হয়, তাহলে হাদীসের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি?

আমাদের জবাব

প্রকাশ্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ, রাসূলের রেসালাত এবং আখেরাতের বাস্তবতা। বিধিবিধানগুলী প্রকাশ্য হওয়া উদ্দেশ্য নয়।

(তিন)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلى (الكهف١١٠)

'আমি তো তেমাদের মতই মানুষ। আমার কাছে ওহী আসে'। আয়াতে রাসূলকে অন্যান্য মানুষের মতো মানুষ বলা হয়েছে। অন্যান্য মানুষের কথা যেমন দলীল নয়, রাসূলের কথাও দলীল হবে না।

আমাদের জবাব

রাসূলুল্লাহ সা. অন্যান্য মানুষের মতো এর অর্থ হচ্ছে অন্যান্য লোক যেভাবে ইচ্ছা করে মু'জেযা দেখাতে পারে না সেভাবে রাসূলুল্লাহ সা. ও ইচ্ছা করে মু'জেযা দেখাতে পারেন না। আয়াতের শানে নুযুল এবং পূর্ব ইঙ্গিতই এর প্রমাণ।

এছাড়াও আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা. কে অন্যান্য মানুষের মতো মানুষ বলা হলেও ওহী অবতীর্ণ হয় বলে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করা হয়েছে। সুতরাং যার কাছে

ওহী আসবে তাঁর কথা দলীল হবে আর যার কাছে ওহী আসে না তার কথা দলীল না হওয়াই স্বাভাবিক।

(চার)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ (انفال ٦٧)

'কোন নবীর জন্য উচিত নয় যে তাঁর কাছে বন্দী থাকবে অথচ দুনিয়া অর্জনের লোভে তাদের ফাঁসি দেবে না'।

উক্ত আয়াত বদরের যুদ্ধে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে হুজুরকে এর তিরস্কার করে আল্লাহ হুশিয়ার করেছেন। বুঝা গেল সর্বদা রাসূলের ফয়সালা আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সুতরাং রাসূলের কথা কিভাবে দলীল হতে পারে?

আমাদের জবাব

আল্লাহ যদিও রাসূলকে তিরস্কার করেছেন কিন্তু যে সকল সাহাবায়ে কেরাম এই ফয়সালার আনুগত্য করেছিলেন তাঁদেরকে তিরস্কার করা হয় নি। বুঝা গেল রাসূলের সকল কথাই তাঁদের মানা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ এই তিরস্কারে বুঝা গেল রাসূলের সকল কাজ তো দলীলই বটে। কিন্তু কোথাও যদি বিচ্যুতি ঘটে তাহলে আল্লাহ তাঁকে সাবধান করে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

(পাঁচ)

নবীজির বাণী أنتم أعلم بامور دنياكم (তোমরা তোমাদের পার্থিব ব্যাপারে বেশী জ্ঞাত) তা'বীরে নখলের ব্যাপারে রাসূলের এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় রাসূলের সকল কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের জবাব

রাসূলের বক্তব্যের দু'টি দিক আছে-

(১) রাসূল হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে।

(২) ব্যক্তিগত পরামর্শের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে।

১ম প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির বক্তব্য অবশ্যই মানতে হবে কারণ এটা (রেসালাত) তাঁর মূল দায়িত্ব। ২য় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির বক্তব্য মানা জরুরী নয়। কারণ এটা)ইহলৌকিক কল্যাণ) তাঁর মূল দায়িত্ব নয়। উপরোল্লেখিত হাদীসে ২য় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তার প্রমাণ হাদীসে بأمور دنياكم শব্দ প্রয়োগ হয়েছে।

অর্থাৎ পার্থিব বিষয় তোমরা আমার চাইতে বেশি বুঝ। এখানে আমার আনুগত্য তোমাদের জন্য জরুরী নয়।

হাদীস দলীল হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত

রাসূলের হাদীস এর আনুগত্য করা যে জরুরী এ ব্যাপারে অনেক আয়াত আছে। এর মধ্যে ১০টি আয়াত নিম্নে দেওয়া হলো-

(১) ما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر: ٧)

'রাসূল সা. তোমাদেরকে যে কাজের নির্দেশ দেন তা কর এবং যে কাজ থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক'। বুঝা গেল রাসূল সা.এর আনুগত্য জরুরী। আর রাসূল সা.এর আনুগত্য তাঁর কথা ও কাজের আনুগত্যের মাধ্যমে হবে। আর কথা আর কাজকেই হাদীস বলে।

(২) قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (ال عمران: ٣١)

'হে নবী আপনি বলে দিন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তা হলে আমার আনুগত্য কর। তিনি তোমাদেরকে ভালবাসবেন'। আর রাসূলের আনুগত্য তাঁর কথা কাজ এর আনুগত্যের মাধ্যমে হবে।

(৩) اطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء: ٥٩)

'তোমরা আল্লাহ, রাসূল এবং দায়িত্বশীলদের আনুগত্য কর। আয়াতে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য যেভাবে أطيعوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে রাসূলের আনুগত্যের জন্যও স্বতন্ত্র ভাবে أطيعوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বুঝা গেল আল্লাহর আনুগত্যের মতো স্বতন্ত্রভাবে রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। আর আনুগত্য কিভাবে হয় তা তো বলাই হয়েছে।

(৪) وأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (نحل: ٤٤)

'আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আপনি মানুষকে তা ব্যাখ্যা করে বুঝানোর জন। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে'। আয়াতে রাসূলকে ব্যাখ্যা কারী বলা হয়েছে। যদি রাসূলের কথা ও কাজ দলীল না হয় তাহলে তার ব্যাখ্যাকারী হওয়ার কি অর্থ দাঁড়াবে?

(৫) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (نساء ٨٠)

'যে রাসূল সা.-এর আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল'। সুতরাং যদি তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে চাও, তাহলে রাসূল সা.এরও আনুগত্য করো। আর রাসূল সা.এর আনুগত্য তাঁর কথা ও কাজের আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব।

(৬) فلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (نساء: ٦٥)

'আপনার পালনকর্তার শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ না তাদের পরস্পরের দ্বন্দে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করবে। এবং আপনার ফয়সালায় অন্তরে কোন দুঃখ পাবে না এবং নতশীরে মেনে নেবে'। উক্ত আয়াতে রাসূল সা.-এর ফয়সালাকে মেনে নেওয়ার উপরই ঈমানের ভিত্তি রাখা হয়েছে রাসূল। সা.-এর ফয়সালা মানা তার কথা কাজ মানার মাধ্যমেই সম্ভব।

(৭) لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (نور: ٦٣)

'তোমরা রাসূলের আহবানকে পরস্পরের আহবানের মতো মনে করো না'। অর্থাৎ তোমাদের কথা বার্তা যেভাবে দলীল নয় রাসূলের কথাবার্তাকেও সেভাবে দলীলহীন মনে করো না। বরং তাঁর কথা বার্তা দলীল।

(৮) فلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (نور ٦٣)

'যারা রাসূল সা.-এর নির্দেশের বিরোদ্ধাচরণ করে তাদেরকে বিরাট বিভ্রান্তি / বেদনাদায়ক শাস্তির ভয় দেখানো উচিত'। রাসূলের বিরোধিতা তাঁর কথা কাজের বিরোধিতার মাধ্যমে হবে। উক্ত আয়াত হাদীস অস্বীকার কারীদের জন্য কঠোর শাস্তি ঘোষণা করছে।

(৯) ومَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (نساء: ٦٤)

'আমি যত রাসূলই প্রেরণ করেছি আল্লাহর নির্দেশে তাঁদের আনুগত্যের জন্যই প্রেরণ করেছি'। তাদের আনুগত্য তাদের হাদীসের আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব।

(১০) مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (احزاب:٣٦)

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা করে নিলে কোন মুমিন নর নারীর জন্য সমীচিন নয় নিজের মত প্রকাশ করা'। উক্ত আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের ফায়সালার মোকাবেলায় নিজ মতামত প্রকাশের ক্ষমতা রহিত করা হয়েছে। হাদীস অস্বীকারকারীদের দাবী উল্লেখিত মত প্রকাশেরই অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন: যদি রাসূলের হাদীস না থাকত তা হলে আমাদের কেউই কুরআন বুঝতে সক্ষম হতাম না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন: আমি কুরআন শরীফে চিন্তা করে ৩৩টি আয়াত এমন পেয়েছি যেগুলোতে রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ জন্য আমার এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে, যদি কেউ আনুগত্য না করে তাহলে বড় বিভ্রান্তিতে পতিত হবে। আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে তা হচ্ছে হৃদয়ের বক্রতা যা বাড়তে বাড়তে কুফরীতে পৌঁছাবে।

আমাদের যুক্তিভিত্তিক দলীলসমূহ

(১) কুরআনে কারীমে প্রত্যেকটি বিধানের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীসে এ গুলোর ব্যাখ্যা এবং বাস্তবায়নের পদ্ধতি বিধৃত হয়েছে। কুরআন শরীফে আছে নামায কায়েম করো। কিন্তু এ কথা উল্লেখ নেই কত ওয়াক্ত, কত রাকাত এবং কিভাবে? যদি হাদীস দলীল না হয়, তাহলে 'নামায কায়েম করো' এ নির্দেশের উপর কিভাবে আমল হবে?

(২) যদি আপনাদেরকে কেউ প্রশ্ন করে সালাত এর আভিধানিক অর্থ নিতম্ব দুলানো। সুতরাং আকিমুস্ সালাতের অর্থ হবে হে মুসলমানরা তোমরা সকলে নিতম্ব দোলাও। তাহলে আপনাদের উত্তর কি হবে?

(৩) মুশরিকদের একান্ত চাহিদা ছিল কোন রাসূল ছাড়াই আসমান থেকে সরাসরি কোন কিতাব নাযিল হয়ে যাওয়া। যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে - حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ (اسراء ٩٣) আর যদি তাদের এ চাহিদা মতো রাসূল ছাড়াই শুধু কিতাব অবতীর্ণ হতো তাহলে তাদের ঈমান গ্রহণ না করার কোন অজুহাত অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু আল্লাহ তা করেননি। আল্লাহ কেন বাধ্য করে কিতাবের সাথে রাসূল প্রেরণ করলেন? বাস্তবতা হচ্ছে মানুষের হেদায়াতের জন্য শুধু কিতাব যথেষ্ট নয়। বরং এমন একজন শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি মানুষকে কিতাবের উপর আমল করে দেখাবেন। যিনি হবেন অন্যান্যদের জন্য আদর্শ। আর এটি তখনই সম্ভব যখন রাসূলের শিক্ষা তথা হাদীস মানুষের জন্য দলীল হবে।

(৪) নবী যুগের পর থেকে এ পর্যন্ত বিনা বাক্যে সমস্ত উম্মত হাদীসের প্রমাণ্যতা স্বীকার করে আসছেন।

যদি খায়রুল কুরুনের আকাবিরগণ হাদীসের প্রমাণ্যতা স্বীকার করে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকেন এবং ১৪শত বছর পর দ্বীনের সঠিক জ্ঞান গোলাম আহমদ পারভেজদের অর্জন হয় তাহলে কি ঐ দ্বীন অনুসরণের উপযুক্ত হবে? যা ১৪শত বছর পর্যন্ত কোন মানুষই বুঝেনি?

(৫) কুরআনের কুরআন হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যদি হাদীস গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে কুরআনের কুরআন হওয়াই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। তখন আল্লাহর বাণী ও মানুষের কথার মধ্যকার পার্থক্য থাকবে কোথায়?

(৬) যদি আপনাদের কারো কাছে আবেদন করি যে সুরায়ে ফাতেহার তাফসীর করেন, আর তিনি করেন তাহলে কি আপনারা তার তাফসীর মানবে না? অবশ্যই মানবে। তাহলে একজন সাধারণ ব্যক্তির কুরআনের ব্যাখ্যা তাফসীরের নামে মেনে নিতে পারেন, কিন্তু রাসূলের ব্যাখ্যা হাদীসকে মেনে নিতে পারেন না? গোড়ামী আর কাকে বলে?

রাউইও মুহাদ্দিসীনের জীবনী :

সাহাবা

খোলাফায়ে আরবাআ'হ (চার খলিফা) :

হযরত আবুবকর সিদ্দীক্ব রা.

নাম আব্দুল্লাহ বিন উসমান, আবু কুহাফা বিন আমির বিন আমর বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তামীম বিন মুররা। তাঁর উর্ধ্বতনঃ সপ্তম পুরুষের মাধ্যমে নবীজীর বংশের সাথে তাঁর বংশের মিলন হয়। তাঁর উপাধি আতিক (মুক্ত) হওয়ার কারণ- নবীজী সা. বলেছিলেন,

من أراد أن ينظر أبي عتيق من النار فلينظر أبي أبي بكر

'যে জাহান্নাম থেকে মুক্ত ব্যক্তি দেখতে চায়, সে যেন আবু বকরকে দেখে নেয়'। নবীজীর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ইসলাম পূর্ব ও ইসলাম উত্তর উভয় যুগেই নবীজীর পাশে ছিলেন। তিঁনি পূরুষদের মাঝে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর আকৃতি:

তিঁনি ফর্সা, হালকা পাতলা গাল, শুকনো চেহারা, বসা চক্ষু, প্রসস্থ ললাট, হস্তমুষ্টির পৃষ্ঠদেশে ভাসমান রগ ছিল, মেহেদী ও কাতিমের খেজাব ব্যবহার করতেন। তাঁর মাতা-পিতা, সন্তানাদী নাতি পর্যন্ত নবীজীর সহচর্য্য লাভে ধন্য হয়েছেন। অন্য কোন সাহাবী এই সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি।

তাঁর জন্ম :

তিনি মক্কায় হস্তি বাহিনীর আক্রমণের দুই বছর কিছু দিন কম চার মাস পরে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর মৃত্যুঃ তের হিজরী জুমাদাল উখরার ২২ তারিখ মঙ্গলবার রাতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। তাঁর অসিয়ত মোতাবেক তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস তাঁর লাশ ধৌত করেন। হযরত উমর (রা.) তাঁর জানাযা পড়ান। তাঁর খেলাফত কাল ছিল দুই বছর চার মাস। তাঁর কাছ থেকে বহু সাহাবী ও তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি বেশী হাদীস বর্নণা করতে পারেননি। কারণ নবিজীর পর তিনি বেশী দিন বেঁচে থাকেননি।

হযরত ওমর রা.

নাম : ওমর বিন খাত্তাব উপাধি ফারুক, উপনাম আবু হাফস আল আদাউই আল ক্বারশী। নবীজীর নবুয়ত লাভের ৬ষ্ঠ বছর মতান্তরে ৫ম বছর চার জন পুরুষ ও এগারো জন মহিলার পরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো মতে তিনি ছিলেন ৪০তম মুসলমান। তাঁর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম গোপনীয়তা পরিবর্তন করে প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। এ জন্য তাঁকে ফারুক বলা হয়। দাউদ বিন হুসাইন ও যুহরী বলেন, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন জীবরাঈল আঃ অবতরণ করে বলেন, হে মোহাম্মদ! ওমরের ইসলাম গ্রহনে আসমানবাসী ফেরেস্তারা আনন্দ উদযাপন করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, আল্লাহর শপথ আমি ওমর (রা.) এর ইলমের ধারণা পেয়েছি। যদি তাঁর ইলম এক পাল্লায় রাখা হয় আর গোটা জগতবাসীর ইলম অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে ওমর (রা.)-এর ইলমের পাল্লাই ভারী হবে। আমি মনে করি

ওমর ইলমের নয় দশমাংশই নিয়ে গেছেন। তিনিই প্রথম খলিফা, যাকে আমিরুল মু'মিনীন বলে ডাকা হয়। তাঁর আকৃতি তিনি লাল মিশ্রিত ফর্সা রংয়ের মতান্তরে বাদামী রংয়ের ছিলেন। লম্বা, মাথার সম্মুখ ভাগের চুল মুক্ত এবং আঁখিদ্বয় প্রচন্ড লাল ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) এর মৃত্যুর পর তাঁর সম্মতি ও নিয়োগ অনুযায়ী খেলাফত এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তাঁর ইন্তেকাল ২৩ হিজরী, জিলহজ্জের ২৬ তারিখ বুধবার ফজরের নামাযরত অবস্থায় হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-এর ক্রীতদাস আবু লু'লু' তাঁকে তীর নিক্ষেপে আহত করে। ২৪ হিজরী ১০ মুহাররম রবিবার তাঁকে দাফন করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। তাঁর খেলাফতকাল ছিল দশ বছর ছয় মাস। হযরত সোহাইব (রা.) তাঁর জানাযা পড়ান। তাঁর কাছ থেকে হযরত আবু বকর রা., জান্নাত এর সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অবশিষ্টজন সহ বহু সাহাবী ও তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত উসমান রা.

নাম উসমান বিন আফ্‌ফান উপনাম আবু আবদুল্লাহ আল উমাউই আল ক্বারশী তিনি হাবশায় হিজরতকারীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নবীজির কন্যা রুকাইয়ার অসুস্থতার দরুন বদরের যুদ্ধে শরীক হতে না পারলেও নবীজি তাঁর জন্য যুদ্ধ লব্ধ মালে গনীমত থেকে তাঁর অংশ রেখেছিলেন। সন্ধিচুক্তি আলোচনার জন্য মক্কাবাসীর প্রতি নবীজির দূত হিসেবে প্রেরিত হওয়ার কারণে বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। অন্যান্য সাহাবাদের বায়াত গ্রহনের সময় নবীজির এক হাত অন্য হাতের মধ্যে রেখে বলেন এক হাত আমার অন্য হাত উসমানের পক্ষ থেকে। নবীজির দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম কে বিবাহ করার কারণে তাঁকে যিন্‌নুরাইন বা দুই নূরের অধিকারী বলা হয়।

তাঁর আকৃতিঃ

তিনি ফর্সা রংয়ের, মধ্য গঠনের, সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। কেউ বলেন শ্যমলা রং পাতলা তক্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রশস্ত কাঁধ, ঘন চুল, বড় দাড়ি ছিল। ২৪ হিজরী পহেলা মুহাররম খেলাফত লাভ করেন। আসওয়াদ মিশরী মতান্তরে অন্য কোন দুষ্কৃতিকারীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। শনিবারে জান্নাতুল বাক্বীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

তখন তাঁর বয়স ছিল ৮২ মতান্তরে ৮৮ বছর। তাঁর খেলাফতকাল ছিল কিছুদিন কম বার বছর। বহুলোক তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আলী রা.

নাম আলী বিন আবু ত্বালিব উপনাম আবুল হাসান ও আবু তোরাব। মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ। তিনি নবীজির চাচাতো ভাই ও জামাতা ছিলেন। হিজরতের ২৩ বছর পূর্বে ৫৯৯ ঈসায়ীতে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহন করেন। যুবকদের মধ্যে তিনি সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তাবুক ছাড়া সকল যুদ্ধে নবীজির সঙ্গে ছিলেন। কারণ নবীজি

তাঁকে পরিবারের দায়িত্ব অর্পণ করে বলেছিলেন,

ألا ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى ؟

তাঁর আকৃতি

তিনি গাঢ় বাদামী রংয়ের ছিলেন। বড় আঁখি যুগল, লম্বার তুলনায় খাটোর নিকটবর্তী, বড় পেট, ঘন চুল, লম্বা দাড়ি মাথার সম্মুখ ভাগের চুলবিহীন ছিলেন। ৩৫ হিজরীতে জিলহজ্জের ১২ তারিখ শুক্রবার হযরত উসমান (রা.)-এর

শাহাদাৎ-এর দিন খলীফা নিযুক্ত হন। হযরত উসমান (রা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামী রাষ্ট্রের ৪র্থ খলিফা নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনকাল ছিল ৪ বছর ৯ মাস কয়েকদিন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৮৬টি। বুখারী ও মুসলিমে ২০টি, শুধু বুখারীতে ৯টি, শুধু মুসলিমে ১৫টি হাদীস উল্লেখ আছে। ৪০ হিজরী ১৮ রমজান আব্দুর রহমান ইবনে মুলযিম তাঁকে তীর নিক্ষেপে আহত করে। তিনদিন পর ২০ রমজান তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে ধৌত করেন তাঁর দুসন্তান হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) এবং আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর রা.। হযরত হাসান তাঁর জানাযা পড়ান। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ মতান্তরে ৬৪,৭০,৫৮ বছর। হাসান হুসাইন মোহম্মদ সহ বহু সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

(আল ইকমাল বিযিকরি আসমাইর রিজাল)

হযরত আবু মুসা আশআ'রী রা.

নাম আব্দুল্লাহ বিন কায়েছ বিন সালীম বিন হাযযার উপনাম আবু মুসা, মক্কায় ইসলাম গ্রহন করে হাবশা (আবিসিনিয়া বর্তমান ইথিওপিয়া) এর দিকে হিজরত করেন। সেখান থেকে সফিনা দলের সাথে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন নবীজি খায়বারে অবস্থান করছিলেন। ২০ হিজরীতে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সেখানে কর্মরত অবস্থায় তিনি আহওয়ায জয় করেন। এবং একটানা হযরত উসমান (রা.) এর খেলাফতের প্রথম দিক পর্যন্ত বসরায় বহাল থাকেন। অতঃপর বরখাস্ত হন। সেখান থেকে কুফায় ফিরে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত কুফার শাসনকর্তা ছিলেন। ঐতিহাসিক সিফফীন যুদ্ধে দুই মধ্যস্থতাকারীর এক জন ছিলেন। ৫০/৫২ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৮০৬ ও ৩৪৯।

হযরত আবু হুরায়রা রা.

ইসলাম গ্রহণের পুর্বে তাঁর নাম ছিল আব্দে শামস ইবনে সখর। ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলুল্লাহ সা. তাঁর নাম রাখেন আব্দুর রহমান। কারও মতে আব্দুল্লাহ। এবং তাঁর ডাক নাম ছিল আবু হুরায়রা। হিজরতের ২১বছর পূর্বে ৬০১ঈসায়ীতে তাঁর জন্ম হয়। সপ্তম হিজরী সনের মহরম মাসে খায়বার যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নবীজির সর্বক্ষণের সাথী। ইসলাম গ্রহনের পর থেকে নবীজির ইন্তেকাল পর্যন্ত নবীজির সাহাচর্য্য ত্যাগ করেন নাই একমাত্র নবীজির পক্ষ থেকে হাদীস অর্জনের লক্ষ্যে। অন্যান্য সাহাবীগণ পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবসা বাণিজ্য ও চাষাবাদের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু আবু হুরায়রার কোন ব্যস্তাতা ছিলনা। ফলে তিনি নবীজির সর্বোচ্চ বেশী হাদিস সংরক্ষণ করেছেন। তিনি নিজেই বলেন, আমার মুহাজির ভাইগণ অধিকাংশ সময় বাজারে

ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি থাকতাম রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাচর্য্যে। বাহিরে আমার কোন ব্যস্ততা ছিলনা। তাঁরা যখন রাসূলের দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন আমি তখন সেখানে থাকতাম উপস্থিত। তাঁরা ভুলে গেলে আমি তা স্মরণ রাখতাম। অপরদিকে আমার আনসার ভাইগণ তাঁদের ধন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। পক্ষান্তরে আমি ছিলাম আসহাফে সুফফার নিবিষ্ট তালিবে হাদীস। ফলে তাঁরা কোন বিষয় ভুলে গেলেও আমি তা স্মরণ রাখতাম। বুখারী ১/২৭৪।

আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে এত প্রখর স্মরণশক্তি দান করেছিলেন তিনি যা কিছু শুনতেন কিছুই ভুলতেন না। এবং তা ছিল রাসূল (সা.) এ দোআ ও বিশেষ তদবীরের ফল। ইমাম বুখারী বলেন তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৮০০ মনীষী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর যুগে তিনিই ছিলেন হাদীসের সবচেয়ে বড় হাফেয। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা ৫৩৭৪। তার মধ্যে বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ৩২৫ টি হাদীস। শুধু বুখারীতে ৭৯টি এবং শুধু মুসলিমে ৯৩টি। তাহযীবুল কামাল ৪৬২পৃষ্টা।

হযরত আবু হুরায়রা এর কাছে তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস লিখিত ছিল। এতে ৫৩৬৪টি হাদীস ছিল। তাঁর পান্ডুলিপির নাম ছিল সহীফায়ে আবু হুরায়রা। নবীজি এবং খলীফাদের প্রথম যুগে তিনি এই হাদীসগুলো লিখেননি। কিন্তু শেষ বয়সে হাদীসগুলো ভুলে যাওয়ার আশংকায় নিজ উদ্যোগে লিখেছিলেন। তিনি ৫৭ হিজরীতে ৭৮বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আবাদালায়ে ছালাছা

১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.

হিজরতের ৩৫/৩৬ বছর পুর্বে ৫৮৫/৮৬ ঈসায়ীতে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ছিলেন প্রথম সারির মুসলমান। কারও মতে তিনি ছিলেন ৬ষ্ঠ মুসলিম। নবী সা.'র সংগে সকল যুদ্ধে ভ্রমণ করেছেন। তিনি ছিলেন নবীজির লাঠি ও জুতার সংরক্ষক। নবীজির গায়ে তিনি কাপড় পরিয়ে দিতেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে কুফায় শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেন। হযরত হুযায়ফা বলতেন, গাম্ভীর্যে ও পথচলায় আচার আচরনে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ছিলেন নবীজির অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি কুফায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় কুফাকে নববী ইলম দিয়ে আবাদ করেছিলেন। সেখানে প্রায় চার হাজার আলেম তৈরী হয়েছিলেন তাঁর প্রচেষ্টায়। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৮৪৮টি। বুখারী ও মুসলিমে ৬৪টি, শুধু বুখারীতে ২১টি ও মুসলিমে ৩৫টি। তিনি ৩২ হিজরীতে ৬৬/৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। উমদাদুল কারী ১/১৫।

২. হযরত আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস রা.

তিনি ছিলেন রাসূলুললাহ সা.-এর আপন চাচাতো ভাই। তাঁর মাতার নাম ছিল লুবাবা বিনতে হারিছ। উম্মুল মু'মিনিন হযরত মায়মুনা ছিলেন তাঁর খালা। হিজরতের ৩ বছর পূর্বে

৬১৯ ঈসায়ীতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি তাঁর খালা মায়মুনার ঘরেই অবস্থান করতেন। এ কারণে নবীজির রাত্রিকালীন ইবাদত বন্দেগী স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। নবীজি তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন

اللّٰهُمَّ علمه الكتاب و فقهه فى الدين'আল্লাহ ! তাঁকে শিক্ষা দাও কুরআনের ব্যাখ্যা এবং দ্বীনের জ্ঞান'। ফলে তাঁকে আরবের বড় আলেম হিসাবে গণ্য করা হত। নবীজির ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩-১৫ বছর। তিনি জিব্রীল আলাইহিস সালামকে দু বার দেখেছেন। তাঁর থেকে ১৬৬০টি হাদীস বর্নিত। তার মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে ৯৫টি, শুধু বুখারীতে ১২০টি, এবং শুধু মুসলিমে ৪৯টি হাদীস রয়েছে। ৬৮হিজরীতে ৭১বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল ইসাবা ফী তামীযিসসাহাবা ২/৩৩০।

৩. হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.

তিনি হিজরতের ১৪ বছর পুর্বে ৬০৮ ঈসায়ীতে জন্মগ্রহন করেন। নবী সা.'র দরবারের স্বল্প বয়স্ক সাহাবী ছিলেন তিনি। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৩০টি। বুখারী ও মুসলিমে ১৭৩টি, শুধু বুখারীতে ৮১টি এবং মুসলিমে ৩১টি। আবু হুরায়রার পরে তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ হাদীস বর্ণনাকারী। ৮৪ বছর বয়সে ৭০হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। উমদাতুল ক্বারী ১/১১২পৃষ্টা।

হযরত আনাস বিন মালিক রা.

তাঁর পিতার নাম মালিক বিন নযর। মাতার নাম উম্মে সুলায়ম বিনতে মিলহান। হিজরতের ১০ বছর পূর্বে ৬১২ ঈসায়ীতে জন্মগ্রহন করেন। তিনি নবীজির খেদমতে ১০ বছর ছিলেন। নবীজি তাঁর জন্য চারটি দোয়া করেছিলেন। اللّٰهُمَّ بارك في ولده وماله وأطل عمره واغفر ذنبه 'হে আল্লাহ ১। তাঁর সন্তানে বরকত দাও। ২। তাঁর মালে বরকত দাও। ৩। তাঁর হায়াত বাড়িয়ে দাও। ৪। তাঁকে ক্ষমা কর'। এই দোয়ার ফল প্রকাশ হয়েছিল তাঁর নিজের ভাষায়-

لقد دفنت من صلبي مائة الا اثنين 'আমি আমার ঔরশজাত সন্তান ৯৮ জন সহস্তে দাফন করেছি'

وإن شجرتي لتحمل فى السنة مرتين'আমার ফলবৃক্ষ থেকে বছরে দু'বার ফল আহরণ করা হত' ولقد بقيت حتى سئمت الحيواة 'দীর্ঘ হায়াতের কারণে বেঁচে থাকার উপর আমার বিরক্তি এসে গেছে'। এই তিনটি দোআ যখন পেয়ে গেলাম وإنا أرجو الرابعة'চতুর্থটি পাওয়ার ব্যাপারে আমি আশাবাদী'। মিরক্বাত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৬২

তাঁর হাদীসের দারসে মক্কা মদীনা সিরীয়া কুফা বসরার হাদীস শিক্ষার্থীগণ প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে শরীক হতেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস ২২৮৬। বুখারী ও মুসলিমে ১৬৮টি। শুধু বুখারীতে ৮৩টি ও মুসলিমে ৯১টি হাদীস আছে। তিনি নবীজির যুগ থেকেই হাদীস লিখে রাখতেন এবং

নবীজিকে পাঠ করে শুনিয়ে ভুল শুধরাতেন। ১০৩ বছর বয়সে ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বসরা নগরে ইন্তেকালকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা.

হিজরতের ২০ বছর পূর্বে ৬০২ ঈসায়ী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাদীসে বিশেষ পারদর্শী। হাদীসই ছিল তাঁর জীবন সাধনার মূল লক্ষ্য। উহুদের যুদ্ধে তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ শহীদ হলে তিনি নবীজির স্থায়ী সাহচর্য লাভ করেন। মুসলিম জাহানের বড় বড় নগর সফর করেন। তিনি ছিলেন অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৫৪০ টি। বুখারী ও মুসলিমে ৬০ টি, শুধু বুখারীতে ২৬ টি ও মুসলিমে ২৬ ট হাদীস আছে। তিনি ছিলেন দীর্ঘজিবী সাহাবী। মসজিদে নববীতে হাদীস শিক্ষা দানের একটি হালকা তৈরী করেছিলেন। নবীজির ইন্তেকালের পরও ৬৪ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি ৯৪ বছর বয়সে ৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.

নাম সাদ বিন মালিক আনসারী। হিজরতের ১০/২০ বছর পূর্বে ৬০২/৬১২ ঈসায়ী সনে জন্মগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা শহীদ হন। এরপর থেকে নবীজির সাহাচার্য লাভ করেন একনিষ্ঠভাবে। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১১৭০ টি। তিনি ছিলেন ফকীহ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন। নবীজি ছাড়াও বহু সাহাবীর কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং বহু সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ননা করেছেন। তিনি ৮৪ বছর বয়সে ৬৪/৭৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। জান্নাতুল বাক্বীতে তাঁকে দাফন করা হয়। আল ইসাবা ফিততামীযিসসাহাব ২/৩৫।

হযরত মা'য বিন জাবাল রা.

উপনাম আবু আব্দুল্লাহ আনসারী খাযরাযী। ১৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। বাইআতে আকাবায়ে সানীয়ায় অংশগ্রহণকারী ৭০ জন আনসারীদের একজন ছিলেন। বদর সহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। নবীজি তাঁকে শিক্ষক ও শাসনকর্তা হিসাবে ইয়ামান প্রেরন করেন। তাঁর কাছ থেকে হযরত ওমর (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.) ইবনে ওমর সহ অনেকেই রিওয়ায়াত করেছেন। হযরত ওমর তাঁকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন হযরত আবু উবায়দা ইবনুর যাররাহ (রা.)-এর পর। সে বছরই (طاعون) ব্যাপক মহামারীতে ১৮ হিজরীতে ৩৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

হযরত সালমান ফারসী রা.

উপনাম আবু আব্দিল্লাহ। নবীজির আযাদকৃত গোলাম। মূলত পারস্যের রামহরমুজের অধিবাসী জমিদার পরিবারের লোক ছিলেন। এমনকি কেউ বলেন তিনি স্পেনের জয় নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সত্য ধর্মান্বেষণে বের হয়ে প্রথমে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এই ধর্মের প্রচুর গ্রন্থাবলী পাঠ করেন। ধারাবাহিক ভাবে বহু কষ্ট স্বীকার করেন। অতঃপর আরব্য ও সিরীয় লোকেরা তাঁকে ইহুদীদের হাতে বিক্রী করে দেয়। তিনি মুক্তিপণে চুক্তিবব্ধ হন। নবীজি তাঁকে মুক্তিপণ আদায়ে পূর্ণ সহযোগীতা করেন। বর্ণিত আছে পারস্য থেকে সত্য ধর্ম অন্বেষণে বের হয়ে নবীজির সান্নিধ্যে পৌছা পর্যন্ত ১০ বারেরও বেশি গোলাম হিসাবে বিক্রীত হয়েছেন। নবীজির মদিনায় হিজরতের পর সালমান নবীজির সান্নিধ্য পান ও ইসলাম গ্রহন করেন। নবীজি তাঁর ব্যাপারে বলতেন সালমান আমার পরিবারভূক্ত। জান্নাত যাদের জন্য সালমান তাঁদের একজন।

তিনি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। কারও মতে ২৫০ বছর কারও মতে ৩৫০ বছর বেঁচে ছিলেন। কারও মতে হযরত ইসা আ.-এর যুগ পেয়েছিলেন। তিনি স্বহস্তে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহে ও দান খয়রাতে ব্যয় করতেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত অসংখ্য। নবীজি অসংখ্য হাদীসে তাঁর ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। ৩৫ হিজরীতে ইরাকের মাদায়েনে (যার বর্তমান সালমান পাক)

ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু হুরায়রা তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু যর গিফারী রা.

নাম জুনদাব বিন জুনাদাহ। তিনি মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে জ্ঞানী ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। কারও মতে তিনি পঞ্চম মুসলমান। ইসলাম গ্রহণ করার পর খন্দক যুদ্ধের সময় নবীজির কাছে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর গোত্রের কাছেই ছিলেন। অতঃপর রাবযা নামক স্থানে

বসবাসকালে ৩২ হিজরীতে হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফত যুগে ইন্তেকাল করেন। নবীজির নবুওত প্রাপ্তির পূর্ব থেকে তিনি আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তাঁর কাছ থেকে অনেক সাহাবী ও তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত নু'মান বিন বশীর রা.

উপনাম আবু আব্দুল্লাহ আনসারী। তিনি ছিলেন হিজরতের পর আনসারীদের প্রথম জন্মগ্রহণকারী সন্তান। নবীজির ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৮ বছর ৭ মাস। তাঁর মাতা পিতাও মুসলমান ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে কুফার শাসনকর্তা ও সেখানের অধিবাসী ছিলেন। অতঃপর হিমসের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) এর জন্য দো'আ করার কারণে হিমস বাসী তাঁকে ৬৪ হিজরীতে শহীদ করে ফেলে। তাঁর কাছ থেকে তাঁর ছেলে মুহাম্মদ ও শা'বী সহ অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস বিন ওয়াইল বিন হাশিম বিন সুআইদ বিন সা'দ বিন সাহম আস্‌সাহমী। উপনাম আবু মুহাম্মদ, আবু আব্দুর রহমান। অধিক হাদীস বর্ণনা কারী ও ফকীহ আবাদালাহদের একজন। তিনি মক্কার কুরাইশ বংশে হিজরতের ৭বছর পুর্বে ৬১৫ ঈসায়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম থেকে হাদীস লিখতেন। তাঁর পান্ডুলিপির নামছিল আসসহীফাতুস সাদিকা। বুখারী ১/২২ পৃষ্ঠায় আবু হুরায়রা (রা.)-এর বক্তব্য তাঁর ব্যাপারে এ রকম। নবীজির কোন সাহাবী আমার চাইতে বেশী হাদীস মুখস্তকারী ছিলেন না। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন আমর। তিনি আমার চেয়ে বেশী হাদীস মুখস্তকারী ছিলেন। এর কারণ তিনি হাদীস লিখতেন আর আমি লিখতাম না। এতে অনুমান হয় তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা হযরত আবু হুরায়রার ৫৩৭৪ টির চাইতেও বেশী হবে। কিন্তু বর্তমানে তার বর্ণিত হাদীস ৭০০ টি। ১৭ টি বুখারী ও মুসলিমে, ৮ টি শুধু বুখারীতে, ২০ টি শুধু মুসলিমে পাওয়া যায়।

তাঁর অধিক সংখ্যক হাদীস মুখস্ত থাকা সত্ত্বেও বর্ণনা এত কম হওয়ার কারণ আবু হুরায়রা থাকতেন মদিনায় যেখানে হাদীসের ছাত্রদের কেন্দ্র ছিল। পক্ষান্তরে তিনি থাকতেন সিরিয়ায়। যেখানে হাদীসের ছাত্ররা সহজে পৌছা সম্ভব ছিলনা। তাই তাঁর সংগ্রহে থাকা সত্ত্বেও বর্ণনা করেছেন অনেক কম।

তিনি তাঁর সংকলিত সহীফায়ে সাদেকা অত্যন্ত যত্নসহকারে রাখতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রপৌত্র হযরত আমর বিন সুয়াইব এর হস্তগত হয়। যিনি অধিকাংশ সময়ে আন আবিহী আন জাদ্দিহী সুত্রে বর্ণনা করতেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন

এবং আলী ইবনুল মাদীনী বলেন উক্ত সূত্রে বর্ণিত তাঁর হাদীসগুলো বুঝতে হবে সহীফায়ে সাদিকারই হাদীস।

তিনি ৭২বছর জিবীত ছিলেন। ৬৩/৬৫/৬৭/৬৯ হিজরীতে মক্কা/তায়েফ/ মিশরে ইন্তেকাল করেন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মতে তিনি ৬৫হিজরীতে সিরীয়ায় ইন্তেকাল করেন। উমদাদুল ক্বারী ১/২০৪। আল ইসাবা ২/২৫২। বিশুদ্ধ মতানুসারে ত্বায়েফের লাইলাতুল হাররায় ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৩৪৬।

হযরত আমর ইবনুল আস রা.

তিনি আসসাহমী আল কারশী গোত্রের ছিলেন। পঞ্চম হিজরীতে মতান্তরে অষ্টম হিজরীতেই জন্মগ্রহণ করেন। হযরত খালেদ বিন ওলীদ ও উসমান বিন তালহার সাথে তিনি মুসলমান হন। নবীজি তাঁকে আম্মানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। নবীজির ইন্তেকাল পর্যন্ত সেখানে বহাল থাকেন। অতঃপর হযরত ওমর তাঁকে আবার নিযুক্ত করেন। একটানা ওসমান ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন।

তিনি হযরত ওমরের যুগে মিশর জয় করেন এবং হযরত ওমরের জীবিত থাকা পর্যন্ত মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) তাঁকে প্রায় চার বছর স্বপদে বহাল রাখার পর বরখাস্ত করেন। অতপর হযরত মুয়াবিয়া আবার তাঁকে নিযুক্ত করেন। তিনি ৪৩ হিজরীতে ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পরে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। হযরত ওমর তাঁকে বরখাস্ত করেন। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ, ইবনে ওমর ও কায়েছ বিন আবি হাযিম সহ অনেকে তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)

উপনাম আবু বকর আল আসাদী আল কারশী। নবীজি তাঁকে তাঁর নানা আবু বকরের নামে উপাধি দিয়েছিলেন। মদিনায় হিজরতের পরে তিনিই ছিলেন মুহাজিরদের প্রথম জন্মগ্রহণকারী সন্তান। হযরত আবু বকর তাঁর কানে আযান দিয়েছিলেন। মদিনার উপকণ্ঠে কুবায় তাঁর মা আসমা (রা.) তাঁকে প্রসব করেন। অতঃপর দরবারে নিয়ে এসে নবীজির কুলে রাখেন।

নবীজি একটি খেজুর চেয়ে নিয়ে চিবিয়ে তাঁর মুখে দেন। যাকে তাহনীক বলে। সর্বপ্রথম তাঁর পেটেই নবীজির লালা প্রবেশ করে। অতঃপর নবীজি তাঁর জন্য বরকতের দোয়া করেন।

তিনি শ্যামলা রংয়ের ছিলেন। তাঁর চেহারায় লোম দাড়ি কিছুই ছিলনা।

তিনি অধিকাংশ সময়ই রোযা ও নামাযে কাটাতেন। সত্যপ্রেমী, আত্মীয়তা রক্ষাকারী ছিলেন। তাঁর মতো সৌভাগ্য সকলের হয় না। তাঁর পিতা নবীজির ঘনিষ্ট বন্ধু। তাঁর মাতা সিদ্দীক কন্যা আসমা। নানা আবু বকর। দাদী নবীজির ফুফু সুফিয়া। খালা নবীজির স্ত্রী আয়শা।

৮ বছর বয়সেই নবীজির হাতে বায়াত হন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে মক্কায় শুলে চড়িয়ে শহীদ করে। ৭৩ হিজরীর জুমাদাল উখরার ১৭ তারিখ মঙ্গলবারে তিনি শহীদ হন। ৫৪ হিজরীতে তাঁর খেলাফতের বায়াত গ্রহন করেন। তাঁর পূর্বের কাউকেই খেলাফতের প্রস্তাব দেয়া হয়নি। হিজাজ, ইয়ামান, ইরাক, খুরাসান শুধুমাত্র সিরিয়াএর কিছু অঞ্চল ছাড়া সমগ্র আরব বাসী তাঁর আনুগত্যে ঐক্যমত্য পোষণ করেন। ৮ বার তিনি জনগনসহ হজ্ব করেন। তাঁর কাছ থেকে বহু শিক্ষার্থী হাদীস বর্ননা করেছেন।

হযরত বিলাল বিন রাবাহ রা.

তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। বদরসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সিরীয়ায় বসবাস করতেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। বহু সাহাবা ও তাবেঈ তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ২০ হিজরীতে দামেস্কে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বাবুসসগীর নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। কারও মতে হুলবে ইন্তেকাল করেন। বাবুল আরবাইন নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। ইসলাম গ্রহণের কারণে মক্কাবাসী যাদেরকে কষ্ট দিত তিনি তাদের অন্যতম। যারা তাঁকে কষ্ট দিত তাদের মধ্যে উমাইয়া বিন খালফ ছিল অন্যতম। আল্লাহর কুদরতে বদর যুদ্ধে হযরত বেলাল তাঁকে হত্যা করেন। হযরত জাবির বলেন هو سيدنا وأعتق سيدنا আবু বকর আমাদের সরদার। তিনি আমাদের আরেক সরদার (বেলাল) কে মুক্ত করে দিয়েছেন।

হযরত যায়দ বিন ছাবিত রা.

যায়দ বিন ছাবিত বিন আয্যাহ্হাক বিন লাওযান। আল আনছারী আন্নাজ্জারী। উপনাম আবুসাঈদ ও আবু খারেজাহ। ওহী লেখক বিশিষ্ট সাহাবী। মাসরূক বলেন, তিনি অগাধ ইলমের অধিকারী ছিলেন। ইন্তেকাল করেন ৪৫/৫৮ হিজরীতে। কারো মতে ৫০ হিজরীর পর। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ২২৬।

হযরত হাফসা রা.

তিনি উম্মুল মু'মিনিন হযরত হাফসা রা.। তাঁর মাতা যয়নব বিনতে মাযউন। নবীজির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তিনি খুনায়ছ বিন হুযাফা আস সাহমীর স্ত্রী ছিলেন। তাঁকে নিয়ে তিনি হিজরত করেছিলেন। বদর যুদ্ধের পর তাঁর

স্বামী মারা যান। হযরত উমর পর্যায়ক্রমে আবু বকর ও উসমানকে হাফসার বিবাহের প্রস্তাব দেন। তাঁরা কেউই সাড়া দেননি। অতঃপর নবীজি তাঁকে বিয়ে করেন তৃতীয় হিজরীতে। নবীজি তাঁকে এক তালাক দেয়ার পর রেযআত করেন। এ ব্যাপারে যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল

رجع حفصة فإنها صوامة و قوامة و صاحبتك فى الجنة

হাফসাকে প্রত্যাবর্তন করুন কেননা সে অধিক রোযাদার ও নামাযী। এবং সে তোমার জান্নাতেও স্ত্রী।

হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রা.

তিনি উম্মুল মু'মিনিন খাদিজা বিনতে খুয়াইলীদ বিন আসাদ আল কারশী। তিনি পর্যায়ক্রমে আবু হালা বিন যুরারা ও আতিক বিন আ'ইয এর স্ত্রী ছিলেন। অতঃপর নবীজি তাঁকে বিয়ে করেন। এ সময় নবীজির বয়স ছিল ২৫ বছর এবং তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। নবীজি তাঁর আগেও কাউকে বিয়ে করেননি এমনকি তাঁর জীবদ্দশায়ও কাউকে বিয়ে করেননি। তিনি নবীজির সাথে ২৫ বছর সংসার করেছিলেন। সর্বপ্রথম তিনিই সকল নারী পুরুষের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইব্রাহীম ছাড়া নবীজির সকল সন্তানই ছিলেন তাঁর গর্ভজাত। ইব্রাহীম ছিলেন নবীজির দাসী মারিয়া ক্বিবত্বিয়ার গর্ভজাত। তিনি মক্কায় হিজরতের ৩/৪/৫ বছর পূর্বে নবীজির নবুওত প্রাপ্তি দশম বছর ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে (হাযুন পাহাড়) বর্তমান জান্নাতুল মুয়াল্লায় দাফন করা হয়।

হযরত উম্মে সালমা রা.

তিনি উম্মুল মু'মিনীন। নাম হিন্দ বিন্তে আবি উমাইয়া। পুর্বে তিনি আবু সালমার স্ত্রী ছিলেন। তিনি যখন ৩য় হিজরী মতান্তরে ৪র্থ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেন তখন নবীজি তাঁকে আবু সালামার ইন্তেকালের বছর শাওয়াল মাসের শেষের দিকে বিবাহ করেন। তিনি ৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাক্বীতে তাকে দাফন করা হয়। তখন তঁর বয়স ছিল ৮৪ বছর। তাঁর কাছ থেকে তাঁর ছেলে উমর ও মেয়ে যায়নাব, হযরত ইবনে আব্বাস, আয়শা ও ইবনে মুসাইয়াবসহ বহু সাহাবী ও তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়শা সিদ্দিকা রা.

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.) হিজরতের ৯ বছর পুর্বে ৬১৩ ঈসায়ী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বছর বয়সে নবীজির সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ৯ বছর বয়সে সংসার শুরু করেন। সংসারের সময় ছিল ৯ বছর। তাঁর ১৮ বছর বয়সে নবীজির ইন্তেকাল হয়। অতঃপর প্রায় ৩৯ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত

হাদীস সংখ্যা ২২১০ টি। বুখারী ও মুসলিমে ১৭৪ টি, শুধু বুখারীতে ৫৪ এবং মুসলিমে ৫৮টি। উমদাদুল ক্বারী ১/৩৮। তিনি ছিলেন বড় ফিকহাবিদ সাহাবীয়া এবং অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসা। ৬৭ বছর বয়সে ৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা.

উম্মুল মু'মিনীন। তাঁর মাতা উমাইয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব নবীজির ফুফু ছিলেন। পূর্বে তিনি নবীজির পালক পুত্র যায়েদ বিন হারেছার স্ত্রী ছিলেন। তিনি তালাক দেয়ার পর নবীজি তাঁকে ৫ম হিজরীতে বিবাহ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম নবীজির পর ইন্তেকাল করেন। তাঁর নাম ছিল বাররাহ। নবীজি তাঁর নাম পরিবর্তন করে নাম দেন যয়নব। হযরত আয়শা তার ভূয়সী প্রসংসা করে বলেছেন

ولم تكن إمراة خيرا منها فى الدين وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد تبذلا لنفسها فى العمل الذى يتصدق به ويتقرب إلى الله تعالى

মদিনায় ২০/২১ জিহরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কাছ থেকে হযরত আয়শা ও উম্মে হাবীবাহ সহ অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর রা.

তাঁকে ذات النطاقين(দুইপট্টি ওয়ালী) বলা হয়। কেননা তিনি নবীজির হিজরতের রাতে কোমরের পট্টি খুলে দু টুকরা করে একটি দিয়ে দস্তারখানা অপরটি দিয়ে পানির মশক বেধে দিয়েছিলেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের মাতা। ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় ইসলাম গ্রহন করেন। কেউ বলেন তিন ১৮তম মুসলমান। তিনি হযরত আয়শা রা.এর ১০ বছরের বড়। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের শাহাদাতের ১০/২০দিন পর তাঁকে ফাসির কাষ্ট থেকে নামানোর পর ১০০ বছর বয়সে ৭৩ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর কাছ থেকে বহু লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আলক্বামা ইবনে ওয়াক্বাস রা.

আল লাইসী। নবীজির যুগে জন্মগ্রহন করেন। খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের আমলে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁর নাতি উমর ও মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম তাইমী রিওয়ায়াত করেন।

ক্বাতাদা ইবনে নু'মান রা.

ক্বাতাদা বিন নুমান বিন যায়েদ বিন আমির আল আনসারী আযযাফারী। বদর যুদ্দে অংশ গ্রহন কারী বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি হযরত আবু সাঈদ (রা.) এর বৈপিত্রিয় ভাই। বিশুদ্ধ মতানুসারে তিনি তেইশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৫৩২।

কয়েকজন তাবেঈর জীবনী

হযরত হাসান বসরী রহ.

নাম হাসান। উপনাম আবু সাইদ। পিতা আবুল হাসান ইয়াসার বসরী। তাঁর মাতা খায়তারা উম্মুল মু'মিনিন উম্মে সালমার বাঁদী ছিলেন। ২১ হিজরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা

কোন কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় তিনি দুধ পানের জন্য কাঁদলে উম্মে সালমা তাঁকে স্তন্য দান করতেন। তাঁর জীবদ্দশায় বহু সাহাবী বেঁচে ছিলেন। তিনি সকল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। সকল ফিতনা থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। বড় আবেদ পরহেজগার, শুদ্ধ ও মিষ্টভাষী, সুন্দর ও

অমায়িক ছিলেন। হাফেজ যাহাবীর ভাষায় তিনি ছিলেন ইলমের সাগর। তিনি হযরত উসমান, আবু মুসা আসআরি, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক প্রমুখ বড় বড় সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী থেকে তাঁর বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়। ১১০ হিজরীতে রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। তাহযীবুত তাহযীব ২/৬২৩। ইকমাল ফি আসমাইর রিজাল।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ.

হযরত উমর (রা.) এর খেলাফতের ২য় বা ৪র্থ বছরে জন্মগ্রহন করেন। হযরত আবু হুরায়রা ছিলেন তাঁর শশুর। এ সুবাদে হাদীস অর্জন তাঁর জন্য সহজতর হয়েছিল। তাঁর অধিকাংশ হাদীস-ই আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। একবার যা শুনতেন চিরদিন স্মরনে রাখতে পারতেন।

আবু হুরায়রা (রা.) ছাড়াও উবাই ইবনে কাব রা.,আনাস ইবনে মালিক রা.,বারা ইবনে আযিব রা,যাবের ইবনে আব্দুলরাহ রা., যুবায়ের ইবনে মুতঈম রা., যায়েদ ইবনে ছাবেত রা.,আব্দুল্লাাহ ইবনে আব্বাস রা.,আব্দুললাহ ইবনে উমর রা.প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছেন উসামা ইবনে যায়েদ আল লাইছি, ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া, ছালিম ইবনে আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম, ইবনে শিহাব যুহরী প্রমুখ তাবেঈগন। তিনি ছিলেন তৎকালীন মদীনার বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিস। মাকহুল বলেন- ইলমার্জনের জন্য আমি বহু স্থানে গিয়েছি কিন্তু ইবনে মুসাইয়াব এর মত বড় আলেম পাইনি। সুলায়মান ইবনে মুসা বলেন তিনি ছিলেন তাবেঈনদের সবচেয়ে বড় ফকীহ। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন তিনি ওলীদ ইবনে আব্দুল মালিক এর খেলাফত কালে ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল ৭৫ বছর। তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল। ১১/৬৬। ইকমাল ফি আসমাইর রিজাল।

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহ.

প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। পিতার নাম মুসলিম। দাদার নাম শিহাব। দাদার দিক থেকে সম্বন্দযুক্ত করে তাঁকে ইবনে শিহাব বলা হয়। তার উর্ধ্বতন পুরুষ যুহরা ইবনে কিলাবের দিকে নিসবত করে তাঁকে যুহরী বলা হয়। উপনাম আবু বকর। তবে তিনি ইবনে শিহাব যুহরী নামেই প্রসিদ্ধ। ৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহন করেন। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন।

তিনি আনাস ইবনে মালিক রা., সাহাল ইবনে সাদ রা., যায়েদ ইবনে ইয়াযিদ রা., শুয়াইব রা, আব্দুর রহমান ইবনে সাদ রা., রাবিয়া ইবনে আতাদ রা., মাহমুদ ইবনে রবিআ. ও আবু তুফাইল প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা

করেছেন অসাংখ্য তাবেঈ। তিনি ছিলেন অপুর্ব স্মৃতিশক্তির অধিকারী। আরম ইবনে দিনার বলেন, ইমাম যুহরীর মুকাবেলায় হাদীসের অধিক প্রামান্য ও অকাট্য ব্যক্তিত্ব কাউকে পাইনি। আল্লাহ তাঁকে অপরিসীম স্মরনশক্তি দান করেছিলেন। ইমাম বুখারীর বর্ণনা মতে তিনি মাত্র

৮০টি রাত্রে পুর্ণ কোরআন মজীদ মুখস্ত করে ফেলেন। তিনি নিজেই বলেন, মুখস্ত করে নেওয়ার পর আমি কখনও ভুলিনা। আল হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন পৃঃ ১৭৫।

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ.এর আদেশক্রমে সর্বপ্রথম তিনিই হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করেন। এ মর্মে ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন-

لولا الزهري لذهب السنن من المدينة যুহরী না থাকলে মদীনায় হাদীস সমুহ নিঃসন্দেহে বিলীন হয়ে যেত। স্বয়ং উমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার ব্যাপারে বলেন- لم يبق أحد أعلم بالسنة من الزهري সুন্নত ও হাদীস সম্পর্কে যুহরী অপেক্ষা বিগত কালের কোন বড় আলেম বেঁচে নেই। ১২৪ হিজরীতে সিরীয়ার সাগবাদা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। সেখানে-ই তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্য ২২০০। তাযকিরাতুল হুফফায ১/১০৯। তাহযীবুত তাহযীব ৯/৪৪৫।

হযরত ইকরিমা রহ.

তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। ২৭ হিজরীতে জন্মগ্রহন করেন। হযরত ইবনে আব্বাসই তাঁকে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা দান করেন। ইকরিমা নিজেই বলেন- ইবনে আব্বাস আমার পায়ে বেড়ি পরিয়ে আটকে রেখে কোরআন হাদীস শিক্ষা দিতেন। তিনি মক্কার বিশিষ্ট ফকীহ তাবেঈ ছিলেন।

ইবনে আব্বাস ছাড়াও আয়শা রা.আবু হুরায়রা (রা.) আবু সাইদ খুদরী (রা.) হাসান ইবনে আলী (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) প্রমুখ সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর কাছ থেকে জাবির ইবনে ইয়াযীদ রহ. আমর ইবনে দীনার রহ. কাতাদা রহ. আইয়ূব রহ. সহ বিপুল সংখ্যক তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাইদ ইবনে মুসাইয়াবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনার চেয়ে অধিক হাদীসের জ্ঞানী কেউ আছেন কি ? তিনি বলেন, হ্যাঁ আছেন তিনি হচ্ছেন ইকরামা। ৮০বছর বয়সে ১০৭বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আল ইকমাল (মিশকাত) পৃ ৬১২

হযরত আলক্বামাহ রহ.

আলক্বামাহ বিন ওক্বক্বাস আল্লাইছী আলমাদানী। বিশ্বস্থ , ৩য় তবক্বার তাবেঈ। যারা বলেন তিনি সাহাবী ছিলেন তাদের কথা ঠিক নয়। কারো মতে তিনি নবীজীর যুগে জন্ম গ্রহন করে খলীফা আব্দুল মালিকের যুগে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৪৫৫।

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ রহ.

তিনি বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের ছেলে। উপনাম আবু বাকরা। সালিম ইবনে আব্দুল্লাহর সহোদর ভাই। তাঁর ঘর ও পরিবার ছিল ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। এই পরিবেশে তিনি অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলেন। তিনি বহু সাহাবী ও তাবেঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁর ছেলে কাশিম এবং ইমাম যুহরীসহ বড় বড় তাবেঈগন হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরী বলেন হাদীস বর্ণনায় তাঁর জুড়ি নেই। আবু যুরআ, নাসাঈ,ইবনে হিব্বান ও ইবনে হাজার রহ.বলেন- তিনি একজন বিশ্বস্ত রাউই ছিলেন। তার ভাই সালিমের পুর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম তারিখ ও মৃত্যু তারিখ জানা যায়নি। তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল ১৯/৭৭।

হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ রহ.

উপনাম আবু আমর। মদীনার শীর্ষস্থানীয় তাবেঈদের অন্যতম ছিলেন। এবং ইলম ও আমলের সমন্বয়ক। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ছাড়াও আবু হুরায়রা আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) আয়শা সিদ্দীকা (রা.) এর কাছ থেকে হাদীস লাভ করেছিলেন। ১০৬হিজরীতে জিলহজ্ব মাসে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

হযরত হিশাম বিন উরওয়াহ রহ.

হিশাম নামে কমপক্ষে ৪জন তাবেঈ ছিলেন।

১) হিশাম বিন উরওয়াহ ২) হিশাম বিন যায়েদ, ৩) হিশাম বিন আম্মার, ৪) হিশাম বিন যিয়াদ। তিনি হিশাম বিন উরওয়াহ বিন যুবায়ের। উপনাম আবুল মুনযির আল কারশী আল মাদানী। তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ অধিক হাদীস বর্ণনাকারী বড় বড় আলেমদের মাঝে গন্য। প্রজ্ঞাবান তাবেঈদের একজন ছিলেন। তিনি

হাদীস অর্জন করেছেন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ও ইবনে উমর (রা.) থেকে। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন সওরী, মালিক বিন আনাস, ইবনে উইয়াইনাসহ বহু শিক্ষার্থী। খলীফা মনসুরের শাসনামলে তিনি বাগদাদ এসেছিলেন। ৬১ হিজরীতে তাঁর জন্ম ও ১৪৬ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

হযরত উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের রহ.

২২ হিজরীতে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ হাদীস বিশারদ। তাঁর পিতা, ভাই, মা, খালা সকল নিকটাত্নীয়-ই হাদীসে পারদর্শী ছিলেন। এ সুযোগে সকলের কাছ থেকে তিনি হাদীস অর্জন করেন। হযরত আয়শা ছিলেন তাঁর খালা। এ সুবাদে তাঁর কাছে বার বার যেতেন এবং সকলের তুলনায় বেশী হাদীস শিখতে পারতেন। তিনি নিজেই বলেন হযরত আয়শা (রা.) ইন্তেকালের আগেই আমি তাঁর সমুদয় ইলমে হাদীস অর্জন করে ছিলাম। মদীনার ৭ফক্বীহদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বড় ফক্বীহ। হাসিম বিন হামযা রহ., আসিম বিন মনযির রহ.,আব্দুললাহ বিন দিনার রহ.সহ বড় বড় তাবেঈগন তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৯৯/১০১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ.

নাম, আসলম। ডাকনাম আতা। উপনাম আবু মুহাম্মদ মক্কী কুরায়শী। তিনি ইবনে খুসাইমের আজাদকৃত গোলাম ছিলেন। উসমান (রা.) এর খেলাখতের শেষদিকে জন্মগ্রহনকারী বিশিষ্ট তাবেঈ ছিলেন। তিনি আবাদালায়ে আরবাআ তথা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে হাদীস শুনেছেন। এছাড়াও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) আবু হুরায়রা রা.আয়শা রা.আবু সাঈদ খুদরী রা.প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমর ইবনে দীনার, যুহরী, কাতাদাহসহ অনেক তাবেঈগন হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন মক্কাবাসীর মুফতী। তিনি হাবসী গোলাম হওয়া সত্ত্বেও ইলম ও আমল তাকওয়া ও পরহেজগারীর দিক দিয়ে সৈয়দ বংশের তাবেঈদের মধ্যে গন্য হতেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত হাফেযুল হাদীস। তিনি ৮৮ বছর বয়সে ১১৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত ইব্রাহীম নখঈ রহ.

নাম ইব্রাহীম বিন ইয়াযীদ বিন কায়েছ। উর্ধ্বতন পুরুষের নাম ছিল মালিক ইবনে নখআ। সেই নখআর দিকে নিসবত করে তাঁকে ‘নখই’ বলা হয়। তিনি কুফার শ্রেষ্ট তাবেঈদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর চাচা আলকামা ও মামা আসওয়াদ উভয়ই কুফার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হযরত আয়শার খেদমতে যাতায়াত

করতেন এবং তাঁর মজলিশ সমুহে যোগদান করতেন। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ হাফিযুল হাদীস। আযলি বলেন- নখই পুণ্যবান ফকীহ এবং স্বল্পভাষী ছিলেন। ৪৯/৫৮ বছর বয়সে ৯৬হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তাহযীবুল আসমা ১/১০৫। তাহযীবুত তাহযীব ১/১৭৭।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী মাদানী রহ.

উপনাম আবু সাইদ। বিশিষ্ট তাবেঈদের অন্যতম ছিলেন। হাফেয যাহাবী তাকে হাফিয ও শায়খুল ইসলাম নামে উল্লেখ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন হযরত আনাস (রা.) সাইব (রা.) আবু উমামা (রা.) সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রা.ক্বাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রা.) ছাড়াও বহু সাহাবী ও তাবেঈ থেকে। তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ননা করেছেন শু'বা, হিশাব ইবনে উরওয়া, মালিক ইবনে আনাছ, সুফিয়ান সওরী, হাম্মাদ ইবনে মুবারক, ইবনে ওয়াইনা সহ বহু তাবেঈ। আইয়ুব ছখতিয়ানী বলেন- তিনি ছিলেন মদীনার বড় ফকীহ। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ হাফিজুল হাদীস। তাঁর বর্ণিত হাদীস ৩০০টি। উমাইয়া খেলাফতকালে মদীনায় বিচারক পদে নিযুক্ত হন। খলীফা মনসুরের খেলাফত কালে তিনি ইরাকের বিচারক নিযুক্ত হন। ১৪৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মদীনায় বিক্ষিপ্ত হাদীসগুলো একত্র করণে যুহরীর পরেই তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ইয়াযিদ ইবনে হারুন বলেন- ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ তাঁর বর্ণিত ৩০০ হাদীস মুখস্ত করেছিলেন। তাযকিরাতুল হুফফায ১/১৩৯।

হযরত আল আসওয়াদ রহ.

তিনি আল আসওয়াদ বিন হেলাল আল মুহারিবী। তিনি হযরত আমর বিন মাআয ও ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন। এবং তাঁর কাছ থেকে বহু লোক বর্ণনা করেন। ৮৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত মুজাহিদ রহ.

তিনি মুজাহিদ বিন জাব্‌র। উপনাম আবু হাজ্জাজ। তিনি আব্দুল্লাহ বিন সাইব মাখযূমীর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। মক্কার প্রসিদ্ধ ফকীহ ও ক্বারী তাবেঈদের ২য় স্থরের ছিলেন। তিনি কিরআত ও তাফসীরের ইমাম ছিলেন। অনেকে তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। ১০০হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল ইকমাল (মিশকাত) পৃ ৬১৯

হযরত ক্বাতাদাহ রহ.

তিনি ক্বাতাদাহ বিন দাআ'মাহ। উপনাম আবুল খাত্তাব আস সাদুসী, আল আ'মা আল হাফিয। বকর বিন আব্দুল্লাহ আল মাদানী বলেন যে, তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতি

শক্তির অধিকারী কে দেখতে চায় সে যেন ক্বাতাদাকে দেখে নেয়। তাঁর চেয়ে অধিক ধীশক্তিধর কাউকে দেখিনি। কাতাদা নিজেই বলেন আমি যখন-ই যা শুনি তখন-ই তা মুখস্ত করে ফেলি। তিনি বলতেন আমল ছাড়া কারও কথা কবুল হয়না। যে ভাল আমল করেন আল্লাহও তাঁর কথা কবূল করেন। তিনি হযরত আনাস রা., আব্দুল্লাহ বিন সারজিস (রা.) ছাড়াও অনেকের কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর কাছ থেকে আইয়ুব, শু'বা, আবু আওয়ানাসহ অনেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল ইকমাল (মিশকাত) পৃ ৬১৪

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.

তিনি উমর বিন আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান বিন হিকাম। উপনাম-আবু হাফস আল উমাবী আল কারশী। তাঁর মাতা উম্মে আসীম বিনতে আসীম বিন উমর বিন খাত্তাব। নাম লায়লা। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুবকর বিন আব্দুর রহমানের কাছ থেকে। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যুহরী, আবু বকর ইবনে হাযম। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহন করেন ৯৯হিজরীতে। সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের পর। হিমসে ইন্তেকাল করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল ২বছর ৫মাস কিছু দিন। তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। কারও মতে আরও কম। তিনি ইবাদত পরহেজগারী, খোদাভিতি, সচ্চরিত্রতা ও উত্তম আদর্শে সবার শীর্ষে ছিলেন।

বিশেষ করে খেলাফতের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত হওয়ার পর তাঁর ঘর থেকে কান্নার রুল শুনা গেল। কেউ প্রশ্ন করলে তহারা উত্তর দিল উমর তাঁর দাসীদের থাকা অথবা চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বলেছেন আমার উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে এতে তোমাদের প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই। এতদশ্রবনে তারা কান্নার রুল জুড়ে দেয়। উব্বা বিন নাফে ত্বার (ওমর স্ত্রী) ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন উমর সম্পর্কে আমাকে একটু বলবেন কি ? তাঁর স্ত্রী বললেন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যে গোসল করতেন তা সহবাস কিংবা স্বপ্নদোষের বলে আমি জানিনা।

তাঁর চেয়ে রোযা বা নামাযে কেউ অগ্রগামী হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ভয়ে ভীত তাঁর মতো কাউকে দেখিনি। তিনি ঘরে প্রবেশ করলেও অন্তর রেখে আসতেন মসজিদে। তিনি দোয়ায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যেতেন। জাগ্রত হয়ে সেই কান্নায় মগ্ন হতেন। ত্ববাক্বাতে ইবনে সা'দে আছে তাঁর স্ত্রী বলতেন হায় যদি খেলাফতের দায়িত্বটা আমাদের ঘরে না ঢুকতো তাহলে তাঁর এমন করূণ কান্না শুনতে হতনা।

এভাবেই তাঁর রাত কেটে যেত। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন যদি এই উম্মতের কেউ মাহদী হয় তবে তিনি হবেন হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ.। তাঁর গুনাবলী অশেষ।

হযরত শা'বী রহ.

তিনি আমীর বিন সুরাহবীল আল কূফী। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে জন্মগ্রহন করেন। তিনি বলেন আমি ৫শত জন সাহাবী পেয়েছি। আমি যা লেখতাম ও বলতাম তা মুখস্ত হয়ে যেত। ইবনে উইয়াইনা বলেন ইবনে আব্বাস তাঁর যুগে, শা'বী তাঁর যুগে, ও সওরী তাঁর যুগে অদ্বিতীয় ছিলেন। যুহরী বলেন নির্ভরযোগ্য আলেম চারজন। মদীনায় ইবনে মুসাইয়াব। কুফায় শা'বী। সিরিয়ায় মাকহুল ও বসরায় হাসান। ৮২ বছর বয়সে ১০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু বকর মাখযুমী রহ.

তিনি আবু বকর বিন আব্দুর রহমান মাখযূমী। তিনি হাদীস শুনেছেন হযরত আয়শা ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে। তাঁর কাছ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন শা'বী ও যুহরী।

ইমাম আহমদ রহ.

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থের সংকলক। পুর্ণ নাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল আশশায়বানী আল ওয়ায়লী। জন্ম ১৬৪ হিজরী। ইন্তেকাল ২৪১ হিজরী।

হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও হাদীস বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতাগন

ইমাম দারেমী রহ.

'মাসনাদে দারেমী' গ্রন্থের সংকলক। পুর্ন নাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান বিন ফযল বিন বাহরাম দারমী তামেমী সমরকন্দি। একাদশ তবকার বিশ্বস্ত প্রামাণ্য,হাফিযুল হাদীস। জন্ম ১৮১ হিজরী। ৭৪ বছর বয়সে ৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৩৪০।

ইমাম বায়হাকী রহ.

'সুনানে কুবরা' 'শুআবুল ইমান' গ্রন্থের সংকলক। পুর্ণনাম আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন বাইহাকী শাফেঈ। জন্ম ৩৮৫ হিজরী। ইন্তেকাল ৪৫৮ হিজরী।

ইমাম বগবী রহ.

'আল মাসাবীহ, 'মাআলিমুত তানযীল' ইত্যাদি গ্রন্থের সংকলক। পূর্ন নাম মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ ফাররা বগবী শাফেঈ। জন্ম ৪৩৪হিজরী। ইন্তেকাল ৫১৬হিজরী।

আল্লামা নিমবী রহ.

'আসারুস সুনান' গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইবনে আলী। তিনি যহির আহসান ইবনে সুবহান আলী নিমবী আযিমাবাদী হানাফী নামে প্রসিদ্ধ। ইন্তেকাল ১৩২৫হিজরী।

হযরত ইবনে আবি শায়বা রহ.

'মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা' গ্রন্থের রচয়িতা। পুর্ন নাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আবি শায়বা। জন্ম ১৫৯হিজরী। ইন্তেকাল ২৩৫হিজরী।

হযরত ইবনুল জযরী রহ.

'আল হিসনুল হাসীন', 'মুক্বাদ্দামাতুল জযরীয়া', ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ন নাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ আবুল খায়র শামসুদ্দীন উমুরী দামেশকী সিরাজী শাফেঈ। জন্ম ৭৫১ হিজরী।
ইন্তেকাল ৮৩৩ হিজরী।

হযরত মুনযিরী রহ.

'আত তারগীব ওয়াতারহীব' গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ন নাম আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল ক্বারী ইবনে আবী রাবিহী আবু মুহাম্মদ ফকীহুদ্দীন মুনযিরী। জন্ম ৫৮১ হিজরী। ওফাত ৬৫৬হিজরী।

হযরত ইবনে খুযায়মাহ রহ.

পুর্ণ নাম আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মাহ সালামী নিশাপুরী। জন্ম ২২৩ হিজরী। ইন্তেকাল ৩১১হিজরী।

হযরত আলী মুত্তাক্বী রহ.

'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের রচয়িতা। নাম আলী ইবনে হুসাম উদ্দিন মুত্ত্বাক্বী বুরহানপুরী মাক্কী। ইন্তেকাল ৯৭৫হিজরী।

হযরত হাকীম তিরমিযী রহ.

'নাওয়াদিরুল উসুল ফি আহাদিসীর রাসুল' গ্রন্থের রচয়িতা। নাম আবু আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হাসান তিরমিযী সুফী। তিনি হাকীম তিরমিযী নামে খ্যাত। ইন্তেকাল ৩২০হিজরী।

হযরত সাঈদ ইবনে মানসুর রহ.

'সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর' গ্রন্থের সংকলক। নাম সাঈদ ইবনে মানসুর ইবনে শু'বা খুরাসানী মাক্কী।

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রহ.

'মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক' গ্রন্থের সংকলক। পূর্ব নাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাদ সানানী। জন্ম ১২৬হিজরী। ইন্তেকাল ২১১হিজরী।

ইমাম হুমায়দী রহ.

'মুসনাদে হুমায়দী' গ্রন্থের সংকলক। নাম আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইদ কারশী আসাদী মাক্কী শাফেঈ। তিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ। ইন্তেকাল ২১৯ হিজরী।

ইমাম হাকিম রহ.

'আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন' গ্রন্থের রচয়িতা। নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামদায়া ইবনে নাঈম যাব্বী তাহমানী নিশাপুরী। জন্ম ৩২১হিজরী। ওফাত ৪০৫ হিজরী।

ইমাম তাবরানী রহ.

'মাআ'জিমে তাবরানী'র রচয়িতা। নাম আবুল কাশেম সুলায়মান তাবরানী। জন্ম ২৬০ হিজরী। মৃত্যু ৩৬০ হিজরী।

ইমাম যায়লাঈ রহ.

'নাসবুর রাইয়া লি আহাদীসিল হিদায়া' গ্রন্থের রচয়িতা। নাম জামাল উদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ যায়লাঈ হানাফী।

ইমাম খতীবে তিবরিযী রহ.

'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থের রচয়িতা। নাম ওলী উদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল খতবী আল উমুউই আততাবরিযী। ইন্তেকাল ৭৩৭হিজরী এর পর।

মাওলানা ইউসুফ রহ.

'আমানিল আহবার ফি শরহি মা'নিল আসার' গ্রন্থের রচয়িতা। নাম মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ ইলিয়াস ইবনে মুহাম্মদ ইসমাইল কান্দলবী। জন্ম ১৩৩৫ হিজরী। ইন্তেকাল ১৩৮৪হিজরী।

মাওলানা আযিমাবাদী রহ.

'আল আওনুল মা'বুদ', 'গায়াতুল মাকসুদ' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। নাম শামসুদ্দীন আবু তায়্যিব মুহাম্মদ ইবনে আসির ইবনে আলী ইবনে হায়দার আযিমাবাদী পাঠনী। জন্ম ১২৭৩হিজরী। ইন্তেকাল ১৩২৯হিজরী।

শায়খুল হাদীস রহ.

'আউযাযুল মাসালিক্ব', 'আল আবওয়াব ওয়াত্তারাযীম' 'ফাযায়েলে আ'মাল' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। নাম আবু তালহা যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ ইসমাইল কান্দলবী সাহারানপুরী। জন্ম ১৩১৫হিজরী।

আল্লামা বলিয়াউই রহ.

'হাদিয়্যাতুল আহওয়াযী বিশারহি সুনানীত তিরমিযী' এর রচয়িতা। গ্রন্থখানা এখনও মুদ্রনের অপেক্ষায় আছে। পুর্ন নাম মুহাম্মদ ইব্রাহীম ইবনে আব্দুর রহীম বলিয়াউই।

জন্ম ১৩০৪হিজরী। ইন্তেকাল ১৩৮৭হিজরী।

মাওলানা ইদ্রিস কান্দলবী রহ.

'আত্তালিকুস সবীহ' এর রচয়িতা। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্দলবী ছুম্মা লাহুরী। ইন্তেকাল ১৩৯৪হিজরী।

মাওলানা ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী রহ.

'ইজাহুল বুখারী,' 'আল কওলুন নাসিহ' ইত্যাদির রচয়িতা। নাম ফখরুদ্দীন আহমদ ইবনে সায়্যিদ আলম ইবনে আব্দুল করিম হুসাইনী। জন্ম ১৩০৭হিজরী। ওফাত ১৩৯২।

মাওলানা যুফার আহমদ থানবী রহ.

'এলাউস সুনান' এর রচয়িতা। জন্ম ১৩০৮হিজরী দেওবন্দের দেওয়ান মহল্লায়।

ইন্তেকাল ১৩৯৪ হিজরী পাকিস্তানে।

মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী রহ.

'তরজমানুস সুন্নাহ' এর রচয়িতা। পূর্ণ নাম বদরে আলম ইবনে তাহাব্বুর আলী মিরাঠী সুম্মা মাদানী। ইন্তেকাল ১৩৮৫হিজরী।

আল্লামা উসমানী রহ.

'ফাতহুল মুলহিম', 'ফাওয়াইদে কোরআনীয়া' ইত্যাদির রচয়িতা। পুর্ন নাম হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী দেওবন্দী। জন্ম ১৩০৫হিজরী। ইন্তেকাল ১৩৬৯হিজরী।

মুহাম্মদ মুবারকপুরী রহ.

'তুহফাতুল আহওয়াযী'র রচয়িতা। পূর্ণ নাম আব্দুল আলী মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুর রহীম মুবারকপুরী। ইন্তেকাল ১৩৫৩হিজরী।

আলামা কাশ্মীরী রহ.

'ফয়জুল বারী'র রচয়িতা। সমকালীন অণ্যতম শ্রেষ্ট মুহাদ্দিস। নাম শাহ আনওয়ার আল কাশ্মীরী। জন্ম ১২৯২হিজরী। ইন্তেকাল ১৩৫২হিজরী।

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.

'বযলুল মাজহুদ' গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ণ নাম খলীল আহমদ ইবনে মজিদ আলী ইবনে আহমদ আলী আমীঠী ছুম্মা সাহারনপুরী ছুম্মাল মাদানী। জন্ম ১২৬৯ হিজরী। ইন্তেকাল ১৩৪৬ হিজরী মদীনা মুনাওয়ারায়।

মাওলানা আব্দুল হাই লখনউই রহ.

'আততা'লীকুল মুমাজ্জাদ' গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ণ নাম আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আব্দুল হাই ইবনে মুহাম্মদ আব্দুল হালীম লখনউই। জন্ম ১২৬৪হিজরী। ইন্তেকাল ১৩০৪হিজরী।

মুহাদ্দিসে সাহারনপুরী রহ.

বুখারী শরীফের টীকাকার। পূর্ণ নাম মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরী।
ইন্তেকাল ১২৯৮হিজরী।

শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ', 'আল ফাওযুল কাবীর', 'আল মুসাওয়া', 'আল মুসাফফা' ইত্যাদি গ্রন্থের সংকলক। পূর্ণ নাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ কুত্বুবুদ্দীন আহমদ ইবনে শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী। জন্ম ১১১৪ হিজরী। ইন্তেকাল ১১৭৬হিজরী।

আল্লামা সিন্দী রহ.

নাসাঈ শরীফ ও বুখারী শরীফ এর টীকাকার। পূর্ণ নাম আবুল হাসান নুরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাদী সিন্দী। ইন্তেকাল ১১৩৮হিজরী।

আল্লামা কুত্বুদ্দীন দেহলভী রহ.

'মাযাহিরে হক্ব' এর রচয়িতা। পূর্ণ নাম কুত্বুবুদ্দীন ইবনে মুহিউদ্দীন হানাফী দেহলভী।
জন্ম ১২৫০হিজরী। ইন্তেকাল ১২৮৯হিজরী।

আল্লামা শওকানী রহ.

'নায়লুল আওতার, এর রচয়িতা। পুর্ন নাম মুহাম্মদ ইবনে আলী শাওকানী। জন্ম ১১৭৩হিজরী। ইন্তেকাল ১২৫০হিজরী।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.

'আশিআ'তুল লুমআত, লামআ'তুত তানক্বীহ ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। পুর্ন নাম আব্দুল হক ইবনে সাইফুদ্দীন দেহলভী। জন্ম ৯৫৮হিজরী। ইন্তেকাল ১০৫২হিজরী।

মুল্লা আলী ক্বারী রহ.

'মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ', 'শরহুশ শিফা লিল কাযীইয়াজ', 'তাজকিরাতুল মাওযুআত' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। নাম নুরুদ্দীন আলী ইবেন মুহাম্মদ সুলতান হারাবী ছুম্মাল মাক্কী। ইন্তেকাল ১০১৪হিজরী।

আল্লামা ত্বীবী রহ.

'আল কাশিফ আন হাক্বায়িকিস সুনান' গ্রন্থের রচয়িতা। নাম শরফুদ্দীন হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ত্বীবী শাফেঈ। তিনি মিশকাত শরীফ সংকলকের উস্তাদ ছিলেন। ইন্তেকাল ৭৪৩হিজরী।

আল্লামা খাত্তাবী রহ.

'মাআলিমুস সুনান' এর রচয়িতা। পূর্ণ নাম হামদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আবু সুলায়মান খাত্তাবী বুসতী। জন্ম ৩১৯হিজরী। ইন্তেকাল ৩৮৮হিজরী।

আল্লামা নওউই রহ.

'আল মিনহাজ', 'শরহুল মুসলিম', 'তাক্বরীব', 'রিয়াযুস সালেহীন', 'মিনহাজুত তালিবীন' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। পুর্ন নাম আবু যাকারিয়া মহিউদ্দীন ইয়াহ ইয়া ইবনে শরজ ইবনে

শুরী ইবনে হাসান খারামী হুরানী নওউই শাফেঈ। জন্ম ৬৩১হিজরী। ইন্তেকাল ৬৭৬ হিরজী।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ.

'আল ইসতিআ'ব', 'আত তাহমীদু লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনী ওয়ল আসানীদ', ইসতিসকার ফি মাযাহিবি উলামাইল আমসার ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ণ নাম আবু উমর ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বার কুতুবী খালেক্বী। জন্ম ৩৬৮হিজরী। ইন্তেকাল ৬৬৩হিজরী।

আল্লামা ক্বাসতাল্লানী রহ.

'ইরশাদুস সারী,' 'আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। পুর্ন নাম আবুল আব্বাস সিহাব উদ্দিন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি বাকার ক্বাসতালানী কুতায়বী মিশরী। জন্ম ৮৫১হিজরী। ইন্তেকাল ৯২৩হিজরী।

আল্লামা হাফিজ আইনী রহ.

'উমদাতুল ক্বারী ফি শরহিল বুখারী', 'বেনায়া ফি শারহিল হিদায়া', 'নুখাবুল আফকার মাবানিল আখবার' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। নাম মাহমুদ ইবনে আহমদ বদরুদ্দিন আইনী। জন্ম ৭৬২হিজরী। ওফাত ৮৫৫হিজরী।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.

'ফাতহুল বারী ফি শরহিল বুখারী' 'নুখবা' ও 'শরহে নুখবা' গ্রন্থের রচয়িতা। পুর্ন নাম শিহাবুদ্দিন আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলী কেনানী আসকালানী মিশরী শাফেঈ। জন্ম ৭৭৩হিজরী। ইন্তেকাল ৮৫২হিজরী।

হাদীস বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা

আল্লামা তাহের পাঠনী রহ.

'মাজমাউ বিহারীল আনওয়ার' গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ণ নাম আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে তাহের পাঠনী। জন্ম ৯১৩/১৪হিজরী। ইন্তেকাল ৯৮৬হিজরী।

আল্লামা সাখাবী রহ.

'ফাতহুল মুগীস', 'মাক্বাসীদে হাসানা' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ণ নাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ সাখাবী। জন্ম ৮৩১হিজরী। ইন্তেকাল ৯১০হিজরী।

আল্লামা হাফেয ইরাক্বী রহ.

'আলফিয়্যাতুল ইরাক্বী, আল মুগনী ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ণ নাম যইনুদ্দীন আবুল ফযল আব্দুর রহীম ইবনে হুসাইন ইরাক্বী। জন্ম ৭২৫হিজরী।

হাফিয যাহাবী রহ.

'তাযকিরাতুল হুফফায', 'মীযানুল এ'তেদাল' গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ণ নাম শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহদ ইবনে উসমান ইবনে কায়যাম যাহাবী।

জন্ম ৬৭৩হিজরী। ইন্তেকাল ৭৪৮হিজরী।

আল্লামা মিযযী রহ.

'তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল' গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ণ নাম আব্দুল হাজ্জাজ জামাল উদ্দীন ইউসুফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনুযযাকী কাযাই কালবী মিযযী। জন্ম ৬৫৪হিজরী। ইন্তেকাল ৭৪২হিজরী।

আল্লামা ইবনে হাযিম রহ. : 'শুরুতুল আইম্মাতিল খামসাহ' গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ণ নাম আবু বকর যইনুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবু উসমান মুসা হাযেমী শাফেঈ হামদানী। জন্ম ৫৪৮হিজরী। ইন্তেকাল ৫৮৪হিজরী।

আল্লামা ইবনুল আসীর রহ.

'নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস' গ্রন্থের রচয়িতা। পুর্ন নাম আবুস সাআদাত মুবারক ইবনে মুহাম্মদ। জন্ম ৫৪৪হিজরী। ইন্তেকাল ৬০৩হিজরী।

আল্লামা ইবনে শিহাব যুহরী রহ.

নাম মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন শিহাব বিন আব্দুল্লাহ বিন আলহারিছ বিন যুহরাহ বিন কিলাব আলক্বারশী আযযুহরী। উপনাম আবুবকর। উপাধি আল হাফিজ, আল ফকীহ। তাঁর মাহাত্ম ও গ্রহনযোগ্যতার ক্ষেত্রে সকলেই একমত। তিন চতুর্থ তবক্বার প্রথম সারির মুহদ্দিস ছিলেন। তিনি ২৫হিজরীতে, কারো মতে ২৫হিজরীর দুই এক বছর পর ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৫৯৮।

আবু বকর বিন হাযাম রহ.

নাম ও উপনাম আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযাম আল আনসারী, আন্ নাজ্জারী, আল মাদানী, আল ক্বাযী। পঞ্চম তবকার বিশ্বস্ত আবেদ ব্যক্তিত্ব। ২২০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৭৪৪।

হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান রহ.

নাম মুসলিম, উপনাম আবু ইসমাঈল, আল আশআরী, আলকুফী। পঞ্চম তবক্বার বিশ্বস্থ ফকীহ। তবে কিছু বিসৃতির স্বীকার হয়েছিলেন। ২০ হিজরী বা এর আগে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ১৮৩।

রবীআতুর রায় রহ.

রবীআ বিন আবী আব্দুর রহমান আত তাইমী, উপনাম আবু উসমান। আল মাদানী। তিনি রবীআতুর রায় নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। পিতার নাম ফাররূখ। পঞ্চম তবকার প্রসিদ্ধ, বিশ্বস্থ ফকীহ। বিশুদ্ধ মতানুসারে ৩৬ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ২০৭।

আল্লামা আউযাঈ রহ.

নাম আব্দুর রহমান বিন আমর বিন আবী আমর আল আউযাঈ। ৭ম তবকার বিশ্বস্ত ফকীহ। ৫৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৩৮৮।

হযরত শু’বা রহ.

শু'বা বিন হাজ্জাজ বিন ওয়ারদ। উপনাম আবু বিসত্বাম। আল ওয়াসিত্বী, অতঃপর আল বসরী। সপ্তম তবকার বিশ্বস্ত আবেদ, হাফিযুল হাদীস। সুফয়ান সওরী বলতেন

هو أمير المؤمنين فى الحديث و هو أول من فتش بالعراق عن الرجال و ذب عن السنة

তিনি ছিলেন হাদীসের সম্রাট এবং ইরাকে রিজাল সাস্ত্রের সর্ব প্রথম অনুসন্ধান কারী। ৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ২৮৩।

হযরত সওরী রহ.

(১) নাম সুফইয়ান বিন সাঈদ বিন মাসরুক্ব আস্সওরী,আল কুফী। উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। সপ্তম তবকার প্রথম সারির বিশ্বস্থ, আবেদ, ফকীহ হাফিযুল হাদীস। কোন কোন সময়ত তিনি তাদলীস করতেন। ৬১হিজরীতে ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ২৫৫।

(২) নাম মুনযির বিন ইয়া'লা। উপনাম আবু ইয়া'লা। আল কুফী। ৬ষ্ঠ তবকার বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৬৪৭

হযরত হাম্মাদ বিন সালামাহ রহ.

হাম্মাদ বিন সালামহ বিন দীনার আল বসরী। উপনাম আবু সালামাহ। ৮ম তবকার প্রথম সারির বিশস্ত, আবেদ ব্যক্তিত্ব। শেষ দিকে তাঁর স্মৃতি বিস্মৃতি ঘটেছিল। ৬৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ১৭৩।

হযরত ইবনে মুবারক রহ.

নাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক আল মারুযী। ৮ম তবকার বিশ্বস্থ, দানবীর, মুজাদ্দিদ, আলেমে দ্বীন। সকল কল্যাণের কেন্দ্র বিন্দু ছিলেন। ৬৩ বছর বয়সে ৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৩৫২।

হযরত ইয়াহইয়া আল ক্বাত্তান রহ.

নাম ইয়াহইয়া বিন সা্ঈদ বিন ফররুখ আত্ তামীমী। উপনাম আবুসাঈদ। উপাধী আল ক্বাত্তান। আল বসরী। ৯ম তবকার প্রথম সারির বিশ্বস্ত, ধীশক্তি সম্পন্ন, হাফিজুল হাদীস। স্বরণীয় ইমাম। ৭৮ বছর বয়সে ৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৭০৪।

হযরত আব্দুর রহমান বিন মাহদী রহ.

নাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী বিন হাসসান আল আম্বরী। উপনাম আবু সাঈদ আল বসরী। ৯ম তবকার বিশ্বস্ত, হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ হাফিযুল

হাদীস। ইবনে মাদীনী বলেন, আমি তাঁর চেয়ে বেশী জ্ঞানী কাউকে দেখিনি। ৭৩ বছর বয়সে ৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৩৯৩।

হযরত সুফইয়ান বিন উইয়াইনা রহ.

নাম মায়মুন ও সুফয়ান উপনাম আবু মুহাম্মদ বিন উইয়াইনা বিন আবী ইমরান। আল হেলালী, আল কুফী ছুম্মা আল মাক্কী বিশ্বস্থ, ফকীহ, প্রামাণ্য ইমাম, হাফিযুল হাদীস। তবে তাঁর শেষ বয়সে স্মৃতির বিস্মৃতি ঘটেছিল, অনেক সময় তাদলীস করতেন, তবে কেবল বিশ্বস্তদের কাছ থেকেই তাদলীস করতেন। ৮ম তবকার প্রথম সারির হাদীস বিশারদ ছিলেন। ৯১ বছর বয়সে ৯৮ হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ২৫৫।

হযরত ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহ.

নাম ইয়াহইয়া উপনাম আবু যাকারিয়া বিন মাঈন বিন আউন আল গাতফানী, আল বাগদাদী। ৮ম তবকার বিশ্বস্ত প্রসিদ্ধ হাফিযুল হাদীস ও জরাহু তা'দীলের ইমাম। ৭০ বা তদুর্দ্ধ বছর বয়সে ৫৩ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৭১২।

হযরত আলী ইবনুল মাদীনী রহ.

প্রথমে উসূলে হাদীস ছিল মৌখি, হাদীসের কিতাব রচনার সাথে সাথে তাও রচনায় আসে বিক্ষিপ্তভাবে, স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থস্থকরণে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে আলী ইবনে মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি:) তিনি কয়েক অধ্যায়ের একখানা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন।

হযরত খতীব বাগদাদী রহ.

আবু বকর খতীবে বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি:) লিখে ছিলেন

الجامع لاختلاف الراوي وآداب السامع ও الكفارة على علوم الحديث

হযরত মাক্কী বিন ইবরাহীম রহ.

নাম মাক্কী, উপনাম আবুস সাকান বিন ইবরাহীম বিন বশীর আত তামীমী, আল বালাখী। ৯ম তবকার বিশ্বস্ত, প্রমাণ্য ব্যক্তিত্ব। ৯০ বছর বয়সে ১১৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৬৪৬।

হযরত হুমায়দী রহ. : নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবু বকর বিন যুবায়র বিন ঈসা আল কুরাশী, আল আল আসাদী আল হুমায়দী, আল মাক্কী। ১০ তবকার বিশ্বস্থ, প্রমাণ্য ব্যক্তিত্ব। ইবনে উইয়াইনার বিশিষ্ট ছাত্র ও ইমাম বুখারীর উস্তাদ। হাকিম বলেন ইমাম বুখারী কোন হাদীস হুমায়দীর কাছে পেলে বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য অন্য

উস্তাদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করতেন না। ১৯ হিজরীতে কারো মতে আরো পরে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৩৩০।

হযরত ইসহাক বিন রাহওয়াই রহ.

নাম ইসহাক, উপনাম আবু মুহাম্মদ। পিতার দুই নাম রাহওয়াই আল মারুযী ও ইবরাহীম বিন মুখাল্লাদ আল হানযালী। বিশ্বস্থ, প্রমাণ্য, মুজতাহিদ ব্যক্তিত্ব। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর সহ পাঠী। ইমাম আবু দাউদ রহ.বলেন মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মাঝে কিছুটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। ৭২ বছর বয়সে ৩৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৬৩।

হযরত ইসহাক বিন মুসা আনসারী রহ.

ইসহাক বিন মুসা বিন আব্দুল্লাহ বিন মুসা বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল খিতমী আল মাদানী। উপনাম আবু মূসা পদবী ক্বাযী নিশাপুরী। ১০ম তবকার বিশ্বস্ত প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব। ৪৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৬৯।

হযরত নুআইম বিন হাম্মাদ রহ.

নুআইম বিন হাম্মাদ বিন মুআবিয়া বিন হারিছ আল খুযাঈ আল মারুযী। উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। মিশরে আগমনকারী। ১০ তবকার বিশ্বস্ত, ফকীহ, ইলমে ফারাইযে পারদর্শী ব্যক্তিত। তবে হাদীস বর্ণনায় তিন অনেক ভুলের স্বীকার হয়েছিলেন, যা ইবনে আদী অনুসন্ধান করেছিলেন। অবশ্য তাঁর বর্ণিত অবশিষ্ট হাদীস গুলো সঠিক আছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে ২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৬৬৯।

হযরত কুতায়বা বিন সাঈদ রহ.

কুতায়বা বিন সাঈদ বিন জামীল বিন তুরাইফ আস সাক্বাফী, আল বাগলানী। উপনাম আবু রাজা। কেউ বলেন তাঁর নাম ইয়াহইয়া কেউ বলেন আলী। ১০ম তবকার বিশ্বস্ত প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব। ৯০ বছর বয়সে ৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৫৩২।

হযরত আবু যুরআ রহ.

নাম উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল করীম বিন ইয়াযীদ বিন ফররুখ আর রাজী। উপনাম আবু যুরআ একাদশ তবক্বার প্রসিদ্ধ, বিশস্ত, হাফিযুল হাদীস ও অনুস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ৬৪ বছর বয়সে ৬৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৪২০।

হযরত আবু হাতিম রহ.: মুহাম্মদ বিন ইদরীস বিন মুনযির আল হানযালী, আররাযী। উপনাম আবু হাতিম। একাদশ তবকার হাফিযুল হাদীস। ৭৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৫৪৯।

হযরত ইবনে খুযাইমা রহ.

নাম উমারা বিন খুযায়মা বিন সাবিত আল আনসারী, আল আউসী। উপনাম আব্দুল্লাহ, আবু মুহাম্মদ আল মাদানী। ৩য় তবকার বিশস্ত প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব। ৭৫ বছর বয়সে ১০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৪৭০।

হযরত ইবনে হিব্বান রহ.

নাম মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয় বিন হাব্বান বিন মুনক্বিয আল আনসারী আল মাদানী ৪র্থ ত্ববক্বার বিশ্বস্ত ফকীহ ব্যক্তিত্ব। ৭৪ বছর বয়সে ২১হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাক্বরীবুত্ তাহযীব পৃঃ ৬০৫।

তাক্বলীদে আইম্মা বা ইমামগনের অনুসরণ

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনুগত্য ফরজ। বরং রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনুগত্য একারণে ফরজ যে তিনি আল্লাহর বিধান ব্যাখ্যা করেছেন। নতুবা মৌলিক ভাবে আনুগত্য আল্লাহ ছাড়া কারও হতে পারে না। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয় যে সে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলে তাঁর সন্তুষ্টি জেনে নিবে এবং এটাও সম্ভব নয় যে রাসূল সা.-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাত করে আল্লাহর বিধানাবলীর ব্যাখ্যা জেনে নিবে। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জন্য কোরআন ও হাদীসের দ্বারস্ত হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ বাকী নেই।

এদিকে কোরআন হাদীসের কিছু বিধানতো মর্ম প্রকাশে অকাট্য যাতে কোন অস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা ও বৈপরিত্য নেই। যেমন যিনা-ব্যভিচার হারাম হওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ফরজ হওয়া, মাহরাম নারীদের বিবাহ হারাম হওয়া ইত্যাদি। এই ধরণের বিধানাবলী প্রত্যেক ব্যক্তিই কোরআন হাদীস থেকে জানতে পারে। এখানে যেমন ইজতেহাদের প্রয়োজন নেই, তেমন নেই কারো আনুগত্যেরও প্রশ্ন।

পক্ষান্তরে কোরআন হাদীসের কিছু বিধানতো মর্ম প্রকাশে অকাট্য নয়, যাতে কোনা কোন অস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা কিংবা বৈপরিত্য-সাংঘর্ষিকতা আছে। যেমন কোরআনে কারীমে আছে والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء এখানে قروء আভিধানিক ভাবে মুশতারাক(দ্বিবিদ অর্থ বোধক)

১) হায়েয বা ঋতুস্রাব কালীন অবস্থা।

২) তুহুর বা পবিত্রতার প্রিয়ড।

এখানে এই প্রশ্ন অবশ্যই আসবে যে আমরা কোন অর্থ গ্রহন করবো ?

এমনিভাবে হাদীসে আছে

من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله (أبو داؤد ج٢ص٤٨٣)

এখানে المخابرة বা বর্গা চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাস্তবে আমরা কৃষকদের মাঝে বর্গা চাষের বিভিন্ন প্রকার দেখতে পাই। এখানে কোন প্রকারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর কোন প্রকারকে বৈধ রাখা হয়েছে এর বর্ণনা নেই।

আরেকটা উদাহরণ, এক হাদীসে আছে

لا صلواة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب (بخارى ج ١ ص ١٠٤)

উক্ত হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দাড়ায় সূরা ফাতিহা পড়া ইমাম, মুক্তাদী, মুনফারিদ সবার জন্য ফরয। আবার অন্য হাদীসে আছে

من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له (شرح معانى الاثار ج١ ص١١٤

উক্ত হাদীসের আলোকে মুক্তাদীর জন্য কোন প্রকার কেরাআত ফরয থাকেনা। উভয় হাদীসে আমলের পদ্ধতি কি হতে পারে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কোরআন- হাদীসের বিধানাবলীতে এমন জঠিলতায় পড়তে হয় অহরহ।

এ সকল স্থানে যুক্তির নিরিখে দুটি পথই খোলা থাকে

১) আমরা নিজেরা নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে কোন একটা দিককে অগ্রাধিকার দিয়ে আমল শুরু করব।

২) আমরা নিজেরা নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির উপর ভরসা না করে আমরা দেখব ইজতেহাদের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমাদের পূর্বসূরী মহান ব্যক্তি বর্গ এ সকল স্থানে আমলের জন্য কি পদ্ধতি গ্রহন করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে যে মুজতাহিদ আলেমের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে তাঁর ব্যখ্যার উপর আমল করব। এই দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহনকেই পরিভাষায় “তাক্বলীদ”বলে।

যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে চিন্তা করা যায় তাহলে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা যে উল্লেখিত উভয় পদ্ধতির প্রথমটি মারাত্মক বিপজ্জনক ও পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ এ কথা কোন নিকৃষ্ট, মুর্খ ও অস্বীকার করতে পারেনা যে আমাদের ইলম ও তাকওয়ার সাথে পূর্বসূরীদের ইলম ও তাকওয়ার কোন তুলনাই হতে পারে না। কারণ

প্রথমতঃ মুজতাহিদ ইমামগণ আমাদের তুলনায় নবীজীর যুগের কতো! নিকটতম ছিলেন , ফলতঃ কোরআন অবতীর্নের প্রেক্ষাপট ও কোরআন হাদীসের

ঘোষণাবলীর অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটন আমাদের তুলনায় তাদের জন্য কত! সহজ ছিল।

দ্বিতীয়তঃ মুজতাহিদ ইমামগনকে আল্লাহ তাআলা যে অতুলনীয় স্বরণ শক্তি , জ্ঞান ও পান্ডিত্য দান করেছিলেন তা আমাদের স্বরণশক্তি, জ্ঞান ও পান্ডিত্যের কত! উর্ধে যা বারবার পরীক্ষিত

তৃতীয়তঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর ও তাঁর রাসূলের বাণীর তাৎপর্য্য এমন ব্যক্তির কাছে উম্মোচন করেন না যে তাঁর ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীতে কোমর বেঁধে নেমেছে। সুতরাং কোরআন- সুন্নাহর বিশুদ্ধ মর্ম উদঘাটনে ইলমী অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তাকওয়া-পরহেজগারীর ও প্রয়োজন। এই আঙ্গিকে ও যদি আমরা আমাদের অবস্থার তুলনা মুজতাহিদ ইমামগনের সাথে করি তাহলে আকাশ-পাতালের তারতম্য ভেসে উঠবে। এজন্যই যে কোন ইনসাফপ্রেমী উল্লেখিত দুই পদ্ধতির ঐ পন্থাটাকেই বেশী নিরাপদ মনে করবে যে, নিজ বিদ্যা-বুদ্ধির উপর ভরসা করে কোন একটা দিককে অগ্রাধিকার দিয়ে আমল করার পরিবর্তে ইজতেহাদের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমাদের পূর্বসূরী কোন মহান ব্যক্তির বিদ্যা-বুদ্ধির উপর আস্থা রেখে তাঁর উদঘাটন করা বিশুদ্ধ মর্মের উপর আমল করবে। এটাকেই “তাকলীদ” বলে।

যার সমর্থনে কোরআন হাদীসের বহু ঘোষনা বিদ্যমান।

কোরআনের আলোকে তাকলীদ

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء)

মুফাস্সিরীনের বড় এক জামাত আয়াতের أُولِي الْأَمْرِ দ্বারা দ্বারা উলামা-মুজতাহিদীন বুঝিয়েছেন

যাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা., হযরত জাবির রা., হযরত হাসান বসরী রহ., হযরত আত্বা বিন আবীরাবাহ রহ., হযরত আত্বা ইবনুস্সাইব রহ., হযরত আবিল আলিয়াহ রহ. ছিলেন অন্যতম। (দ্রষ্টব্য তাফসীরে ত্বাবারী, তাফসীরে কাবীর)

উক্ত তাফসীরের আলোকে আয়াতটি তাকলীদের স্পষ্ট দলীল প্রতিভাত হয়। কারণ এতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের সাথে সাথে মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। যেন আয়াতে বলা হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পদ্ধতিই হচ্ছে মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামের আনুগত্য করা।

(২)وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

উসূলে তাফসীরের মূলনীতি العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب-এর আলোকে ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে ও ইমাম আবুবকর জাস্সাস আহকামূল কোরআনে উক্ত আয়াত দ্বারা তাকলীদের বৈধতার প্রমান দিয়েছেন।

(৩)فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

উক্ত আয়াতে এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে সকল লোকই এক কাজে লেগে না গিয়ে

১) কিছুলোক জিহাদে, ব্যাবসায়, কৃষিতে নিয়োজিত থাকবে আর

২) কিছুলোক কোরআন হাদীসের ইলম অর্জন করবে। অতঃপর ইলম অর্জন কারীরা ফিরে এসে যারা ইলম অর্জন করতে পারে নাই তাদেরকে দ্বীনের মাসাইল শিক্ষা দান করবে। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত লোকদের জন্য ওয়াজিব হবে তাদের (ইলম অর্জন কারীদের) কথা মেনে চলা। আর একেই তাকলীদ বলে।

(٤)فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

উক্ত আয়াতে العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب মূলনীতি অনুসারে যারা জানে না তারা আলেমদেরকে প্রশ্ন করে জেনে আমল করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এটাই তো তাকলীদ।

হাদীসের আলোকে তাকলীদ

(১) عن حذيفة رض قال قال رسول لله ﷺ إني لا أدري مابقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (ترمذى،سنن ابن ماجه،مسند احمد،)

اقتداء শব্দটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কারো আনুগত্য করার নাম নয় বরং ধর্মীয় কাজে কারো আনুগত্য করাকে বলে।

(২) সাহাবায়ে কেরাম নামাজের জামাআতে দেরীতে আসতে শুরু করলে নবীজী সা.-এরশাদ করেন

ائتموا بى وليئتم بكم من بعدكم(بخارى ج١ص٩٩)

উক্ত হাদীসের এক ব্যখ্যা তো হচ্ছে প্রথম কাতারের মুসল্লিরা নবীজীকে দেখে দেখে অনুস্বরণ করবে। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম ভালভাবে

নবীজীর নামায দেখে দেখে শিখে নিবেন। কারণ আগামী প্রজন্ম সাহাবায়ে কেরামের তকলীদ ও অনুসরণ করবে। যা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফতহুল বারীতে এভাবে উল্লেখ করেছেন।

وقيل معناه تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعد كم وكذالك اتباعهم إلى انقراض الدنيا.

(৩)عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وإنتحال المبطلين وتأويل الجاهلين (مشكواةالمصابيح ج ١ص٣١

(৩) উক্ত হাদীসে জাহিলদের ব্যাখ্যার নামে তাবীলের, সীমা লঙ্ঘনকারী ফেরক্বাগুলো (সালাফী লা মাযহবীদের মত) কেরআন হাদীসে চাঁটাই বাচাই করে নিজ মতবাদ প্রমানের আপচেষ্টা ও বিকৃতি সাধনের নিন্দা করা হয়েছে, সাথে সাথে এদের মোকাবেলার গুরু জিম্মাদারী ন্যায়পরায়ন উলামায়ে কেরামের উপর ন্যস্থ করা হয়েছে।

এ জন্যই যারা কোরআন হাদীসে ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেনা তারা নিজ বিদ্য-বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাখ্যা না করে অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামে স্বরণাপন্ন হওয়া চাই। এটার নামই তাকলীদ।

লক্ষ্যনীয় যে একেবারে অজ্ঞব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যার দুঃসাহস দেখায় না। কিছু জানা ব্যাক্তিরাই এটা করে থাকে। এই কিছু জানা ব্যক্তিদেরকেই হাদীসে জাহিল সাভ্যস্থ করে তাদের ব্যাখ্যাকে প্রতিহত করতে অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

(৪) ইসলামী রাজত্ব যখন বেড়ে গেল রাসূল সা.- এর জমানায়, তখন রাসূল সা. বিভিন্ন এলাকায় সাহাবাদের মুজতাহিদ বানিয়ে প্রেরণ করে পাঠিয়েছেন। তাদের পাঠানো এলাকার লোকদের উপর সেই সাহাবীর তাকলীদ তথা মাযহাবের অনুসরণ করা আবশ্যক।

عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ- لَمَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ - قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللّٰه. قَال فَإِنْ لَمْ تَجِد فِي كِتَابِ اللّٰه - قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللّٰه - ﷺ- . قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰه - ﷺ- وَلاَ فِي كِتَابِ اللهِ. قَالَ أَجْتَهِدُ برَأْيِى وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ الله - ﷺ- صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰه الّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللّٰه لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللهِ.

রাসূল সা. যখন মুয়াজ বিন জাবাল রা.- কে ইয়ামানে পাঠাতে মনস্থ করলেন তখন মুয়াজ রা. কে জিজ্ঞেস করলেন- যখন তোমার কাছে বিচারের ভার ন্যস্ত হবে তখন তুমি কিভাবে ফায়সাল করবে? তখন তিনি বললেন আমি ফায়সালা করব কিতাবুল্লাহ দ্বারা। রাসূল সা. বললেন- যদি কিতাবুল্লাহ এ না পাও? তিনি বললেন- তাহলে রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করব। রাসূল সা. বললেন- যদি রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাতে না পাও? তখন তিনি বললেন- তাহলে আমি ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করব। তখন রাসূল সা. তাঁর বুকে চাপড় মেরে বললেন- যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই তৌফিক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট। [সূনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৫৯৪, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ১৩২৭, সুনানে দারেমী, হাদীস নং- ১৬৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ২২০৬১]

হযরত মুয়াজ রা. এ মুখে আমি ইজতিহাদ করব, একথা শুনে রাসূল সা. কিন্তু আস্তাগফিরুল্লাহ পড়েননি গায়রে মুকাল্লিদদের মত। অথচ মুয়াজ রা. নবীজী সা.- এর জীবদ্দশায় ইজতিহাদ করার কথা বলেছেন। আর সেখানকার ইয়ামেনের লোকেরা হযরত মুয়াজ রা. এর ইজতিহাদের যেন তাক্বলীদ করে সেটারই পরোক্ষ নির্দেশ দিলেন যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই তৌফিক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট বলার মাধ্যমে। সুতরাং নবীজী সা.- এর যমানায়ই মুয়াজ রা. ইজতিহাদ করতেন, আর সে এলাকার লোকেরা তাঁর তাক্বলীদ করতেন।

একটি বিষয় সকল মুসলমানের জানা থাকা আবশ্যক। কারো দ্বিনী কথা সঠিক না বেঠিক, শুদ্ধ না অশুদ্ধ তা বোঝার একটি সহজ উপায় আছে। তা হলো যারাই দ্বীন প্রচার করছে বা বিভিন্ন মাসআলা বর্ণনা করছেন তাদের ভাষা, আচার আচরণ এবং তাদের কথাবার্তা পূর্বসূরী ইমাম, মুহাদ্দিস এবং মুজতাহিদদের সাথে মিলছে কি না। নাকি তারা পূর্বসূরীদের বাদ দিয়ে তাদের তোয়াক্কা না করে নিজেদের মতাদর্শ প্রচারে লিপ্ত। শুধু এ বিষয়টি দেখলেই আপনার কাছে বাতিল আর হকের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ইসলামের শুরু থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা ছিল অত্যন্ত সচেতন। ইসলামের মূল ধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তারা নতুন নতুন দল গঠন করে। এর মধ্যে ইসলামের তৃতীয় খলীফার যুগে সৃষ্টি হয় শিয়া, এরপর খারেজী। এর পর আরো অনেক। তাদের সবসময় চেষ্টা ছিল ইসলামের এমন এমন বিষয় সংযুক্ত করা যা ইসলামে নেই। রাসূল সা. বলেননি। সাহাবায়ে কেরাম বলেননি এবং আমল করেননি। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম সবসময় এসব দলকে রাষ্ট্রের কাছে ভিড়তে দেননি। তাদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করেছেন। তাবেঈনের যুগে এসে এসব বাতিলগুলো তাদের মিশন আরো বাড়িয়ে

দেয়। তাবেঈন তাবেঈনদের যুগে যখন রাফেজী, শিয়া, খারেজী ইত্যাদীর তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন তারা চিন্তা করলেন ইসলামের মূল বিধানগুলো সহীহ শুদ্ধভাবে সংকলন করা না হলে পরবর্তীতে উম্মাতে মুহাম্মদিয়া সঠিক বিষয়গুলো থেকে বঞ্চিত হবে। তখন থেকে ফিকহ ও হাদীস সংকলনের কাজ আরম্ভ হয়। ফিকহ হলো কুরআন হাদীস থেকে উৎকালিত নির্যাস।

কুরআন ও হাদীস থেকে ইসলামের বিধানাবলীকে সংকলন করে মানুষের সহজবোধ্য করে সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশ করাই হলো ফিকহ। কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা সংকলন করতে গিয়ে যেসকল ইমাম যত বেশি শুদ্ধ ও বেশি মাসআলা সংকলন করেছেন তারাই উম্মাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছেন। এর মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ. এক নাম্বারে। কারণ সংখ্যার দিক থেকে তিনিই বেশি মাসআলা সংকলন করেছেন। আবার শুদ্ধের ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রগণ্য। সেরূপ দুই নাম্বারে স্থান পেয়েছেন ইমাম শাফেয়ী রহ. এর পর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ.। তাঁরা ছাড়াও আরো অনেকে মাসআলা সংকলন করেছেন। কিন্তু অন্য ইমামগণ এই চার ইমামের মত এত ব্যাপক আকারে মাসআলা সংকলনে সামর্থ হননি।

আবার অনেকের মাসআলা সংকলন বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। এই কারণে এই চার ইমামকেই পুরো দুনিয়ার মুসলমানগণ কবুল করেছেন। আবার এই চার ইমাম ছিলেন সমকালিন বাতিলপন্থীদের জন্য খড়গহস্ত। কোনো বাতিল দলকে তাঁরা প্রশ্রয় দেননি। সে কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে বাতিলদের ষড়যন্ত্রও বেশি হয়েছে।

বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো দুনিয়ায় এমন কোনো ধর্মীয় বিষয় নেই যেগুলোর ব্যাখ্যা এই চার ইমামের কেউ দিয়ে যাননি। এই কারণে চার ইমামের সমাধানের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। যেহেতু সবচেয়ে বেশি মাসআলার ব্যাখ্যা ইমাম আবু হানীফা রহ. দিয়েছেন সে কারণে একবাক্যে সকলে ইমাম আবু হানীফা রহ. -কে ইমামে আজম তথা সবচেয়ে বড় ইমাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু এই চার ইমাম এমন কোনো মাসআলার সমাধান রেখে যাননি যা পরে আর কাউকে সমাধান করতে হবে সে কারণে এক দিকে চার ইমামের গবেষণার উপর পুরো উম্মত শরীয়তকে সীমাবদ্ধ করেছেন সেহেতু এই কথাও বলা হয়েছে এই চার ইমামের যে কারো মাসআলার ব্যাখ্যামতে চললে ইনশাআল্লাহ সে মুক্তি প্রাপ্ত হবে। এই কারণে আমাদের দেখতে হবে ইসলামের নামে যে কেউ কাজ করছে তাদের শরীয়তের ব্যাখ্যা এই চার ইমামের সাথে মিলছে কি না। যদি না মিলে বলতে হবে এটি খারেজী রাফেজী এবং ইহুদী খৃষ্টানদের সৃষ্ট আরেকটি দল। এদের কথা যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে কুরআন হাদীসের সাথে মিলছে বলে মনে হয় দেখা যাবে কোনো বিষয়ে তারা এমন কথাও বলছেন যা সম্পূর্ণ কুরআন হাদীস বিরোধী। অথবা দেখা যাবে

এমন কোনো আমল এরা করছে যা কুরআন হাদীসের বিরোধী। তখন মনে করতে শুধু কুরআন হাদীস বিরোধী এই কয়টি আমল মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্যই মূলত দলটিকে ইহুদীখৃষ্টান, শীয়া খারেজীরা তৈরী করেছে।

যেমন ধরুণ আহলে হাদীস নামের একটি দল বের হয়েছে। যারা সবসময় চার মাযহাবের বিরোধিতা করে। কিন্তু এরাকি এমন কোনো নতুন মাসআলার ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে যা চার ইমামের কোনো ইমাম বলে যাননি। ইনশআল্লাহ পারবে না। যদি তাই সত্য হয় তাহলে এরূপ আরেকটি দল করার কি প্রয়োজন ছিল? বলা যাবে মুসলমানদের সেরূপ দলের প্রয়োজন না হলেও কাফির- বাতিলদের প্রয়োজন আছে। সে কারণেই এদের সৃষ্টি।

এরা সবসময় মুসলমানদেরকে পূর্বপুরুষদের পন্থা থেকে বের করতে চায়। বরং স্পষ্ট বলে পূর্বপুরুষদের অনুসরণ শিরিক। আচ্ছা বলেনতো পুর্বপুরুষদের বাদ দিলে ইসলামের আর কি বাকি থাকে। কারণ আমরা ইসলাম পেয়েছি তাদের মাধ্যমেই। মাযহাব যারা মানে তারাতো চার ইমামের অনুসরণ করে না। বরং তাদের দেওয়া ব্যাখ্যা মতে রাসূলূ সা. এর অনুসরণ করে থাকে। তাদের ব্যাখ্যা মানায় যখন তাদের অনুসরণ হয় তবে আহলে হাদীসরা যে ব্যাখ্যা দেন তা মানলে কেন শিরিক হবে না? তারা বলবে তারা সহীহ হাদীস থেকে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তখন বলা হবে এতবছর পরে এসে আহলে

হাদীসরাই একমাত্র সহীহ হাদীস থেকে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আর চার ইমামগণ কি রামায়ন আর মহাভারতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নাকি? তারাও তো কুরআন হাদীসেরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে পার্থক্য হলো চার ইমামের সাথে সাহাবা তাবেঈন তবে তাবেঈনের যুগ কাছা কাছিছিল। আর আহলে হাদীসদের উত্থান ১৪০০ পছর পরে হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো যারা সাহাবী দেখে নিজে তাবেয়ী হয়েছেন যারা তাবেয়ীকে দেখে তবে তাবেয়ী হয়েছেন তাদের ব্যাখ্যা শুদ্ধ হবে নাকি যারা ১৪০০ বছর পরে বুশকে দেখে বুশের সাহাবী হয়েছেন, ওবামাকে দেখে ওবামার সাহাবী হয়েছেন তাদের ব্যাখ্যা শুদ্ধ হবে?

একারণেই আহলে সুন্নাত জামাআতের রীতি হলো হক বাতিল চেনার এক নাম্বার পন্থা হলো ওই দলের সাথে পূর্বপুরুষদের সাথে সম্পর্ক কেমন তা দেখা। যদি পূর্বপুরুষদের রীতি থেকে এরা পশ্চাদ পসারিত হয় তখন বুঝতে হবে এরা বাতিল শয়তানের দল। এদের মূলে রয়েছে শিয়া, কাদিয়ানী, বৃটিশ ইসরাঈল এবং আমেরিকা। এদের কোনো কথা শুদ্ধ হলেও মান্য করা যাবে না। কারণ এদের একটি শুদ্ধ কথার পেছনে আরো ১০০টি চক্রান্তমূলক অশুদ্ধ কথা লুকায়িত আছে।

যেমন ধরুন এদের প্রথম কথাটিই ভুল। কারো তাকলীদ বা অনুসরণ করা ভুল। শুধু হাদীস পড়েই মাসআলা জানতে হবে। আচ্ছা দেখুন তো হাদীসগুলো কি রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে এসে বলে যান? না কি সরাসরি তারা নবী করীম সা. থেকে হাদীসগুলো শুনেন? বরং তারা হাদীস বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে পাচ্ছেন। আচ্ছা এসব কিতাব কি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সা. লিখেছেন? না। তাহলে এদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেই হাদীস গুলো পাওয়া যাচ্ছে। এটি কি অন্ধ অনুসরণ নয়? কোন হাদীস সহীহ কোন হাদীস যয়ীফ এসব কথা হাদীসে নেই। এর সবই মুহাদ্দিসগণের মতামত। তাদের মতামতের ভিত্তিতে যদি আমি হাদীসকে সহীহ জয়ীফ বলছি এটি তাদের মতের অনুসরণ নয়? এবং তাকলীদে শখসী নয়? তাহলে এগুলোও তো শিরিক।

তাতে বোঝা যায় আজকে যদিও তারা অন্ধঅনুসরণ করা যাবে না বলে ফিকাহকে বাদ দিতে চাচ্ছে পরে আরেকটি হুবহু বাতিলদের সৃষ্টি এমনও বের হবে যারা বলবে হাদীসও তো অন্ধ অনুসরণ সুতরাং হাদীসও বাদ। এমনিভাবে পুরো ইসলামকেই বাদ দিতে চায় তারা। সম্প্রতি মুনকেরীনে হাদীসের দলও একটা বের হয়েছে।

বাতিল পন্থীদের ষড়যন্ত্র দেখুন। একদিকে আহলে হাদীস নাম দিয়ে ফিকাহ বাদ করার একটি দল আবিষ্কার করল অন্য দিকে আহলে কুরআন নামে হাদীস বাদ করার একটি দল সৃষ্টি করলো। কদিন পরে বের হবে আহলে ইসলাম। তারা বলবে অন্ধ অনুসরণ কোনো মতেই জায়েয নেই, এটি স্পষ্ট শিরিক। সুতরাং ফিকাহও বাদ, হাদীসও বাদ এমনকি কুরআনও তো যুগে যুগে হেগু বাই হেগু এসেছে সুতরাং তাও মাধ্যমের উপর ভর করে এপর্যন্ত এসেছে। তাই এটিও বাদ নাউজু বিল্লাহ।

এ অবস্থা সৃষ্টির প্রাথমিক অপপ্রয়াস হলো আগে যে সকল পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ আমরা পেয়েছি তাদের বদনাম করতে হবে, তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা মুসলমানদের থেকে বিদায় করতে হবে, তাদেরকে সকলের সামনে সন্ধিহান করে তুলতে হবে। এই প্রয়াসে যদি কামিয়াব হয় তখন পুরো ইসলাম সম্পর্কেই মুসলমানগণ সন্ধিহান হয়ে পড়বে। যা হবে সকলের ঈমান ধ্বংসের মূল কারণ। তাই আমরা দেখি, প্রথমে সাহাবী দুশমন বের হয়েছে। যারা সাহাবাগণের দোষ ত্রুটি বর্ণনায় পঞ্চমুখ। এরপর দেখা গেল ফিকার ইমামদের দুশমন। যারা তাদের দোষত্রুটি বর্ণনায় পঞ্চমুখ এবং মুসলমানদেরকে তাদের থেকে ফিরানোর যাবতীয় আয়োজন। আরেকটি দল বের হয়েছে মুহাদ্দিসগণের দুশমন। যারা মুহাদ্দিস গণের সমালোচনায় পঞ্চমুখ এবং হাদীস থেকে মুসলমানদের ফেরানো রকমারী আয়োজন। আরেকটি দল বের হয়েছে আওলিয়ায়ে কেরামের দুশমন। যারা আওলিয়ায়ে কেরামের সমালোচনায় পঞ্চমুখ। এভাবে করেই মুসলমানদের

ঈমান হরণের নিল নকশা বিধর্মীরা তৈরী করছে এবং তাই বাস্তবায়িত হচ্ছে মুসলমানদের মাঝে এসব নতুন নতুন দলগুলোর মাধ্যমে। সুতরাং যে কোনো মুসলমানকে আমাদের দেওয়াথিউরী মনে রেখে চলা উচিত। সাহাবা, তাবেঈন, তবে তাবেঈন, ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, আওলিয়ায়ে কেরাম এদের মাধ্যমে দ্বীনে ইসলাম আমাদের যুগ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এদের কারো বিরুদ্ধে যদি কোনো দল বলে থাকে, বিরুদ্ধে না বললেও এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার পায়তারা যারা করবে ধরে নিতে এরা বাতিল। এদেরকে সমাজে স্থান দেওয়া মানে নিজের দ্বীনকে নষ্ট করার সুযোগ করে দেওয়া।

তাই আমাদের সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এরূপর দল যত সুন্দর রূপেই আসুক, যত বিন্যস্ত আকারেই আসুক এদের খপ্পর থেকে জাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে সম্মিলিত ভাবে, ব্যক্তিগতভাবে। সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে পারিবারিক ভাবে। এককভাবে, সামষ্টিকভাবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন

মাযহাব ও এর অপরিহার্যতা

হযরত আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী

[চট্টগ্রামের দামপাড়াস্থ জমিয়াতুল ফালাহ্ ময়দানে বিগত ২৪, ২৫ ও ২৬ জানুয়ারী ২০০১ ইং তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব হযরতুল আল্লাম মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী যে বয়ান পেশ করেন, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আমি নীচে এ বিষয়ের চুম্বকাংশ তুলে ধরেছি মাত্র।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ফখরে বাঙাল আল্লামা তাজুল ইসলাম রাহ্.। জানিনা আপনারা তাঁর নাম শুনেছেন কি- না, কিংবা কেউ তাঁকে দেখেছেন কি- না। তিনি তৎকালে এইবাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। সে সময় মিশরের প্রেসিডেন্ট দুনিয়ার বড় বড় আলেমগণকে দাওয়াত করেছিলেন একটি বিশ্ব উলামা সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য। তৎকালীন পূর্ব- পাকিস্তানের ফখরে বাঙাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (র.) মিশরের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বিশ্ব উলামা সম্মেলনে যোগ দেন। এবং একটি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে জনৈক মিশরী আলেম (উল্লেখ্য, মিশরের অধিকাংশ আলেম দাড়ি রাখেন না। বড় বড় আলেম- পণ্ডিত, হাদীস- ফিক্বাহ্ জানেন কিন্তু দাড়ি রাখেন না। জানা এক কথা, আর মানা আরেক কথা। এটি মুজতাহিদগণের আরেক যোগ্যতা যে, তিনি যা জানেন তাঁকে তা মানতে হবে। আপনি নিজেই যদি পাপাচারে লিপ্ত থাকেন, তাহলে কি বিশ্বাস যে, আপনি নিষ্ঠার সাথে ইজতিহাদ করছেন?) যার মুখে দাড়ি নেই, ফখরে বাঙাল (র.) এর কাছে এসে দরখাস্ত করলেন যে, আপনার অধিবেশনে একটু বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ হবে কি- না? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন বিষয়ে বক্তব্য দিতে চান?

বললেন, আমি নবীর সুন্নাত সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। দাড়ি নেই মুখে অথচ নবীর সুন্নাত সম্পর্কে বক্তব্য দিতে ইচ্ছুক! আমাদের দেশে একটি তথাকথিত সুন্নী সম্প্রদায় আছে, যাদের মধ্যে সুন্নাতের নাম- গন্ধও নেই অথচ তারা নাকি সুন্নী। তার মুখে নবীর সুন্নাত নেই অথচ সুন্নাত সম্পর্কে বক্তব্য দিতে ইচ্ছুক। ফখরে বাঙাল (র.) তাকে বললেন- تخاطب عن السنة و لم تعاملها؟

অর্থাৎ আপনি সুন্নাত সম্পর্কে বক্তা দিতে ইচ্ছুক অথচ আপনার মধ্যেই সুন্নাত নেই। তখন সে আলেম বলেন- الإسلام ليس بمنحصر في اللحية।অর্থাৎ ইসলাম তো দাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তদুত্তরে ফখরে বাঙাল (র.) বলেন

الإسلام ليس بمنحصر في اللحية لكن اللحية منحصرة في الاسلام

অর্থাৎ একথা ঠিক যে, দাড়ির মধ্যে ইসলাম নিহিত নয়, কিন্তু ইসলামের মধ্যে তো দাড়ি নিহিত। অতঃপর সে আলেম আর কোন যুক্তি পেশ করতে না পেরে নিরুত্তর হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত সে বক্তব্য রাখার সুযোগ পায়নি। দুনিয়ার বড় বড় পণ্ডিতবর্গ, যাদের নিকট ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ্.), ইমাম শাফিঈ (রাহ্.) ইমাম মালেক (রাহ্.) এবং ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বাল (রাহ্.) এর ইজতিহাদ পোষায় না, যাদের নিকট সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনে ঈযামের ইজতিহাদ পোষায় না, যারা নতুনভাবে ইজতিহাদ করতে চান, এধরনের কিছু আলেম ফখরে বাঙাল (রাহ্.)এর অধিবেশনে দরখাস্ত পেশ করলেন, আমরা পূর্ববর্তী ইমামগণের ইজতিহাদ মানব কেন? আমরা নতুনভাবে ইজতিহাদ করব। এমন পণ্ডিতের দেখা আপনারাও হয়তো পেয়ে থাকেন, যারা বলেন ইজতিহাদের দরজা এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। একথা ঠিক, ইজতিহাদের দরজা এখনো বন্ধ হয়নি, ক্বিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সেটাই দেখার বিষয়।

এরকম একটি দাবী ফখরে বাঙাল (রাহ্.) এর অধিবেশনে উপস্থাপিত হলে তিনি বলেন, ভাল কথা, আপনারা ইজতিহাদ করুন। তবে ইজতিহাদ করার আগে ইজতিহাদের মূল উৎস পবিত্র কুরআনের সকল আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সকল হাদীস, সবগুলোর দরকার নেই মাত্র একহাজার হাদীস সনদসহ মুখস্থ বলুন। একহাজার হাদীস সনদসহ মুখস্থ বলার মত একজন আলেমও পাওয়া গেলনা। অতঃপর পাঁচশত হাদীসের কথা বলা হলে পাঁচশত হাদীস সনদসহ মুখস্থ বলার মতও কাউকে পাওয়া গেলনা। সবশেষে বললেন, ইসলামের বিধি- বিধান প্রমাণিত হয়েছে এমন অন্তত একশত হাদীস সনদ এবং বর্ণনাকারীদের জীবনেতিহাসসহ মুখস্থ বলুন। কিন্তু এরকম একজন আলেমও পাওয়া গেলনা।

এরপর বললেন, যে হাদীস দ্বারা বিধি- বিধান প্রমাণিত সে হাদীস আপনারা বলতে পারেননি, ইজতিহাদ করবেন কিসের ভিত্তিতে? উত্তরে তারা বল্লেন, মনে করুন আমার একটা হাদীস জানা আছে, আরেক জনের আরেকটা জানা আছে, আরেক জনের আরেকটা জানা আছে। এভাবে সকলের জ্ঞানের ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে ইজতিহাদ করব।

ফখরে বাঙাল (রাহ্.) বললেন, একটি ঘোড়ার শরীরে যে পরিমাণ শক্তি আছে, একহাজার ছাগলের সম্মিলিত শক্তি হয়ত সমপরিমাণ হবে, কিন্তু এক হাজার ছাগল দিয়ে কি একটি ঘোড়ার কাজ হবে? ঠিক তেমনিভাবে এক হাজার আলেম হয়ত এক হাজার হাদীস মুখস্থ বলতে পারবেন, কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগণের যে প্রত্যেকেই প্রায় সবগুলো হাদীস মুখস্থ জানতেন, তাদের সমতুল্য যোগ্যতা হাজার হাজার আলেমের সম্মিলিত যোগ্যতা হবে কি? কখনো হবে না। যেমন হবে না এক হাজার ছাগল দিয়ে একটি ঘোড়ার কাজ।

আজকাল আমাদের সমাজে একদল পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা বলেন আমরা মাযহাব মানব কেন? ইমামদের অনুকরণ করব কেন? কুরআন- হাদীস আমাদের হাতে আছে। এগুলো দেখে দেখে আমল করব। পাকিস্তানের কৃতি সন্তান মুফ্তী শফী রাহ্. এর সুযোগ্য সন্তান আল্লামা মুফ্তী তাক্বী উসমানী, যিনি পাকিস্তানের শরীয়া বোর্ডের প্রধান বিচারপতি, তাঁর নিকট একবার এধরনের নামধারী এক ব্যক্তি হাদীসের কিছু কিতাবাদী নিয়ে এসে বলল- আমি মাযহাব মানিনা, হাদীস মানি। বলাবাহুল্য, এরা নিজেদেরকে কখনো আহলে হাদীস, কখনো লা- মাযহাবী, কখনো গাইরে মুক্বাল্লিদ আবার কখনো ছলফী বলে দাবী করে। এই চার নামে এরা পরিচিত। যে সমাজে যে নামে চলা যায় সে সমাজে সে নামে পরিচিত হয়।

আসলে এরা সবাই এক ও অভিন্ন। সেই ব্যক্তি বলল- আমি মাযহাব মানি না, হাদীস মানি। হাদীসে আছে, পায়ু পথে বায়ু বের হলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। এখন বায়ু বের হল কি- না এটা প্রমাণ হবে শব্দ শুনে অথবা দুর্গন্ধ পেয়ে। এটি একটি হাদীস।

عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

এই হাদীস অনুযায়ী যদি শব্দ এবং দুর্গন্ধ এ দু'টোর কোনটি পাওয়া না যায়, তাহলে এরূপ বায়ু নির্গত হলে ওযু নষ্ট হবে না।

উক্ত লোক কোন মাযহাব মানে না। মানে রাসূলের হাদীস। অথচ ভিন্ন আরেক হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, শব্দ শুনলে বা দুর্গন্ধ পেলে বায়ু নির্গত হওয়া প্রমাণ হবে- এটা সবার ক্ষেত্রে নয়, বরং যাদের সন্দেহ জাগে যে, বায়ু নির্গত হল কি- না শুধুমাত্র তাদের জন্য। (যে কারনে বিশ্ব বিখ্যাত হাদীসের কিতাব مشكواة المصابيحএর দুনিয়া জুড়া প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

مرقاة المفاتيحএ বলা হয়েছে

عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا أي كالقرقرة بأن تردد في بطنه ريح فاشكل أي التبس عليه أخرج بهمزة استفهام منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد أي للتوضؤ لأن المتيقن لا يبطله الشك قيل يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلي في المسجد لأنه مكانها فعلى المؤمن ملازمة الجماعات للمسجد حتى يسمع صوتا أي صوت ريح يخرج منه أو يجد ريحا أي يجد رائحة خرجت منه وهذا مجاز عن تيقن الحدث لأنهما سبب العلم بذلك كذا قال بعض علمائنا وقال ابن حجر أي يحس بخروجه وإن لم يشمه وقال في شرح السنة معناه حتى يتيقن الحدث لا أن سماع الصوت أو وجدان الريح شرط إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت وقد يكون أخشم فلا يجد الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث)

এখানে লোকটি উপরোক্ত হাদীস দুটির একটির খবর রাখে আরেকটির খবর রাখে না। যেটির খবর রাখে সেটির উপর আমল করছে। কিন্তু যে হাদীসটির খবর রাখে না সেটির উপর আমল করছে না। অথচ লোকটির দাবী মতে সে মাযহাব মানে না, হাদীস মানে। এটাই কি হাদীস মানার স্বরূপ। আর জানা হাদীসটির উপর আমল করতে গিয়ে কি সে সারা জীবন বায়ু ছেড়ে ওযু না করে নামায পড়ে যাচ্ছে না?

১৯৯৬ সনে কুয়েত সফরের সময় জনৈক আহলে হাদীস ছলফী আমাকে প্রশ্ন করেন- মাগরিবের নামাযের আযানের পর দুই রাকাআত নফল নামায পড়লেন না কেন? অথচ হাদীসে আছে-

بين كل أذانين صلواة بين كل أذانين صلواة

অর্থাৎ- প্রতি ওয়াক্ত নামাযের আযানের পর ইক্বামতের আগে কিছু নফল নামায আছে। উক্ত হাদীসের উপর আমল করলেন না কেন? যে নবীর হাদীস মানল না সে নবীকে মানল কোথায়?

হানাফী মাযহাবের বিধান হচ্ছে- মাগরিবের আযানের পর ইক্বামতের আগে কোন নফল নামায নেই। তবে অন্য ওয়াক্তে আছে।

আমি তাকে বললাম- এ ব্যাপারে রাসূলের হাদীস কি একটাই, না আরো আছে? সে বলল, আর কি আছে? আমি বললাম- আরেকটি হাদীসে যে আছে-

بين كل أذانين صلواة بين كل أذانين صلواة إلا في المغرب

অর্থাৎ- প্রত্যেক আযান আর ইক্বামতের মাঝে নফল নামায আছে কিন্তু মাগরিবে নেই। আপনি তো নফল নামাযআছে সম্বলিত হাদীসটি শিখেছেন কিন্তু মাগরিবে নেই" সম্বলিত হাদীসটি শিখেন নি।

নবীর সকল হাদীস একমাত্র মুজতাহিদ ইমামগণ ছাড়া দুনিয়ায় আর কারো জানা নেই। কাজেই সকল হাদীসের উপর আমল করতে হলে মাযহাব ছাড়া কোন পথ নেই।

হানাফী মাযহাবের আরেকটি মাসআলা হচ্ছে, তাকবীরে তাহরীমা কোথায় বাঁধতে হবে তৎসংক্রান্ত এক হাদীসে নাভীর উপরে হাত বাঁধতে বলা হয়েছে। আরেক হাদীসে সিনার উপর বাঁধতে বলা হয়েছে।

এখানে দু'রকম হাদীস পাওয়া গেল। হানাফী মাযহাব মতে যেহেতু দু'টোই রাসূলের হাদীস। সুতরাং যথাসম্ভব রাসূলের কোন একটি হাদীসের উপরও আমল বাদ দেওয়া যাবে না। নাভীর উপর হাত বাঁধার হাদীস পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, আর সিনার উপর হাত বাঁধার হাদীস মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এহেন সমন্বয় সাধন করে তবুও সকল হাদীসের উপর আমল নিশ্চিত করতে হবে। এই চিন্তা থেকেই হানাফী মাযহাবে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তথাকথিত আহলে হাদীসের দাবীদার যারা, তারা নবীর হাদীসের উপর আমলের দাবী করে এক হাদীস অনুযায়ী নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সিনার উপর হাত বাঁধে। অথচ নাভীর উপর হাত বাঁধার হাদীসের উপর আমল ছেড়ে দিল। এর নাম আহলে হাদীস হল কি করে?

১৯৯৯ সালে মধ্যপ্রাচ্যের জনৈক শেখ আমাকে প্রশ্ন করলেন- আবু হানীফা আমাদের নবী, না মুহাম্মদ সা.? আবু হানীফার কথায় দুই মিছিলে আসর নামায পড়ব, না মুহাম্মদ সা. এর কথায় এক মিছিলে আসর নামায পড়ব? সাধারণ

মানুষের জন্য এটা একটা কঠিন মাস্আলা। আলেমদের জন্য কঠিন নয়। সকলের জন্য একটু সহজবোধ্য করে বলার চেষ্টা করছি।

আসর নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কিত দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। এজন্য মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। আগেই উল্লেখ করেছি, কুরআন- হাদীসের বর্ণনা ভঙ্গির বিভিন্নতাসহ বিভিন্ন কারণে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে। কিন্তু মতপার্থক্য হলেও সব মতই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। এসব মতপার্থক্যের কারণসমূহের মধ্যে প্রথম কারণ হচ্ছে, কোন বিষয়ে যদি কুরআন- হাদীসে কোন প্রকার বিবরণ উল্লেখ না থাকে বরং মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদ করে তা বের করতে হয়, তখন মতভেদ সৃষ্টি হয়। অথবা কুরআন- হাদীসে আছে বটে, কিন্তু সুস্পষ্ট ও পরিস্কার ভাষায় নেই, বরং আকার- ইঙ্গিতে রয়েছে। সে ইঙ্গিতটা সনাক্ত করতে আবার ইজতিহাদ করতে হয়, তখন মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে দ্বিমত সৃষ্টি হয়। অথবা আকার- ইঙ্গিতে নয়, বরং সুস্পষ্ট ও পরিস্কার ভাষায়ই আছে কিন্তু ভাষার প্রয়োগ ক্ষেত্রের মাঝে ব্যবধান রয়েছে। এই প্রয়োগ ক্ষেত্রের ব্যবধানের কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কুরআনের এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তা মহিলারা তিন কুরু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, অন্য স্বামীর নিকট বিবাহ বসবে না।

[সূরা বাক্বারা- ২২৮ আয়াত]

কুরু আরবী শব্দ। এটি পরস্পর বিরোধী অর্থবোধক। কুরু শব্দের এক অর্থ হচ্ছে মহিলাদের ঋতুগত অবস্থা। আরেক অর্থ হচ্ছে মহিলাদের পবিত্রকালীন অবস্থা। এখানে ইমাম আবু হানীফা (র.) ঋতুগত অবস্থাকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) পবিত্রকালীন অবস্থাকে গ্রহণ করেছেন। কুরআন- হাদীসের এসব বর্ণনা ভঙ্গির বিভিন্নতার কারণে মুজতাহিদগণের ইজতিহাদে পার্থক্য হয়েছে। একই কারণে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিকাল বেলার এই সময়টার বেশীর ভাগ সময় হল যোহরের ওয়াক্ত আর অল্প সময় হল আসরের ওয়াক্ত। যারা এক মিছিল, দুই মিছিল বুঝবেন না তাদের বোঝার সুবিধার্থে এভাবে বলা হল।

এ ব্যাপারে দুই ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে- বেশীর ভাগ সময় থাকা অবস্থায় আল্লাহর রাসূল আসর নামায পড়েছেন। আরেক হাদীসে আছে- বেশীর ভাগ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর রাসূল সা. আসর নামাযের সময় ধার্য করে দিয়েছেন। একই বিষয়ে একই রাসূলের পক্ষ থেকে দুই রকম বর্ণনা থাকবে কেন? এরূপ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগতে পারে। মূলতঃ স্থান- কাল-

পাত্র- অবস্থাভেদে এরূপ হয়ে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যের সেই শেখ আমাকে বললেন- ইমাম আবু হানীফা (র.) যে বলেন, বেশীর ভাগ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর আসর নামায পড়তে হবে, আমি তা মানি না। রাসূলুল্লাহ সা. এর কথা মানি। তিনি বলেছেন- কম সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আসর নামায পড়তে হবে। তিনি তার দাবীর স্বপক্ষে বুখারী শরীফের একটি হাদীস পেশ করেন।

আমি বললাম, আপনি যেরূপ আবু হানীফা (র.)- কে নবী মানেন না, আমিও তেমনি আবু হানীফা (র.)- কে নবী মানি না। আপনার নবী যেমন মুহাম্মদ সা., তেমনি আমার নবীও তিনিই। দুনিয়ায় আমার নবীর এমন কোন হাদীস নেই যেখানে এক মিছিলে আসর পড়ার কথা বলা হয়েছে। আপনার দাবীর স্বপক্ষে একটি হাদীসও আপনি দেখাতে পারবেন না। তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। আমি বললাম- আপনি যদি এরূপ কোন সহীহ্ হাদীস দেখাতে পারেন, তাহলে হানাফী মাযহাব ত্যাগ করে আপনার কথা মেনে নেব।

তিনি বুখারী শরীফের একটি হাদীস দেখালেন। তাতে বর্ণিত হয়েছে, প্রথম প্রথম যখন নামায ফরয হয়, তখন হযরত জিব্রাঈল আ. হুযূর সা.- কে এক মিছিলে আসর নামায পড়িয়েছেন। এক মিছিল কথাটার অর্থ আপনারা ধরুন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার কিছু সময় পর। আর দুই মিছিল অর্থ ধরুন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অনেক সময় পর। শেখকে প্রশ্ন করলাম, রাসূলের এই হাদীসটি ক্বাওলী না ফেলী। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস তিন প্রকার।

এক. ক্বাওলী, দুই. ফে'লী, তিন. তাক্বরীরী। রাসূলের উক্তিকে ক্বাওলী হাদীস, কর্মকে ফে'লী হাদীস এবং সমর্থনকে তাক্বরীরী হাদীস বলা হয়। হাদীস শাস্ত্রের একটি মূলনীতি হচ্ছে, ক্বাওলী এবং ফে'লী হাদীসের মধ্যে যদি বিরোধ দেখা দেয় এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোন উপায় না থাকে, তাহলে ফে'লী হাদীসের উপর ক্বাওলী হাদীস প্রাধান্য পাবে। শেখকে বললাম, আপনার পেশকৃত হাদীসটি ফে'লী হাদীস।

দেখুন বুখারী শরীফের আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত এক দল কর্মচারী কর্ম করে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পেল, যোহর থেকে আসর পর্যন্ত আরেক দল কর্মচারী কর্ম করে একই পরিমাণ পারিশ্রমিক পেল। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত আরেক দল কর্মচারী কর্ম করে একই পরিমাণ পারিশ্রমিক পেল। প্রথম দল ইহুদীদের দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় দল খ্রীস্টানদের দৃষ্টান্ত। আর তৃতীয় দল আমার উম্মত মুসলমানদের দৃষ্টান্ত। উক্ত হাদীসে আল্লাহর রাসূল সা. সময়ের ব্যবধান বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত অনেক

লম্বা সময়, যোহর থেকে আসর পর্যন্ত মাঝারী লম্বা সময়, আর আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত স্বল্প সময়। শেখকে বললাম- আমার পেশকৃত হাদীসটি হচ্ছে ক্বাওলী হাদীস। আপনারটি হচ্ছে ফে'লী হাদীস। আপনার হাদীসটি যেমন বুখারী শরীফের, তেমনি আমারটিও বুখারী শরীফের। এবার আপনার এবং আমার পেশকৃত ক্বাওলী এবং ফে'লী হাদীসের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তখন পূর্বোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী ক্বাওলী হাদীস প্রাধান্য পাবে। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র.) কর্তৃক বর্ণিত মাস্আলা হুযূর সা. - এর বিশুদ্ধ ক্বাওলী হাদীসের অনুকূলে। কাজেই আমি মান্য করি ইমাম আবু হানীফাকে নয় বরং রাসূলুল্লাহ সা.- কে। কিন্তু আপনার ইমাম আবু হানীফার মাস্আলা না মানার কারণে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস মানা সম্ভব হল না। উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আমি আপনাদের যে কথাটি বোঝাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে, চার মাযহাবের চার ইমাম, চার ইমামের চার মাযহাব এগুলোর কোন একটি যদি বর্তমান দুনিয়ার কেউ না মানে, তাহলে তার পক্ষে কুরআন- হাদীস মানা সম্ভব হবে না। কারণ ফিক্বাহ্ শাস্ত্রের এসব ইমামগণ আমাদের থেকে অনেক অনেক বেশী কুরআন- হাদীস জানতেন এবং বুঝতেন। তাঁদের সাথে আমাদের কোন তুলনাই চলতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা নিজেই পরিস্কার ভাষায় কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون

অর্থাৎ- তোমরা যদি না জান, তাহলে যারা জানে তাদের থেকে জেনে আমল কর। [সূরা নাহল- ৪৩ আয়াত]

এরপর সেই সালাফী শেখকে বললাম- দেখুন! আপনি আবু হানীফা (র.)- কে মান্য করেন, না ইমাম বুখারী (র.)- কে মান্য করেন? সালাফী তো হচ্ছে পূর্ববর্তীদের অনুসারীরা। আর পরবর্তীদের অনুসারীরা খলফী। ইমাম আবু হানীফা রাহ্) হচ্ছেন আগের এবং ইমাম বুখারী (র.) হচ্ছেন তাঁর পরের। আপনারা পরবর্তীদের ইমাম বুখারী (র.)- কে মান্য করে সালাফী দাবী করেন কিভাবে? আর আমাদেরকে বলেন আমরা সালাফী না। অথচ আমরা মান্য করি পূর্ববর্তীদের, আপনাদের সে খবর আছে কি? উল্লেখ্য, ইমাম আবু হানীফা (র.) ইমাম বুখারী (র.)- এর পিতার আমলের লোক ছিলেন।

ফিক্বাহ্ শাস্ত্রের কিতাবে পরিস্কার ভাষায় উল্লেখ রয়েছে যে, বর্তমান দুনিয়ায় যেহেতু ইমাম আবু হানীফা (র.) সহ অন্যান্য ইমামগণের ন্যায় কুরআন- হাদীসের যথার্থ জ্ঞানধারী আর কেউ নেই। কাজেই যে ব্যক্তি বলবে মাযহাব মানি না, কুরআন- হাদীস মানি, সে বোকা নয় কি? সে কুরআন- হাদীস সম্পর্কে কিছুই

জানে না, মানবে কি? কুরআন- হাদীস মানতে হলে চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব মানতে হবে। যারা মাযহাব মানে তারাই কুরআন- হাদীস মানে। যারা মাযহাব মানে না, প্রকৃতপক্ষে তারা কুরআনও মানে না, হাদীসও মানে না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে সকল মুজতাহিদ ইমাম এবং তাঁদের মাযহাব অনুসারে কুরআন- হাদীস মত জীবন- যাপন করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন!

মুসলিমদের মাঝে অনৈক্যের বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে কথিত আহলে হাদীসগোষ্ঠি

ইংরেজদের শাসনভার এই উপমহাদেশে সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে বসার আগে এদেশগুলোতে কোন ধর্মীয় কোন্দল ছিল না। ছিল মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি। শ্রদ্ধা- ভক্তির এক অনুপম দৃষ্টান্ত। বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ করার অপূর্ব উপমা ছিল মুসলমানরা। যেই নজরকাড়া আদর্শ দেখে দলে দলে হিন্দু- বৌদ্ধরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় ভীড় জমায়। ধর্মীয় কোন্দলের কেউ কল্পনাই করতো না। এক আলেম আরেক আলেমকে গালি দিবে, মসজিদে একদল মুসলিম আরেক দল

মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে যাবে দেদারছে এটা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। সবাই ছিল ফিক্বহে হানাফীর বিশ্ব নন্দিত কুরআন সুন্নাহর মাকবুল ব্যাখ্যার একনিষ্ট অনুসারী।

ইংরেজ পশুরা মুসলমানদের এই অনুপম ভ্রাতৃত্বকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র শুরু করল। দাঁড় করিয়ে দিল বেরেলভীর মাধ্যমে একদল মাজারপূজারী, পীরপূজারী ফিরক্বা। অপরদিকে কাদিয়ানী ফিরক্বা। সেই সাথে শত বছরের কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক গোটা পৃথিবীতে সমাদৃত ঐতিহ্যিক মাযহাব হানাফী মাযহাবকে কলুষিত করতে নামিয়ে দিল মুহাম্মদ হোসাইন বাটালবীকে।

বেদআতিরা শুরু করে দিল কুরআন সুন্নাহ রেখে শুধু ব্যক্তি পূজার আরাধনা। পীরকেই সকল বিষয়ের সমাধানদাতা বানিয়ে করতে লাগল শিরক। সাধারণ মানুষকে করতে লাগল বিভ্রান্ত।

অপরদিকে কথিত আহলে হাদীস গোষ্ঠিটি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কুরআন সুন্নাহের ব্যাখ্যা রেখে অযুর ফরয, গোসলের ফরয না জানা মুসলমানদের শিখাতে লাগল কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ পড়েই দ্বীন পালন করতে শুরু করে দাও।

এক কথায় বেদআতিরা ছেড়ে দিল আল্লাহ ও নবীর কিতাব। আর কথিত আহলে হাদীসরা ছেড়ে দিল আল্লাহর প্রিয় বান্দা তথা রিজালুল্লাহদের। এই প্রান্তিক দুই

ফিতনার মাঝামাঝি রাসূল সাঃ এর রেখে যাওয়া পথ, কিতাবুল্লাহ বুঝতে হবে রিজালুল্লাহ এর নির্দেশনা অনুযায়ী মত- ও পথের ধারক রয়ে গেলেন দারুল উলুম দেওবন্দের হাক্কানী ওলামায়ে কিরামগণ।

কুরআন কারীম কিতাবুল্লাহকে বুঝাতে আল্লাহ তায়ালা রিজালুল্লাহ নবী কারীম সা. - কে পাঠিয়েছেন, তেমনি সাহাবাদের বানিয়েছেন রিজালুল্লাহ রাসূল সাঃ এর হাদীসকে বুঝানোর জন্য। ফুক্বাহায়ে কিরামকে নির্ধারিত করেছেন আল্লাহ তায়ালার কুরআনকে বুঝতে হাদীস দিয়ে, আর হাদীস বুঝতে সাহাবাদের আমল দিয়ে। এই সকল কিছুকে মন্থন করে তারা একত্র করলেন ইসলামী ফিক্বহের ভান্ডার।

তো একদিকে দাঁড়িয়ে গেল কিতাবুল্লাহকে অস্বিকারকারীদের দল। অপরদিকে দাঁড়াল রিজালুল্লাহকে অস্বিকারকারীদের দল। মাঝখানে মধ্যপন্থী ওলামায়ে দেওবন্দ রয়ে গেলেন সত্যের প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তীকা হিসেবে।

আহলে হাদীস গ্রুপটি নিজেদের ফিতনাবাজীর সরকারী আনুকূল্য পাওয়ার জন্য ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ৩ ই ডিসেম্বর ১৮৮৬ ঈসাব্দে পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে রেজিষ্ট্রেশন করে।

আর সি. পি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ১৪ই জুলাই ১৮৮৮ ঈসাব্দে, আর ইউপি গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে ২০ই জুলাই ১৮৮৮ ঈসাব্দ, বোম্বাই গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে ১৪ই আগষ্ট ১৮৮৮ ঈসাব্দ, মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে ১৫ ই আগষ্ট ১৮৮৮ ঈসাব্দ ও মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে ১৫ ই আগষ্ট ১৮৮৮ ঈসাব্দ, এবং বঙ্গদেশ গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে ১৮৯০ ঈসাব্দ তারিখে দরখাস্ত মঞ্জুরী করায়। সেই সময় থেকে ইংরেজদের সাপোর্ট নিয়ে শুরু করে ওদের ঘৃণ্য কার্যক্রম। শুরু করে মুসলমান নামাযীর মনে সন্দেহ সৃষ্টির নোংরা প্রচারণা। মুসলমানকে সন্দিহান করে চলে সে কি হানাফী না মুহাম্মদী? এই উদ্ভট প্রশ্ন দিয়ে। বে নামাযীর পিছনে কোন মেহনত নয়, বেদ্বীনের পিছনে কোন মেহনত নয়, বরং ঈমানদার, নামাযী ব্যক্তিদের মনে ইবাদতের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির নীল নকশা নিয়ে কাজ করতে থাকে। শুরু করে দেয়, মুসলমানদের মাঝে ধর্মীয় বিভক্তি, কোন্দলের এক ভয়ংকর খেলা। মসজিদে মসজিদে হাঙ্গামা, এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে মুশরিক, আকাবীরে ওলামা, যারা আজীবন মেহনত করে এই হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাকে জান্নাতী পরিবেশে রুপান্তরিত করে যাচ্ছেন নিরলস প্রচেষ্টা করে, সেই সকল আল্লাহওয়ালা মানুষদের প্রতি মানুষকে করতে থাকে বিতশ্রদ্ধ। নোংরা, খাটো করে উপস্থাপিত করতে থাকে দ্বীনের মশালবাহী ওলামায়ে কিরামদের।

এক কথায় ধর্মীয় কোন্দল আর মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টিই ইংরেজ সৃষ্ট এই কথিত আহলে হাদীসদের কাজ।

মুকাল্লিদ কাকে বলে? গায়রে মুকাল্লিদ কাকে বলে?

তাক্বলীদ কাকে বলে? সহজ ভাষায়- পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাদের কেউ নবী দেখেনি। আমরাও দেখিনি। কিন্তু আমাদের কাছে নবীর আনীত দ্বীন আছে। আমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছানোর জন্য নবীজী সা. পর্যন্ত যত মাধ্যম আছে সবাই উম্মত। কেউ নবী নয়। তাদের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছেছে। তো দ্বীন পৌঁছানোকারী ঐ জামাতকে স্বীকার করে তাদের উপর নির্ভর যারা করে তাদের নাম মুকাল্লিদ। আর যারা অস্বীকার করে তাদের নাম গায়রে মুকাল্লিদ হযরত মুহাম্মদ আমীন সফদর রহ. বলতেন- এক রাষ্ট্রে দুই ধরণের ব্যক্তি থাকে। এক রাজা, দ্বিতীয় প্রকার হল প্রজা। এই প্রকার ছাড়া কেউ কোন রাষ্ট্রে থাকতে পারে না। এক রাষ্ট্রে রাতে এক ব্যক্তি গ্রেফতার হলে পুলিশ তাকে জিজ্ঞেস করল- তুমি কি প্রজা? সে বলল না। পুলিশ জিজ্ঞেস করল- তাহলে কি রাজা? সে বলল- না। তখন পুলিশ বলল- তাহলে তুমি হলে রাষ্ট্রদ্রোহী! কারণ তুমি এদেশের অধিনস্তও নও, আবার প্রশাসনেও নেই। তুমিতো রাষ্ট্রদ্রোহী। এমনি যারা নিজেরা মুজহাদিতও নয়, আবার কারো তাক্বলীদও করে না, ওরা হল গায়রে মুকাল্লিদ। রাষ্ট্রের পরিভাষায় পুলিশ যাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে তারা আমাদের ভাষায় হল গায়রে মুকাল্লিদ। তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী মানেই হল মুকাল্লিদ

সাহাবায়ে কিরামের পরের জামাতের নাম হল- তাবেয়ী। অর্থ হল অনুসারী। যারা পূর্বের অনুসারী। তাদের অনুসারী এই জন্য বলা হয়, যেহেতু তারা সাহাবাদের অনুসরণ করতেন। তারা যদি সাহাবাদের অনুসারী না হতেন, তাহলে তাদের নাম হত- মুহাক্কিকীন। কিন্তু তাদের নাম রাখা হয়েছে তাবেয়ীন, সুতরাং বুঝা গেল তারা মুকাল্লিদ ছিলেন। এমনিভাবে তবেতাবেয়ীন মানে হল- তাবেয়ীদের অনুসারী। তাদেরও তাবে তাবেয়ী এইজন্য বলা হয় যে, তারা তাবেয়ীদের মুকাল্লিদ ছিলেন। তারা গায়রে মুকাল্লিদ ছিলেন না।

আমরা সাহাবাদের উপর নির্ভর করি। করি তাবেয়ীদের উপর। এমনিভাবে তাবে তাবেয়ীদের উপর। এমনিভাবে মুজতাহিদদের উপর। এমনিভাবে যারা আমাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছিয়েন তাদের উপর নির্ভর করি। তাই আমরা মুকাল্লিদ। আর যারা তাদের উপর নির্ভর করেনা ওরা হল গায়রে মুকাল্লিদ। ওরা কাউকে মানে না। সাহাবীকেওনয়, তাবেয়ীকেও না, তাবে তাবেয়ীকেও না।

রাসূল সাঃ- এর জমানায় তাকলীদে শখসী ছিল, ছিল ইজতিহাদও

ইসলামী রাজত্ব যখন বেড়ে গেল রাসূল সাঃ এর জমানায়, তখন রাসূল সা. বিভিন্ন এলাকায় সাহাবাদের মুজতাহিদ বানিয়ে প্রেরণ করে পাঠিয়েছেন। তাদের পাঠানো এলাকার লোকদের উপর সেই সাহাবীর তাকলীদ তথা মাযহাবের অনুসরণ করা আবশ্যক ছিল যুক্তিসঙ্গত কারনেই।

عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ فَإِنْ لمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللّٰه. قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلاَ فِي كِتَابِ اللّٰه قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰه الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللهِ

রাসূল সা. যখন মুয়াজ বিন জাবাল রা.- কে ইয়ামানে পাঠাতে মনস্ত করলেন তখন মুয়াজ রা.- কে জিজ্ঞেস করলেন- যখন তোমার কাছে বিচারের ভার ন্যস্ত হবে তখন তুমি কিভাবে ফায়সাল করবে? তখন তিনি বললেন- আমি ফায়সালা করব কিতাবুল্লাহ দ্বারা। রাসূল সাঃ বললেন- যদি কিতাবুল্লাহ এ না পাও? তিনি বললেন- তাহলে রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করব। রাসূল সা. বললেন- যদি রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাতে না পাও? তখন তিনি বললেন- তাহলে আমি ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করব। তখন রাসূল সা. তাঁর বুকে চাপড় মেরে বললেন- যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই তৌফিক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৩৫৯৪, সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং- ১৩২৭, সুনানে দারেমী, হাদিস নং- ১৬৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ২২০৬১]

হযরত মুয়াজ রা. এ মুখে আমি ইজতিহাদ করব, একথা শুনে রাসূল সাঃ কিন্তু আস্তাগফিরুল্লাহ পড়েননি গায়রে মুকাল্লিদদের মত। অথচ মুয়াজ রাঃ নবীজী সা.- এর জীবদ্দশায় ইজতিহাদ করার কথা বলেছেন। আর সেখানকার ইয়ামেনের লোকেরা হযরত মুয়াজ রাঃ এর ইজতিহাদের যেন তাক্বলীদ করে সেটারই পরোক্ষ নির্দেশ দিলেন। যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই তৌফিক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট বলার মাধ্যমে।

সুতরাং নবীজী সা.- এর জমানায়ই মুয়াজ রা. ইজতিহাদ করতেন, আর সে এলাকার লোকেরা তাঁর তাক্বলীদ করতেন। গায়রে মুকাল্লিদরা বিভ্রান্ত করার জন্য বলে থাকে- তাক্বলীদ বলতে কিছু ছিলনা নবীজী সা.- এর জমানায়। আমরা বলি

শব্দ না থাকাই কি বস্তু না থাকার দলিল? যদি তাই হয়, তাহলে বলুনতো- কুরআনে কি তাওহীদ শব্দ আছে? তাহলে কি কুরআন দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত নয়? কুরআন হাদীসে মক্কা মদীনায় এমনকি গোটা আরব ভূখণ্ডে মুসলমান নেই। অর্থাৎ মুসলমান শব্দ নেই তাইবলেকি মুসলিমই নেই। বুঝা গেল শব্দ থাকাটা মূখ্য নয় বরং মর্ম থাকাটাই মূখ্য।

দ্বীনী বিষয়ে সাহাবাদের অনুসরণ আবশ্যক

রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন-

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

তোমাদের উপর আমার সুন্নাত পালন আবশ্যক। আর হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাতও আবশ্যক। এটাকে তোমরা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখ। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৪৩, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ২৬৭৬, তাহাবী শরীফ, হাদীস নং- ৪৬৮] এই হাদীসে লক্ষ্যনীয় হল- রাসূল সাঃ সুন্নাত বলেছেন, হাদীস বলেননি। খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাতের কথা মানতে বলেছেন হাদীসের কথা বলেননি।

সুতরাং বুঝা গেল খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত তথা আমল আমাদের জন্য পালন করার নির্দেশ নবীজী সাঃ নিজেই দিয়ে গেলেন। এ কারণেই একজন খলীফা যখন কোন দ্বীনী কাজের সূচনা করেন সেটাকে অন্য খলীফা বন্ধ করার কোন অধিকার রাখেন না। তাই হযরত ওমর রা.- যেই পদ্ধতি জারী করেছেন সেটা হযরত উসমান রা. এবং হযরত আলী রা.- কেউ বন্ধ করেননি।

এমনিভাবে যেই সুন্নাত হযরত উসমান রাঃ শুরু করেছেন সেটাকে হযরত আলী রাঃ বন্ধ করেননি। একটি কথা ভাল করে বুঝতে হবে হযরত ওমর রা. ২০ রাকাত তারাবীহ শুরু করেননি।

বরং তিনি তারাবীহের জামাতের সুন্নাত শুরু করেছেন। হযরত ওমর রা. যখন দেখলেন যে, মসজিদে নবীবীতে মুসলমানরা একাকী ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ছে, তখন তিনি তাদের সবাইকে একসাথে জামাতে পড়ার জন্য একত্র করে দিলেন। ২০ রাকাতের সুন্নাত তিনি জারী করেননি, বরং ২০ রাকাতের জামাত জারী করেছেন। যেমনটি বর্ণিত আছে সহীহ বুখারীর ১/২৬৯, হাদীস নং- ১৯০৬] দেখুন মূল হাদিস

عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب (صحيح البخارى- كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم الحديث- ١٩٠٦)

এমনিভাবে জুমআর দুই আজানের সুন্নাত জারী করেছেন। যা পূর্বে ছিলনা। এই সুন্নাতকে হযরত আলী রাঃ জারী রেখেছেন। যা আজো জারী আছে। সে সময় কোন গায়রে মুকাল্লিদ ছিলনা। তাই হযরত উসমান রা.- এর এজতিহাদী সীদ্ধান্তের বিরোধিতা কেউ করেনি। অথচ হযরত উসমান রাঃ তার এই কর্মের পক্ষে কোন কুরআন সুন্নাহর দলিল পেশ করেননি। তারপরও সকল সাহাবায়ে বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নিয়েছেন। এরই নাম তাক্বলীদ। বুখারী শরীফে এসেছে- তখন এই বিষয়টি ধার্য হয়ে গেল। [বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৮৭৪, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ১০৮৯] সাহাবায়ে কেরাম সবাই মেনে নিলেন। সুতরাং আমরা কারা? যারা বলব যে, এটা মানিনা!

যারা বলে আমরা সাহাবাদের চেয়ে দ্বীন বেশি বুঝি ওরা বেদ্বীন

যারা বলে যে, আমরা সাহাবীদের চেয়ে দ্বীন বেশি বুঝি, সে বদদ্বীন। যেমন যে ব্যক্তি বলে যে, সে সাহাবীদের চে নবীজী সা.- কে বেশি ভালবাসে, সে যেমন বদদ্বীন। এমনি যারা বলে যে, সাহাবাদের রেখে নবী থেকে দ্বীন বুঝতে চায় তারাও বদ দ্বীন। যে কাজটি করে থাকে গায়রে মুকাল্লিদরা। ওরা সাহাবাদের ব্যাখ্যা রেখে দ্বীনকে বুঝতে চায়।

নবীজী সা. দাড়িকে বড় রাখতে বলেছেন, কাটতে কোথাও বলেন নি। এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য? হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. এক মুষ্টির পর দাড়ির কেটে ফেলতেন। সুতরাং বুঝা গেল দাড়ি বড় রাখার সীমা হল এক মুষ্টি। সাহাবাদের আমল দলিল না হলে হাদীস মতে দাড়ি বড় রাখতে শুরু করলে সেটা মাটিতে গিয়ে পড়বে।

হযরত ওমর র.- এর ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে নিশ্চয় শয়তান তোমাকে ভয় পায় হে ওমর [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৬৯০] সুতরাং যেই মাসআলা হযরত ওমর

রাঃ বলেন- সেই পথেও শয়তান নেই। হযরত ওমর রা. ২০ রাকাত তারাবীহের ফাতওয়া দিয়েছেন। সুতরাং এই মাসআলায় শয়তানের ওয়াসওয়াসা নাই। হযরত ওমর রা. যখন এক বারে তিন তালাক দিলে তিন তালাক পতিত বর্ণনা করেছেন তখন সেই মাসআলায় শয়তানের কোন দখল নাই। কারণ শয়তান হযরত ওমর রা. এর পথে আসার সাহস পায়না। রাসূল সাঃ আরো ইরশাদ করেছেন- যদি আমার পর কোন নবী হত তাহলে ওমর হত নবী। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৬৮৬] রাসূল সা.- এর এসব নির্দেশনাই প্রমাণ করে হযরত ওমর রা.- এর ফাতওয়া ও তার জারী করা সুন্নাতের গুরুত্ব কত বেশি।

ওরা সালাফী না খালাফী?

গায়রে মুকাল্লিদরা নিজেদের সালাফী বলা ঠিক নয়। কারণ- সালাফ বলা হয় পূর্বসূরীকে যারা মানে। কিন্তু ওরা আসলে কোন সালাফকেই মানে না। যেমন যদি বলা হয়- গায়রে মুকাল্লিদ আলেম আব্দুর রহমান মোবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াজীতে লিখেন- মোজার উপর মাসাহ করার হাদীস ঠিক নয়, ওরা বলে- আমরা ওকে মানি না। যদি বলা হয়- আপনাদের কিতাব আওনুল মাবুদে শামছুল হক আজিমাবাদী লিখেন-

পয়গম্বর স্বীয় কবরে জিবীত থাকেন, আর যে রুকু পায় সে ঐ রাকাত পেয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। ওরা বলবে- আমরা একে মানি না। তিনি সেই রাকাত পেয়েছেন বলে ধর্তব্য হবে, এবং নবীরা কবরে জিবীত। ওরা বলবে- আমরা তাকেও মানি না। যদি বলা হয়- শায়েখ ইবনে তাইমিয়া (র.) ২০ রাকাত তারাবীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ মাজমুআ ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াতে।

ওরা বলবে- আমরা তাকেও মানি না। যদি আরো উপরে গিয়ে বলা হয় যে, ইমাম বুখারী ১ নং খণ্ডে ৭৪১ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন- এক মজলিশে ৩ তালাক দিলে ৩ তালাকই হয়, ওরা বলবে যে, আমরা তাকেও মানি না। আর হযরত ইমাম মুসলিম রহঃ বলেন- যখন কিরাত পড়া হয়, তখন চুপ থাক। ওরা বলবে যে, আমরা তাকেও মানি না।

যদি আরো উপরে গিয়ে বলা হয়- ইমাম আবু হানীফা রহঃ ইমাম শাফেয়ী মাসায়েল বলেছেন। ওরা বলবে- আমরা তাদেরও মানি না। যদি বলা হয়, আরো উপরে গিয়ে হযরত ওমর রাঃ তারাবীহ ২০ রাকাত বলেছেন, এবং৩ তালাককে ৩ তালাক বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। ওরা বলবে- আমরা তাকেও মানি না। এবার বলুনতো- পূর্ণ উম্মতের মাঝে সালাফ [পূর্ববর্তী] আছে কে? যাকে তারা মানে? ওরা সালাফী? না খালাফী [পরবর্তী]?

শুধু সহীহ হাদীস ই কিআমলযোগ্য?

শুধু হাদীস সহীহ হলেই তা আমলযোগ্য হয়ে যায় না। বরং এর মাঝে অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে হবে এ ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী।

১- বুখারী মুসলিমে এসেছে যে, রাসূল সা. জুতাসহ নামায পড়তেন। জুতা পরিহিত অবস্থায় কেন ওরা নামায পড়ে না?

২- সহীহ হাদীসে নেকাহে মুতআ জায়েযের কথা আছে। মূর্খতার কারণে সহীহ দেখে যদি আমল করে তাহলে বলবে নেকাহে মুতআ জায়েয।

৩- সহীহ হাদীসে কেবল দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ আছে, কোথাও কাটার কথা নাই। যদি সহীহ হাদীস মানতে যান, তাহলে আপনি জীবনেও দাড়ি কাটতে পারবেন না। দাড়িতে হাত দেবার কোন অধিকার আপনার নেই সহীহ হাদীসের উপর আমল করতে চাইলে।

৪- সহীহ হাদীস দ্বারা পেশাব খাওয়া জায়েজ প্রমাণিত। শুধু চোখ বন্ধ করে সহীহ হাদীস মানলে পেশাব খাওয়া জায়েজ বলতে হবে।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে যা সহীহ বর্ণনায় এসেছে, কিন্তু তা আমলযোগ্য নয়। সবাইকে কুরআন সুন্নাহ থেকে আমল। করতে বললে কি অবস্থা হবে দ্বীনের একবার ভাবা যায়?

কথিত আহলে হাদীসের ঈমান নবীর উপর নাকি শর্তের উপর?

কাফেররা নবীর উপর বিশ্বাস রাখেনি রেখেছে তাদের দাবিকৃত বিষয়ের উপর। এমনিভাবে আপনারা মন থেকে এই কথা দূরিভূত করে দিন যে, গায়রে মুকাল্লিদদের ঈমান নবী সা.- এর উপর। কখনোই নয়। বরং তাদের ঈমান হল ইমামদের শিখানো শর্তের উপর।

যেমন কাফেররা নবী সা.- কে বলত যে, যা আমরা বলছি, তা আল্লাহ তায়ালা থেকে বলিয়ে নাও। অথবা আল্লাহ তায়ালা থেকে করিয়ে নাও। যদি এমন করতে পার তাহলে তা মানব। নতুবা নয়। এমনিভাবে গায়রে মুকাল্লিদ কথিত আহলে হাদীসরা একটি বিষয় উত্থাপন করে দেয়, আর বলে যে, এর হুবহু শব্দ আল্লাহর নবী সা.- থেকে বলিয়ে নাও। তাহলে আমরা মানব। নতুবা এর আগে নবীজী সাঃ যা কিছু নিজে বলেছেন তা আমরা মানবনা। গায়রে মুকাল্লিদদের আপনি যতই সহীহ হাদীস দেখান না কেন। ওদের শর্ত অনুযায়ী না হলে তারা তা মানবে না। বলবে, বুখারীতে দেখাও, মুসলিমে দেখাও। নতুবা সিহাহ সিত্তায় দেখাও। নুতবা মানব না। যদিও হাদীসটি সহীহ হয়।

এর মানে এই দাঁড়ায় যে, ওরা যেন নবীজী সা.- কে পরামর্শ দিচ্ছে যে, আপনি যদি এরকম শব্দে হাদীস বলেন, আর তা ইমাম বুখারী বা ইমাম মুসলিম বা সিহাহ সিত্তায় স্থান পায় তাহলে আমরা মানব, নতুবা আপনার কথা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব নাউজুবিল্লাহ।

একটি ধোঁকাবাজী প্রশ্ন

ইংরেজদের দোসর গায়রে মুকাল্লিদরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রশ্ন করে থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা রহঃ এর মাযহাবের আগের মানুষ কোন মাযহাবের অনুসরণ করতো?

ওদের জিজ্ঞেস করুন- বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদসহ সিহাহ সিত্তার কিতাব লিখার আগে কোন হাদীস ছিল? তখন কি সহীহ হাদীস ছিলনা? তখনকার মানুষ কি সহীহ হাদীসের উপর আমল করেননি? যেই তিন জমানাকে রাসূল সাঃ শ্রেষ্ঠ জমানা বলেছেন, সেই তিন জমানায় সহীহ হাদীসের উপর আমল হয়নি? বুখারী মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তাহ সংকলিত না হবার কারণে?

বুখারী মুসলিম সংকলিত হবার আগে যেমন তখনকার মানুষ বিক্ষিপ্ত সহীহ হাদীসের উপর আমল করতেন, তেমনি ইমাম আবু হানীফা র., ইমাম শাফেয়ী রহঃ ইমাম মালেক রহ., ইমাম আহমাদ রহ. মাসায়েল সংকলিত করে সুবিন্যাস্ত করার আগে বিক্ষপ্ত মাসাআলাকে একত্র করেছেন। হযরত উসমান রাঃ এর আমলের আগে ৭ কিরাতে কুরআন পড়া হতো। যখন হযরত উসমান রা. এক কিরাতে কুরআন একত্র করলেন। তখন এটি আবশ্যক হয়ে গেল। গোটা পৃথিবীতে সেই একই পদ্ধতিতে কিরাত পড়া হয় কুরআনের। তো কি দাঁড়াল? বিক্ষিপ্ত কেরাতকে হযরত উসমান রাঃ এক করে দিলেন।

এমনি চার মাযহাবের অবস্থা। বিক্ষিপ্ত মাসায়েলকে একত্র করেছেন নতুন কোন বিষয় জারি করেননি।

এখন সময় এসেছে ওদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলার। সোচ্চার হওয়ার। বয়কট করতে হবে ওদের সর্ব প্রকার সামাজিক অবস্থান থেকে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই ভয়ংকর ফিতনা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন।

মাযহাব সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তর

মাযহাব কি এবং কেন?

মাযহাব কি রাসূল, সাহাবী এবং তাবেঈ কারো মানার দলীল আছে?

কুরআন ও হাদীস দেখে আমল করলে অসুবিধা কোথায়?

মুহাদ্দিসগণ কি মাযহাব মেনেছেন?

আমরা কেন চারটি মাযহাব থেকে বেছে বেছে মাসআলা আমল করতে পারব না?

কেন একটি মাযহাবই মানতে হবে?

জবাব

মাযহাব কি

মুজতাহিদ হল কুরআন সুন্নাহ, সাহাবাদের ফাতওয়া, কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐক্যমত্বে এবং যুক্তির নিরিখে কুরআন সুন্নাহ থেকে মাসআলা চয়নকারী গবেষক দলের নাম। যারা নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন মূলনীতি নির্ধারণ করে কুরআন সুন্নাহর বাহ্যিক বিপরীতমুখী মাসআলার মাঝে সামাঞ্জস্যতা এনেছেন। কুরআন সুন্নাহর একাধিক অর্থবোধক শব্দের উদ্দিষ্ট পালনীয় অর্থকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। নতুন উদ্ভূত মাসআলার শরয়ী মূলনীতির আলোকে সমাধান বের করেছেন। সেই সাথে নতুন নতুন মাসআলার কোন মূলনীতির আলোকে হুকুম আরোপিত হবে যার বিধান সরাসরি কুরআন সুন্নাহে বর্ণিত নেই, সেই মূলনীতিও নির্ধারিত করেছেন। মূলত সেই গবেষক দলের নাম হল মুজতাহিদ। আর তাদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে বের হওয়া মাসআলার নাম মাযহাব।

এবং কেন?

মাযহাব পালনের কথা এই জন্য বলা হয় যে, যেহেতু কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে আলেম খুবই নগণ্য। যারাও আছে তারা কুরআনে কারীমের কোন আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে, কোন আয়াতের হুকুম বহাল আছে, কোন আয়াত কোন প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে, কোন আয়াত কাদের উদ্দেশ্য করে নাজিল হয়েছে। কোন আয়াতাংশের প্রকৃত অর্থ কি? আরবী ব্যাকরণের কোন নীতিতে পড়েছে এই বাক্যটি? এই আয়াত বা হাদীসে কী কী অলংকারশাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে? ইত্যাদী সম্পর্কে বিজ্ঞ হন না।

সেই সাথে কোনটি সহীহ হাদীস কোনটি দুর্বল হাদীস? কোন হাদীস কি কারণে দুর্বল? কোন হাদীস কী কারণে শক্তিশালী? হাদীসের বর্ণনাকারীদের জীবনী একদম নখদর্পনে থাকা আলেম এখন নাই। অথচ হাদীসের বর্ণনাকারী শক্তিশালী না হলে তার দ্বারা শরয়ী হুকুম প্রমাণিত হয়না। এই সকল বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যাওয়া দুস্কর। একেতু অধিকাংশ মানুষই আলেম না। আর মুষ্টিমেয় যারা আলেম তারাও উল্লেখিত সকল বিষয় সম্পর্কে প্রাজ্ঞ নয়। তাই আমাদের পক্ষে কুরআন সুন্নাহ থেকে সঠিক মাসআলা বের করা অসম্ভব।

একটি উদাহরণ

এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- أقيموا الصلاة তথা সালাত কায়েম কর।

আরেক আয়াতে বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ তথা নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেস্তারা নবীজীর উপর সালাত পড়ে। এই আয়াতের শেষাংশে এসেছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, তথা হে মুমিনরা তোমরাও তাঁর উপর সালাত পড় এবং তাঁকে সালাম জানাও। [সূরা আহযাব- ৫৬]

এই সকল স্থানে লক্ষ্য করুন- সালাত শব্দটির দিকে। তিনটি স্থানে সালাত এসেছে। এই তিন স্থানের সালাত শব্দের ৪টি অর্থ। প্রথম অংশে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল নামায অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাদের নির্দেশ দিলেন যে তোমরা নামায কায়েম কর। [সূরা বাকারা- ৪৩]

আর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ও তার ফেরেস্তারা নবীজী সা.- এর উপর সালাত পড়েন মানে হল- আল্লাহ তায়ালা নবীজী সা.- এর উপর রহমত পাঠান, আর ফেরেস্তারা নবীজী সাঃ এর উপর সালাত পড়েন মানে হল নবীজী সা.- এর জন্য মাগফিরাতের দুআ করেন।

আর তৃতীয় আয়াতাংশে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল উম্মতরা যেন নবীজী সা.- এর উপর দরূদ পাঠ করেন। (كتاب الكليات۔ لأبي البقاء الكفوى)

একজন সাধারণ পাঠক বা সাধারণ আলেম এই পার্থক্যের কথা কিভাবে জানবে? সেতো নামাযের স্থানে বলবে রহমাতের কথা, রহমতের স্থানে বলবে দরূদের কথা দরূদের স্থানে বলবে নামাযের কথা। এরকম করলে দ্বীন আর দ্বীন থাকবে না, হবে জগাখিচুরী।

এরকম অসংখ্য স্থান আছে, যারঅর্থ উদ্ধার করা কঠিন। তাই একজন বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির শরাপন্ন হয়ে তার গবেষনা অনুযায়ী উক্ত বিষয়ের সমাধান নেয়াটাই হল যৌক্তিক। এই নির্দেশনাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন-

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل٤٣]

তথা তোমরা না জানলে বিজ্ঞদের কাছে জিজ্ঞেস করে নাও। [সূরা নাহল- ৪৩]

বিজ্ঞ ফুক্বাহায়ে কিরাম কুরআন সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মাত, এবং যুক্তির নিরিখে সকল সমস্যার সমাধান বের করেছেন। সেই সকল বিজ্ঞদের অনুসরণ করার নামই হল মাযহাব অনুসরণ। যেই অনুসরণের নির্দেশ সরাসরি আল্লাহ তায়ালা দিলেন পবিত্র কুরআনে।

রাসূল সা.- এর মাযহাব কি?

প্রধানমন্ত্রী কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন? এ প্রশ্ন যেমন অবান্তর, রাসূল সা. এর মাযহাব কি? এ প্রশ্ন তেমন অবান্তর। প্রধানমন্ত্রী কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন নন বরং সকল মন্ত্রণালয় তার অধীন। রাসূল সা.- তো আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে আমল করেছেন ফলে কারো কাছ থেকে জানার বা কারো অনুসনের প্রয়োজন নেই। রাসূল সা. যা করেছেন যা বলেছেন তাইতো শরিয়ত। তাই কুরআনের আয়াতও নবীজীর হাদীসের মর্ম বুঝার উপরই নির্ভর করে আমাদের শরীয়ত। এই মর্ম উদঘাটনে ভিন্ন মতের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে ভিন্ন মাযহাব। সুতরাং মর্ম উদঘাটনের প্রয়োজনে আমাদের জন্য মাযহাব প্রয়োজন। নবীজীর জন্য মর্ম উদঘাটনের প্রয়োজন নেই তাই তার জন্য মাযহাব প্রয়োজননেই।

সাহাবীদের মাযহাব কি?

সাহাবায়ে কিরাম যারা সরাসরি রাসূল সা.- এর কাছে ছিলেন তাদের জন্য রাসূল সা. এর ব্যাখ্যা অনুসরণ করা ছিল আবশ্যক। এছাড়া কারো ব্যাখ্যা নয়। কিন্তু যেই সকল সাহাবারা ছিলেন নবীজী সা. থেকে দূরে তারা সেই স্থানের বিজ্ঞ সাহাবীর মাযহাব তথা মত অনুসরণ করতেন। যেমন ইয়ামেনে হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রা.- এর মত তথা মাযহাবের অনুসরণ হত। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. কে অনুসরণ করতেন ইরাকের মানুষ।

রাসূল সা. যখন মুয়াজ বিন জাবাল রা.- কে ইয়ামানে পাঠাতে মনস্ত করলেন তখন মুয়াজ রা. কে জিজ্ঞেস করলেন- যখন তোমার কাছে বিচারের ভার ন্যস্ত হবে তখন তুমি কিভাবে ফায়সাল করবে? তখন তিনি বললেন- আমি ফায়সালা করব কিতাবুল্লাহ দ্বারা। রাসূল সা. বললেন- যদি কিতাবুল্লাহ এ না পাও? তিনি বললেন- তাহলে রাসূলুল্লাহ সা.- এর সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করব। রাসূল সা. বললেন- যদি রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাতে না পাও? তখন তিনি বললেন- তাহলে আমি ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করব। তখন রাসূল সাঃ তাঁর বুকে চাপড় মেরে বললেন- যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই তৌফিক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৫৯৪, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ১৩২৭, সুনানে দারেমী, হাদীস নং- ১৬৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ২২০৬১]

এই হাদীসে লক্ষ্য করুন- রাসূল সা.- এর জীবদ্দশায় হযরত মুয়াজ রা. বলছেন যে, আমি কুরআন সুন্নাহ এ না পেলে নিজ থেকে ইজতিহাদ করব, আল্লাহর নবী বললেন- আল হামদুলিল্লাহ। আর ইয়ামেনের লোকদের উপর হযরত মুয়াজের মত তথা মাযহাব অনুসরণ যে আবশ্যক এটাও কিন্তু হাদীস দ্বারা স্পষ্ট। এছাড়া

সাহাবাদের যুগে যে সকল সাহাবাদের মাযহাব তথা মত অনুসরণীয় ছিল। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন- হযরত ওমর বিন খাত্তাব রা., হযরত আলী বিন আবু তালিব রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা., হযরত আয়েশা রা., হযরত জায়েদ বিন সাবেত রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. প্রমূখ সাহাবাগণ।

তাবেয়ীদের মাযহাব

তাবেয়ীরা যেই সকল এলাকায় থাকতেন, সেই সকল এলাকার বিজ্ঞ সাহাবীদের বা বিজ্ঞ মুজতাহিদের মত তথা মাযহাবের অনুসরণ করতেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত সাঈদ বিন মুসায়্যিব রহ., হযরত আবু সালমা বিন আব্দির রহমান রহ., হযরত ওরওয়া বিন জুবাইর রহ. হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ রহ., হযরত সুলাইমানবিন ইয়াসার রহ. হযরত খারেজা বিন জায়েদ রহ. প্রমূখবৃন্দ।

তারপর মদীনায় যাদের মত তথা মাযহাবের অনুসরণ করা হত তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল- হযরত ইমাম জুহরী রহ., হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ রহ., হযরত রাবিয়া বিন আব্দির রহমান রহ.। আর মক্কা মুকার্রমায় ছিলেন আতা বিন আবি রাবাহ রহ. আলী বিন আবি তালহা রহ., আব্দুল মালিক বিন জুরাইজ রহ. প্রমূখ। আর কুফায় ছিলেন হযরত ইবরাহীম নাখয়ী, আমের বিন শুরাহবীল, শাবী, আলকামা, আল আসওয়াদ রহ.। আর বসরায় ছিলেন- হাসান বসরী রহ.। ইয়ামানে হযরত তাওস বিন কায়সান রহ.। শামে হযরত মাকহুল রহ. প্রমূখ।

যাদের ফাতওয়া বিধৃত হয়েছে- মুয়াত্তাগুলোতে, মুসনাদগুলোতে, আর সুনান গুলোতে, যেমন মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, কিতাবুল আসার, শরহু মায়ানিল আসার ইত্যাদী গ্রন্থে। [উসুলুল ইফতা লিত তাক্বী উসমানী দা. বা.]

কুরআন ও হাদীস দেখে আমল করলে অসুবিধা কোথায়?

কি কি অসুবিধা তা আশা করি মাযহাব কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পেয়ে গেছেন। সেই উত্তরটি আবার দেখে নিন।

মুহাদ্দিসগণ কি মাযহাব মেনেছেন?

এই কথাটি বুঝার আগে একটি কথা আগে বুঝে নিন। সেটা হল- রাসূল সাঃ এর যুগ থেকেই দুটি দল চলে আসছে, একটি দল হল যারা ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী। তারা ইজতিহাদ করতেন তথা মত দিতেন বিভিন্ন বিষয়ে। আর একদল ছিলেন যাদের এই ক্ষমতা ছিলনা, তারা সেই মুজতাহিদদের মতের তথা মাযহাবের অনুসরণ করতেন।

ঠিক একই অবস্থা ছিল সাহাবাদের যুগে। একদল ছিল মুজতাহিদ, যাদের একটি তালিকা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আর বিশাল এক জামাত ছিল যারা ইজতিহাদের ক্ষমতা রাখতেন না। তারা সেই সকল মুজতাহিদদের মাযহাব তথা মতের অনুসরণ করতেন। তেমনি তাবেয়ীদের একই অবস্থা ছিল, একদল মুজতাহিদ, আরেকদল মুকাল্লিদ তথা অনুসারী। এমনি মুহাদ্দিসীনদের মাঝেও দুই দল ছিল, একদল ছিল যারা ইজতিহাদের ক্ষমতা রাখতেন, আরেকদল ছিলেন যারা ইজতিহাদের ক্ষমতা রাখতেন না। তাই তাদের মাঝে কারো কারো মাযহাব রয়েছে কারো কারো নেই। কেউ কেউ নিজেই মাসআলা বের করেছেন, কেউ কেউ অন্য কোন ইমামের অনুসরণ করেছেন।

যেমন ইমাম বুখারী মুজতাহিদ ছিলেন, তাই তার কারো অনুসরণের দরকার নাই। তবে কেউ কেই তাকে শাফেয়ী মাযহাবী বলে মত ব্যক্ত করেছেন। [আল ইনসাফ=৬৭ তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ- ২/২, আবজাদুল উলুম ৮১০] এমনিভাবে ইমাম মুসলিম রহঃ ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। [আল হিত্তাহ- ১৮৬]

নাসায়ী শরীফের সংকলক ইমাম নাসায়ী রহঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ এর মাযাহাবের অনুসারী ছিলেন।, ইমাম আবু দাউদ রহঃ, ও ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। [ফয়জুল বারী- ১/৫৮, আবজাদুল উলুম- ৮১০, ইলাউল মুয়াক্কিয়ীন- ১/২৩৬]

ইমাম তাহাবী রহঃ ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। যা তার সংকলিত তাহাবী শরীফ পড়লেই যে কেউ বুঝতে পারবে। এছাড়াও বাকি সকল মুহাদ্দিস হয়ত মুজতাহিদ ছিলেন, নতুবা ছিলেন মুকাল্লিদ কোননা কোন ইমামের।

কেনো একটি মাযহাব মানতে হবে?

কুরআনে কারীম ৭টি কিরাতে নাজীল হয়েছে। কিন্তু একটি কিরাতে প্রচলন করেছেন হযরত উসমান রাঃ। যেটা ছিল আবু আসেম কুফী রহ. এর কিরাত। এর কারণ ছিল বিশৃংখলা রোধ করা। যেন দ্বীনকে কেউ ছেলেখেলা বানিয়ে না ফেলে। আর সবার জন্য এটা সহজলভ্য হয়। তেমনি একটি মাযহাবকে আবশ্যক বলা হয় এই জন্য যে, একাধিক মাযহাব অনুসরণের অনুমোদন থাকলে সবাই নিজের রিপু পূজারী হয়ে যেত। যেই বিধান যখন ইচ্ছে পালন করত, যেই বিধান যখন ইচেছ ছেড়ে দিত। এর মাধ্যমে মূলত দ্বীন পালন হতনা, বরং নিজের প্রবৃত্তির পূজা হত। তাই ৪র্থ শতাব্দীর উলামায়ে কেরাম একটি মাযহাবের অনুসরণকে বাধ্যতামূলক

বলে এই প্রবৃত্তি পূজার পথকে বন্ধ করে দিয়েছেন। যা সেই কালের ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সীদ্ধান্ত ছিল। আর একবার উম্মতের মাঝে ইজমা হয়ে গেলে তা পরবর্তীদের মানা আবশ্যক হয়ে যায়। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও লাগামহীনভাবে যে মাযহাব মনে চায় সেটাকে মানা সুস্পষ্ট হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন। [ফাতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া]

ওরা আহলে হাদীস না আহলে তাকলীদ? !গায়রে মুকাল্লিদ হয়ে তাকলীদ কেন?

গায়রে মুকাল্লিদ তথা কথিত আহলে হাদীস ভাইদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উপর সবচে বেশি অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে তাকলীদ নিয়ে। তাদের ভাষ্যমতে কুরআন হাদীসের ইবারত ছাড়া কোন ব্যক্তির তাকলীদ করা জায়েজ নয়। বরং এটি শিরক।

প্রফেসর আব্দুল্লাহ বাঘলপুরী গায়রে মুকাল্লিদ সাহেব লিখেছেন, প্রতিটি মুশরিক প্রথমে মুকাল্লিদ হয়

তারপর মুশরিক হয়। যদি তাকলীদ না থাকতো তাহলে শিরক সৃষ্টি হতো না। শিরকের সৃষ্টিই হয় তাকলীদ থেকে।

মাওলানা সানাউল্লাহ উমারতাসরী গায়রে মুকাল্লিদ সাহেব লিখেছেনঃ আহলে হাদীসদের কিতাব, রিসালা ও ফাতাওয়া দেখুন, যাতে তাকলীদকে শুধু বিদআত বলা হয়নি, বরং কুফরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। [আহলে হাদীস]

গায়রে মুকাল্লিদ মাসউদ সাহেবের লেখা বইয়ের কামাল আহমাদের অনূদিত সালাফী পাবলিকেশন্স ঢাকা থেকে মুদ্রিত মাযহাব ও তাকলীদ নামক বইয়ে তাকলীদকে একাধিক স্থানে শিরক এবং মুকাল্লিদকে মুশরিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম নামক এক গায়রে মুকাল্লিদের লেখা মাযহাবীদের গুপ্তধন নামক বইয়েও একই বক্তব্য স্থান পেয়েছে যে, তাকলীদ করা শিরক। আর মুকাল্লিদরা মুশরিক। আর গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের সংজ্ঞা অনুপাতে তাকলীদ হল, কুরআন হাদীসের দলীল ছাড়া কারো অন্ধ অনুসরণ করার নাম তাকলীদ।

কিন্তু পরিতাপের সেই সাথে মজার ব্যাপার হল, আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা এ শিরকী কর্মটি করেছেন খুবই নিষ্ঠার সাথে। কুরআন হাদীসের দলীল ছাড়া অসংখ্য মাসআলায় ব্যক্তির তাকলীদের নজির উপস্থাপন করে নিজেদের পরিভাষা ও ফাতাওয়া অনুযায়ী মুশরিকের খাতায় নাম লিখিয়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা যে শুধু মুসলমান ব্যক্তির অনুসরণ করেছেন, তাই নয়, বরং কাফেরের তাকলীদ করাকেও আপন করে নিয়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আব্দুল হক গজনবী সাহেব আহলে হাদীসদের সর্দার মাওলানা সানাউল্লাহ উমরতাসরী সাহেব সম্পর্কে লিখেনঃ তিনি ফালসাফা নিচরীউ এবং মুতাজিলাদের মুকাল্লিদ ছিলেন। [আলআরবাঈনা- ৫, রাসায়েলে আহলে হাদীস, প্রথম খণ্ড]

গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আব্দুল আহাদ সাহেব মাওলানা উমরতাসরী সম্পর্কে লিখেনঃ তিনি সাহাবাদের জামাআত এবং তাদের ইজমাকে বাতিল করে দিয়ে কাফের এবং মুশরিকদের তাকলীদ

করতেন। [আলফায়সালাতুল হিজাযিয়্যাহ- ৩৩, রাসায়েলে আহলে হাদীস, ১ম খণ্ড]

যদিও গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের দাবি হল, তারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাসআলাই কেবল মেনে থাকেন হুবহু। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায়, তারা কুরআন ও সহীহ হাদীস রেখে নিজের মনগড়া মতের তাকলীদ করে থাকেন। স্মর্তব্য যে, তাকলীদ মানে গায়রে মুকাল্লিদের পরিভাষায় কুরআন হাদীসের দলীল ছাড়া কোন কিছু নেয়া। সুতরাং যদি কোথাও কুরআনও হাদীসের ইবারত থাকে, তারপরও তারা অন্য মত পোষণ করে থাকেন, কারো কথা মেন, কিংবা নিজের মনগড়া, তাহলেকি তারা তাকলীদ করলেন না?।

আসুন আমরা গায়রে মুকাল্লিদ আলেমদের মনগড়া তাকলীদের কিছু নমুনা দেখিঃ

গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের কাছে বড় আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব। যিনি তাদের প্রসিদ্ধ কিতাব নুজুলুল আবরার এবং হাদিয়াতুল মাহদী ও তাইসীরুল বারী ইত্যাদি কিতাব রচনা করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ আবু ইয়াহইয়া ইমাম খান নৌশহরী ওহীদুজ্জামান সাহেবের নুজুলুল আবরার ও হাদিয়াতুল মাহদী কিতাবের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেনঃ এ দুটি কিতাব আহলে হাদীস ফিক্বহের বিষয়ের উপর লেখা। আর সাধারণ মানুষের মাঝে খুবই গ্রহণযোগ্য। [আহলে হাদীস কি তাসনীফী- ৬২]

কুরবানী ওয়াজিব না সুন্নত?

ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব বুখারীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুখারী **১**ম খণ্ডের **১৩৪** পৃষ্ঠার হাদীসের ব্যাপারে লিখেন যে, এ হাদীস দ্বারা কুরবানী ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। হানাফীদের মত এটাই। [তাইসীরুল বারী- ২/৭০

এখানে তিনি স্বীকার করলেন যে, বুখারীর হাদীস হিসেবে কুরবানী করা ওয়াজিব। কিন্তু তার আরেক কিতাবে লিখেছেনঃ কুরবানী করা সুন্নত। [কানযুল হাকায়েক- ১৯৩] বুখারীর সহীহ হাদীস রেখে কার তাকলীদে এ মত পোষণ করে কথিত আহলে হাদীসরা?

মহিলাদের স্পর্শ করার দ্বারা অজু ভাঙ্গে কি?

ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব বুখারীর **১**ম খণ্ডের ৭৪ নং পৃষ্ঠার হাদীসের ব্যাপারে মন্তব্য করে লিখেন যে, এ হাদীস শাফেয়ীদের মতকে বাতিল করে দেয়। কারণ তাদের নিকট মহিলাকে স্পর্শ করা অজু ভঙ্গের কারণ। [তাইসীরুল হাদী- ২/২১০]

আল্লামা সাহেব একথা স্বীকার করলেন যে, যারা মহিলাদের স্পর্শের দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বলেন, তাদের মতটি বুখারীর উক্ত হাদীস দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, তার মাসলাক হল, মহিলাদের স্পর্শ করার দ্বারা অজু ভেঙ্গে যায়। [তাইসীরুল বারী- **১**/**১৪২**]

ইমাম বসে নামায পড়ালে মুক্তাদীও কি বসে নামায পড়বে?

বুখারীর **১**ম খণ্ডের ৯৬ পৃষ্ঠার হাদীসে এসেছে যে, রাসূল সা. মৃত্যুর আগে অসুস্থ থাকার সময় বসে বসে নামায পড়িয়েছেন। কিন্তু সাহাবাগণকে বসার হুকুম দেন নি। ওয়াহিদুজ্জামান সাহেবও লিখেছেন যে, রাসূল সা. বসে বসে নামায পড়ান। আর সাহাবাগণ রাসূল সা.- এর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। [রফউল আজাজাহ আন সুনানি ইবনে মাজাহ- ১/৪৩০]

কিন্তু এ স্বীকারোক্তির পরও তিনি তার আরেক গ্রন্থে লিখেন যে, আহলে হাদীসদের মাযহাব এটাই যে, যখন ইমাম বসে নামায পড়বে, তখন মুক্তাদীরা বসে বসে নামায পড়বে। [তাইসীরুল বারী- **১**/৪৩৯]

হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে তার হুকুম কি?

মুসলিম শরীফের **১**ম খণ্ডের ৪৭৬ নং পৃষ্ঠায় এসেছে যে, হযরত ইবনে ওমর রাঃ হায়েজ অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিলেন। তখন রাসূল সাঃ তাকে স্ত্রীকে রাজআত করার আদেশ দিলেন।

গায়রে মুকাল্লিদ ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব এ হাদীসের অধীনে লিখেন যে, রাসূল সাঃ যেহেতু রাজআত করার হুকুম দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়ায় তালাক পতিত হয়েছিল। [শরহে মুসলিম- ৪/৮৯]

কিন্তু এ সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়ে তিনি ইবনে তাইমিয়া রহঃ এর অন্ধ তাকলীদ করে লিখেছেনঃ হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয় না। [তাইসীরুল বারী- ৭/১৬৪, ২৩৫]

কুকুর ও তার ঝুটা পাক নাকি নাপাক?

মুসলিম শরীফের **১**ম খণ্ডের **১৩৭** পৃষ্ঠার হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কুকুর নাপাক এবং তার উচ্ছিষ্ট নাপাক।

গায়রে মুকাল্লিদ ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব এসব হাদীসের অধীনে লিখেনঃ এসব হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কুকুর নাপাক, এবং তার লালা ও ঘাম নাপাকা। [শরহে মুসলিম- ১/৪০৬]

কিন্তু এসব হাদীসের উল্টো নিজের আরেক কিতাবে পূর্বসূরীদের তাকলীদ করে লিখে দিলেনঃ অধিক সহীহ কথা এটাই যে, কুকুর ও শুকরের উচ্ছিষ্ট পাক। [নুজুলুল আবরার- **১**/**৩১** ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব নিজেই হাদীসের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করতে গিয়ে হাদীসের একটি অর্থ করলেন। তারপর হাদীসের সে অর্থ রেখে নিজের আহলে হাদীস ইমামদের তাকলীদ করে হাদীসের উল্টো]

আরেক মত পোষন করেছেন। তাহলে হাদীসের বিরোধীতা করে কি তারা আহলে হাদীস থাকে? যারা সারা দিন তাকলীদকে শিরক শিরক বলে চিল্লায় তাদের এ তাকলীদের হুকুম কি হবে?

ইবনে হাযমের তাকলীদ

মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান সহ গায়রে মুকাল্লিদ সাহেবগন শুধু কুরআনও হাদীস মানার দাওয়াত দিয়ে তাকলীদকে হারাম ও শিরক বললেও নির্লজ্জবাবে কুরআন হাদীসের বিপরীত ইবনে হাজম রহঃ এর তাকলীদ করেছেন।

কুরআন মাজীদেস্পষ্টভাষায় لَهْوَ الْحَدِيْثِতথা অবান্তর বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করেছে। [সূরা লুকমান- ৬]

আর এটা সুনিশ্চিত যে, গান- বাজনা অযথা বিষয়ের মাঝে শামিল। সেই সাথে বুখারীর ২য় খণ্ডের ৮৩৭ পৃষ্ঠায় এসেছে যে, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমার উম্মতের মাঝে কিছু লোক এমন হবে, যারা গান- বাদ্যকে হালাল মনে করবে।

কুরআনও হাদীসের এসব বর্ণনা সত্ত্বেও গায়রে মুকাল্লিদ ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব ইবনে হাযম রহ. এর তাকলীদ করে ঘোষণা দিলেন যে, গান- বাজনা জায়েজ হওয়ার মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। [তাইসীরুল বারী- ২/৫০, আসরারুল লুগাত- ৮৬ আসারে খায়রের উদ্ধৃতিতে- ৩৭৭, হাদিয়াতুল মাহদী- ১১৮]

অন্ধ মুকাল্লিদ মাযহাবীরা? না নামধারী আহলে হাদীসরা?

হাফেজ মুহাম্মদ সাহেবের তাকলীদ

গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন যিনি তারীখে আহলে হাদীস তাফসীরে ওয়াজেহুল কুরআন ইত্যাদি কিতাব রচনা করেছেন। তার নাম হল মাওলানা মীর মুহাম্মদ ইবরাহীম শিয়ালকুটি। তিনি তাফসীরে সূরা কাহাফের ৬ নং পৃষ্ঠায় আসহাবে কাহাফের নামে ওসীলা সম্পর্কে কতিপয় আমলের উল্লেখ করেছেন।

এ বক্তব্যের উপর পর্যালোচনা করে গায়রে মুকাল্লিদ আরেকজন আলেম মাওলানা আব্দুল কাদের হাসারয়ী সাহেব লিখেছেনঃ মাওলানা [শিয়াকুটি] এসব নাম নিয়ে ওসীলা গ্রহণের যে আমলের কথা বলেছেন, যাতে এসব নামে উপকার অর্জন আর বিপদ দূরিকরণের প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি শরীয়তের কোন দলীল পেশ করেননি। বরং তিনি অন্য একজন আলেমের উপর তাকলীদ করে তা বলে দিয়েছেন। [ফাতাওয়া সেতারিয়া- ৩/১৪১]

গায়রে মুকাল্লিদ আলেম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখও করে দিয়েছেন যে, কার তাকলীদে শিয়াকুটি সাহেব এ বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি লেখেনঃ মাওলানা [শিয়ালকুটি] হাফেজ মুহাম্মদ সাহেব এর বক্তব্যের দ্বারা দলীল দিয়েছেন যে, এ আমল শরীয়তের অনুকুল। অথচ তার কাছে এটি শরীয়ত সম্মত হওয়ার কোন দলীল নেই। [ফাতাওয়া সেতারিয়া- ৩/১৪২]

দলীল না দেখে শুধু কথা মানার নামই হল তাকলীদ। তাহলে গায়রে মুকাল্লিদ দাবীদার শিয়ালকুটি সাহেব তাকলীদকে অস্বিকার করে নিজে কেন তাকলীদ করলেন?

মুতলাক তাকলীদ গায়রে মুকাল্লিদদের কাছেও ওয়াজিব?

মাওলানা শিয়ালকুটি গায়রে মুকাল্লিদ সাহেব তার শায়েখ মিয়া নজীর হুসাইন দেহলবী সাহেবের কিতাব মিয়ারে হক এর রেফারেন্সে লিখেন যে, মুতলাক তাকলীদ ওয়াজিব।

দেখুন! তার ভাষ্য, অবশিষ্ট রইল না জানা ব্যক্তিদের তাকলীদ। এটি চার প্রকার। প্রথম প্রকার হল ওয়াজিব। এটি হল মুতলাক তাকলীদ। মুজতাহিদ আহলে সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। সুনির্দিষ্ট কাউকে নয়, যার উল্লেখ মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী রহঃ ইকদুলজীদ গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ তাকলীদপুরো উম্মতের ঐক্যমত্বে ওয়াজিব এবং সহীহ। আর দ্বিতীয় প্রকার হল সুনির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করা এটি জায়েজ। [তারীখে আহলে হাদীস- ১৪৭]

একদিকে প্রচার করছে তাকলীদ শিরক আর কুফর। অপরদিক দিয়ে এটাকে ওয়াজিব বলে বেড়াচ্ছে! সেই সাথে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.- এর উদ্ধৃতিতে এর উপর সমস্ত উম্মতের ঐক্যমত্যের কথাও বলছে। হায়রে গায়রে মুকাল্লিদ!

শুধু কি তাই? গায়রে মুকাল্লিদ অন্যান্য আলেমদের মন্তব্য শুনুন!

নওয়াব সিদ্দিক হাসান গায়রে মুকাল্লিদ সাহেব লিখেন, সাধারণ মানুষের উপর মুজতাহিদের তাকলীদ করা এবং তার ফাতওয়ার উপর চলা ওয়াজিব। [লুক্বতাতুল উজলান- ১৩৭]

মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান গায়রে মুকাল্লিদ সাহেব লিখেন, সাধারণ লোকদের জন্য উলামাদের তাকলীদ করা আবশ্যক। [হাদইয়াতুল মাহদী- ১১০]

মাওলানা সানাউল্লাহ উমরতাসরী গায়রে মুকাল্লিদ সাহেব লিখেন, এটাতো স্বীকৃত কথা যে, ইলমহীনের উপর আলেমের তাকলীদ করা জরুরী। [তাকলীদে সখসী- ২০]

তারা একদিকে তাকলীদকে ওয়াজিব বলছেন। অপর দিকে তাকলীদকারীদের মুশরিকও বলে বেড়াচ্ছেন। এ কেমন দ্বি মুখী নীতি?

আল্লামা শাওকানীর তাকলীদ

গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে বড় আলেম আল্লামা শাওকানী নামে প্রসিদ্ধ মুহাম্মদ বিন আলী রহ. ও তাকলীদ করতেন। গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব এ বাস্তবতা স্বীকার করে বলেন, বর্তমান জমানার এক জামাআত যারা নিজেদের আহলে হাদীস পরিচয় দেয়, তারা সুন্নতের অনুসারী দাবি করার পরও নিজেদের আলেম যেমন ইবনে তাইমিয়া, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, শাওকানী এবং মাওলানা ইসমাঈল শহীদ প্রমূখদের এমন মুকাল্লিদ হয়ে যায় যে, তাদের রায়ের বিপরীত দলীল বর্ণনাকারীদের দলীল পর্যন্ত শুনে না। [তাইসীরুল বারী- ৬/৪৯৯, নুমানী কুতুবখানা]

শাওকানী প্রমূখদের এমন কট্টর তাকলীদ করার দরুন বিপরীত মতাবলম্বীদের দলীল পর্যন্ত শুনে না এ কথিত আহলে হাদীসরা। এমনকি তাদের ইমামদের তাকলীদ করে পূর্ববর্তী সম্মানীত মুজতাহিদদেরও সমালোচনা করতে মুখ কাঁপে না।

ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব এ বক্তব্যের পরপরই লিখেন, পূর্ববর্তী আইয়িম্মায়ে দ্বীন যেমন ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম শাফেয়ী রহঃ প্রমূখ ও অন্যান্য ওলীআল্লাহ বা সুফিয়ানে কেরাম ছিলেন, তাদের সমালোচনা পর্যন্ত করে বেড়ায় [তাইসীরুল বারী- ৬/৪৯৯] এর চেয়ে কট্টর তাকলীদ কাকে বলে?

নাপাক কাপড়ে নামায হয়?

মুসলমানদের শিশু বাচ্চারাও জানে যে, নাপাক কাপড়ে নামায হয় না। কিন্তু এর উল্টো আল্লামা শাওকানী রহ.- এর রায় হল, নাপাক কাপড়ে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। গায়রে মুকাল্লিদ দলের মুজাদ্দিদ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব আল্লামা শাওকানী রহ.- এর কট্টর তাকলীদ করে বলে দিলেন, নাপাক কাপড়ে নামায পড়লে নামায হয়ে যায়। [নুযূলুল আবরার- ১/৬৪]

কাপড় থাকা অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে নামায পড়া জায়েয?

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দ্বারা একথা সবাই জানেন যে, কাপড় থাকা অবস্থায় খালি শরীরে নামায পড়া জায়েয নয়। কিন্তু এর বিপরীত আল্লামা শাওকানী রহ.-এর সিদ্ধান্ত হল, উলঙ্গ হয়ে নামায পড়া জায়েয আছে। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব এ মাসআলাও আল্লামা শাওকানী রহ.- এর অন্ধ তাকলীদ করে বলে দিলেন যে, উলঙ্গ হয়ে নামায পড়লে তা সহীহ হয়ে যাবে। [নুযূলুল আবরার- ১/১১১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহঃ এর তাকলীদ

গায়রে মুকাল্লিদ তথা কথিত আহলে হাদীস জামাআতের নামকরা আলেম মাওলানা এনায়েতুল্লাহ আসরী সাহেব লিখেন, গযনবী বুযুর্গরা বিশেষ করে এবং অন্যান্য আহলে হাদীসরা এমনিভাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ এর তাকলীদ করে থাকে। [আল্ইতরুল বালীগ- ১৫৯, রাসায়েলে আহলে হাদীস, ২য় খণ্ড]

গায়রে মুকাল্লিদ দাবিদারদের তাকলীদ নিয়ে ওহীদুজ্জামান সাহেবের ধমকি

মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান গায়রে মুকাল্লিদ সাহেব লিখেছেন, আমাদের আহলে হাদীস ভাইয়েরা ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়্যুম, শাওকানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ এবং মাওলানা ইসামাঈল শহীদ রহ. প্রমূখদের দ্বীনের ঠিকাদার বানিয়ে রেখেছে। যেখানেই এসব বুযুর্গদের বিপরীত মত কেউ গ্রহণ করেছে, সেখানেই তাদের

পিছনে লেগে গেছে। ভাল- মন্দ বলতে শুরু করে দেয়। ভাইয়েরা! একটু ইনসাফতো করেন। সেই সাথে একটু ভেবে দেখুন! যখন তোমারা আবু হানীফা এবং ইমাম শাফেঈ রহ. প্রমূখদের তাকলীদ ছেড়ে দিয়েছো, সেখানে ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়্যুম এবং শাওকানী রহ. প্রমূখদের মত পরবর্তীদের তাকলীদের কী প্রয়োজন? [ওহীদুল লুগাত, মাদ্দা সার, হায়াতে ওহীদুজ্জামানের উদ্ধৃতিতে- ১০২]

বাইতুল্লাহ- মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা ছাড়া কোন কিছুর জন্য সফর বৈধ নয়?

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, বাইতুল্লাহ, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সফর বৈধ নয়। এমন কি রাসূল সা.- এর রওজা যিয়ারতের জন্যও সফর করা জায়েজ নয়। [নুযূলুল আবরার- ১/১৭৯]

কিন্তু সহীহ কথা হল, রাসূল সা.- এর রওজা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয এবং সওয়াবের কারণ। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. - এ মাসআলায় ভুল করেছেন।

এ কারণেই আল্লামা ওহীদুজ্জামান গায়রে মুকাল্লিদ সাহেব লিখেন, এ বাবের সর্বশেষ কথা হল, এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.- থেকে ভুল হয়েছে। তবুও তিনি একটি সওয়াব পাবেন। একটি মাসআলার ভুলের কারণে তার মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে? কখনোই নয়। [তাইসীরুল বারী- ২/১৯৭]

এখানে ওহীদুজ্জামান সাহেব স্পষ্টভাবে স্বীকার করলেন যে, এ মাসআলায় ইবনে তাইমিয়া রহ. ভুলের মাঝে রয়েছেন। তারপরও তার অন্ধ তাকলীদ করে তিনি তার আরেক গ্রন্থে লিখেন, সফর করা বৈধ নয় এ তিনটি ঘর ছাড়া। সেখানে শুধু যিয়ারতের জন্য সফর করা কি করে বৈধ হতে পারে? [শরহে মুসলিম- ৩/৪০৫]

তিন তালাকে এক তালাক?

এক মজলিসে তিন তালাক দিলে এক তালাক পতিত হবে এ মতটি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. 'র। গায়রে মুকাল্লিদ কথিত আহলে হাদীসদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া সকলেই ইবনে তাইমিয়া রহ. এর তাকলীদ করে এ মত পোষণ করেন যে, তিন তালাক দিলে এক তালাকই পতিত হবে।

মাওলানা শরফুদ্দীন দেহলবী আহলে হাদীস লিখেন, আসল কথা হল, মুজীব সাহেব যে লিখেছেন যে, মুহাদ্দিসীনদের নিকট এক মজলিসের তিন তালাকে এক তালাকের হুকুমে হবে, এ মতবাদ সাহাবা রাঃ, তাবেয়ী, তাবেয়ীগণ, আইয়িম্মায়ে মুহাদ্দিসীন এবং মুতাকাদ্দিমীন আলেমদের নয়, বরং এ মতবাদ সাত শত বছর

পরের মুহাদ্দিসীনদের। যারা ইবনে তাইমিয়া রহ.- এর ফাতওয়ার পাবন্দ এবং অনুসারী। [ফাতাওয়া সানাবিয়্যাহ- ২/২১৯]

এ ইবারত দ্বারা বুঝা গেল যে, এক মজলিসে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে মতটি সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেয়ী তাবেয়ীগণের নয়, বরং এটি শায়েখ ইবনে তাইমিয়া রহঃ এর মত। অথচ ইবনে তাইমিয়া রহ.- এর অন্ধ তাকলীদ করে বর্তমানের সকল আহলে হাদীস নামধারীরা তিন তালাকে এক তালাকের ফাতওয়া প্রদান করে থাকে।

এ মাসআলায় ইবনে তাইমিয়া রহ.- এর তাকলীদের কথা অস্বিকার করে কথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা বলতে পারেন যে, আরে! আমরাতো এ মাসআলায় ইবনে তাইমিয়া রহ.- এর তাকলীদ করে একথা বলি না। আমরা এটা বলি মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনা দ্বারা। যেখানে বলা হয়েছে যে, রাসূল সা., হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা., এবং হযরত ওমর রা.- এর শাসনামলের প্রথম ভাগে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো। এ হাদীসের ভিত্তিতে আমরা তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করি। ইবনে তাইমিয়ার তাকলীদ করে নয়।

এ কথার জবাব হল, আল্লামা ইবনে হাযম রহ. [যাকে আহলে হাদীস নামধারীরা নিজেদের একজন বলে গণ্য করে] লিখেছেন, মুসলিমের এ বর্ণনাটি রাসূল সা.- এর হাদীস নয়। কেননা, এ বক্তব্যটি না রাসূল সাঃ এর বাণী, না তার কোন আমল না রাসূল সা.- থেকে এ ব্যাপারে তাকরীর রয়েছে। এটি হাদীসের তিন প্রকারের কোন প্রকারের মাঝেই শামিল নয়। [মুহাল্লা লি ইবনে হাজম- ১০/১০৬, নুযূলুল আবরার- ২/৬৪]

আহলে হাদীসদের আলেম মাওলানা শরফুদ্দীন সাহেব দেহলবীও বলেন, এ হাদীস মারফু নয়। অর্থাৎ এটি রাসূল সা.- এর হাদীস নয়। তাই তিনি লিখেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা.- এর মুসলিমের এ হাদীসটি মারফু নয়। এটি কতিপয় সাহাবীর আমল। যাদের রহিত হওয়ার কোন ইলম ছিল না। [ফাতাওয়া সানাবিয়্যাহ- ২/২১৯]

সুতরাং একথা বলা যে, তিন তালাকে এক তালাক গণ্য করার বিষয়টি হাদীস থেকে গৃহিত তা সম্পূর্ণই মিথ্যাচার বরং এটি পুরোটাই ইবনে তাইমিয়া রহ.- এর অন্ধ তাকলীদের ফল।

ওরা আহলে হাদীস না আহলে তাকলীদ? !

মুহাদ্দিসীনদের তাকলীদ

গায়রে মুকাল্লিদদের প্রথম সারির আলেম মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী সাহেব লিখেছেন, গায়রে মুজতাহিদীন মুতালাকের জন্য মুজতাহিদীনদের তাকলীদ থেকে বের হয়ে আসা এবং তাদের অস্বিকার করার কোন জো নেই। তাদের কোথাও না কোথাও মুজতাহিদীন এবং মুহাদ্দিসীনদের আবশ্যকীয়ভাবে তাকলীদ করতে হয়। কিছু শাখাগত মাসআলার বিষয়ে হোক বা উসূল বা কায়দা-কানুনের ক্ষেত্রে হোক। চাই তা হাদীসের সহীহ বা জঈফ বলার ক্ষেত্রে হোক। [ইশাআতুস সুন্নাহ- ১১/৩১২]

বাটালাবী সাহেবের বক্তব্য একথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত করছে যে, যে ব্যক্তি মুজতাহিদে মুতলাক নয়, তার কোন না কোন স্থানে তাকলীদ করতেই হয়। চাই তা মাসআলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে হোক, বা হাদীস সহীহ- জঈফ বলার ক্ষেত্রেই হোক না কেন। সুতরাং গায়রে মুকাল্লিদ তথা কথিত আহলে হাদীসরা যে হাদীসকে সহীহ বা জঈফ বলছেন এটাতো মুহাদ্দিসীনদের মতের উপর তাকলীদ করেই।

হ্যাঁ, যেহেতু তাদের কাছে তাকলীদ শব্দের মাঝে চুলকানি রয়েছে, তাই তারা তাকলীদ শব্দ ব্যবহার না করে, এখানে তারা ইত্তিবা শব্দ ব্যবহার করে থাকে। আসলে কাজ কিন্তু একই। তাকলীদের মাঝে যেমন একজন সাধারণ মুকাল্লিদ সাধারণত দলীল জিজ্ঞেস করে না। তেমনি মুহাদ্দিসীনগণের মন্তব্য মানার ক্ষেত্রেও অধিকাংশ সময় দলীল জানা যায় না। তাই মুহাদ্দিসীনদের কথা মেনে হাদীসকে সহীহ- জঈফ বলাওতো তাকলীদ।

নাসীরুদ্দীন আলবানীর স্বীকারোক্তি

১) গায়রে মুকাল্লিদদের বড় ইমাম শায়েখ নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেব এক হাদীসের সনদের ব্যাপারে জনৈক মুহাদ্দিস মন্তব্য করেন- رجاله رجال الصحيح তথা এর রাবীগণ সহীহ রাবী। এ কথাটি আল্লামা সুয়ূতী রহ. নকল করে বলেছেন যে, হাদীসটি সহীহ। এ বক্তব্যের উপর নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেব লিখেছেন, এ ব্যাপারে সুয়ূতী তার তাকলীদ করেছেন। [সিলসিলাতুজ জঈফাহ- ২/৩৪০]

২) হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ, এক হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন, رجاله ثقات তথা এর রাবীগণ সিক্বাহ তথা তাদের উপর নির্ভর করা যায়। এ বক্তব্যটিই আল্লামা ছানআনী রহ. নকল করেছেন। এ ব্যাপারে আলবানী সাহেব লিখেছেন, সানআনী তাকলীদ করেছেন। [সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ- ২/৩৬২]

৩) আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. একটি হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এ ব্যাপারে শায়েখ আলবানী সাহেব লিখেছেন, শাওকানী, সিদ্দিক হাসান এবং আলুসী রহ. - এ ব্যাপারে তার তাকলীদ করেছেন। [সিলসিলাতুল আহাদীসিজ জঈফাহ- ২/৩৮৭]

সারা দুনিয়া জানে যে, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এবং আল্লামা শাওকানী রহঃ আপনাদের ঘরাণার লোক তথা গায়রে মুকাল্লিদ।

অথচ আল্লামা আলবানী সাহেবের তাহকীক অনুযায়ী তারা হাদীসের সহীহ-জঈফের ক্ষেত্রে হাফেজ ইবনে কাসীর শাফেয়ী রহঃ এর তাকলীদ করেছেন।

৪) আলবানী সাহেব নিজের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেনঃ قلدت في ذلك كله للجنة القائمة على تحقيقه তথা আমি এসব ব্যাপারে এ মজলিসের তাকলীদ করেছি, যা তাহকীকের জন্য কায়েম করা হয়েছে। [{সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ- ২/৩১৬]

শায়েখ আলবানী সাহেবের বক্তব্য একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রমাণ করছে যে, পরবর্তী ব্যক্তিগণ পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্যের আলোকে হাদীসকে সহীহ-জঈফ বলাটা তাদেরই তাকলীদ করা।

এ হিসেবে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এবং শাওকানী এবং আলবানী সাহেব নিজেকেও মুকাল্লিদ বলেছেন। অথচ এ তিনজনই গায়রে মুকাল্লিদ দাবিদার।

আহলে হাদীসদের কাছে নাসীরুদ্দীন আলবানীর মর্যাদা

ফাতাওয়া উলামায়ে হাদীস কিতাবে শায়েখ আলবানীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয় যে, শায়েখ আলবানী জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা ইউনিভার্সিটির প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বংশের দিক থেকে তিনি ইংরেজ ছিলেন। তার খান্দানের লোকেরা যখন মুসলমান হন, তখন তারা হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ইলম ও ফজলের পূর্ণতা দান করেন।

তিনি স্বীয় তাহকীকে আহলে হাদীস বনে যান। সিরিয়াতে শিক্ষকতা শুরু করেন। তার ইলমে হাদীসে বিশেষ করে আসমাউর রিজালের ক্ষেত্রে বিশেষ পান্ডিত্ব ছিল। আরব রাষ্ট্রসমূহে তার ইলমী গ্রহণযোগ্যতার প্রসিদ্ধি এমন ছিল যে, তার মত তাহকীক আর কারো ছিল না। [ফাতাওয়া উলামায়ে হাদীস- ৩/১৭৬]

এই হল, আহলে হাদীসদের নিকট শায়েখ আলবানীর অবস্থান। সেই আলবানী সাহেব বলছেন যে, তিনি পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীনদের মুকাল্লিদ ছিলেন। তাহলে নিজেরা তাকলীদ করে নফসে তাকলীদের উপর এমন খরগ হস্ত কেন?

তাকলীদ কী? তাকলীদ গায়রে মুকাল্লিদরাও করে কি?

তাকলীদের সংজ্ঞা গায়রে মুকাল্লিদদের কিতাব ফাতাওয়া নাজীরিয়্যাহ এর ১ম খণ্ডের ১৮৪ নং পৃষ্ঠায় এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে- এমন ব্যক্তির কথা মানা, যার কথা শরয়ী দলীল, এর নামই হল তাকলীদকথিত আহলে হাদীস দলের বড় আলেম জুবায়ের আলী জুয়ীর বক্তব্য হল- হাদীসের সহীহ- জঈফ বলার বিষয়টি মুহাদ্দিসীনদের ইলহামের উপর নির্ভরশীল। [মুহাসসালাহ নূরুল আইনাইন- ৮৫]

তাহলে কী দাঁড়াল? শুধু কুরআন ও হাদীসের দাবিদারদের জন্য আবশ্যক হয়, যখনি কোন হাদীসকে সহীহ বা জঈফ বলে মন্তব্য করবে, সাথে সাথে উক্ত হাদীসটিকে আল্লাহ বা রাসূল সা.- এর বক্তব্যের আলোকে সহীহ বা জঈফ বলবে। কিন্তু তারা একাজটি করে না, বা কিয়ামত পর্যন্ত করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তার কী করে থাকে? মুহাদ্দিসীনদের কথাকে দলীলহীনভাবে মেনে নেয়। [স্মর্তব্য যে, তাদের মতে দলীল কেবল কুরআন ও হাদীস ইজমা বা কিয়াস কোন দলীল নয়] আর জুবায়ের আলী জুয়ী সাহেব স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে, হাদীস সহীহ- জঈফ বলাটা মুহাদ্দিসীনদের ইলহামী সিদ্ধান্ত। আর ইলহাম কোন শরয়ী দলীল নয়। তাহলে শরয়ী দলীল ছাড়া কারো কথা মানার নামইতো তাকলীদ। এ তাকলীদ আপনারা সর্বদা করার পরও তাকলীদকে শিরক বলার আগে নিজেদের কী হুকুম হচ্ছে তা একবার ভেবে দেখেন কি?

ইমাম বুখারীর তাকলীদ

১) ইমাম বুখারীর মত হল, সেজদায়ে তেলাওয়াত অজু ছাড়া করা জায়েজ। [আউনুল বারী- ২/৫৫৪] এ বক্তব্যকে দুর্বল আখ্যায়িত করে গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা হাফেজ আব্দুস সাত্তার সাহেব লিখেছেন, ইমাম বুখারীর এমতটি দুর্বলতাহীন নয়। [মুখতাসার সহীহ বুখারী- ১/৩৭১]মাওলানা সাহেব ইমাম বুখারী রহঃ এর মতকে দুর্বলতাহীন নয় মন্তব্য করে উক্ত মতকে দুর্বল বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি এবং তার সম- মতবাদের গায়রে মুকাল্লিদ মাযহাব যেহেতু ইমাম বুখারীর মুকাল্লিদ, তাই তাকলীদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বলে দিলেন যে, অজু ছাড়া সেজদায়ে তেলাওয়াত দেয়া জায়েয। [ফাতাওয়া নজীরিয়া- ১/৫৭১]

২) নাসায়ীর ১ম খণ্ডের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় হাদীস এসেছে যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, যখন কিরাত পাঠ করা হয়, তখন তোমরা চুপ থাক। ”এ হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, ইমামের উপর আবশ্যক হল, কিরাত পড়া, আর মুক্তাদীর উপর আবশ্যক হল চুপ থেকে ইমামের কেরাত শ্রবণ করা। ইমাম বুখারী রহঃ এ হাদীসের উপর অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, উক্ত হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু খালেদ আলআহমার মুফরাদ তথা একা। [জুযউল কেরাত- ৫৬] অর্থাৎ আবু খালেদ আহমার এ হাদীস একাকী বর্ণনা কারার কারণে উক্ত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী সাহেব তাহকীক করা ছাড়াই ইমাম বুখারী রহঃ এর বক্তব্যের উপর তাকলীদ করে লিখে দিলেন যে, এ হাদীস বর্ণনাকারী আবু খালিদ মুতাফাররিদ একা। [আবকারুস সুনান- ১৫২, আহসানুল কালাম- ১/১৬৯]

মুবারকপুরী সাহেব ইমাম বুখারী রহ যে বক্তব্যের উপর তাকলীদ করেছেন। উক্ত বক্তব্যটি শুধু দুর্বলই নয়, বরং এটি দলীলহীন একটি মত। এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবু খালেদ একা নয়, বরং এ হাদীস আরো বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ বিন সাদ আলআনসারী। [দলীলুত তালেব- ২৯৪]

আব্দুর রহমান মুবারকপুরী সাহেব যদি ইমাম বুখারীর অন্ধ তাকলীদ না করে তাহকীক করতেন, তাহলে আবু খালেদের হাদীস দেখার পর পর নাসায়ীতেই বর্ণিত মুহাম্মদ বিন সাদ আনসারীর হাদীসও তার নজরে আসতো। আর তিনি এটাকে মুতাফাররিদ মন্তব্য করতে পারতেন না। সুতরাং বুঝা গেল যে, দলীলের ভিত্তিতে তিনি এ কাজটি করেননি। বরং ইমাম বুখারীর তাকলীদ করেছেন।

হয়তো ইমাম বুখারী রহ.- এর কাছে মুহাম্মদ বিন সাদের হাদীসটি পৌঁছেনি। বা তিনি ভুলেগিয়েছিলেন, তাই তিনি বলে দিয়েছেন আবু খালেদ উক্ত হাদীসে মুতাফাররিদ। কিন্তু বর্তমানে সিহাহ সিত্তার কিতাব যখন সর্বত্র পাওয়া যায়, তারপরও তাহকীক না করে একথা বলা যে, আবু খালিদ উক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে মুতাফাররিদ, এটি তাকলীদ নয়তো কি?

মুফাসসিরীনদের তাকলীদ

মুফাসসিরীনগণ তাফসীরের ক্ষেত্রে মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। একটি মূলনীতির ক্ষেত্রে তারা বলেন যে, العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب কুরআনের শব্দ শুধু তার খাস বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এর হুকুমটি আমভাবে সকলের উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন সূরা বাকারা ২০৪ নং আয়াতে কাফের আখনাস বিন শুরাইকের বিষয়ে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। কিন্তু উক্ত আয়াতের শব্দ আম হওয়ার কারণে সেটি আমভাবে ঐ সকল মানুষকে শামিল করবে, যারা আখনাসের মত আচরণ করবে। গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা সালাহউদ্দীন ইউসুফ লিখেছেন, শব্দের উমুম তথা ব্যাপকাতা গ্রহণ করা হবে। শানে নুজুলের খুসুসের উপর নির্ভর করা হবে না। সুতরাং আখনাস বিন শুরাইক [যার উল্লেখ ইতোপূর্বে হয়েছে] মন্দ কাজের একটি নমুনা মাত্র। যে ব্যক্তিই এমন কাজ করবে, তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম আরোপিত হবে। [তাফসীরী হাওয়াশী- ৮৩ এ মূলনীতিটি গায়রে মুকাল্লিদদের সকলের কাছেই গ্রহণীয়। এ মূলনীতিটির অবস্থা কি?

গায়রে মুকাল্লিদদদের আলেম মাওলানা আবু সাঈদ শরফুদ্দীন দেহলবী সাহেবের ভাষায় দেখুন, খাস শব্দকে আম হিসেবে মেনে নেয়াও কিয়াস। [ফাতাওয়া সানাবিয়্যাহ- ২/৩৩৮]তাহলে গায়রে মুকাল্লিদরা যখনি এ উসুলকে মেনে নিবে, তখনি মুফাসসিরীনদের কিয়াসকে মানছে। আর কিয়াসী মাসআলা মানা মানেইতো তাকলীদকে মানা। অথচ এ গায়রে মুকাল্লিদরাই প্রচার করে থাকে যে, কিয়াস হল ইবলিসের কর্মকান্ড। আর এ কথিত ইবলিসী কর্মকান্ডকেই মানছে তারা দ্বিধাহীন চিত্তে।

কিয়াসী মাসআলায় উলামায়ে কেরামের তাকলীদ

আহলে হাদীস নামধারী ভাইয়েরা যদিও সারাদিন প্রচার করে বেড়ায় যে, তারা শুধু কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিধানকেই মানেন। কিয়াসের অনুসরণ করেন না। কিন্তু সত্য কথা হল, কার্যত তারা অনেক মাসআলায় তারা কেবল কিয়াসের উপর ভিত্তি করে আমল করে থাকেন। এছাড়া কোন গতি নেই।

এ বিষয়ের বিশাল সমুদ্রতুল্য মাসআলা ভান্ডারের মাঝে কয়েকটি মাসআলা নিচে উদ্ধৃত হল-

১) গায়রে মুকাল্লিদ মাওলানা মুবাশশির রাব্বানী সাহেব লিখেছেনঃ

বিতিরের কুনুতের সময় হাত উঠানো রাসূল সা.- এর কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়। যেসব আহলে হাদীসরা হাত উঠিয়ে দুআ করে থাকেন, এর উপর কিয়াস করে তারা এটাকে কুনুতে নাজেলা এর উপর কিয়াস করে এমনটি বলে থাকেন। [আহকাম ওয়া মাসায়েল- ২৫৯]

২) গায়রে মুকাল্লিদ ডক্তর শফীকুর রহমান সাহেব লিখেছেন, আগের কাতার থেকে পিছনের কাতারে কোন মুসল্লিকে টেনে নিয়ে আসা কোন সহীহ হাদীস দিয়ে প্রমানিত নয়। তবে এক ইমাম ও এক মুক্তাদীর মাসআলার উপর কিয়াস করে এটা জায়েজ বলে প্রতিপন্ন হয়। [নামাযে নববী- ১৩০]

৩) গায়রে মুকাল্লিদ হাফেজ নাঈমুল হক মুলতানী সাহেব লিখেছেনঃ কিয়াসে শরয়ী যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শরয়ী ইবারতের বিপরীত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা শরয়ী দলীল হিসেবে গৃহিত হবে।

[ভয়েস কি কুরবানী কা তাহকীকী জায়েজাহ- ৯১]

৪) গায়রে মুকাল্লিদ মাওলানা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেনঃ আহলে হাদীসরা শুকর ও কুকুরকেও মৃতের উপর কিয়াস করেছেন। এবং বলেছেন যে, হাদীসটি আম। তাই শুকর ও কুকুরের চামড়া দাবাগত করালে তা পাক হয়ে যাবে। [তাইসীরুল বারী- ৭/৩৭৭]

৫) গায়রে মুকাল্লিদ মাওলানা সানাউল্লাহ উমরতাসরী সাহেব লিখেছেনঃ এসব হাদীসের উপর কিয়াস করে যদি কেউ মৃতের পক্ষ থেকে কাযা নামায আদায় করে তাহলে সওয়াব পৌঁছার আশা করা যায়।

[হাশিয়ায়ে ফাতাওয়া সানাবিয়্যাহ- ২/৩৮]

৬) গায়রে মুকাল্লিদ মাওলানা শরফুদ্দীন দেহলবী সাহেব লিখেছেনঃ যে পশুর গোস্ত খাওয়া যায়, তার হাড্ডির ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। আর যেসব পশুর গোস্ত খাওয়া জায়েয নয়, সেসব ব্যবহার করা এবং বিক্রির বিষয়টি হাতির দাঁতের উপর কিয়াস করে জায়েজ হওয়া দলীল সমৃদ্ধ বলে মনে হচ্ছে।

৭) গায়রে মুকাল্লিদ মাওলানা হাফেজ আব্দুস সাত্তার হাম্মাদ সাহেব লিখেছেনঃ সফরের সময় আলবিদা বলা সুন্নত। চাই মুসাফির মুকীমকে বলুক, বা মুকীম মুসাফিরকে বলুক। হাদীসের মাঝে প্রথম সুরতের কথা বর্ণিত। দ্বিতীয় সুরতটিকে এর উপর কিয়াস করা যেতে পারে। [মুখতাসার সহীহ বুখারী- ২/৭৩]

৮) গায়রে মুকাল্লিদ মাওলানা মীর মুহাম্মদ ইবরাহীম শিয়ালকুটি সাহেব লিখেছেনঃ সন্ধানহীন ব্যক্তির স্ত্রীকে অক্ষম ব্যক্তির স্ত্রীর উপর কিয়াস করা সহীহ বরং উত্তম। [ফাতাওয়া সানাবিয়্যাহ- ২/২৬৬]

৯) আল্লামা শাওকানী রহ. লিখেছেন, সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, আম বিষয়কে কিয়াস দ্বারা খাস করা যায়। [নাইলুল আওতার- ৪/৮] এই হল আহলে হাদীস দাবিদারতের কিয়াস মান্য করার একটি ঝলক মাত্র।

নামাযের যে সকল মাসআলায় আহলে হাদীস ভাইদের দলিল নেই

কথিত আহলে হাদীসরা কথায় কথায় আমাদের নামাযের উপর অভিযোগ উত্থাপিত করে থাকে, প্রচার করে বেড়ায় যে, আমাদের নামায দুর্বল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিংবা কোন প্রমান নেই আমাদের নামায পড়ার পদ্ধতির।

দ্বীন ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মুসলমানদের মনে নামায সম্পর্কে সৃষ্টি করে চলে ওয়াসওয়াসা। হাজার বছর ধরে পড়া নামায হচ্ছে না। তারা যে নামায বলছে সেটাই কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নামায। আর অন্যরা যা পড়ছে তা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে গায়রে মুকাল্লিদদের এ মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করা হবে। তাদের নামায কোন পূর্ণাঙ্গ নামাযই নয় তাদের মূলনীতি অনুযায়ী।

কারণ তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন হাদীস ছাড়া অন্য কিছু দলিল হতে পারে না। সে হিসেবে নামাযের অসংখ্য মাসায়েল তারা প্রমাণ করতে পারবে না কুরআন

হাদীস দ্বারা। ফলে তাদের নামায হয়ে যায় অপূর্ণাঙ্গ। এমনকি তারা জাতিকে একটি পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষার বইও উপহার দিতে পারেনাই।

১- গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা আপনাদের নামাযের জন্য কি কি শর্ত? দয়া করে কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন। আলফিক্বহু আলা মাজাহিবিল আরবাআতে চার মাযহাবের পূর্ণাঙ্গ নামাযের শর্তসমূহ সাবলীল ভাষায় ধারাবাহিকভাবে একের পর এক লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমাদের নামাযের ৭ শর্তের কথা তালীমুল ইসলামের ৪৪ নং পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে বিদ্যমান। প্রতিটি মানুষই তা বুঝতে সক্ষম। সেই সাথে বেহেস্তী জেওরের মাঝেই স্পষ্ট ভাষায় নামাযের শর্তের কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিটি সাধারণ মানুষই যা পড়ে সহজে বুঝতে পারবেন। আমাদের দাবি হল কথিত আহলে হাদীস বন্ধুরা তাদের নামাযের শর্ত কুরআন হাদীসের আলোকে জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। নামায সহীহ হওয়ার জন্য কুরআন হাদীস দ্বারা কয়টি শর্ত?

২- একথা সবাই জানে যে, চার ফিক্বহ সংকলিত হওয়ার পর সিহাহ সিত্তার কিতাব লিখা হয়েছে। তাই সিহাহ সিত্তার গ্রন্থ প্রণেতাদের উপর আবশ্যক ছিল ফিক্বহের কিতাবে উল্লেখিত নামাযের শর্তের বিরুদ্ধে হাদীস দ্বারা প্রতিবাদ করা ও সেসব শর্তকে বাতিল বলে প্রমাণ করা। এ হিসেবে বর্তমান গায়রে মুকাল্লিদ তথা কথিত আহলে হাদীসদের উপর দায়িত্ব হল সিহাহ সিত্তার কিতাবের বরাত দিয়ে ফিক্বহের কিতাবের বর্ণিত নামাযের শর্তসমূহকে হাদীস বিরোধী বলে সাব্যস্ত করা, এবং একথা দেখানো যে, সিহাহ সিত্তার লেখকগণ নামাযের শর্ত বর্ণনাকারীদের বদ্বীন বলে আখ্যায়িত করেছেন কোন কোন স্থানে?

৩- গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা নিজেদের নামাযে গ্রহণযোগ্য ফরজসমূহ গ্রহণযোগ্য সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত কিতাব থেকে দেখান! সকল ফুক্বাহায়ে কেরাম তাদের নামায পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা করেছেন। যা সিলেবাসভূক্ত হয়ে মাদরাসায় পড়া নোহয়। রুকন কয়টি? ওয়াজিব কয়টি?

সুন্নাত কয়টি? মুস্তাহাব কয়টি? কোনটি ছেড়ে দিলে কি হুকুম? কোনটি ছেড়ে দিলে নামায ভেঙ্গে যায়, কোনটি ছেড়ে দিলে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়, কোনটি ছেড়ে দিলে কিছু হয় না ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণসহ কিতাব আছে। যা মাদরাসাসমূহের নিসাবে অন্তর্ভূক্ত।

আমাদের কথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা তাদের নামায পদ্ধতির, শর্ত, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাবসহ কোনটি ছাড়লে কি হুকুম তা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণ সমৃদ্ধ একটি কিতাব উপুস্থাপন করুন যা তাদের দরসে নিজামীর অন্তর্ভূক্ত। শুধুমাত্র একটি কিতাব।

৪- কথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা প্রথমে স্বীয় কিতাব থেকে কুরআন হাদীস দিয়ে রুকন, ওয়াজিব, মুস্তাহাব এবং এসব ছেড়ে দিলে নামাযে হুকুম কী হবে? তা বর্ণনা করার পর দয়া করে বলবেন-

ক) নামায সংক্রান্ত আমাদের সংজ্ঞা, হুকুম এবং আরকান ভুল হওয়ার বিষয়টি সহীহ, সরীহ ও বৈপরীত্বহীন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করবেন।

খ) নিজেদের নামাযের বিভিন্ন অবস্থার সংজ্ঞা, হুকুম, আরকান হাদীস দ্বারা দেখাবেন। অথবা আরকান মান্যকারীদের মুশরিক, বেদআতি হওয়া প্রমাণ করে দেখাবেন।

৫- ওয়াজিব কাকে বলে আমাদের সংজ্ঞা আমাদের মাদরাসার নিসাবী কিতাব তালীমুল ইসলামে স্পষ্টাক্ষরে বিদ্যমান। [তা'লীমুল ইসলাম উর্দু- ৩- ১২৯-১২৮]আপনারাও ওয়াজিবের সংজ্ঞা স্বীয় নেসাবী কিতাব থেকে কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে দেখান।

৬- নামাযের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব বিষয় সব ক'টি বিষয়কে কুরআন হাদীস দ্বারা বাতিল প্রমাণ করে দেখান, অথবা চারটিকেই কুরআ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে দেখান। নতুবা এ চারটি মান্যকারীকে বেদ্বীন হওয়া কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে দেখান।

৭- হানাফীরা সুন্নাতে মুআক্কাদার সংজ্ঞা, প্রমাণ পদ্ধতি তরককারীর হুকুম, এবং সুন্নাত কয়টি? এসব আমাদের দরসে নিজামীতে পঠিত কিতাব থেকে দেখাবো। যেমন- তালীমুল ইসলাম- ৩/১৩০] এবার কথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা তাদের ক্লাসের সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত কিতাব দিয়ে সুন্নাতের সংজ্ঞা, প্রমাণ, পদ্ধতি, তরককারীর হুকুম এবং সুন্নাত কয়টি? এসব কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে দেখাবেন। নতুবা আমাদের বর্ণিত সংজ্ঞা কুরআন হাদীস দ্বারা বাতিল ও শিরক বলে প্রমাণ করে দেখান।

৮- আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হানাফীরা নামাযের মুস্তাহাব, সংজ্ঞা, পদ্ধতি, প্রমাণ, আদায়কারী ও তরককারীর হুকুম এবং মুস্তাহাবের পরিমাণ নিজেদের ক্লাসে পঠিত সিলেবাসভূক্ত কিতাব

তালিমুল ইসলাম ৩/১৩০ নং পৃষ্ঠা থেকে দেখাব।

৯- এবার কথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা আমাদের মুস্তাহাবের সংজ্ঞা, পদ্ধতি, প্রমাণ, আদায়কারী ও তরককারীর বিধান এবং সংখ্যা ইত্যাদিকে কুরআন হাদীস দ্বারা বাতিল বলে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। আর মুস্তাহাবের সহীহ সংজ্ঞা, পদ্ধতি, প্রমাণ, সংখ্যা, আদায়কারী ও তরককারীর হুকুম কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নিজস্ব সিলেবাসভূক্ত কিতাবে দেখাতে হবে।

১০- নামায ভঙ্গের কারণ কয়টি? কতগুলো বিষয় থেকে নামাযকে রক্ষা করা জরুরী? এসব জানা আবশ্যকীয় বিষয়। তাই হানাফীগণ নামায ভঙ্গের সংজ্ঞা, হুকুম, সংখ্যা স্বীয় নিসাবের কিতাব দিয়ে দেখাতে পারবে। [তালীমুল ইসলাম-৩/১৬৭]

১১- এবার গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা আমাদের নামায ভঙ্গের সংজ্ঞা, হুকুম এবং সংখ্যাকে ভুল প্রমাণ করবেন কুরআন ও সহীহ হাদীস দিয়ে। সেই সাথে নামায ভঙ্গের সঠিক সংজ্ঞা, হুকুম, সংখ্যা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে তা স্বীয় নিসাবে অন্তর্ভূক্ত কিতাব দিয়ে দেখাবেন।

১২- আমরা নামাযের মাকরূহসমূহ, মাকরূহের সংজ্ঞা, প্রমাণ, হুকুম মাকরূহাতের সংখ্যা নির্ভরযোগ্য দরসী কিতাব থেকে দেখাতে পারবো। [তালীমুল ইসলাম-৩/১৬৯]

১৩- এবার কথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা আমাদের এ সংজ্ঞা, প্রামাণ, হুকুম এবং সকল মাকরূহাতকে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা ভুল প্রমাণ করে দেখান। সেই সাথে মাকরূহাতের সঠিক সংজ্ঞা, সহীহ প্রমাণ, সহীহ হুকুম, এবং সহীহ সংখ্যা নিজেদের নির্ভরযোগ্য নিসাবী কিতাব দিয়ে দেখাবেন, সেই সাথে উল্লেখ করতে হবে কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোথায় এসব আছে?

গায়রে মুকাল্লিদদের নামায কুরআন হাদীস দিয়ে প্রমাণিত নয়

১৪- এ আলোচনায় কথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা স্বীয় উসূল কুরআন ও সহীহ হাদীসই মান্য হিসেবে শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসই দলিল হিসেবে উপস্থাপন করতে পারবেন। এমন কোন নাম উচ্চারণ করতে পারবেন না যার নাম কুরআন ও হাদীসে নেই। উসুলে ফিক্বহ, উসুলে হাদীস, উসূলে তাফসীর, আসমায়ে রিজাল, ও উসূলে জারাহ ও তাদীলের মধ্য থেকে কেবল সেসব কথাই উদ্ধৃত করতে পারবে, যা উক্ত বিশেষজ্ঞ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়ে কোন কিছু আবিস্কার করে থাকলে তা দলিল হিসেবে যোগ্য হবে না। তাহলে কুরআন ও সহীহ হাদীসের উল্টো ব্যক্তির তাক্বলীদ হয়ে যাবে। যা তাদের ভাষায় শিরক।

মেশকাতে সিনার উপর হাত বাঁধার শব্দ আছে। [ইসবাতুর রফয়ে ইয়াদাইন- ১৯] অথচ এসব কিতাবের কোন কিতাবেই এ শব্দ নেই। তাহলে অসত্য কথা কেন বলা হল?

১৫- যদি গায়রে মুকাল্লিদ বিতার্কিক নিজেদের নামাযের শর্ত, আরকান, সুনান, মুস্তাহাব্বাত, মাকরূহাত, মুফসিদাত, এবং বিধি- বিধান স্বীয় গ্রহণীয় নিসাবী কিতাব থেকে এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত করে দেখাতে অপারগ হয়, তাহলে তার একথা লিখে দিতে হবে যে, সে তার নিজের নামাযের

বিশদ বিবরণ নিজেদের গ্রহনীয় নিসাবী কিতাব থেকে এবং কুরআন ও সহীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণ করে দেখাতে অক্ষম। আর নিজেদের দাবী তথা কুরআন হাদীসই মানে এ দাবীর ক্ষেত্রে মিথ্যুক প্রমানিত হয়েছে। এমনিভাবে হানাফীদের নামাযের শর্ত, রুকন, সুনান, মুস্তাহাব্বাত, মাকরূহাত, মুফসিদাত, তাদের সংজ্ঞা ও আহকামকে কুরআন হাদীসের বিপরীত প্রমাণ করতে অক্ষম হয়েছে। এবং তাদের এ দাবীর ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ মিথ্যুক যে, হানাফীদের নামায কুরআন হাদীসের বিপরীত। কথিত আহলে হাদীসরা যখন তাদের নামাযের বিশদ বিবরণ তাদের নিজস্ব সিলেবাসের কিতাব থেকে দিতে অক্ষম প্রমানিত। এখন তাদের নামাযের আমলী হালাতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি। তাদের উপর আবশ্যক হল, তাদের প্রতিটি মাসআলা সহীহ, সরীহ ও বৈপরীত্বহীন হাদীস দ্বারা প্রমানিত করবে। কথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা! কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে জবাব দিন!

১- নামাযের নিয়ত করার সময় মনে মনে “সময়” “নামায” “সুন্নাত- ফরজ” ইত্যাদির মাঝে কোন কোন বিষয়ের ইচ্ছা করতে হবে? কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

২- আল্লাহ তাআলার বাণী وذكر اسم ربه فصلى এর সম্পর্ক নামাযের সাথে এবং وربك فكبر আয়াতাংশের সম্পর্ক কি নামাযের সাথে? নাকি না? কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

৩- এ দুই আয়াত অনুযায়ী কেউ যদি আল্লাহু আকবারের বদলে আল্লাহু আজাল্লু বা আল্লাহু আজামু বলে বলে তাহলে সে কি আয়াতের বিপরীত করল না করেনি? কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

৪- আল্লাহু আকবার শব্দটি কি ফরজ না ওয়াজিব নাকি সুন্নাত? কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

৫- তাকবীরে তাহরীমা একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি এবং মুক্তাদী সর্বদা আস্তে আওয়াজে বলে। এটা কুরআনের কোন আয়াত বা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? ৬- তাকবীরে তাহরীমা ইমাম সাহেব সর্বদা জোরে বলে থাকে। কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোথায় একথা বিদ্যমান?

৭- তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এটাকে সুন্নাতে মুআক্কাদা একথা কোন সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে?

৮- হাতকে কিবলামুখী রাখা সম্পর্কিত হাদীসটি উমায়ের বিন ইমরানের কারণে দুর্বল। [মাযমাউজ যাওয়ায়েদ- ২/১০২] অথচ এর উপর আপনাদের আমল কোন সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে?

৯- নামাযে আঙ্গুলি খোলা ও প্রশস্ত রাখার তিরমিযীর হাদীসটি বাতিল। [কিতাবুল ইলাল লিইবনে আবী হাতেম- ১/১৬২]অথচ এর উপর আপনারা কোন সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে আমল করে থাকেন?

১০- পুরুষ কাঁধ পর্যন্ত আর মহিলারা সিনা পর্যন্ত হাত উঠাবে [তাবরানী]এর উপর আপনাদের আমল নেই কেন? শুধু কিয়াস ভিত্তিক আমল করেন কেন?

১১- ওয়াইল বিন হুজুর রাঃ এর হাদীস হল, রাসূল সাঃ ডান হাতকে বাম হাতের উপর বাঁধতেন। মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ তায়ালিসী, ইবনে হিব্বানে এ বর্ণনা এসেছে। এ সাত কিতাবে সিনার উপর হাত বাঁধার কথা নেই। শুধু ইবনে খুজাইমাতে সিনায় হাত বাঁধার কথা আছে। যার বর্ণনাকারী মুআম্মাল বিন ইসমাঈল জয়ীফ। এ মুনকারও মারদূদ বর্ণনার উপর আপনাদের আমল কেন?

১২- ফাতওয়া সানায়িয়্যাহ ১ নং খণ্ডের ৫৩৪ পৃষ্ঠায় এবং ফাতাওয়া ওলামায়ে হাদীস এর ৩ নং খণ্ডের ৯৫ নং পৃষ্ঠায় কুরআনে কারীমের আয়াত فصل لربك وانحر দিয়ে সিনার উপর হাত বাঁধার দলিল দেয়া হয়েছে। অথচ সহীহ হাদীস ও উম্মতের ইজমা হল যে, وانحر দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরবানী। সহীহ হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের বিপরীত কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করা গোনাহ নাকি সওয়াবের কাজ?

১৩- যদি বলা হয় যে, তারা দু'টি অর্থই গ্রহণ করে থাকেন। কুরবানী ও উদ্দেশ্য নেন, আবার সিনার উপর হাত বাঁধাও উদ্দেশ্য নেন। তাহলে কুরবানীতো আপনারা নামাযের পর করে থাকেন, শুধু তাই নয়, বরং ঘরে গিয়ে করে থাকেন। তাহলে সিনার উপর হাত কেন নামাযের ভিতর বাঁধেন। এটাও নামাযের পর ঘরে গিয়ে করেন!

১৪- ফাতাওয়া সানায়িয়্যাহ এর ১ নং খণ্ডের ৪৪৩ পৃষ্ঠা এবং ফাতাওয়া উলামায়ে হাদীস এর ৩ নং খণ্ডের ৯১ নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে যে, সিনার উপর হাত বাঁধার বর্ণনা বুখারী, মুসলিম ইত্যাদিতে আছে। অথচ বুখারী মুসলিমে এমন কোন হাদীসই নেই। তাহলে এ মিথ্যাচার কেন?

১৫- মাওলানা নূর হুসাইন গুজরাটি লিখেছেন যে, হযরত ওয়াইল বিন হুজুর রা.- এর রফয়ে ইয়াদাইন এর হাদীসে মুসলিম, ইবনে মাজাহ, দারা কুতনী, দারেমী,

আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, এবং মেশকাতে সিনার উপর হাত বাঁধার শব্দ আছে। [ইসবাতুর রফয়ে ইয়াদাইন- ১৯] অথচ এসব কিতাবের কোন কিতাবেই এ শব্দ নেই। তাহলে অসত্য কথা কেন বলা হল?

১৬- মৌলবী মুহাম্মদ ইউসুফ জিপুরী গায়রে মুকাল্লিদ সাহেব তার হাকীকাতুল ফিক্বহ" নামক কিতাবে লিখেন যে, সিনার উপর হাত বাঁধার হাদীস মুহাদ্দিসীন ইমামদের ঐক্যমত্বে সহীহ। হেদায়ার ১ নং খণ্ডের ৩৫ নং পৃষ্ঠা ও শরহে বেকায়ার ৯৩ পৃষ্ঠা দেখুন। এ ডাহা মিথ্যা বক্তব্যটি কি উদ্দেশ্যে দয়া হল?

১৭- নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীস আইয়িম্মায়ে মুহাদ্দিসীনদের নিকট দুর্বল। দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হয় যে, হেদায়ার ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৫০। এটিও একটি মিথ্যাচার। হেদায়াতে এমন বক্তব্য নেই। থাকলে আরবী ইবারত দিন।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকারা! লক্ষ্য করুন। কিভাবে কুরআন ও হাদীসের উপর আমলকারীরা ফিক্বহের উপর মিথ্যারোপ করে জন সাধারণকে ধুকা দিয়ে থাকে।

১৮- ফাতাওয়া সানায়িয়্যাহ এর ১নং খণ্ডের ৪৪৪ পৃষ্ঠায় সহীহ ইবনে খুজাইমার দুর্বল হাদীস এনে সহীহ মুসলিমের একটি সনদ জোরে দেয়া হয়েছে। কত বড় জালিয়াতি ভাবা যায়?

১৯- সকল নবীগণ নাভির নিচে হাত বেঁধেছেন মর্মে মুসনাদে যয়েদ ও মুহাল্লা বিন হাযম এ হযরত আলী রাঃ, হযরত আয়শা রা., হযরত আনাস রাঃ থেকে উল্লেখ আছে। রাসূল সা.- এর নাভির নিচে হাত বাঁধার বর্ণনা করাচি থেকে প্রকাশিত মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবার ১নং খণ্ডের ৩৯০ নং পৃষ্ঠায় এসেছে। আর এটি সুন্নাত একথা এসেছে মুসনাদে আহমাদে। কিন্তু হানাফীদের প্রতি বিদ্বেষে গায়রে মুকাল্লিদরা এসব হাদীসের উপর আমল করে না।

২০- ওলামায়ে কেরাম একমত যে, নারীরা সিনার উপর হাত বাঁধবে। [আসসিয়ায়াহ- ২/১৫৬] এ ইজমাকে তারা কেন অস্বিকার করে?

সানার উপর আলোচনা

২১- ইমাম হয়ে উঁচু আওয়াজে সানা পড়ার বিষয়টি রাসূল কারীম সাঃ থেকে নাসায়ী এর উর্দু অনুবাদ এ ১ম খণ্ডের ৩৫৬ নং পৃষ্ঠায় এবং হযরত ওমর রাঃ থেকে ইমাম হয়ে সানা জোরে পড়ার কথা সহীহ মুসলিমের হাদীস নং ৯১৮ তে বর্ণিত। গায়রে মুকল্লিদগন কিসের ভিত্তিতে এর উপর আমল ছেড়ে দিচ্ছে?

২২- নাসায়ী শরীফের উর্দু অনুবাদের ১ম খণ্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায় মুক্তাদীর সানা জোরে পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। গায়রে মুকাল্লিদগন এ হাদীস ছেড়ে কোন হাদীসের উপর আমল করে?

২৩- একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি সানা আস্তে আস্তে পড়ার আমল গায়রে মুকাল্লিদদের। তাদের এ আমলের পক্ষে কী দলিল আছে?

২৪- রাসূল সা.- এর পর খুলাফায়ে রাশেদীন এর মাঝে কেউ سبحانك اللّٰهُمَّ الخ তথা সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা। এ সানা ছাড়া অন্য কোন সানা পড়েন নি। চাই সেটি ফরজ নামায হোক বা সুন্নাত নামায হোক। ঐক্যমত্বের আমল দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা মানেন না কোন সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে?

২৫- যদি নামাযে সানা ইচ্ছেকৃত না পড়ে, তাহলে নামায হবে কি না? সহীহ হাদীস দিয়ে জানান।

২৬- যদি ভুলে সানার স্থলে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে ফেলে, তাহলে সাহু সেজদা আবশ্যক হবে কি না? সহীহ সরীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণ দিন।

২৭- وجل ثنائك ব্যতিত জানাযার নামাযের সানায় যা পড়া হয়, তা গায়রে মুকাল্লিদ ভাইগন সহীহ সরীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণিত করুন।

২৮- রাসূল সা.- কেরাত পড়ার আগে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم পড়তেন। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক- ২/৮৬] রাসূল সাঃ এর পর হযরত ওমর রাঃ ও এটাই পড়তেন। [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা- ১/২৩৭] এটাই প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত। গায়রে মুকাল্লিদগণ এটাকে সুন্নাত থেকে বাদ দেন কোন সহীহ সরীহ হাদীসের ভিত্তিতে?

২৯- আউজুবিল্লাহ একাকী নামায আদায়কারী, ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য আস্তে পড়ার বিধান রাসূল সা. এর কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে তারা এর উপর আমল করেন কুরআনের কোন আয়াত বা কোন সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে?

৩০- আউজুবিল্লাহ পড়া সুন্নাত না ফরজ? যদি এটি কেউ না পড়ে, তাহলে তার নামায হবে কি না? সহীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণ করুন।

বিসমিল্লাহ প্রসঙ্গে

৩১- ইমাম সাহেবের বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার কথা সহীহ মুসলিমের ১ম খণ্ডের ১৭২ নং ও মুসনাদে আহমাদের ৩য় খণ্ডের ১১৪নং পৃষ্ঠায় এসেছে। ইমাম সাহেবের জোরে বিসমিল্লাহ পড়া বেদআত, একথা এসেছে সুনানে তিরমিজীর ১ম খণ্ডের ৬২পৃষ্ঠায় এসেছে। গায়রে মুকাল্লিদগণ এ সুন্নাতের খেলাফ আমল করেন কোন হাদীসের ভিত্তিতে?

৩২- একা নামায আদায়কালে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার কথা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

৩৩- নামাযে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান কি? ফরজ না সুন্নাত? না পড়লে কি নামায হবে না? এসব কথা কোন সহীহ সরীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গে

৩৪- একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি প্রতিটি নামাযেই সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা আস্তে আস্তে পড়ে থাকে, ইয়রবএর দলিল কোন সহীহ সরীহ হাদীস?

৩৫- পানির যেমন প্রতিটি ফোটাই পানি, তেমনি কুরআনের প্রতিটি অংশই কুরআন। তাহলে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে যে, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ তথা কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। [সূরা মুজ্জাম্মিল- ২০] এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কুরআন পড়া ফরজ। কোন নির্দিষ্ট অংশ পড়া আবশ্যক নয়। গায়রে মুকাল্লিদগণ এ আয়াত না মেনে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক বলে, তা না পড়লে নামায হবে না বলে কেন?

৩৬- সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ একথা কোন সরীহ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত?

৩৭- রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন যে, যে নামাযে ফাতিহা না পড়া হয়, সে নামায অপূর্ণাঙ্গ। [সহীহ মুসলিম- ১/১৬৯] কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না বলে রাসূল সা. এর বিরোধীতা করে কেন?

৩৮-

عن أبي هريرة قال قال لى رسول الله ﷺ اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সাঃ আমাকে বললেন, তুমি বের হয়ে মদীনায় ঘোষণা দাও যে, কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া নামায হয় না। অন্তত সূরা ফাতিহা এবং এছাড়া অতিরিক্ত কিছু হোক মিলাতেই হবে। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৮১৯]

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ফাতিহা পড়া ফরজ নয়। মুতলাকভাবে কুরআন পড়া ফরজ। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদগন এ হাদীস মানে না কেন?

৩৯- রাসূল সা. নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার যেমন গুরুত্বারোপ করেছেন, ঠিক তেমনি ফাতিহার সাথে আরো কিছু অংশ মিলানোরও গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৮২০, সুনানে বায়হাকী কুবরা, হাদীস নং- ২১৯১, সুনানে দারা কুতনী, হাদীস নং- ১৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-

১৭৯১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৯৫২৯, মুসনাদে ইসহাক বিন রাহুয়াহ, দীস নং- ১২৬, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং- ৩৬৪৩। এ কারণেই হানাফীগণ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়াকে যেমন ওয়াজিব বলে, তেমনি এর সাথে অতিরিক্ত আরো কিরাত পড়াকেও ওয়াজিব বলেন। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা সূরা ফাতিহার সাথে অতিরিক্ত আয়াত পড়া ওয়াজিব হওয়াকে অস্বিকার করে সরাসরি হাদীসের সাথে বিদ্রোহ করছে কেন?

৪০- ইমাম আহমাদ রহ বলেন, আমি আহলে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত কাউকে একথা বলতে শুনিনি যে, যারা বলেন যে, ইমাম যখন জোরে কিরাত পড়ে, আর মুক্তাদী তার পিছনে কিরাত না পড়ে, তার নামায ভেঙ্গে যায়"। তিনি আরো বলেন, রাসূল সা. এবং তার সাহাবাগণ, এবং তাবেয়ীগণ, আহলে হেজাজের ইমাম মালিক রহ., ইরাকের ইমাম সাওরী রহ., শামের অধিবাসী ইমাম আওযায়ী রহ., মিসরের অধিবাসী ইমাম লাইস রহ., তাদের কেউ একথা বলেন নি যে, যখন কোন ব্যক্তি নামায পড়ে, আর তার ইমাম কিরাত পড়ে, আর মুক্তাদী কিরাত না পড়ে, তাহলে তার নামায বাতিল। [মুগনী লিইবনে কুদামা- ১/৬০২] কিন্তু আফসোসের বিষয় হল; পুরো উম্মতের খিলাফ গায়রে মুকাল্লিদরা হানাফীদের নামাযকে বাতিল বলে অপপ্রচার করতে লাগল।

এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জবাজী শুরু করে দিয়েছে। শত শত ইস্তেহার প্রকাশ করছে। এর জবাবে পাকিস্তানের মুহাদ্দিসে আজম শাইখুল হাদীস সরফরাজ খান সফদর রহঃ যখন আহসানুল কালাম লিখলেন, তখন গায়রে মুকাল্লিদরা হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করলেন। গায়রে মুকাল্লিদ আলেম হাফেজ মুহাম্মদ কান্ধলবী, মাওলানা ইরশাদুল হক আসরী সাহেব পরিষ্কার ভাষায় লিখলেন যে, ইমাম বুখারী রহ.- থেকে নিয়ে বর্তমান জমানা পর্যন্ত কোন মুহাক্কিক আহলে হাদীস আলেমদের লিখায় এ দাবি করা হয়নি যে, সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায বাতিল তথা তার নামায হয়নি"। [তাওযীহুল কালাম- ১/৯৯]

তাওযীহুল কালামের ৪৩ নাম্বার পৃষ্ঠায় যারা নামায হয় না বলে মনে করেন, তাদের গায়রে যিম্মাদার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে যিম্মাদার এমন অনেক আহলে হাদীস আলেমগণ আল্লাহর চেয়ে জনগণকে বেশি ভয় পেয়ে এখনো একথার প্রচার করছে যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না।

৪১- গায়রে মুকাল্লিদদের গায়রে যিম্মাদার সাধারণ ভক্ত ও আলেমদের মতে ইমামের পিছনে কুরআনে কারীমের ১১৪ সূরার মাঝে ১১৩ সূরা পড়া হারাম। শুধুমাত্র এক সূরা তথা সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ। যে ব্যক্তি এটি না পড়বে, তার নামায হবে না।

আমাদের চ্যালেঞ্জ হল, পূর্ণ কুরআনে কারীমের একটি আয়াতও নেই, যাতে তাদের এ দাবি বিদ্যমান। কুরআনে কারীম তাদের এ দাবির স্বপক্ষে নয়।

তাদের যিম্মাদার ও গায়রে যিম্মাদারদের দাবিকৃত এ দাবির কারণে তারা কুরআনে কারীমের এক আয়াত নয় বরং ৫টি আয়াতকে আমলহীন সাব্যস্ত করছে। যেমন فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। [সূরামুজ্জাম্মিল- ২০ সূরা

মুজ্জাম্মিলের এ আয়াত তাহাজ্জুদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৩০৬, সুনানে বায়হাকী কুবরা, হাদীস নং- ৪৪১৪]রাসূল সা. যখন কাউকে একাকি নামায পড়ার পদ্ধতি শিখাতেন, তখন তিনি বলতেন- اقرأ ما تيسر معك من القران তথা তোমার কাছে যা সহজ তাই তিলাওয়াত কর। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৭২৪, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং- ১৮৯০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৯১১] রাসূল সা.- এর এসব হাদীস গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা মানেন না কেন?

৪২- তারা কোন আয়াতের শানে নুযূল কোন হাদীস দিয়ে এটা প্রমাণ করতে পারবে না যে, এ আয়াত নাজিল হওয়ার আগে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহা পড়তো না বরং অন্য সূরা পড়তো।

এ আয়াত নাজিল হয়ে মুক্তাদীর উপর শুধু সূরা ফাতিহা ফরজ করে দেয়, আর বাকি সূরাকে হারাম করে দেয়।

৪৩ - তাদের আরেকটি দলিল হল- وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ আমি আপনাকে সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি। [সূরা হিজর- ৮৭] এ আয়াতের না অনুবাদে তাদের উপরোক্ত ৪১ নং এর মত দাবি আছে। না উল্লেখিত ৪২ নাম্বারের অনুরূপ এ আয়াতের শানে নুজুল কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

৪৪ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلا مَا سَعَىٰ :এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে। [সূরা আননজম- ৩৯] এ আয়াত দিয়ে কেবল ব্যর্থ চেষ্টাই করা যাবে, কিন্তু না এ আয়াতের অনুবাদের সাথে ন্যুনতম কোন সম্পর্ক আছে ইমাম ও মুক্তাদীর কিরাতের সাথে। আর উল্লেখিত ৪১নং দাবি ও এবং ৪২ নং এর অনুরূপ কোন শানে নুজুল ও নেই এ আয়াতের।

৪৫- কুরআনে কারীমের ১১৩ সূরা আপনারা ইমামের পিছনে পড়েন না। ইমামের সুতরা এবং খতীবের খুতবাও সবার পক্ষ থেকে হয়। সেখানে আপনাদের এ আয়াত মনে হয় না কেন?

৪৬- চতুর্থ দলিল হল وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দরত ও ভীত- সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে- খবর থেকো না। [সূরা আরাফ- ২০৫]

এ আয়াতের অনুবাদ না ৪১ নং দাবির সাথে সামাঞ্জস্যশীল না ৪২ নং এর অনুরূপ শানে নুজুলের মাসআলা বিদ্যমান। তাহলে এটি দলিল হয় কি করে?

৪৭- ইমামের পিছনে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে থাকে, কুরআনে কারীমের বাকি ১১৩ সূরা না পড়ার কী কারণ? উল্লেখিত ৪টি আয়াত ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার দলিল হিসেবে মৌলবী ইরশাদুল হক আসরী এবং তার উস্তাদ হাফেজ মুহাম্মদ কান্ধলবী সাহেব উপস্থাপন করেছেন।

৪৮- পঞ্চম আয়াত তাদের জামাতের আমীর মৌলবী মুহাম্মদ ইসমাঈল সালাফী সাহেব পেশ করেছেন।

সেটি হল- وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। [সূরা ত্বহা- ১২৪]

এ আয়াতেরও কোন সম্পর্ক নেই আলোচিত মাসআলার সাথে।

না আছে ৪১ নং দাবির সাথে কোন সম্পর্ক, না ৪২ নং এর অনুরূপ শানে নুজুল। সেই সাথে ১১৩ সূরা থেকেও সালাফী সাহেব মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা হিফাযত করুন।

৪৯- ষষ্ঠ আয়াত মৌলবী মুহাম্মদ সাদেক সারকুধী সাহেব উপস্থাপন করেছেন। সেটি হল- أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ নিজে বহন করবে না। [সূরা আননজম- ৩৮]

এ আয়াতের সাথেও আলোচিত মাসআলার কোন সম্পর্ক নেই। না আছে ৪১ নং দাবির সাথে, না আছে ৪২ নং এর মত শানে নুজুলের সাথে। এ আয়াত একথারও জবাব হয়নি যে, কেন ইমাম ১১৩ সূরা, খুতবা এবং সুতরার বুঝার ভার বহন করে?

সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকা!

লক্ষ্য করুন। কুরআনে কারীমের কেমন ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে মাসআলা কুরআনে কারীমে নেই, সেটিকে কুরআনে কারীমে আছে বলে উল্লেখ করা কত বড় গোনাহ ও নাফরমানীর কাজ। এ কথিত আহলে হাদীস ফিরক্বার যিম্মাদার ওলামাদেরই এর দায়ভার নিতে হবে।

৫০- কুরআনে কারীমের আয়াত-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাকে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়। [সূরা আলআরাফ- ২০৪] ইমাম আহমাদ রহ. বলেন যে, লোকদের ঐক্যমত্ব একথার উপর যে, এ আয়াত নামাযের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। [মুগনী লিইবনে কুদামা- ১/৬০৫, ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া- ২/৪১২] কিন্তু এ আয়াতও তাদের দাবিকে প্রমাণিত করে না। ৪১ নং দাবিকেও নয়, ৪২ নং এর মত শানে নুজুল হিসেবেও নয়।

৫১- রাসূল সাঃ যখন নামাযের পদ্ধতি শিখালেন, তখন বললেন-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا

তথা যখন কুরআন পড়া হয়, তখন চুপ থাক। [সহীহ মুসলিম- ১/১৭৪, মুসনাদে আহমাদ- ১/৪১৫]

এ বর্ণনা হযরত আবু হুরায়রা রা., হযরত আনাস রা., হযরত ওমর রা., হযরত উসমান রা., হযরত আলী রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা., হযরত জায়েদ বিন আসলাম এবং হযরত জুহরী রহ. থেকেও বর্ণিত। সেই সাথে এই শানে নুজুলও হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাগফাল রা. সহ অনেক তাবেয়ী থেকে বর্ণিত। আলহামদুলিল্লাহ! কুরআনে কারীমের ছায়া আমাদের উপর। গায়রে মুকাল্লিদরা কেবল জিদের বশে আমাদের বিরোধীতা করছে। আর কিছু নয়।

৫২- যেমনিভাবে কুরআনে কারীমের আয়াত দিয়ে গায়রে মুকাল্লিদদের এ মাসআলা প্রমাণিত নয়, তেমনি খাইরুল কুরূনে লিখা হাদীসের কিতাব, মুয়াত্তা মালিক" ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর "কিতাবুল আসার" ইমাম আবু ইউসুফ রহঃ এর কিতাবুল আসার" কিতাবুল হুজ্জাত আলা আহলিল মদীনাহ, মুসনাদে ইমামে আযমসহ কোন হাদীসের কিতাবের একটি হাদীসও তাদের ৪১ নং দাবির স্বপক্ষে পেশ করতে পারবে না।

৫৩- এমনিভাবে খাইরুল কুরুনের পর লিখা হাদীসের কিতাবের মাঝে বুখারী মুসলিমের কোথাও তাদের উপরোক্ত দাবির স্বপক্ষে কোন সহীহ ও সুস্পষ্ট দলিল নেই।

৫৪- সুনান হাদীস গ্রন্থসমূহের থেকে ওবাদা বিন সামেত রাঃ এর ফজর নামাযের ঘটনা সম্বলিত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে। কিন্তু হাদীসটি সহীহ নয়। এতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক রয়েছেন। তিনি জয়ীফ ও মুদাল্লিস সেই সাথে মাকহুলের সাথীদের সাথে বিরোধীতার কারণে তিনি শাজ ও মুনকার। মাকহুলের তাদলীস, ইরসাল, এবং নাফে বিন মাহমুদের জাহালাতসহ সব দোষই তাতে বিদ্যমান।

৫৫- হানাফীদের মতে যে ব্যক্তি রুকু পেল সে উক্ত রাকাত পেল এই মাসআলার বিরোধী কুরআন ও ইজমায়ে উম্মতের বিরোধীতা। সেই সাথে প্রসিদ্ধ হাদীস

قراء الامام له قراء -এর ও বিপরীত।

মোটকথা যতক্ষণ পর্যন্ত গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা তাদের দাবীর পক্ষের হাদীস সহীহ মুত্তাফাক আলাই এবং وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا الخ এর পর প্রমাণিত না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কিছুই প্রমাণিত হয় না। আর এ দুটি কথা তারা কিয়ামত পর্যন্ত প্রমানিত করতে পারবে না।

৫৬- এ দুর্বল ও মুনকার হাদীসেও জোরে কিরাত পড়া নামাযের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বাকি এগার রাকাত যাতে ইমাম সাহেব আস্তে আস্তে কিরাত পড়েন, তাতে মুক্তাদীরা ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা না পড়লে তার নামায বাতিল ও বেকার একথা তারা কোন দুর্বল হাদীস দিয়েও স্পষ্ট প্রমাণ করতে পারবে না।

কাফেরদের আয়াত

৫৭- গায়রে মুকাল্লিদদের যখন প্রশ্ন করা হয় যে, আপনারা وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا الخ আয়াতটি মানেন না কেন? তখন তারা তৎক্ষণাৎ জবাব দেয় যে, এ আয়াত কাফেরদের জন্য নাজিল হয়েছে। আমাদের জন্য নয়। যখন বলা হয় যে, এটি কাফেরদের জন্য নাযিল হয়েছে কোন একটি হাদীস দিয়ে প্রমাণ করুন। তখন গালি দেয়া শুরু করে দেয়।

মুনাযাআত হাদীসের আলোচনা

৫৮- গায়রে মুকাল্লিদদের প্রসিদ্ধ আলেম নাসীরুদ্দীন আলবানী রহঃ ফজর নামাযের ঘটনা সম্বলিত উবাদা রাহ.- এর হাদীসকে তার প্রণীত কিতাব "সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি"এর মাঝে রহিত হয়ে গেছে সাব্যস্ত করেছেন। হাদীসে

মুনাযাআতকে এর রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। হাদীসে মুনাযাআত হযরত আবু হুরায়রা রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুহাইনা রা., হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা., হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা., হযরত আনাস বিন মালিক রা. - এবং হযরত ওমর রা.- থেকে বর্ণিত। অথচ গায়রে মুকাল্লিদরা কেবল জিদের বশে নিজের নফস পূজা করে এ হাদীসকে অস্বিকার করে। এছাড়া আর কোন কারণ নেই।

৫৯- হাদীসে মুনাযাআত দ্বারা একথাও প্রমাণিত যে, ইমামের পিছনে কিরাত পাঠকারীর উপর রাসূল সাঃ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের ধমক দিয়েছেন। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদদের রাসূল সাঃ এর অসন্তুষ্টির ব্যাপারে কোন পরওয়া নেই।

কেরাআত খালফাল ইমাম তথা ইমামের পিছনে কেরাত পড়া প্রসঙ্গে

৬০- হাদীসে মুনাযাআত দ্বারা একথাও প্রমাণিত যে, জোরে কেরাত পড়া নামাযে সমস্ত সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ইমামের পিছনে কেরাত ছেড়ে দিয়েছিলেন। গায়রে মুকাল্লিদরা এ ইজমাকেও মানে না।

৬১- যেমনিভাবে একটি আজান গোটা মহল্লার জন্য যথেষ্ঠ। এক ইকামত পূর্ণ জামাতের জন্য যথেষ্ঠ। ইমামের সুতরা সকল মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ঠ। খতীবের খুতবা জুমআয় উপস্থিত সকলের জন্য যথেষ্ঠ। এমনিভাবে হাদীসে এসেছে যে, ইমামের কেরাত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ঠ। এ হাদীসটি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা., হযরত আবু দারদা রা., হযরত আনাস রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা., হযরত আলী রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা., হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা., হযরত নাওয়াস বিন সামআন রা. এবং হযরত আবু হুরায়রা রা.- থেকে বর্ণিত। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদরা শুধুমাত্র গোঁড়ামির কারণে উক্ত হাদীসকে মানে না।

৬২- যখন বলা হয় যে, আপনারা এতগুলো হাদীসের বিপরীতে একটি সহীহ হাদীস পেশ করুন, যাতে রাসূল সাঃ বলেছেন যে, ইমামের কিরাত মুক্তাদীর কিরাত কখনোই নয়। এরকম কোন হাদীস ন্দেগীতে উপস্থাপন করতে পারবে?

৬৩- আজকালের গায়রে মুকাল্লিদগণ কুরআন ও সিহাহ সিত্তার সহীহ হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের বিপরীত কিতাবুল কিরাতে" বাইহাকীর ৫৬ নং পৃষ্ঠায় একটি হাদীস উপস্থাপন করে থাকে। সেটা হল-

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام

[তথা ঐ ব্যক্তির নামায হয় না যে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ে]। কিন্তু এ হাদীসটি কিছুতেই সহীহ নয়। কারণ হাদীসটির সনদের ভিত্তি হল যুহরী। আর

তিনি عن শব্দে বর্ণনা করছেন। আর গায়রে মুকাল্লিদরা মুদাল্লিস এর আনআনাহ কে জঈফ বলে থাকে।

তাছাড়া এ যুহরী এ "কিতাবুল কিরাতে" বর্ণনা করেন যে, সাহাবাগণ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا الخ

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইমামের পিছনে কিরাত পড়তেন। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। স্বয়ং যুহরী নিজেই উক্ত হাদীসকে রহিত হওয়ার বিষয়টি বলে দিয়েছেন। যুহরী থেকে ১৪জন ছাত্র لا صلاة لمن الخ হাদীসটি বর্ণনাকারী। কিন্তু ইউনুস ছাড়া কেউ বর্ণনায় خلف الامام তথা ইমামের পিছনে শব্দটি বলেননি। আর ইউনুসেরও ছাত্র ৩ জন। তাদের মাঝে দুইজন এ শব্দ বর্ণনা করেননি। শুধুমাত্র উসমান বিন আমর নামের একজন তা বর্ণনা করেছেন। আর উসমান বিন আমরের ছাত্র ২জন। এক ছাত্র হাসান বিন মুকাররম এ শব্দ বর্ণনা করেন না। দ্বিতীয় ছাত্র মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আসসাফফার কেবল তিনি সারা উম্মতের খেলাফ এ خلف الإمام শব্দটি বর্ণনা করেন। মৌলবী ইরশাদুল হক আসরী নিজের ১৩শতের অধিক পৃষ্ঠার কিতাবে গালি দিয়েতো ভরেছেন, কিন্তু মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আসসাফফার এর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে রিজালশাস্ত্র এর একটি গ্রহণযোগ্য কিতাব থেকে প্রমাণ করতে পারেন নি। কিয়ামত পর্যন্ত আর পারবেনও না ইনশাআল্লাহ। আফসোস! এরকম অপ্রমাণিত বর্ণনাকে বাহানা বানিয়ে কুরআনকে অস্বিকার করে যাওয়া হচ্ছে। সহীহ হাদীসকে বাদ দেয়া হচ্ছে। ইজমায়ে উম্মত থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আর সমস্ত হানাফীদের বেনামাযী বকে যাচ্ছে। আল্লাহ হিফাযত করুন।

৬৪- তারপর এ কিতাবুল কিরাত বায়হাকীর ১৩৬ পৃষ্ঠায় হযরত জাবের রাঃ, ১৭১ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়রা রাঃ, ১৭৩ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে হাদীস বর্ণিত। হাদীসটি হল- ফাতিহা ছাড়া নামায অসম্পূর্ণ। কিন্তু ইমামের পিছনে পড়বে না। এ হাদীসকে তারা অস্বিকার করে কেন?

৬৫- মৌলবী ইরশাদুল হক আসরী সাহেব এবার একটি নতুন হাদীস তালাশ করলেন। যাতে করে কুরআনের বিরোধীতার হাতিয়ার পাওয়া যায়। তারপর কুরআনে কারীমকে মসজিদের বাহির করে গায়রে মুকাল্লিদরা হাদীস জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে পারে। তারা একথাও জানে না যে, কুরআনে কারীম, মশহুর হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের মুকাবিলার জন্য কমপক্ষে মুতাওয়াতির হাদীস আনা চাই। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ যা আবার সহীহ নয় এমন এক হাদীস উপস্থাপন করে, যাতে

তাদের পূর্ণ দাবিও নেই, না তাতে একথা আছে যে, ইমামের পিছনে ১১৩ সূরা পড়া হারাম, আর না একথা আছে যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ। একথাও নেই যে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা না পড়ে তার নামায বাতিল এবং বেকার। তাহলে এ হাদীস আনার মানে কি?

৬৬- মোটকথা, না দাবিটির পক্ষে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। না হাদীসটি সহীহ। মাকহুলের তাদলীস। সাঈদ বিন আব্দুল আজীজের ইখতিলাত। উতবা থেকে বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী, নাসায়ী ও আবু দাউদের বর্ণনা না নেয়া। এছাড়া হুয়াইত বিন আহমদ এর নির্ভরযোগ্যতা আসমায়ে রিজালের মুসতানাদ কিতাব থেকেরাসূল সা.- এর মেরাজের পূর্বে সূরা ফাতিহা নাজিল হয়েছিল।

নামাযও পড়তেছিলেন। রাসূল সা.- মেরাজের রাতে নবীগণের ইমামতী করেছেন। এবার একটি হাদীস দিয়ে কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, রাসূল সা. প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়েছেন, তারপর পরের রাকাতে তারাও সূরা ফাতিহা পড়েছেন?

৬৯- যখন গায়রে মুকাল্লিদদের এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, তারা وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ এর পর একটাও সহীহ সরীহ হাদীস পেশ করতে অপারগ। তখন তারা ওয়াসওয়াসা ঢালতে শুরু করে দিয়েছে যে, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ الخআয়াতকে রদ করার জন্য বলেঃ সূরা ফাতিহা কুরআনের অন্তর্ভূক্ত নয়।

আমরা তাদের বলি তোমরা সমগ্র পৃথিবীর মাঝে একটি কুরআন দেখাতে পারবে যাতে সূরা ফাতিহা নেই? আমরা বুখারী শরীফ থেকে প্রমাণ করতে পারবো যে, সূরা ফাতিহা কুরআনের অন্তর্ভূক্ত।

তারা এমন একটি হাদীসও দেখাতে পারবে না, যাতে রাসূল সা. বলেছেন যে, সূরা ফাতিহা কুরআন নয়। তাদের পক্ষে হাদীস থাকুক আর নাই থাকুক জিদতো আছে।

৭০সহীহ হাদীসগুলোকে রদ করার জন্য বলে থাকে যে, রাসূল সাঃ কেরাত পড়তে নিষেধ করেছেন, ফাতিহা কেরাত নয়।

আশ্চর্য! তাহলে একটি হাদীস দেখান, যাতে বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা কেরাত নয়, বরং বাকি সূরা কেরাত। কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করে এমন হাদীস বা আয়াত দেখাতে পারবে? দেখাতে পারুক আর না পারুক। জিদতো দেখাতেই পারবে। তাইনা?

৭১- কুরআন ও হাদীসে মুক্তাদীদের চুপ থাকার হুকুম এসেছে। তাই তাদের দলিল হল যে, ঠোট নাড়িয়ে, জিহবা দিয়ে আস্তে আস্তে পড়লে তা চুপ থাকার আদেশ অমান্য করা হয় না।

অথচ বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে প্রমানিত যে, জিহবা নাড়ানো, আর ঠোট হেলানোও চুপ থাকার বিরোধীতা হয়। দেখুন- বুখারী, হাদীস নং- ৭০৮৬। তারপরও নিজের জিদ ছাড়তে নয় কথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা।

৭২- হাফেজ ইবনে আব্দিল বার রহ. বলেনঃ রুকুতে যে মুক্তাদী এসে শরীক হয়, সে মুক্তাদী উক্ত রাকাত পেয়েছে একথার উপর পূর্ণ উম্মতের ইজমা তথা ঐক্যমত্ব। মাওলানা ইরশাদুল হক আসরী সাহেবও মানেন যে, মুহাদ্দিসীন ও ফুক্বাহাদের অধিকাংশের বক্তব্য হল যে, রুকুতে পাওয়া রাকাত হয়ে যায়। [তাওযীহুল কালাম- ১/১৪২]কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা পুরো উম্মতের বিপরীত জিদের বশে বলে বেড়ায় যে, রুকুতে পাওয়া রাকাত হয় না। অথচ একটি সহীহ হাদীসও দেখাতে পারে না, যাতে একথা বলা হয়েছে যে, রাসূল সাঃ রুকুতে পাওয়া রাকাত দ্বিতীয়বার পড়তে বলেছেন।

ফাতাওয়া সেতারিয়ায় মৌলবী আব্দুস সাত্তার, জামাআতে গুরাবায়ে আহলে হাদীস এর ইমাম হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, রুকুতে পাওয়া রাকাত হয়ে যায়।

তারপরও জিদের বশে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা এ সকল হাদীস ও ইজমাকে অস্বিকার করে থাকে।

আমীন বলা বিষয়ে পর্যালোচনা

৭৩- গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা যখন একাকি নামায পড়ে, তখন সর্বদা আমীন আস্তে বলে। একটি সহীহ হাদীস পেশ করতে বলুন যাতে একাকি নামায আদায়কারীর জন্য আমীন আস্তে বলতে বলা হয়েছে।

৭৪- কথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা ইমামের পিছনে সর্বদা এগার রাকাত নামাযে আমীন আস্তে বলে থাকে। যথা জোহরের চার রাকাত ফরজে, আসরের চার রাকাত ফরজে, মাগরিবের ফরজ নামাযের শেষ রাকাতে এবং ইশার শেষ দুই রাকাতে। এ এগার রাকাতে আস্তে পড়ার বিধান কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? এতে জোরে আমীন বলা নিষেধ কোন হাদীসের ভিত্তিতে?

৭৫- যে ৬ রাকাত নামাযে ইমাম জোরে কিরাত পড়ে থাকে, [ফজরের ফরজ দুই রাকাত, মাগরিবের ফরজের প্রথম দুই রাকাত ও ইশার ফরজের প্রথম দুই রাকাত] উক্ত ছয় রাকাত যদি ইমামের পিছনে মুক্তাদী কোনক্রমে না পায়, তাহলে উক্ত ছয় রাকাত যখন একাকী পূর্ণ করে তখনও তারা জোরে আমীন বলে না? কেন? কোন সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে এতে জোরে আমীন বলার নিষেধাজ্ঞা এসেছে? আস্তে আমীন বলার আদেশও বা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

৭৬- যে ছয় রাকাতে ইমাম কেরাত জোরে পড়ে থাকে, উক্ত ছয় রাকাত নামাযে যদি কোন মুসল্লি দেরী করে শরীক হওয়ার কারণে এসে দেখে যে, ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা অর্ধেক পড়ে ফেলেছে, আর মুক্তাদী মাত্র সূরা ফাতিহার শুরুর الحمد لله رب العلمين বলেছে, এমন সময় ইমাম সাহেব وَلَا الضَّالِّينَ বললেও মুক্তাদী সূরা ফাতিহা শেষ না করলেও আমীন জোরে বলে তারপর বাকি সূরা ফাতিহা পূর্ণ করে থাকে। এখন প্রশ্ন হল পূর্ণসূর ফাতিহা শেষ না করে শুধু الحمد لله رب العلمين পড়ে এভাবে আমীন বলা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? দয়া করে জানাবে কি?

৭৭- রাসূল সাঃ কোন সহীহ হাদীসে এ হুকুম দিয়েছেন যে, ইমামের পিছনে ছয় রাকাতে জোরে আমীন বলবে, আর এগার রাকাতে আমীন আস্তে বলতে হবে?

৭৮- রাসূল সাঃ মুক্তাদী হয়ে সারা জীবনে কোন নামাযে জোরে আমীন বলেছেন এমন একটি সহীহ হাদীস দয়া করে পেশ করুন।

৭৯- রাসূল সাঃ এর ২৩ বছরের নবুওতী জীবনে রাসূল সা.- এর পিছনে কোন সাহাবী অন্তত এক রাকাতেও জোরে আমীন বলেছেন এমন কোন সহীহ সরীহ হাদীস আছে? সাহাবীগণ আমীন জোরে বলার কারণে মসজিদে গুঞ্জন উঠে যেত মর্মে সুনানে ইবনে মাজাহ এর যে হাদীস উপস্থাপন করা হয়, সেটা দুর্বল হাদীস। এ কারণেই সালাতুর রাসূল কিতাবের টিকায় গায়রে মুকাল্লিদ আলেম আব্দুর রউফ সাহেব লিখেন যে, "এর সনদ দুর্বল"। কারণ এতে বিশর বিন রাফে জঈফ। আর আব্দুল্লাহ মাজহুল। [সালাতুর রাসূল- ২৩৯]

এছাড়া ইবনে হিব্বান রঃ উক্ত হাদীসকে মওজু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর গায়রে মুকাল্লিদদের ইমাম আলবানী রহ. ও এটাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন- সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৮৫৩] তাহলে এ হাদীস দিয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসওয়ালা ভাইরা দলিল দেন কি করে?

৮০- এ হাদীস দুর্বল ইবনে হিব্বান রহঃ এর মতে মওজু হওয়া সত্বেও এটি কুরআনে কারীমের আয়াতেরও বিপরীত। কেননা কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে যে, নবীজী সা.- এর আওয়াজের উপর কারো আওয়াজ উচু হওয়া জায়েজ নয়। এমন করলে সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। [সূরা হুজুরাত- ২] অথচ এ হাদীসে এসেছে যে, রাসূল সা.- এর কেরাত কেবল প্রথম কাতারে থাকা সাহাবাগণই শুনতো, আর মুক্তাদী সাহাবাগণের আওয়াজ রাসূল সা.- এর আওয়াজের তুলনায় এতটাই উঁচু ছিল যে, পুরো মসজিদে গুঞ্জরিত হয়ে যেত।

তাহলেতো নবীজী সা.- এর আওয়াজের উপর সাহাবাগণের আওয়াজ উঁচু হওয়ায় কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবাগণের নামায (এমনকি গোটা জিন্দেগীর সমস্ত বন্দেগী) বাতিল সাব্যস্ত হয়। [নাউজুবিল্লাহ]

৮১- যঈফ ও কুরআনের খেলাফ হওয়ার সাথে সাথে এটি সাহাবাগণ ও তাবেয়ীগণের ইজমার ও বিপরীত। কেননা, এই হাদীসেই হযরত আবূ হুরায়রা রা.- এর ফরমান ترك الناس التأمين তথা লোকেরা আমীন [জোরে] বলা ছেড়ে দিয়েছেন"। আর একথাতো স্পষ্ট যে, সে জমানায় লোক বলতে সাহাবা তাবেয়ীগণকেই বুঝানো হয়েছে।

৮২ যঈফ, খেলাফে কুরআন, ইজমার খিলাফ হওয়ার সাথে সাথে এটি আমলের খেলাফ। কেননা প্রতিধ্বনি উঠার বিষয়তো বিল্ডিংয়ে সৃষ্টি হয়। আর নবীজী সা.- এর জমানায়তো মসজিদ ছিল কাঁচা ইটের। খেজুরের ডালও পাতা দিয়ে মসজিদ বানানো হতো। এতেতো প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হতেই পারে না।

দেখুন গায়রে মুকাল্লিদরা কিভাবে কুরআনের খেলাফ, হাদীসের খেলাফ, ইজমার খেলাফ, যুক্তির খেলাফ দুর্বল বর্ণনা নিয়ে বিশ্বব্যাপী ফিতনা বিস্তার করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এদের হাত থেকে জাতিকে হিফাযত করুন।

৮৩- গায়রে মুকাল্লিদদের ইমাম সাহেব ১১ রাকাতে আস্তে আমীন বলে থাকে। এ কর্ম কোন সহীহ হাদীসের ভিত্তিকে করা হয়?

৮৪- তাদের ইমাম নামাযের ছয় রাকাতে আমীন আস্তে বলে। একথা কোন সহীহ সরীহ হাদীসে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ আছে?

৮৫- সুবিশাল হাদীস ভান্ডারে খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে একটি বর্ণনাও এমন নেই যে, তে প্রমাণিত যে, খলীফায়ে রাশেদীনগন ইমাম বা মুক্তাদী হয়ে আমীন জোরে জোরে বলেছেন। আছে?

৮৬- একটি হাদীসও নেই যাতে একথা আছে যে, খুলাফায়ে রাশেদীনদের জামানায় কোন একজন মুসল্লিও একদিনের কোন নামাযের কোন রাকাতে আমীন জোরে জোরে বলেছেন।

৮৭- আবু ওয়াইল বিন হুজুর রা.- এর যে হাদীস আবু দাউদ থেকে পেশ করা হয় উক্ত হাদীস একেতো সহীহ নয়। কারণ এর সনদে থাকা সুফিয়ান মুদাল্লিস। আলী বিন সালেহ শিয়া, মুহাম্মদ বিন কাসীর যঈফ। এছাড়া এ হাদীসে সর্বদা আমীন জোরে বলার কোন কথা নেই।

৮৮- আর উম্মুল হুসাইন এর হাদীসের মাঝে নজর বিন শুমাইল মুতাআসসিব, হারুনুল আওয়ার শিয়া, ইসমাইল বিন মুসলিম মক্কী যঈফ, আবু ইসহাক

মুখতালাত, ইবনে উম্মুল হুসাইন মাজহুল। এরকম হাদীস গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের কাছে গ্রহণীয়?

৮৯- কুরআনে পাকের সূরায়ে ইউনুসে হযরত ঈসা আ.- এর দুআর পর আল্লাহ তাআলার ফরমান হল- قد أجيبت دعوتكما তথা তোমাদের উভয়ের দুআ কবুল করে নেয়া হয়েছে। সমস্ত মুফাসসিরীনে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মুসা আ.- এর সাথে হারুন আ. ছিলেন।

তিনি দুআ করছিলেন শুধু আমীন আমীন বলে। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে হারুন আঃ এর উক্ত আমীন বলাকে দুআ বলে সম্বোধন করেছেন। আর সহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ডের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় এসেছে যে, وقال عطاء آمين الدعاء তথা আতা বলেছেন যে, আমীন হল দুআ। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা আমীন যে দুআ তা অস্বিকার করে আল্লাহর বাণী, মুফাসসিরীনদের ইজমা অমান্যকরে।

৯০- দুআর নিয়ম কুরআনে এসেছে যে, ادعوا ربكم تضرعا وخفية তথা তোমরা তোমাদের রবের কাছে দুআ কর বিনয়ের সাথে ও আস্তে আওয়াজে। [সূরা আরাফ- ৭] إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا [যাকারিয়া আঃ] স্বীয় রবের কাছে দুআ চান আস্তে আস্তে। [সূরা মরিয়ম- ৩]

হাদীসে দুআর মূলনীতি হল যে, আস্তে আওয়াজে দুআ করা উঁচু আওয়াজে ৭০বার দুআ করার সমান। [أخرجه ابو الشيخ عن أنس مرفوعا بسند صحيح] [ফাতহুল কাদীর]সুতরাং একথা প্রমাণিত যে, আমীন হল দুআ। আর দুআর মাঝে আসল হল আস্তে আস্তে বলা। এ কারণে ইমাম হোক বা একাকী নামায আদায়কারী হোক কিংবা মুক্তাদী হোক আমীন আস্তে বলাই উচিত।

৯১- গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের কাছে আমাদের চাওয়া হল, তারা কুরআন ও সহীহ হাদীস দিয়ে একথা প্রমাণ করে দিন যে, আমীন দুআ নয়। আর একথাও প্রমাণ দিন যে, দুআর মাঝে আস্তে নয় জোরে বলা উত্তম।

৯২- হযরত ওয়াইল বিন হুজুর রা.- এর বর্ণনা হল- রাসূল সা. ولا الضالين বলার পর আমীন আস্তে বলেছেন। [দ্রষ্টব্য- মুসনাদে আহমদ- ৪/৩১৬, হাদীস নং- ১৮৮৪৩, সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং- ২৪৮, মুস্তাদরাকে হাকেম- ২/২৩২]

قال الحاكم على شرطها واقره الذهبي

৯৩- হযরত ওমর রাঃ, হযরত আলী রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ ও আস্তে আস্তে আমীন বলতেন। [তাহাবী, তাবারানী]

৯৪- যুক্তিও এটা বলে যে আমীন কুরআনে নেই। এজন্য যে, কুরআন উঁচু আওয়াজে পড়া হবে, আর আমীন আস্তে আওয়াজে পড়া হবে, যেন কারো এ ব্যাপারে সন্দেহ না হয় যে, আমীন কুরআনের অন্তর্ভূক্ত।

৯৫- পাকিস্তান ও ভারতে ইসলাম আগমণের ১৩ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু ১২শত বছর ধরে এখানের সকল কুরআন হাদীস, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবাদের আমলের অনুরূপ আমীন আস্তে বলে আসছে। এ ১২শত বছরের মধ্যে এখানে না কেউ আমীন আস্তে বলার বিরুদ্ধে পুস্তক লিখেছে। না কেউ এ ব্যাপারে বাহাসের চ্যালেঞ্জ করেছে।

১২শত বছর পর মুহাদ্দিস, আলেম বা সুফী কেউ নয়, বরং ফাখের ইলহাবাদী সর্বপ্রথম এ উপমহাদেশে আমীন জোরে বলা সংস্কৃতি শুরু করে। প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ ঐতিহাসিক ইমাম খান নওশহারয়ী সাহেব লিখেন যে, মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ফাখের ইলহাবাদী সর্বপ্রথম দিল্লি জামে মসজিদে আমীন জোরে বলে তাকলীদের গোঁড়ামী দূরিভূত করেন। [নকুশে আবুল ওয়াফা- ৩৪]

লক্ষ্য করুন! কুরআন হাদীস এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের মতকে কিভাবে তাকলীদের গোঁড়ামী বলে কুরআন ও সুন্নতের সাথে বিদ্রোহ করে নিজেদের ভদ্রতার! মুখোশ উন্মেচিত করছে।

কে এই মাওলানা ফাখের?

তার ব্যাপারে মাওলানা সানাউল্লাহ উমরতাসরী সাহেব লিখেন, তাকে পোষাকে মনে হয় আলেম, কিন্তু না জানে দ্বীন, না জানে মাযহাব। [ফাতাওয়া সানাইয়্যাহ- ১/১০৩] দ্বিতীয়বার জোরে আমীনের অওয়াজ ইংরেজ সরকারের চাকরিজীবি হাফেজ ইউসুফ দিয়েছেন। [নুকুশে আবুল ওয়াফা- ৪২]এ লোক পরবর্তীতে কাদিয়ানী হয়ে যায়।

ইশাআতুস সুন্নাহ এর ২১ নং খণ্ডের ১১৪ নং পৃষ্ঠায় এসেছে যে, আমরতাসর এ সর্ব প্রথম হাদীসের উপর আমল শুরুকারী ডেপুটি কালেক্টর হাফেজ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব মির্যা গোলাম আহমদ দিয়ানীর সহকারী হয়ে যায়। এমনিভাবে ইংরেজ আমলে এ মাসআলাকে মুসলমানদের মাঝে প্রচার করা শুরু হয়।

গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে প্রশ্নঃ আপনারা ইংরেজ আমলের আগে উপমহাদেশের একটি মসজিদ দেখান যেখানে ইংরেজরা আসার আগে আমীন জোরে বলা হত।

৯৬- কুরআনে পাকের নীতি, সহীহ হাদীস, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত এবং সাহাবাগণের আমলের বিপরীত জোরে আমীন বলার যে দুর্বল হাদীস গায়রে মুকাল্লিদগণ উপস্থাপন করে থাকেন, সে ব্যাপারে খোদ ওয়াইল বিন হুজুর রা.

ব্যাখ্যা করে বলেন, إلا ليعلمنا ماأراه তথা শুধুমাত্র নামায শিখানোর জন্য উঁচু আওয়াজে বলা হয়েছে। [কিতাবুল আসমায়ি ওয়াল কুনা- ১/১৯৬] আমাদের মাদরাসাগুলোতেও যখন বাচ্চাদের নামায শিখানো হয়, তখন সামনের বাচ্চাও উঁচু আওয়াজে আমীন বলে, তখন পিছনের বাচ্চাগুলোও একসাথে উঁচু আওয়াজে আমীন বলে। আমীন জোরে বলার দুর্বল হাদীসের উপরও আমাদের আমল বিদ্যমান আছে। আমাদের কোন আয়াত বা হাদীসের বিরোধীতার ভয় নেই।

৯৭- গায়রে মুকাল্লিদ মিস্ত্রি নূর হুসাইন সাহেব লিখেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাঃ সর্বদা আমীন জোরে বলতেন। আর অন্যদের বলতেন যে, আমীন জোরে জোরে বল। [বুখারী- ১/১০৮, রেসালায়ে আমীন বিলজেহের- ১৮] এ কথাটি বুখারীর উপর একটি সরাসরি মিথ্যাচার। বুখারীতে জোরে বলার শব্দই নেই।

৯৮- হাকীম সাদেক শিয়ালকুটি একটি হাদীস লিখেছেন যে, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেনঃ ইহুদীরা যত আমীন [জোরে] বলার কারণে যতটুকু ক্ষিপ্ত হয়, এত ক্ষীপ্ত অন্য কোন আওয়াজে হয় না। [ইবনে মাজাহ] যদি কেউ উঁচু আওয়াজে আমীন বলে, তাহলে রাসূল সাঃ এর এ পাক সুন্নতের কারণে ক্ষীপ্ত হইয়ো না। অপছন্দও করো না। কেননা, আমীন জোরে বলার দ্বারা ইহুদীরা ক্ষীপ্ত হয় এবং অপছন্দ করে। আর আমাদের ইহুদীদের বিরোধীতা করা উচিত। [সালাতুর রাসূল- ২৪২]দেখুন! কিভাবে সারা উম্মতকে ইহুদী বানিয়ে দিল। অথচ প্রথমত হাদীসটিই সহীহ নয়। খোদ আব্দুর রউফ গায়রে মুকাল্লিদ এর টিকায় লিখেছেন যে, এ হাদীসের সনদ জঈফ। কেননা, তালহা বিন ওমর জঈফ এ ব্যাপারে সবাই একমত। [২৪১]তারপর এ জঈফ হাদীসেও উঁচু [جهر] শব্দ একদম নেই। উঁচু শব্দ মিলানো রাসূল সাঃ এর উপর পরিষ্কার মিথ্যাচার।

৯৯- গায়রে মুকাল্লিদ পুরুষ মহিলারা যখন একাকী নামায পড়ে, আর জোহর, আসর এর নামাযে যখন ইমাম এবং মুক্তাদী উঁচু আওয়াজে আমীন না বলে, তখন কি তারা ইহুদী হয়ে যায়?

১০০- যেহেতু উঁচু আওয়াজে আমীন বলার হাদীস সহীহ নয়, তাই তারা সাধারণের লোকের সামনে একটি আশ্চর্য বিষয় প্রকাশ করে থাকে।

গায়রে মুকাল্লিদদের আজীব চালাকী

হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ এর জোরে আমীন বলা সংক্রান্ত একটি হাদীস লিখে এ ব্যাপারে হাফেয আব্দুল্লাহ রূপরী সাহেব লিখেন যে, এ হাদীস সুনানে দারা কুতনীতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন এর সনদ সহীহ। আর হাকেম ও বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন যে, বুখারী মুসলিম এর শর্ত এর উপর আছে এ হাদীস।

আর বায়হাকীও বর্ণনা করেছেন। তিনি এটাকে হাসান বলেছেন। [আহলে হাদীস কা মাসায়েল ইমতিয়াজী- ৭৯]অথচ তিন কিতাবের কোথাও এ হাদীস নেই। মুহাদ্দিসগণের সহীহ বলাতো দূরে থাক।

১০১- মৌলবী ইউসুফ জিপুরী হাকীকাতুল ফিক্বহ"এর ১৯৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হেদায়া ১/৩৬৫ এবং শরহে বেকায়া- ৯৭ এ জোরে আমীন বলার হাদীসসমূহ বিদ্যমান।

অথচ এটি একেবারেই মিথ্যাচার। সত্য হলে হেদায়া ও শরহে বেকায়ার আরবী ইবারত প্রকাশ করুন।

১০২- মৌলবী ইউসুফ "হাকীকাতুল ফিক্বহ" এর ১৯৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, ইবনে হুমাম আস্তে আমীন বলার হাদীসকে জঈফ বলেছেন। [হেদায়া- ১/৩৬৩]কি আশ্চর্য মিথ্যাচার! হেদায়া ষষ্ঠ শতাব্দীর কিতাব। আর ইবনুল হুমাম নবম শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব। তিনি তিনশত বছরের আগের কিতাবে কিভাবে লেখেছেন?

১০৩- হাকীম মুহাম্মদ সাদেক সাহেব লিখেনঃ মসজিদে নববীতে রাসূল সা.- এর জমানা থেকে আজ পর্যন্ত জোরে আমীন বলার ধ্বনি রয়ে গেছে।

[সলাতুর রাসূল- ২৪০]

এটা একেবারে মিথ্যাচার। খেলাফতে রাশেদা, খেলাফতে উমাইয়্যাহ, খেলাফতে আব্বাসী, খাওয়ারজামী, সুবলুকী, তুর্কীদের আমলের সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী আমীন আস্তে বলা হতো।

সেজদায়ে সাহু

১০৪- যদি ইমাম ভুলে ফজর মাগরিব বা ইশার রাকাতে আস্তে কেরাত পড়ে, তাহলে সেজদায়ে সাহু আবশ্যক হবে কি না?

১০৫- যদি ইমাম ভুলে জোরে কেরাত পড়া নামাযে আস্তে কেরাত পড়ে তাহলে সেজদায়ে সাহু আবশ্যক হবে কি না?

১০৬- যদি সূরায়ে ফাতিহা পড়ে সূরা পড়া ভুলে যায়, রুকু করে ফেলে, তাহলে সেজাদায়ে সাহু দিতে হবে?

১০৭- এক ব্যক্তি প্রথমে সূরা ইখলাস পুরোটা পড়ে ফেলল তারপর সূরা ফাতিহা পড়ল তার উপর সেজদায়ে সাহু আবশ্যক নাকি না?

১০৮- জোরে আর আস্তের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা কি?

এসব কিছুর জবাব কুরআন বা সহীহ সরীহ গায়রে মুআরেজ তথা বৈপরীত্বহীন হাদীস দিয়ে দিন। যদি না পারেন তাহলে প্রোপাগান্ডা বন্ধ করুন।

ماضی استمراري তথা চলমান অতীতকাল

১০৯- রাসূল সাঃ জোহরের নামাযে والیل اذا یغشی الخ পড়তেন। [সহীহ মুসলিম- ১/২৫৪]হাদীসের শব্দ হল کان یقرأ তথা তিনি পড়তেছিলেন। যেটা নাহুর পরিভাষায় ماضی استمراري তথা চলমান অতীতকালীন শব্দ।

১১০- রাসূল সা. ফজর নামাযে ق والقرآن المجيد সূরাটি পড়তেন। এ হাদীসেও کان یقرآ চলমান অতীতকালীন শব্দ এসেছে। রাসূল সা. ফজরের সুন্নতে সূরায়ে কাফেরূন এবং সূরায়ে ইখলাস পড়তেন। এ হাদীসেও کان یقرآ চলমান অতীতকালবোধক শব্দ এসেছে। এসব নামাযে এ সূরাগুলো কি নির্দিষ্ট না অন্য সূরা ও পড়া যাবে?

ماضی استمراري তথা চলমান অতীতকালটি কি সর্বদার জন্য এসেছে? নাকি না? কুরআন ও সহীহ হাদীস কী বলে?

১১১- আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. রাসূল সা.- কে অসংখ্যবার মাগরিবের সুন্নতে সূরায়ে কাফেরূন ও সূরায়ে ইখলাস পড়তে শুনেছেন। [তিরমিজী]কি এসব রাকাতে জোরে কেরাত পড়া সুন্নত? আপনারা যে মাগরিবের সুন্নতে আস্তে আস্তে কেরাত পড়েন এর পক্ষে একটি সহীহ সরীহ হাদীস দেখান।

১১২- রাসূল সাঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন। [সহীহ বুখারী- ১/৩৫] হায়েজা স্ত্রীর গায়ে হেলান দিয়ে কুরআন পড়েছেন। [সহীহ বুখারী- ১/৪৪] এ হাদীসে ماضی استمراري তথা চলমান অতীতকালীন শব্দ এসেছে।

রাসূল সা. হায়েজা স্ত্রীর সাথে মুবাশারাত তথা শারিরিকভাবে একান্ত স্পর্শ করতেন। [সহীহ বুখারী- ১/৪৪] এখানেও ماضی استمراري তথা চলমান অতীতকালীন শব্দ এসেছে। রাসূল সাঃ রোজা রাখা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করতেন। হাদীসের শব্দ হল کان یقبل তথা তিনি চুম্বন করতেন। [বুখারী- ১/২৫৮] এখানেও ماضی استمراري তথা চলমান অতীতকালীন শব্দ ব্যবহৃত।

রাসূল সাঃ নামাযের পূর্বে স্ত্রীকে চুম্বন করতেন। [বুখারী- ১/৪২] এখানেও ماضی استمراري তথা চলমান অতীতকালীন শব্দ ব্যবহৃত। এই সকল কর্ম রাসূল সাঃ থেকে ماضی استمراري তথা চলমান অতীতকালীন শব্দ দিয়ে প্রমাণিত। এসব

থেকে নিষেধ করা বা রহিত হওয়া সম্বলিত কোন হাদীস থাকলে পেশ করুন। নতুবা এসবের উপর সুন্নতে মুআক্কাদার মত আমল করুন। আর এসবকে পরিত্যাগকারীকে সুন্নত পরিত্যাগকারী বলে চ্যালেঞ্জবাজী করতে শুরু করে দিন।

১১৩- ماضی استمراري তথা চলমান অতীতকালীন শব্দকে মূলত একবারের কর্মের ক্ষেত্রে। শরহে নববী- ১/২৫৪] মাজমাউল বিহার- ৩/২৩৫, মাসকুল খিসাম- ১/৫৬৭]এর দ্বারা নস হিসেবে স্থায়িত্ব প্রমাণিত হয় না। হ্যাঁ, মুজতাহিদ তার ইজতিহাদী যোগ্যতা দিয়ে ক্বরিনা” তথা আলামত দেখে কোথাও স্থায়িত্ব উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। আবার কোথাও স্থায়িত্ব উদ্দেশ্য নেন না। হানাফীদের কাছে সকল ক্বরিনা” তথা আলামতের চেয়ে বড় ক্বরিনা” হল খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল। অথবা খাইরুল কুরুন তথা রাসূল সাঃ এর বলা শ্রেষ্ঠ যুগের ব্যক্তিদের আমল। যদি রাসূল সাঃ এর আমল ماضی استمراري দিয়েও প্রমাণিত হয়, তারপর যদি এর আমল জারী হয়, তাহলে এ আমলের ক্বরিনা” স্থায়িত্বকে বুঝায়। আর যদি উক্ত কাজের উপর আমল জারী না হয়, তাহলে এটি ছেড়ে দেয়ার উপর স্থায়িত্বের “ক্বরিনা” হিসেবে ধর্তব্য হবে। যেমন ১১২ এ বর্ণিত বলা মাসায়েলগুলি। কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে হারাম বলা ব্যক্তিদের কী দশা হবে? শব্দের অর্থ তাদের যা বলছে তা ছেড়ে দেয়া তাদের জন্য নিজেদের বক্তব্য অনুযায়ী জায়েজ হয় না। কিন্তু নিজেদের ফাতওয়ায় নিজেরাই নাজায়েজ কাজগুলো করে বেড়ান।

১১৪- রুকুর তাকবীর একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি এবং মুক্তাদী আস্তে আস্তে বলে। আর ইমাম জোরে বলে। এ ব্যাপারে সহীহ সরীহ দেখান। এমনটি কোন সহীহ সরীহ হাদীসের ভিত্তিতে করা হয়?

১১৫- প্রথম তাকবীরের সাথে হাত উঠানোর হুকুম তাবরানীতে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। নিষেধ কোথাও নেই। ফেলী হাদীস তাওয়াতুর স্তরে বর্ণিত। যার বিপরীত কোন জঈফ হাদীসও নেই। আর উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল বিদ্যমান রয়েছে। এ তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সারা উম্মত তাকবীরে তাহরিমার সময় হাত উঠানোকে সুন্নত বলে থাকেন।

১১৬- চার রাকাত নামাযে ২২টি তাকবীর হয়। [বুখারী- ১/১১০]ওমায়ের বিন হাবীবের বর্ণনা, ইবনে আব্বাস রাঃ এর হাদীস [ইবনে মাজাহ- ৬২] জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ এর হাদীস [মুসনাদে হমাদ] ইবনে ওমর রা.- এর হাদীস [মাশকিলুল আসার লিততাহাবী] আবু হুরায়রা রাঃ এর হাদীস [কিতাবুল ইলাল, দারাকুতনী]এ পাঁচটি হাদীসে ماضی استمراري রয়েছে। কিন্তু শিয়ারা এর উপর আমল করে আর গায়রে মুকাল্লিদরা এসব হাদীসের সাথে বিদ্রোহ করে।

রফয়ে ইয়াদাইন ও হাদীসের সাথে বিদ্রোহ

১১৭- সেজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করা তথা হাত উঠানো রাসূল সাঃ থেকে-

১- হযরত মালেক বিন হুয়াইরিস রা. [সুনানে নাসায়ী]

২- হযরত ওয়াইল বিন হুজুর রা. [আবু দাউদ, দারা কুতনী, মুয়াত্তা মুহাম্মদ]

৩- হযরত আনাস রা. [মুসনাদে আবী ইয়ালা]

৪- হযরত আবু হুরায়রা রা. [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৮৬০]

৫- আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. [তাবারানী]

৬- আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. [আবু দাউদ]

এ ছয়টি এবং আগের ৫টি মোট এগারটি হাদীস সেজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন প্রমাণিত। এ হাদীস রহিত হওয়ার কোন দলিল গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে নেই।

সেজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দেয়ার হাদীস শুধুমাত্র ইবেন ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত। যে হাদীস নিজেই বিপরীতমুখী।

গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা একটি বিরোধপূর্ণ হাদীসের উপর ভিত্তি করে এগারটি হাদীসের সাথে বিদ্রোহ করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদদের মিথ্যাচার!

১১৮- তারা বলে যে, সমস্ত সাহাবাগণ সারা জীবন রফয়ে ইয়াদাইন করতেন, কথাটি পরিস্কার মিথ্যা কথা।

১১৯- কখনো বলে থাকে যে, প্রতিটি রফয়ে ইয়াদাইনের উপর দশটি নেকি পাওয়া যায়। রাসূল সা. নাকি ওয়াদা দিয়েছেন। এটাও পরিস্কার মিথ্যাচার।

১২০- দারুল উলুম কুফার আবাদকারীদের অন্যতম হযরত আলী রা.- এর রফয়ে ইয়াদান সম্বলিত হাদীসতো বর্ণনা করে, কিন্তু একথা বর্ণনা করে না যে, খোদ আলী রা. রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। [তাহাবী, মুয়াত্তা মুহাম্মদ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং- ২৪৫৭, বায়হাকী]

একথাও বলে না যে, হযরত আলী রা.- এর ছাত্রগণ [যাদের সংখ্যা হাজারের উপর] দের মাঝে কেউ রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। [মুসান্নাফে আবী শাইবা, হাদীস নং- ২৪৬১] একথাও বলে না যে, কুফাবাসী পূর্বাপর কখনোই রফয়ে ইয়াদাইন করতো না। [আততালীকুল মুজাদ্দিদ- ৩/৯১]

আর ইমাম মারওয়াজী রহ. বলেন,

لا نعلم مصرا من امصار تركوا اليدين عند الخفض والرفع بإجماعهم رفعإ لااهل الكوفة (التعليق المجدد)

৯১) অথাৎ আহলে কুফার মাঝে সর্বদা তরকে রফয়ে ইয়াদাইন এর উপর ঐক্যমত্ব ছিল। একটি উপমাও রফয়ে ইয়াদাইন এর উপর পাওয়া যায় না। না কুফায় বসবাসকারী সাহাবা থেকে না কোন তাবেয়ী বা তাবে তাবেয়ী থেকে। তবে অন্য শহরগুলোতে তরকে রফয়ে ইয়াদাইন এর উপর ইজমা ছিল না। কেউ কেউ কখনো সখনো তা করেও বসতেন।

গায়রে মুকালি≠দদের একটি ভয়ঙ্কর খেয়ানত

সুনানে আবু দাউদের হাওয়ালা দিয়ে হযরত আবূ হুরায়রা রা.- এর একটি হাদীস রফয়ে ইয়াদাইন এর প্রমাণবাহী একটি হাদীস নকল করেছে। অথচ এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস বুখারীর ১/১১০, সহীহ মুসলিমের ১/১৬৮, জামে তিরমিজীর ১/৬৪ এ হাদীস বিদ্যমান।

যে হাদীসে রফয়ে ইয়াদাইন এর কোন উল্লেখই নেই। আবু দাউদে রফয়ে ইয়াদাইন এর কথা উল্লেখকারী বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব” হল জঈফ। [মিযানুল ইতিদাল]এ কারণে হুফ্‌ফাযদের বিপরীত এ হাদীস মুনকার। এরকম মুনকার উল্লেখ করেছে।

কিন্তু এ হাদীসে সারা জীবন রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন একথা উল্লেখ নেই। হ্যাঁ, এর পর আবু দাউদেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ, হযরত বারা বিন আযেব রাঃ, হযরত জাবের বিন সামুরা রাঃ এর তরকে রফয়ে ইয়াদাইন তথা হাত না উঠানো সংক্রান্ত হাদীস আছে। এগুলো আর নকল করেনি।

খেয়ানত করা কার আলামত?

তারপর সুনানে নাসায়ীর হযরত ওয়াইল রা.- এর জঈফ হাদীস রফয়ে ইয়াদাইন এর পক্ষে নকল করে। যাতে রফয়ে ইয়াদাইন সর্বদার জন্য প্রযোজ্য একথা উল্লেখ নেই। সাথে সাথে এরপরের আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.- এর রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীসটি ছেড়ে দিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ করেনি।

এটা এমন ধোঁকা, যেমন কোন খৃষ্টান বাইতুল মুকাদ্দাসওয়ালা হাদীস নকল করে, অথচ বাইতুল্লাহর নাম উল্লেখই করে না। এছাড়া আরেক মিথ্যা এই বলে যে, এক লাখ চৌচল্লিশ হাজার সাহাবাগণ নাকি রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। একথাটি একটি বানোয়াট ও মিথ্যাচার।

একথার কোন ভিত্তি নেই। একথাটি ওয়াইল বিন হুজুর রাঃ এর মদীনায় দ্বিতীয়বার আগমণ এর দিকে নিসবত করা। অথচ আবু দাউদে দ্বিতীয়বার আগমণের সময় শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রফয়ে ইয়াদাইন রহিত হওয়ার আলোচনা

গায়রে মুকাল্লিদদের কতিপয় আলেম অপূর্ণাঙ্গ হাওয়ালা নকল করে পরিশেষে মোল্লা আলী কারী হানাফী রহঃ এর নারায়ে হকের শিরোনাম লিখে মাওযূআতে কাবীর" এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলে যে, রফয়ে না করা সম্বলিত সকল হাদীস বাতিল। এর দ্বারা ভাবটা এমন যেন যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গেছে! কিন্তু এ কর্মটি এমন ধোঁকা, যা কোন কাফেরের কিতাবেও পাওয়া দুষ্কর। মোল্লা আলী কারী র. এ বক্তব্য জোরদারভাবে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। পুরো চব্বিশ লাইনে তরকে রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি রফয়ে ইয়াদাইনকে মানসুখ তথা রহিত প্রমাণ করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের স্বভাবই হল মিথ্যাকে গ্রহণ করা। সত্যকে সহ্যই করতে পারেন না। এ কারণেই নিজেদের হাদীস অনুসারী দাবি করে তরকে রফয়ে ইয়াদাইনসহ অনেক সহীহ হাদীসকে স্পর্ধার সাথে অস্বিকার করে। হাদীস অস্বিকারকারী দল মুনকিরীনে হাদীস থেকেও আগে বেড়ে হাদীস নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে থাকে।

১২১- মৌলবী মুহাম্মদ ইউসুফ জিপুরী হাকীকাতুল ফিক্বহ" এর ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেনঃ রুকুর আগে পরের রফয়ে ইয়াদাইনের সত্যতা- [হেদায়া- ১/৩৮৪, শরহে বেকায়া- ১০২]এ উভয় হাওয়ালা পরিষ্কার মিথ্যাচার। আল্লাহ তাআলা এমন মিথ্যাচার থেকে জাতিকে হেফাযত করুন।

১২২- আরো লিখেছে যে, রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস তরকে রফয়ে ইয়াদাইন থেকে শক্তিশালী। [হেদায়া- ১/৩৮৯] পরিষ্কার মিথ্যা কথা। এমন কথা হেদায়াতে নেই।

১২৩- রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস দুর্বল। [শরহে বেকায়া- ১০২] একেবারে মিথ্যাচার এ বক্তব্য। এমন কথা শরহে বেকায়ায় নেই।

১২৪- রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস দুর্বল। [হেদায়া- ১/৩৮৬]একেবারে মিথ্যাচার এ বক্তব্য। এমন কথা হেদায়ায় নেই।

১২৫- সত্য কথা হল, রাসূল সা. থেকে রফয়ে ইয়াদাইন সহীহভাবে প্রমাণিত। [হেদায়া- ১/৩৮৬]

পরিস্কার মিথ্যা কথা। একথা হেদায়ায় নেই।

১২৬- যে রফয়ে ইয়াদাইন করে তার সাথে বিতর্ক জায়েজ নয়। [হেদায়া- ১/৩৮৯] একথাও মিথ্যাচার। হেদায়া এ কথা নেই।

নোট

উল্লেখিত প্রশ্নের মাঝে প্রশ্ন নং ১২১ এবং ১২৬ এর মাঝে যে হাওয়ালা দেয়া হয়েছে তা হেদায়া ও শরহে বেকায়ার। এ উভয় কিতাব আরবীতে লিখা। এর মূল ইবারতের আরবীটা উল্লেখ করুন। এতে কি এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে? যেমন তারা করেছেন? আল্লাহ তাআলা মিথ্যাচার থেকে জাতিকে হিফাযত করুন। একটু লক্ষ্য করুন! এক মাসআলায় এত মিথ্যাচার ও ধোঁকা আপনার আর কোন ফিরক্বায় পাবেন কি না? সন্দেহ আছে।

আফসোস!

ওরা এসব মিথ্যাচার ও ধোঁকা কুরআন ও হাদীসের নামে করে বেড়াচ্ছে। আমাদের যে সকল ভাইয়েরা তাদের প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়েছেন, আর এটা ভাবছেন যে, এ দলটি কুরআন ও হাদীসের খাদেম। তারা দয়া করে এ দলের মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজীর ব্যাপারে আশা করি একটু চিন্তা ভাবনা করবেন, যা কুরআন ও হাদীসের নামে করা হচ্ছে।

১২৭- রুকুর আগে তাকবীর একটি না দু'টি?

যদি গায়রে মুকাল্লিদরা দুই তাকবীর বলে। এ হিসেবে যে, একটি তাকবীরে তাহরীমার সাথে আরেকটি রুকুতে যাওয়ার সময়। তাহলে এ বক্তব্যটি পরিস্কারভাবে হাদীসের খেলাফ। কেননা, বুখারীর হাদীসে এসেছে যে, চার রাকাত নামাযে বাইশটি তাকবীর। রুকুর আগেই দুই তাকবীর হলে তাকবীরতো হয়ে যাবে ত্রিশের অধিক। তাহলে হাদীস অনুসরণ হল কিভাবে?

১২৮- যদি বলে যে, তাকবীর একটি। তাহলে এটি হবে রুকুতে যাওয়ার তাকবীর তাকবীরে তাহরিমা নয়। কারণ হাদীসে এসেছেكبر عند كل خفض ورفعতথা প্রতিটি উঠা- নেয়ায় তাকবীর রয়েছে। এ কারণেই এসব তাকবীরকে তাকবীরে ইন্তিকাল তথা পরিবর্তনকালীন তাকবীর বলা হয়। তাহলে তাকবীরে তাহরিমার সময় আর তাকবীর থাকে না, তখন রফয়ে ইয়াদাইন করাটা তাকবীরবিহীন হয়ে যায়। আর তাসবীহ ছাড়া হাত উঠানো কি কোন ইবাদত? এর জবাব কি?

১২৯- রুকুর তাসবীহ একবার বলা জায়েজ না জায়েজ? কেননা, বুখারী মুসলিমে কোন সংখ্যার কথা উল্লেখ নেই।

১৩০- কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ বলার হাদীস জঈফ। কারণ এ হাদীসের রাবী আউন এর ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে শ্রবণ প্রমানিত নয়। আর ইসহাক বিন ইয়াযিদ মাজহুল রাবী। তাহলে এক্ষেত্রে কতবার তাকবীর বলবে সহীহ হাদীসের আলোকে?

১৩১- দশবার পড়ার বর্ণনা নাসায়ীতে এসেছে। এ হাদীসও জঈফ। কারণ এতে ওহাব বিন মানূস মাসতুর।

রাসূল সাঃ শুধুমাত্র ١٣٢سبحان ربى العظيم- এর হুকুম দিয়েছেন। [আবু দাউদ, হাদীস নং- ৮৮৬, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৮৯০] এক্ষেত্রে অন্য কোন তাসবীহ পড়া জায়েজ আছে? পড়লে নামায হবে কি?

১৩৩- কেউ যদি রুকুতে কোন তাসবীহই না পড়ে তাহলে তার নামায হবে। [সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং- ১০৫৩] এর উপর গায়রে মুকাল্লিদদের আমল নেই কেন?

১৩৪- যদি কেউ রুকুতে সেজদার তাসবীহ পড়ে, তাহলে সেজদায়ে সাহু আবশ্যক হবে? না নামায বাতিল হয়ে যাবে?

১৩৫- নাসায়ী [উর্দু অনুবাদ- ১/৩৪৯] ও আবু দাউদ [উর্দু অনুবাদ- ১/৩৪০] এ রুকুতে জোরে তাকবীর বলার বর্ণনা এসেছে। এ হাদীসের উপর গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের আমল নেই কেন?

১৩৬- গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা সর্বদা রুকুতে আস্তে আস্তে তাসবীহ বলেন, এর স্বপক্ষে একটি সহীহ সরীহ হাদীস পেশ করুন।

১৩৭- রুকুতে কুরআন পড়া নিষেধ। কেউ যদি ভুলে কুরআনের এক দুই আয়াত পড়ে ফেলে তাহলে তার উপর সেজদায়ে সাহু আবশ্যক না নামায বাতিল হয়ে যাবে?

১৩৮- নাসায়ী শরীফে রুকুতে ছয় ধরণের তাকবীরের কথা উল্লেখ আছে। রাসূল সাঃ সব ক'টি সর্বদা পড়তেন? নাকি একটি পড়তেন? আমাদের জন্য কোনটি পড়ার হুকুম?

১৩৯- হাকীম মুহাম্মদ সাদেক শিয়ালকুটি সাহেব রুকুতে চারটি দুআর কথা বুখারী মুসলিমের হাওয়ালা দিয়ে উল্লেখ করেছেন। অথচ না বুখারীতে আছে, না মুসলিমে আছে। যদি থাকে তাহলে পৃষ্টা নং পেশ করুন।

১৪০- রুকু থেকে উঠার সময় ইমাম জোরে আর মুক্তাদী আস্তে তাকবীর বলে থাকে, এ পার্থক্যের কী দলিল আছে? পেশ করুন।

১৪১কতিপয় গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা রুকু থেকে উঠে আবার হাত বাঁধে। আর কেউ কেউ ছেড়ে দেয়। এ উভয় আমল কোন হাদীস অনুযায়ী করা হয়?

১৪২- রুকু থেকে উঠার সময়ের তাকবীর মুক্তাদীর জোরে বলার বর্ণনা নাসায়ীতে আছে। গায়রে মুকাল্লিদরা এর উপর আমল করে না কেন?

১৪৩- রুকু থেকে উঠার তাকবীর ফরজ, না ওয়াজিব না সুন্নত? সরীহ হাদীস দেখান।

১৪৪- সেজদার যাওয়া ও উঠার তাকবীর ইমাম জোরে আর মুক্তাদী আস্তে বলে থাকে, এ পার্থক্যের কথা সহীহ সরীহ হাদীস দিয়ে দেখান।

১৪৫- সেজদার তাসবীহ কতবার পড়তে হবে? সহীহ সরীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণ করুন।

১৪৬- সেজদাতে কোন তাসবীহ না পড়লেও তাও জায়েজ আছে। [সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং- ১১৩৬] গায়রে মুকাল্লিদদের আমল নেই কেন?

১৪৭- হাকীম সাদেক শিয়ালকুটি সাহেব সেজদার দ্বারা স্তর উঁচু হওয়া] এর শিরোনামে একটি হাদীস এনেছেনঃ عليك بكثر السجود الخ অথচ এ বাক্য রাসূল সাঃ এর হাদীস নয়। সাদেক শিয়ালকুটি সাহেব নিজের পক্ষ থেকে জোড়ে দিয়েছেন।

১৪৮- দুই সেজদার মাঝে হাত খোলা রাখবে? না বেঁধে রাখবে? পরিষ্কার হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন।

১৪৯- মুসনাদে আহমদের ৪নং খণ্ডের ৩১৭ নং পৃষ্ঠায় হাত হাটুর উপর রাখার কথা আছে, সাথে সাথে দুই সেজদার মাঝে তর্জনী দিয়ে ইশারা করার কথা আছে। এর উপর গায়রে মুকাল্লিদদের আমল নেই কেন?

১৫০- দুই সেজদার মাঝে যে আপনারা আস্তে আওয়াজে আল্লাহর নাম নিয়ে থাকেন এটা কোন হাদীসের ভিত্তিকে করে থাকেন?

১৫১- দুই সেজদার মাঝে জিকির বলা কি ফরজ, না ওয়াজিব না সুন্নত? যদি কেউ না পড়ে তাহলে তার নামায হবে কি? না বাতিল হবে?

১৫২- ইমাম বায়হাকী ২/২২২ এবং ফাতাওয়া ওলামায়ে হাদীস ২/১৪৮ এ আহাদীস ও চার ইমামের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, মহিলা ও পুরুষের নামাযে পার্থক্য আছে। গায়রে মুকাল্লিদরা এসকল হাদীস ও ইজমার বিপরীত শুধু কিয়াসের উপর নির্ভর করে বলে যে, মহিলা ও পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই। হাদীসের চেয়ে তাদের কাছে কিয়াস এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? অথচ কিয়াসকে হারাম বলে ফাতাওয়া দিতেই পারঙ্গম তারা।

১৫৩- রুকু সেজদার তাসবীহ আরবীতে বলা জরুরী? যদি কেউ আরবীতে না বলে অন্য ভাষায় বলে তাহলে তার নামায হবে কি?

১৫৪- এক ব্যক্তি এক সেজদার পর ভুলে দাঁড়িয়ে গেছে দ্বিতীয় রাকাতে রুকুতেস্মরণ হয়েছে এখন সে নামায কিভাবে পূর্ণ করবে? স্পষ্ট সহীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণ দিন।

আহলে হাদীস আবার হাদীস বিরোধী?

ফাতাওয়া ওলামায়ে হাদীসের ৪ নং খণ্ডের ৩০৬ নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে যে, সেজদার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করার হাদীস নিঃসন্দেহে সহীহ। এটা রাসূল সা.- এর শেষ বয়সের আমল। নিঃসন্দেহে এর উপর আমলকারী মৃত সুন্নতকে জিন্দাকারী। তাই একশত শহীদের সওয়াব পাবে। গায়রে মুকাল্লিদরা এ সুন্নতের বিরোধী। তাই এর উপর আমল করে না।

১৫৫ বিতর নামাযে রুকু থেকে উঠে দুআর মত হাত উঠিয়ে দুআয়ে কুনুত পড়া, আর মুখে হাত বুলিয়ে সেজদা করা কোন সহীহ সরীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

জলসায়ে ইস্তেরাহাত তথা সেজদা থেকে দাঁড়ানোর আগে কিছুক্ষণ বসা ও গায়রে মুকাল্লিদদের ধোঁকা

১৫৬- কোন সহীহ সরীহ হাদীসে একথা আছে কি যে, জলসায়ে ইস্তিরাহাত সুন্নতে মুআক্কাদা?

১৫৭- জলসায়ে ইস্তিরাহাতে কোন জিকিরও আছে কি? এটা أقم الصلاة لذكري- এর খেলাফ কি না?

১৫৮- জলসায়ে ইস্তিরাহাতের পর আল্লাহু আকবার বলে উঠাও কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? যখন তাকবীর প্রমাণিত নয়, তাই এটি সুন্নত বা মুস্তাহাব হতে পারছে না। কেননা, ইস্তিরাহাতের পর তাকবীর থাকলে তাকবীরের সংখ্যা দাঁড়ায় কত? অথচ রাসূল সা. তাকবীরে সংখ্যা বলেছেন ২২টি। তাহলে এ অতিরিক্ত কোন সহীহ সরীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

১৫৯- রাসূল সাঃ সেজদার পর সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন। [সহীহ বুখারী- ১/৯৮৬]

হযরত আবূ মালেক আশআরী রাঃ যখন তারা পুরো কওমকে রাসূল সা.- এর নামাযের পদ্ধতি শিখালেন, তখন তিনি প্রথম তাকবীরের পর রফয়ে ইয়াদাইন তথা হাত উঠানো শিখিয়েছেন। কিন্তু জলসায়ে ইস্তিরাহাত শিখাননি। [মুসনাদেআহমাদ- ৫/৩৪৩]

ইমাম শা'বী বলেনঃ হযরত ওমর রাঃ, হযরত আলী রা. - এবং রাসূল সা.- এর সাহাবাগণ জলসায়ে ইস্তিরাহাত করতেন না। হযরত নুমান বিন আবী আইয়্যাশ বলেনঃ আমি অনেক সাহাবার সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাদের কাউকে জলসায়ে ইস্তিরাহাত করতে দেখিনি। আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাঃ, আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাঃ, আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলা রাঃ, হযরত ইবনে ওমায়ের রাঃ হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহঃ কেউই জলসায়ে ইস্তিরাহাত করতেন না। [মুসান্নাফ ইবনে আবী

শাইবা- ১/৩৯৪]আইয়ুব সাখতিয়ানী রহঃ বলেনঃ আমি এক বুড়ো ওমর বিন সালামাকে ছাড়া কাউকে জলসায়ে ইস্তিরাহাত করতে দেখিনি। [বুখারী- ১/১১৩]ইমাম ইবনে আব্দিল বার রহ. বলেন, ইমাম মালিক রহঃ, ইমাম মুহাম্মদ রহঃ, ইমাম আওযায়ী রহঃ, ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. ও জলসায়ে ইস্তিরাহাত এর প্রবক্তা ছিলেন না। [তামহীদ, কিতাবুল হজ্ব- ১/৩১৭]

ইমামে আজম বলেন, সুন্নত এটাই যে, জলসায়ে ইস্তিরাহাত না করে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া। হ্যাঁ বার্ধক্যজনিত কারণে বা এ জাতীয় ওজরের কারণে যদি কেউ সোজা উঠতে না পারে, তাহলে ওজরের কারণে জলসায়ে ইস্তিরাহাত করে উঠবে। [তামহীদ, কিতাবুল হজ্ব- ১/৩১৫]

গায়রে মুকাল্লিদ নাসীরুদ্দীন আলবানী যার উল্লেখ ফাতাওয়া ওলামায়ে হাদীস এর ৩ নং খণ্ডের ১৭৬ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, তিনি বলেন যে, জলসায়ে ইস্তিরাহাত শরীয়ত সম্মত নয়। শুধু প্রয়োজনের জন্য। [আরদাউল গলীল- ২/৮৩]

১৬০- মৌলবী ইউসুফ জিপুরী হাকীকাতুল ফিক্বহ" এর ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, জলসায়ে ইস্তিরাহাত না করার হাদীস জঈফ। [শরহে বেকায়া- ১০১] এ বক্তব্য শরহে বেকায়ার উপর প্রকাশ্য মিথ্যাচার। এরকম কোন কথা শরহে বেকায়ায় নেই।

১৬১- শায়েখ নাসীরুদ্দীন আলবানী গায়রে মুকাল্লিদ লিখেন, প্রতিটি রাকাত আওজুবিল্লাহ দিয়ে শুরু কর। [সীফাতু সালাতুন্নবী- ১৩৭]এ কথা রাসূল সাঃ এর কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

১৬২- দুই রাকাতের পর বৈঠক করা ফরজ, ওয়াজিব না সুন্নত? যদি কেউ ভুলে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সেজদায়ে সাহু করবে? না নামায বাতিল? মাঝখানের বৈঠক ও শেষ বৈঠক নিয়ে একটু ভাবুন!

১৬৩- যে সমস্ত গায়রে মুকাল্লিদরা বেতের নামাযে দুই রাকাতের পর তাশাহুদ পড়ে না তারা কি ফরজ তরক করে, না ওয়াজিব না সুন্নত?

১৬৪- হাকীম সাদেক শিয়ালকুটি বেতের সম্পর্কে لا يقعد ওয়ালা যে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর

রাউইর মাঝে শাইবান হল জঈফ, আবান মুনফারিদ আর কাতাদা হল মুদাল্লিস। আর মুস্তাদরাকে অধিকাংশ নুসখায় এ বর্ণনা বিদ্যমান নয়। এ কারণেই মৌলবী আব্দুর রউফ গায়রে মুকাল্লিদও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, এ বর্ণনাটি এ শব্দে বর্ণনা করা দোষমুক্ত নয়। [হাশিয়ায়ে সালাতুর রাসূল- ৩৯১]

ইমাম বায়হাকী রহঃ এটাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। [সুনানে বায়হাকী- /২৮] আলবানী সাহেবও এটাকে "শাজ" বলে মন্তব্য করেছেন। [আরদাউল গলীল]

১৬৫- এক ব্যক্তি মাঝখানে বৈঠকে তাশাহুদের বদলে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নিল, আর তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর স্মরণ হল, এখন হাদীস অনুপাতে লোকটি নামায পূর্ণ করবে কিভাবে?

১৬৬- মাঝখানের বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ফরজ ওয়াজিব না সুন্নত? কতটুকু পড়বে? শায়েখ আলবানী বলেনঃ দরূদও পড়বে। আর আব্দুল্লাহ রূপুরী সাহেব বলেনঃ দরূদ পড়বে না। এ দুজনের মাঝে কার মাসআলাটি হাদীস অনুযায়ী সঠিক? কারটি ঠিক নয়? হাদীস দিয়ে প্রমাণ দেখান।

১৬৭- শেষ বৈঠক ফরজ, ওয়াজিব না সুন্নত? যদি কেউ শেষ ছেড়ে দিয়ে পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সে এখন কী করবে? সহীহ সরীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণ করুন।

১৬৮- শেষ বৈঠক করে তাশাহুদ পড়ে পঞ্চম রাকাতের জন্য যদি কেউ দাঁড়ায়, তাহলে সে এখন বাকি নামায কিভাবে পূর্ণ করবে? সহীহ সরীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণ করুন।

১৬৯- শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ফরজ, ওয়াজিব না সুন্নত?

১৭০- নাসায়ীতে তাক্বরীরী হাদীসে [উর্দু অনুবাদ- ১/৪২৪] তাশাহুদ জোর আওয়াজে পড়া প্রমানিত। আপনাদের এ হাদীসের উপর আমল নেই কেন?

১৭১- যদি কেউ শেষ বৈঠকে ভুলে তাশাহুদের স্থলে ফাতিহা পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেয়, তাহলে সে কী করবে?

১৭২- আখেরী বৈঠকে দরূদ শরীফ পড়া ফরজ, ওয়াজিব না সুন্নত?

দরূদে ইবরাহিমীর উপর আলোচনা

১৭৩- সিহাহ সিত্তার কোন হাদীসে একথা স্পষ্ট আছে কি যে, নামাযে দরূদে ইবরাহিমীই খাস? এছাড়া অন্য কিছু পড়া যাবে না? নাসায়ীতে তাক্বরীরী বর্ণনায় [উর্দু অনুবাদ- ১/৪২৪] দরূদ জোরে পড়া প্রমাণিত। আপনারা এর উপর আমল করেন না কেন?

১৭৪- আপনাদের ইমাম, মুক্তাদী, একাকী নামায আদায়কারী সবাই দরূদ আস্তে আস্তে পড়ে, এ ব্যাপারে কোন সহীহ সরীহ বর্ণনা আছে কি?

১৭৫- যদি কেউ দরূদ পড়া ছাড়াই সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তাহলে কি তার নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে? নাকি পড়তে হবে না?

১৭৬- কোন ব্যক্তি দরূদে ইবরাহিমীর বদলে অন্য কোন বর্ণিত দরূদ পড়লে তার নামায হবে কি?

১৭৭- দরূদ এরপর দুআ চাওয়া ফরজ, না ওয়াজিব না সুন্নত? সরীহ হুকুম হাদীস দিয়ে প্রমাণ করুন।

১৭৮- দুআটি আরবীতে করা জরুরী? নাকি অন্য ভাষায় বা গায়রে মাসুরা দুআও পড়া জায়েজ? হাদীস দ্বারা জবাব দিন।

১৭৯- নাসায়ীর তাক্বরীরী হাদীসে [উর্দু অনুবাদ- ১/৪২৪] দুআ উঁচু আওয়াজে পড়ার কথা প্রমাণিত। এর উপর আপনাদের আমল নেই কেন?

১৮০- যদি কেউ এ দুআ হাত উঠিয়ে পড়ে, তাহলে কোন হাদীসের ভিত্তিতে তাকে নিষেধ করা হবে? আর কোন হাদীস দিয়ে তা প্রমাণিত করা হবে?

সালামের উপর আলোচনা

১৮১- নামাযের শেষে উভয় দিকে সালাম ফিরানো ফরজ, সুন্নত না ওয়াজিব?

১৮২- ইমাম মুক্তাদী, এবং মুনফারিদ সালাম ফিরানোর সময় মনে মনে কী নিয়ত করবে?

১৮৩- ইমাম উচ্চ আওয়াজে আর মুক্তাদী ও মুনফারিদ আস্তে আওয়াজে সালাম ফিরায়। এ পদ্ধতিটি সহীহ সরীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণ করুন।

১৮৪- ফাতাওয়া ওলামায়ে হাদীস এর ৩ নং খণ্ডের ২১৪পৃষ্ঠায় আছে যে, নামায ফরজ, সুন্নত এর পর হাত উঠিয়ে দুআ করতে পারে। এর উপর কওলী, ফেলী এবং আসরী দলীল রয়েছে। আর নাজায়েজের উপর কোন দলিল নেই। আজকালকার গায়রে মুকাল্লিদরা এ কওলী ফেলী দলীলের বিরোধী হয়ে দুআকে পরিষ্কার অস্বিকার করে। কেন?

১৮৫- কোন বেগানা মহিলার সাথে চুম্বন ও আলিঙ্গন করে নামায পড়ে নিলে সব কিছু মাফ হয়ে যায়। [বুখারী- ১/৭৫]গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের এই হাদীসের উপর আমল আছে কি?

১৮৬- রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেনঃ মহিলারা সামনে দিয়ে গেলে নামায ভেঙ্গে যায়। [সহীহ মুসলিম- ১/১৯৭, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭০২]কিন্তু হযরত আয়শা সিদ্দিকা রাঃ রাসূল সাঃ এর সামনে শুয়ে থাকতেন, আর রাসূল সা.- সেজদায় যাওয়ার সময় নিজের হাতে পা সরিয়ে দিতেন। [সহীহ মুসলিম- ১/১৯৭]মহিলা সামনে দিয়ে গেলে কি নামায ভেঙ্গে যায়?

১৮৭- হায়েজা মহিলা সামনে দিয়ে গেলে নামায ভেঙ্গে যায়। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭০৩]

হযরত আয়শা রাঃ হায়েজা অবস্থায় রাসূল সা.- এর নামাযরত অবস্থায় সামনে শুয়ে ছিলেন। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭১০]হযরত মায়মুনা রাঃ থেকেও এমন বর্ণিত। [বুখারী- ১/৭৪, মুসলিম- ১/১৯৮]গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা এক্ষেত্রে কোনটি মানেন এবং কেন?

১৮৮- মহিলা যদি নামাযে ইমামের লজ্জাস্থান দেখতে থাকে, তাহলে তার নামায ভাঙ্গবে না। [বুখারী- ২/২৯০]

যদি পুরুষ মহিলার লজ্জাস্থান দেখে ফেলে তাহলে নামায ভাঙ্গবে কি না? সহীহ সরীহ হাদীস দেখান।

১৮৯- রাসূল সাঃ নামাযে বিবিদের পায়ে হাত লাগাতেন। রাসূল সা. নামায পড়ার সময় তাঁর পায়ের গিটে হাত লাগাতেন, কিন্তু নামায ভাঙ্গতো না। যদি নামাযী ব্যক্তি মহিলার অন্য কোন অঙ্গে হাত লাগায় তাহলে নামায ভাঙ্গবে কি?

১৯০- রাসূল সা. নামাযের পূর্বে সম্মানিতা স্ত্রীকে চুম্বন করেছেন। এতে অজু ভাঙ্গেনি। যদি পুরুষ নামাযরত মহিলাকে চুম্বন করে, তাহলে নামায ভাঙ্গবে কি না? সহীহ সরীহ দিয়ে প্রমাণ দিন।

১৯১- যদি এর উল্টো তথা নামাযরত পুরুষকে মহিলা চুম্বন করে, তাহলে পুরুষের নামায ভাঙ্গবে কি? সহীহ সরীহ হাদীস দিয়ে দলিল দিন।

১৯২- নামাযীর দৃষ্টি যদি লজ্জাস্থানে পরে, তাহলে নামায ভাঙ্গবে কি না?

১৯৩- নামাযরত মায়ের কোলে বাচ্চা প্রস্রাব করে দিলে, মায়ের নামায ভেঙ্গে যাবে কি?

১৯৪- মা নামাযরত থাকা অবস্থায় বাচ্চা যদি দুধ পান করা শুরু করে দেয়, তাহলে কি নামায ভেঙ্গে যাবে? সহীহ সরীহ হাদীসের জবাব চাই।

১৯৫- রাসূল সা. ইরশাদ করেছেনঃ গাধা সামনে দিয়ে অতিক্রান্ত হলে নামায ভেঙ্গে যায়। [মুসলিম- ১/১৯৭]

কিন্তু রাসূল সাঃ নামায পড়াচ্ছিলেন, আর সবার সামনে গাধা বিচরণ করছিল। [মুসলিম- ১/১৯৬, আবু দাউদ, নাসায়ী] এমনকি রাসূল সা. গাধার উপর নামাযও পড়েছেন। এরকম বিপরীতমুখী কেন কওল ও ফেল?

১৯৬- রাসূল সা. ইরশাদ করেছেনঃ কুকুর সামনে দিয়ে অতিক্রান্ত হলে নামায ভেঙ্গে যায়। [মুসলিম- ১/১৯৭]অথচ রাসূল সাঃ নামায পড়তেছিলেন, আর সামনে কুকুর খেলতেছিল। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৭১৮]

১৯৭- রাসূল সা. নামাযরত অবস্থায় তাঁর উপর উটের নাড়িভূরি ঢেলে দেয়া হয়েছিল। তারপরও রাসূল সাঃ নামায শেষ করে উঠেন। [সহীহ বুখারী, ১/৭৪]সারা শরীরে নামাযরত অবস্থায় নাপাক লাগলে নামাযের কী হুকুম?

১৯৮- রাসূল সা.- এর নাতি হযরত উমামা রাঃ পিঠে উঠিয়ে নামায পড়তেন। [বুখারী- ১/৭৪, মুসলিম]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব লিখেন যে, ইমাম শাফেয়ী রহঃ এর মাযহাব হল, ছেলে বা মেয়ে অথবা কোন পবিত্র প্রাণি নামাযরত ব্যক্তির গায়ে উঠানো জায়েজ আছে।

এটি ইমাম মুক্তাদী এবং মুনফারিদ সবার জন্যই তা জায়েজ আছে। ইমাম মালিক রহঃ বলেনঃ এটা জায়েজ হওয়াকে নফল নামাযের সাথে খাস করেছেন। কিন্তু এটি ঠিক নয়। কারণ খোদ হাদীস দ্বারা প্রমানিত যে, রাসূল স. ইমাম ছিলেন আর উমামাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

কতিপয় মালেকীগণ বলেনঃ এ হাদীস মানসুখ তথা রহিত হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন যে, জরূরতের কারণে এমনটি করেছেন।

কিন্তু সব কথাই বাতিল এবং মারদুদ। কেননা, হাদীস দ্বারা স্পষ্টই জায়েজ প্রমাণিত। এটি শরীয়তের মূলনীতির ও বিরোধী নয়। কেননা, মানুষ পবিত্র। আর বাচ্চার শরীর এবং কাপড়কেও পবিত্র মনে করা উচিত যতক্ষণ না নাপাকীর উপর কোন দলীল না হয়। [হাশিয়ায়ে মুসলিম- ২/১১৭- ১১৮]

১৯৯- গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের মাযহাব অনুযায়ী কুকুর ও শুকর পাক। [উরফুর জাদী- ১০]

তাহলে আপনাদের মাযহাবে কুকুর বা শুকর উঠিয়ে নামায পড়া কোন হাদীসের খেলাফ?

২০০- আপনাদের মাযহাব অনুযায়ীতো নামাযী ব্যক্তি যে বস্তু উঠাবে সেটা পবিত্র হওয়া শর্ত নয়। [বুদুরুল আহিল্লাহ- ৩৮]আপনাদের মাযহাবেতো কুকুর ও শুকরের পায়খানায় লেপ্টে গেলেও নামায হয়ে যায়। [উরফুর জাদী- ২১]

এসবের দলিল কি?

২০১- মা নামায পড়তেছে সন্তান উড়না টেনে নিয়ে গেল, তাহলে কি নামায ভেঙ্গে যাবে?

২০২- হাদীসের কিতাব মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে আছে যে, হযরত মুয়াজ রা. হযরত আলী রাঃ উকুন মারতেন। [আবী শাইবা- ২/৩৬৭- ৩৬৮]

২০৩- হাদীসের কিতাবে এসেছে যে, ইবরাহীম, কাতাদাহ, হাকাম, আদা রহ. বলেছেন যে, কেউ যদি তাকবীরে তাহরিমা না বলে তাহলে নামায জায়েজ আছে। [আব্দুর রাজ্জাক- ২/৭২- ৭৩]

২০৪- হাদীসের কিতাবে এসেছে যে, আতা রহ. বলেছেন, আউজুবিল্লাহিমিনাশ শাইতানিররাজীম না পড়লেও নামায জায়েজ হবে। [আব্দুর রাজ্জাক- ২/৮৭]ইমাম হাসান বসরী রহ. বলেছেন, একাকী ব্যক্তিও যদি সূরায়ে ফাতিহা না পড়ে, তাহলে নামায পুনরায় পড়তে হবে না। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক- ২/৯৫]

২০৫- হযরত ওমর রা. মাগরিবের পূর্বে মাগরিবের প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতিহা না পড়ে সেজদায়ে সাহু করেছেন। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক- ২/১২৩]

হযরত মুআম্মার, কাতাদা এবং হযরত হাম্মাদ রহঃ বলেনঃ কেউ যদি তাশাহুদ না পড়ে, তাহলে তার নামায হবে। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক- ২/২০৫]

হযরত আবূ বারযাহ আসলামী খচ্চরকে হাতে ধরে নামায পড়েছিলেন। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক- ২/২৬২]

২০৬- নামাযী ব্যক্তি যদি লাঠি দিয়ে প্রাণীকে ভাগিয়ে দেয় তাহলে কোন সমস্যা নেই। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক- ২/২৬২]

২০৭- হযরত সাঈদ বিন জুবাইর রহঃ নফল নামাযে পানি ইত্যাদি পান করতেন। হযরত তাওস ও এটাকে জায়েজ বলতেন। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক- ২/৩৩৩]

২০৮- জারজ সন্তান নামাযের ইমাম হতে পারে। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক- ২/৩৯৬- ৩৯৭]

২০৯- রাসূল সাঃ এর জমানায় মসজিদে নববী কাঁচা ছিল না পাকা?

২১০- রাসূল সাঃ মসজিদে নববীর নাম মসজিদে কুদস রেখেছিলেন? না মসজিদে মুবারক? না মসজিদে আহলে হাদীস?

২১১- আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেনঃ হযরত আলীরা. মসজিদের মেহরাব দেখলে তা ভেঙ্গে ফেলতেন।

মসজিদে মেহরাব বানানো খেলাফে সুন্নত। এখন অধিকাংশ লোকেরা এটাকে গ্রহণ করে নিয়েছে ইল্লা মা'শাআল্লাহ। আহলে হাদীসদের এক জামাত কিছু মসজিদ সুন্নতের মুতাবেক বানিয়েছে। যাতে না মিম্বর আছে না মেহরাব। [লুগাতুল হাদীস- ৪৪, কিতাবুল হায়া]

২১২- হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল সা.- এর জমানায় মসজিদের ফ্লোর কাঁচা ছিল। কপালে মাটি লেগে যেত। মসজিদ পাকা করার কথা হাদীসে এসেছে?

২১৩- রাসূল সা. কি মসজিদে ফ্লোরমেট ও কার্পেট বিছাতেন?

২১৪- রাসূল সা. মসজিদে কয়টি মিনার বানিয়েছিলেন? আর এর উচ্চতা ছিল কতটুকু?

২১৫- রাসূল সা. মসজিদের সাথে কতগুলো ইস্তেঞ্জাখানা ও গোসলখানা বানিয়েছিলেন?

২১৬- রাসূল সা. মসজিদে অজুর স্থান কেমন বানিয়েছিলেন?

২১৭- রাসূল সা. মসজিদে কোন ধরণের পাখা লাগিয়েছিলেন?

২১৮- রাসূল সা. বলেছেন যে, প্রতিটি বাজনাতে শয়তান আছে। মসজিদে বাজনাওয়ালা ঘড়ি লাগানোর হাদীসে কী হুকুম বিদ্যমান?

২১৯- রাসূল স. এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে অজু করতেন। এর চেয়ে বেশি পানি ব্যবহার করা কি অপচয় কি না? একটু বুঝে শুনে বলুনতো।

২২০- রাসূল সা. এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন। গোসলের সময় এর চেয়ে বেশি পানি ব্যবহার করা কি অপচয়ের অন্তর্ভূক্ত? নাকি না?

২২১- মুদ এবং সা'এর পরিমাণ আমাদের প্রচলিত ওজন অনুযায়ী হাদীস দ্বারা কতটুকু প্রমাণিত?

২২২- কুরআন ও হাদীসে সাধারণ স্থান ও মসজিদের মাঝে কী কী পার্থক্য আছে?

২২৩- রাসূল সা.- এর জমানায় মসজিদ কতটুকু আলোকিত করা হতো? বর্তমানে এর চেয়ে বেশি আলোকিত করা কি জায়েজ? ২২৪- রাসূল সাঃ এর জমানায় হাবশীরা মসজিদে খেলাধোলা করত, আপনাদের মসজিদে এ সুন্নত জিন্দা আছেতো?

২২৫- রাসূল সা. জুতাকে দুই পায়ের মাঝে রাখার হুকুম দিয়েছেন। যে ব্যক্তিরা মসজিদের বাইরে জুতা রাখে, বা মসজিদের সামনে বা মুসল্লিদের সামনে রাখে তারা এ হাদীসের খেলাফ আমল করে না?

২২৬- হাদীসে যেমন এসেছে যে, من رغب عن سنتى فليس منى তথা যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার [উম্মতের] অন্তর্ভূক্ত নয় বলে বক্তব্য এসেছে, তেমনি কি من رغب عن حديثى فليس منى তথা যে ব্যক্তি আমার

হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার [উম্মতের] অন্তর্ভূক্ত নয় মর্মে কোন হাদীস এসেছে?

২২৭- যেমন হাদীসের মাঝে من أحب سنتى فقد أحبنى তথা যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো মর্মে হাদীস এসেছে তেমনি কি من أحب سنتى فقد أحبنى তথা যে ব্যক্তি আমার হাদীসকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো এমন হাদীস এসেছে?

২২৮- হাদীসে যেমন عليكم بسنتي তথা তোমাদের উপর আমার সুন্নতের অনুসরণ আবশ্যক মর্মে আদেশ এসেছে, তেমন কি عليكم بحديثي তথা তোমাদের উপর আমাদের হাদীস আবশ্যক একথাও এসেছে?

২২৯- যেমন সুন্নতের উপর আমল করার ফযীলত একশত শহীদের সমমানের বলে হাদীসে এসেছে, তেমনি কি হাদীসের উপর আমল শত শহীদের সওয়াব হবে মর্মে এসেছে?

২৩০- যেমন হাদীসে সুন্নত ও হাদীসের আলাদা আলাদা হওয়ার কথা এসেছে, তেমনি কি হাদীসে হাদীস ও সুন্নত এক একথাও এসেছে?

২৩১- সহীহ মুসলিমের ১ম খণ্ডের ১০নং পৃষ্ঠায় হাদীসের নাম নিয়ে গোমরাহকারী ফেতনাবাজদের মিথ্যুক ও দাজ্জাল বলা হয়েছে। কোন সহীহ হাদীসে কি সুন্নতের উপর আমলকারীদেরও এমন বলা হয়েছে?

২৩২- শায়েখ আব্দুল কাদীর রহ.- এর লিখা গুনিয়াতুত তালেবীনের এক হাদীসে শয়তানের বাচ্চার নাম "হাদীস" এসেছে। হাদীসের নাম নিয়ে সমাজে বিশৃংখলাকারী সে শয়তানের বাচ্চা কারা?

২৩৩- হাদীসে ইজমার অস্বিকারকারীকে গোমরাহ এবং জাহান্নামী বলা হয়েছে। কোন হাদীসে কি ইজমা মান্যকারীদের গোমরাহ ও জাহান্নামী বলা হয়েছে?

২৩৪- যেমন কুরআন ও হাদীসে ফিক্বহের প্রশংসা এসেছে, তেমনি কোন আয়াত বা হাদীসে কি ফিক্বহের নিন্দাবাদ এসেছে?

২৩৫- হাদীস অস্বিকারকারীরা অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। যেমন তারা বলে যে, [মাআজাল্লাহ] হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সা.- এর কথা ও কাজে বিপরীতমুখীতা আছে। এসব পরীতমুখীতাকে নিজের কিয়াস তথা যুক্তি দিয়ে নয় হাদীস দিয়ে জবাব দিন, যাতে হাদীসের প্রতি মানুষে খারাপ ধারণা নাহয়।

রাসূল সা.- এর হুকুম ছিল যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার সময় কিবলামুখী হওয়া বা সেদিকে পিঠ দেয়া নিষেধ। অথচ রাসূল সা. নিজেই কেবলামুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করেছেন। যুক্তি তথা কিয়াস নয় হাদীস দিয়ে এ প্রশ্নের জবাব দিন।

২৩৬- রাসূল সা.- এর হুকুম ছিল যে, তিনটির কম পাথর দিয়ে ইস্তেঞ্জা করবে না। কিন্তু তিনি নিজেই দুই পাথর দিয়ে ইস্তেঞ্জা করেছেন।

২৩৭- রাসূল সা. স্ত্রীর গোসল করা পানির অবশিষ্টাংশ দিয়ে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তিনি নিজেই বিবির গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করেছেন।

২৩৮- রাসূল সা. বারবার বলেছেন যে, আগুনে পাকানো খাবার খেলে অজু ভেঙ্গে যায়, অথচ তিনি নিজে পাকানো গোস্ত খেয়ে অজু করতেন না।

২৩৯- রাসূল সা.- এর হুকুমতো এই ছিল যে, গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি অজু করে শুইবে, কিন্তু তিনি নিজেই অজু ছাড়াই শুয়ে যেতেন।

২৪০- রাসূল সা. ফরজ নামায আলোকিত অবস্থায় পড়তে আদেশ দিতেন, অথচ তিনি নিজে অন্ধকারেই ফজরের নামায পড়তেন।

২৪১- রাসূল সা. আসরের নামাযের পর নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। অথছ তিনি নিজেই নামায পড়তেন।

২৪২- রাসূল সা.- লোকদের নামাযে এদিক সেদিক তাকাতে নিষেধ করতেন, অথচ তিনি নিজেই চোখের কোণা দিয়ে এদিক সেদিক তাকাতেন।

২৪৩- রাসূল সা. জানাযার সাথে সওয়ার হয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনিই ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে গিয়েছেন।

২৪৪- রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন যে, যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় সিঙ্গা লাগাবে, তার রোজা ভেঙ্গে যাবে, অথচ তিনি নিজেই সিঙ্গা লাগিয়েছেন। এ সকল মাসআলাগুলো তিরমিজীতে বিদ্যমান। এ সকল প্রশ্নের জবাব সহীহ সরীহ হাদীস দিয়ে দেয়া (সহীহ হাদীসের উপর আমল করার দাবিদার) গায়রে মুকাল্লিদ তথা কথিত আহলে হাদীসদের জিম্মায় আবশ্যক।

২৪৫- রাসূল সা.- যেভাবে স্বীয় সাহাবীদের আহলে কুরআন বলে সম্বোধন করেছেন [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ১১৭০, সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং- ৪৫৩, ২৮২]ঠিক এভাবে কোন সহীহ হাদীসে সাহাবাগণকে এভাবে আহলে হাদীস বলা হয়েছে?

২৪৬- মৌলবী সানাউল্লাহ সাহেব এবং মৌলবী এনায়েতুল্লাহ আসরী মির্যায়ী তথা কাদিয়ানীদের পিছনে নামায পড়া জায়েজ বলতেন। [ফায়সালায়ে মক্কা- ৩৬]

নিজেরা পড়তেনও নামায। এটি কোন হাদীসের উপর আমল?

২৪৭- রাসূল সা. বনু কুরায়জার রাস্তায় আসর নামায আদায়কারী এবং তরককারী দুই দলের কোন দলের ইজতিহাদকে ভুল বলে আখ্যায়িত করেননি। কোন দলের উপর প্রশ্নও তোলেন নি তারা কেন এটা করেছে? গায়রে মুকাল্লিদরা কোন হাদীসের উপর নির্ভর করে মুজতাহিদগণকে শয়তান বলে থাকে?

২৪৮- রাসূল সা.- এর হাদীস অনুযায়ী মুজতাহিদের প্রতিটি অবস্থায়ই সওয়াব পায়, ভুল করলে একটি আর সঠিক হলে দুইটি। এমতাবস্থায় মুজতাহিদদের গালি দেয়া কোন হাদীসের উপর আমল?

২৪৯- মৌলবী মুহাম্মদ ইউসুফ গায়রে মুকাল্লিদ সাহেব হাকীকাতুল ফিক্বহএ বলেছেন যে, গর্দান মাসাহ করা বেদআত। আর এ সংক্রান্ত হাদীস জাল। হেদায়া- ১/১৮, ১৯৩]অথচ একথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। কেননা, হেদায়াতে একথা বিলকুল নেই।

২৫০- হাকীকাতুল ফিক্বহের ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, পাগড়ির উপর মাসাহ করা জায়েজ আছে। হেদায়া- ১/১০]

অথচ হেদায়ার আসল ইবারতে আছে যে, لا يجوز المسح على العمامة তথা পাগড়ির উপর মাসাহ করা জায়েজ নেই। তাহলে হেদায়ার নামে এ মিথ্যাচার কেন?

২৫১- হাকীকাতুল ফিক্বহের ২০০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, একবার মাটিতে হাত মেরে তায়াম্মুম করার বর্ণনা সহীহাইন তথা বুখারী মুসলিমে অনেক বর্ণিত। এবং তা সহীহ। [হেদায়া- ১/১৪২, শরহে বেকায়া- ৮৭]আর ২০১ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, তায়াম্মুম এর মাঝে দুই বার হাত মারার হাদীস জঈফ ও মওকূফ। [হেদায়া- ১/১৪২, শরহে বেকায়া- ৫৬] হেদায়া ও শরহে বেকায়ার নামে লেখা সব কটি কথাই মিথ্যাচার। বরং হেদায়াতে লেখা আছে যে, তায়াম্মুমে দুইবার হাত মাটিতে মারতে হবে। একবার চেহারার জন্য আরেকবার উভয় হাতের জন্য। এটাই রাসূল সাঃ এর ফরমান। তারপর তিনি হাকীকাতুল ফিক্বহের ৩২ নাম্বার পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, রাসূল সা. এর সর্বদার আমল অন্ধকার অবস্থায় ফজর নামায পড়াই ছিল। [হেদায়া- ১/২৯২]অথচ হেদায়ার মূল আরবী ইবারত হল- ويستحب الإسفار بالفجر لقوله عليه السلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر অর্থাৎ ফর্সা হওয়া অবস্থায় ফজর নামায পড়া মুস্তাহাব, কেননা, রাসূল সাঃ ইরশাদ

করেছেন, তোমরা ফজরকে ফর্সা হলে আদায় কর, কেননা এটাই অধিক সওয়াবের কারণ। তিনি আরো লিখেছেন যে, তারজীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। [হেদায়া- ১/২৯২]অথচ হেদায়াতে ঠিক এর উল্টোটি লিখা আছে। হেদায়াতে লিখা হল- لنا انه لا ترجيع في المشاهير لا ترجع فيه অর্থাৎ আজানে তারজীহ নেই। কেননা, মাশহুর হাদীসে তারজীহ প্রমাণিত নয়।

তিনি আরো লিখেছেন যে, ইকামত হল একবার একবার করে। [শরহে বেকায়া] অথচ শরহে বেকায়ার মূল আরবীতে আছে যে, ইকামত হল আযানের মত। কেননা, ফেরেস্তা আজান ও ইকামত একইভাবে শিখিয়েছেন।

এভাবে একের পর এক মিথ্যা রেফারেন্স দিয়ে ভরে রেখেছেন তিনি হাকীকাতুল ফিক্বহ নামক মিথ্যা সর্বস্ব বইয়ে। দ্বীন প্রচারের নামে এত মিথ্যাচার আরো কেউ করেছে কি না চিন্তার বিষয়।

এরকম অসংখ্যা মিথ্যচারের ভাগাড় হল গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মৌলবী মুহাম্মদ ইউসুফ এর লেখা হাকীকাতুল ফিক্বহ। আরো কিছু মিথ্যাচারের নমুনা দেখুন, হাকীকাতুল ফিক্বহের মিথ্যাচার

২৫২- সেজদায়ে সাহু উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর করবে। [হেদায়া- ১/৫৮৪, শরহে বেকায়া- ৩৯]

২৫৩- এক সালামের পর সেজদায়ে সাহুকারী বেদআতি। [হেদায়া- ১/৫৮৫]

এ সকল কিছুই মিথ্যা কথা। আপনি নিজে উক্ত কিতাব উঠিয়ে দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। কিভাবে এমন জঘন্য মিথ্যাচার করা হয়েছে ওসব কিতাবের নাম নিয়ে। অথচ এসব বক্তব্যের সম্পূর্ণ উল্টো হেদায়া ও শরহে বেকায়ায় লিখা আছে। এরকম মিথ্যা কথা নিসবত এসব গ্রহণযোগ্য কিতাবের দিকে করে সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দেয়ার এক জঘন্য খেলায় মত্ত হয়েছেন তিনি।

আরো লিখেছেন যে, তারাবীহের মাঝে ২০ রাকাতের হাদীস দুর্বল। [হেদায়া- ১/৫৬৩, শরহে বেকায়া- ১৩৩]

২৫৪- তারাবীহের ৮ রাকাতের হাদীস সহীহ। [শরহে বেকায়া- ১৩৩]

২৫৫- বেতেরের সাথে তারাবীহ এগার রাকাত প্রমাণিত। [হেদায়া- ১/৫৬৩, শরহে বেকায়া- ১৩৩]

২৫৬- তারাবীহ ৮ রাকাত সুন্নত আর ২০ রাকাত মুস্তাহাব।

[শরহে বেকায়া- ১৩৪]

এ সব কটি বক্তব্য স্পষ্ট মিথ্যাচার। এসব কিতাবে শুধু ২০ রাকাত তারাবীহের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কি নির্লজ্জভাবে এসব কিতাবের দিকে নিসবত করে মিথ্যাচার করা হয়েছে।

২৫৭- হাকীকাতুল ফিক্বহে আরো লিখা হয়েছে যে, ফজরের ফরজের পর সুন্নত পড়া যায়। [হেদায়া- ১/৫৪২, শরহে বেকায়া- ৮৪] এটাও এসব কিতাবের দিকে নিসবত করা সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। আরবী হেদায়া ও শরহে বেকায়ায় এমন কোন বক্তব্য নেই।

আরো লিখেছেন যে, ফজরের সুন্নত পড়ে ডান কাৎ হয়ে শুইবে। [হেদায়া- ১/৫৪১] একদম মিথ্যা কথা। হেদায়ার আরবী কিতাবে এর নাম- গন্ধও নেই। আমরা সাধারণ গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের কাছে অনুরোধ করি এরকম মিথ্যাচার কেন করলেন আপনাদের পথিকৃত গায়রে মুকাল্লিদ আলেমরা? উপরে বর্ণিত নামায সম্পর্কিত মাসায়েলগুলোর কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক জবাব দিতে কোন দিন কি দিতে পারবে গায়রে মুকাল্লিদ তথাকথিত আহলে হাদীস নামধারীরা? যদি না দিতে পারেন, তাহলে আপনাদের কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক নামাযের মিথ্যা স্লোগান বর্জন করে কুরআন হাদীসের আলোকে মুজতাহিদ ইমামদের বের করা নামায পদ্ধতি অনুসরণ করুন। আর জাতিকে প্রোপাগান্ডা, বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের হাত থেকে রক্ষা করুন।

আহলে হাদীসদের দৈন্যদশা

[আমীন জোরে বলার ব্যাপারে আহলে হাদীসদের কাছে কোন সহীহ হাদীস নেই। আমীন বলার অনেক সহীহ হাদীস আছে। কিন্তু আমীন জোরে বলার কোন সহীহ হাদীস নেই। এই বিষয়ে আহলে হাদীসদের চ্যালেন্জ করলেও তারা কোন সহীহ হাদীস দেখাতে পারেনি। বিস্তারিত পড়ুন এবং জানুন এই মাসআলায় আহলে হাদীসরা কেন ইয়াতীম। আমরা নিজেরাও আমীন বলি। এজন্য শুধু আমীন বলার হাদীস নয়, বরং জোরে আমীন বলার সহীহ হাদীস দেখাতে বলা হয়েছে। এখানে তাদের দেয়া দলিলগুলো সংক্ষেপে খণ্ডন করা হলো]

প্রথম দলিল: হাদিস নং ১: আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্নিতঃ রাসুল স. যখন সূরা ফাতিহা পড়ে শেষ করতেন তখন উচ্চস্বরে আমীন বলতেন। (মুসতাদারাকে হাকিম ২২৩ পৃ., বায়হাকি ২য়, ৫৮ পৃ)

খণ্ডন: আপনি প্রথম দলিল হিসেবে একটা দুর্বল হাদীস এনেছেন। এই হাদীসে তিনজন রাউই সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে, ১. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আলা। সে দুর্বল ও মিথ্যুক। ২. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম এর উস্তাদ আমর ইবনে হারেস মাজহুল বা অজ্ঞাত। ৩. আমর ইবনে হারেস এর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সালেম

নাসেবী ছিলো। সতুরাং এধরনের মনগড়া বর্ণনা আনলেন কেন? আপনাকে সহীহ সনদ আনতে বলা হয়েছিলো।

দ্বিতীয় দলিল: ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযি. সুত্রে বর্ণিত। তিনি রাসুল স.- এর পিছনে সলাত আদায় করেছেন। রাসুল স. ولا الضالين বলার পর সশব্দে "আমীন" বলেছেন। (আবু দাউদ; হাসান সহীহ;হাদীস নঃ ৯৩৩, পৃ ১/১৩৫)

খণ্ডন:এই হাদীসে আলা ইবনে সালেহ আল- আসাদী একজন নিতান্ত দুর্বল রাউই রয়েছে। ইমাম আবু হাতিম রহ. তার সম্পর্কে বলেন, সে শিয়াদের সর্দার ছিলো। দেখুন, মিজানুল ই'তেদাল খ. ২, পৃ. ২১২।

তৃতীয় দলিলঃ হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল স. নামাযে ولا الضالين এমনভাবে বলতেন যে রাসূল স. এর নিকটবর্তী কাতারের লোকেরা শুনতে পেত। ইবনে মাজা, হাদীস নং ৯৩৪।

খণ্ডন: এই হাদীসটি খুবই দুর্বল। এই হাদীসের বর্ণনায় বিশর ইবনে রাফে নামে একজন রাউই রয়েছে যে হাদীস জাল করতো। তার মতো জালকারী বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও হাদীসের বর্ণনায় আবু আব্দুল্লাহ নামে একজন মাজহুল ও অজ্ঞাত রাউই রয়েছে।

চতুর্থ দলিলঃ সাহাবী আবু হুরায়রাহ রা. হতে বর্ণিত, লোকেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে! অথচ নবী (সঃ) যখন ولا الضالين তখন এতটা জোরে আমীন বলতেন যে, প্রথম কাতারের সমস্ত লোক তা শুনতে পেতেন এবং মসজিদ বেজে উঠত (ইবনে মাযাহ ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ);

খণ্ডন: এই হাদীসের বর্ণনায় বিশর ইবনে রাফে রাউই রয়েছে। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সে হাদীস জাল করতো। মুহাদ্দিসদের ঐকমত্যে সে দুর্বল।

পঞ্চম দলিলঃ নারী সাহাবী উম্মে হোসাইন রা. তিনি বলেন- রাসুল স. আমীন বললেন। আমি পিছনের মেয়েদের কাতার হতে তা শুনতে পেলাম (মাসমাউজ যাওয়াদের ১৮৭ পৃঃ;তুহ্‌ফাতুল আহওয়াযী ১ম খণ্ড ২০ পৃঃ;তালীকুল মুমাজ্জাদ ১০৫); খণ্ডন:এই বর্ণনায় ইসমাইল ইবনে মুসলি আল- মক্কী নামে একজন দুর্বল রাউই রয়েছে।

এই বর্ণনাটি উম্মে হোসাইন থেকে ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেছে। ইবনে উম্মে হোসাইন মাজহুল বা অজ্ঞাত। এই বর্ণনায় আরেকটা সমস্যা হলো, ইসমাইল ইবনে মুসলিম হাদীসটি আবু ইসহাক সাবেয়ী থেকে বর্ণনা করেছে। আবু ইসাহাক সাবেয়ী শেষ জীবনে ভ্রমগ্রস্ত হন।

এই বর্ণনার আরেকটি ত্রুটি হলো, আবু ইসহাক সাবেয়ী মুদাল্লিস ছিলো। এখানে সে ইবনে উম্মে হোসাইন থেকে আন সূত্রে বর্ণনা করেছে।

ষষ্ঠ দলিল: হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল স. বলেন, ইহুদীরা আমীন ও সালামের উপর যে পরিমাণ হিংসা করে অন্য কিছুর উপর এতোটা হিংসা করে না। (ইবনে মাজা, মুসানদে আহমাদ)

খণ্ডন: প্রথমত এই হাদীসের সাতে নামাজে আমীন আস্তে বা জোরে বলার কোন সম্পর্ক নেই। বরং এই হাদীস থেকে নামাযে আমীন আস্তে বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ নামাযে সালাম আস্তে বলা হয়, ঠিক তেমনি আমীনও আস্তে বলা হবে। কানযুল উম্মালে এই হাদীসটির আরেকটি অংশ হলো, ইহুদীরা রব্বানা লাকাল হামদ এর উপরও হিংসা করে। নামাযে কেউ রব্বানা লাকাল হামদ জোরে বলে না।

২. এই হাদীসের সবগুলো সনদই দুর্বল। ইবনে মাজার বর্ণনায় সুহাইল ইবনে আবি সালেহ নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। শেষ জীবনে তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। সুহাইল ইবনে আবি সালেহ এর শাগরেদ হাম্মাদ ইবনে আবি সালামা এরও শেষ জীবনে স্মৃতিতে ত্রুটি দেখা যায়।

৩. মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আলী ইবনে আসেম নামে একজন নিতান্ত দূর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে।

সপ্তম দলিল: আবু দাউদের ৯৩২ নং হাদীসটিতে রয়েছে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত ولا الضالين পাঠ করার পর জোরে আমীন বলতেন।

এই হাদীসের উপর একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। পাঠকের সমীপে নিবেদন ধৈর্য সহকারে পুরো আলোচনা পড়ুন।

এই জোরে আমীন" বলার কথাটি শায ও বিচ্ছিন্ন বর্ণনা। এই হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য কিতাবে জোরে আমীন বলার কথা নেই। সেখানে আমীন মাদসহ পড়ার কথা আছে।

অর্থাৎ আমীন টেনে মাদসহ পড়েছেন। এই হাদীসটিতে স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে রাসূল স. নামাযে মাদসহ আমীন বলেছেন না কি নামাযের বাইরে। সুতরাং এই হাদীসের শায ও বিচ্ছিন্ন বর্ণনা দ্বারা আমীন জোরে বলার প্রমাণ দেয়া কখনও সমীচিন নয়।

এই হাদীসটি শায বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রমাণ:

এই হাদীসটি ইমাম সুফিয়ান সাউরী থেকে তার দশজন ছাত্র বর্ণনা করেছে। এর মাঝে ৮জন বর্ণনা করেছে যে, রাসূল স. আমীন টেনে মাদসহ পড়েছেন আর দুইজন বলেছে রাসূল স. জোরে আমীন বলেছেন। তাদের এই দুইজনের বক্তব্য শায ও দুর্বল।

সুফিয়ান সাউরী রহ. এর ৮জন ছাত্রের বর্ণনা:

১. ইমাম ওকী তার উস্তাদ ইমাম সুফিয়ান সাউরী থেকে মাদসহ টেনে পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খ. ২, পৃ. ৪২৫। দারে কুতনী, খ. ১, পৃ. ১২৭। মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৩১৬।

২. ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আল- মুহারেবী সুফিয়ান সাউরী থেকে মাদসহ পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। দেখুন, দারে কুতনী, খ. ১, পৃ. ১২৭।

৩. ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী সুফিয়ান সাউরী থেকে مد بها صوته (মাদসহ টেনে পড়েছেন) বর্ণনা করেছেন। তিরমিযি, খ. ১, পৃ. ৫৭, দারে কুতনী, খ. ১, পৃ. ১২৭।

৪. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল- কাত্তান সাউরী থেকে مد بها صوته(মাদসহ টেনে পড়েছেন) বর্ণনা করেছেন। তিরমিযি, খ. ১, পৃ. ৫৭।

৫. ইমাম উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দির রহমান আল- আশজায়ী সুফিয়া সাউরী থেকে يمد بها صوته (মাদসহ টেনে পড়েছেন) বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকী, খ. ২, পৃ. ৫৭।

৬. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল- ফারইয়াবী মাদসহ পড়ার বর্ণনা করেছেন।

৭. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ সুফিয়ান সাউরী থেকে মাদসহ পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। (জুযউল কিরায়া, পৃ. ২৬)

৮. সুফিয়ান সাউরী রহ. এর অষ্টম শাগরিদ হলো ইমাম কবীসা। তিনিও মাদসহ পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। জুযউল কিরাআত, পৃ. ২৬।

সুফিয়ান সাউরী রহ. এর নবম ছাত্র খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া। সে এই হাদীস বর্ননা করেছে এভাবে, قال أمين رفع بها صوته في الصلوة অর্থাৎ তিনি আমীন বলেছেন এবং নামাযে জোরে আমীন বলেছেন।

খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারী। তার বর্ণিত এই বর্ণনাটি মূলত: জাল। এই শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি।

এই সনদের আবু আব্দুর রহমান সুলামী নামে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ তার শক্ত সমালোচনা করেছেন। আবু আব্দুর রহামন সুলামী সূফীদের পক্ষে জাল হাদীস তৈরি করতো। এছাড়াও এই হাদীসের বর্ণনাকারী খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়ার এর ছাত্র মুয়াজ ইবনে নাজদাও বিতর্কিত।

সুফিয়ান সাউরী রহ. এর দশম ছাত্র হলো মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর। আবু দাউদের হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে কাসীরের সূত্রে বর্ণিত। মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর একজন বিতর্কিত রাউই। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন, لا تكتبوا عنه، لم يكن بالثقة অর্থাৎ তার কাছ থেকে হাদীস লিখবে না। কেননা সে বিশ্বস্ত নয়।

(মিজানুল ই'তেদাল, খ. ৩, পৃ. ১৬৬)।

সুতরাং সার কথা হলো, সুফিয়ান সাউরী থেকে হাদীসটি দশজন রাউই বর্ণনা করেছে। এর মাঝে আটজন টেনে পড়ার শব্দে বর্ণনা করেছে। কিন্তু দু'জন জোরে আমীন বলার কথা বলেছে। এই দু'জনের মাঝে একজনের বর্ণনা জাল। অপর বর্ণনাকারী বিতর্কিত। সুতরাং এতোজন মুহাদ্দিসের বিপরীতে মুহাম্মাদ ইবনে কাসীরের বর্ণনা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে ন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো:

ইমাম সুফিয়ান সাওরী নিজে এই হাদীসের বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে আস্তে আমীন বলতেন।

সুতরাং এধরনের শায বর্ণনাকে যারা সহীহ বলে চালিয়ে দেয় তারা আর যাই হোক কখনও প্রকৃত আহলে হাদীস হতে পারে না।

অথচ আমীন অনুচ্চস্বরে বলার পক্ষে বহু সহীহ, হাসান, হাসান লিগাইরিহী, সহীহ লিগাইরিহী হাদীস আছে, তেমনি যুগ যুগ ধরে যেমন সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীন, আইম্মায়েমুজতাহিদীন, মুহাদ্দিস, মুফতী ওলামায়ে কেরাম সবার আমল এ প্রমাণকে আরো বহুগুণ শক্তিশালী করেছে। তার পরেও আহলে হাদীসরা শুধু মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে, নামাযের মত ইসলামের মুখ্য ইবাদতকে বিতর্কিত বানানোর মানসে বিকট আওয়াজে উচ্চস্বরে আমীন বলার প্রথা জারি করতে চায়। আমি নিচে কটি হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের আমলের বর্ণনা উল্লেখ করছি।

ইমাম, মুক্তাদী এবং একাকী নামায আদায়কারী সকলে 'আমীন' অনুচ্চস্বরে বলবে

১। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন:আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে নামায আদায় করেছি, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ولا الضالين বললেন, তখন অনুচ্চস্বরে আমীন বললেন।

(মুস্তাদরাকে হাকেম ২/২৩২ হা. ২৯১৩, দারা কুতনী ১/২৬৩ হা. ১২৫৬)

২। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন "আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায পড়ান। অতঃপর যখন " ولا الضالين তেলাওয়াত করেন তখন তিনি অনুচ্চস্বরে আমীন বললেন।

(মুসনাদে আহমদ ৪/৩১৬ হা. ১৮৮৫৪)

৩। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পেছনে নামায আদায় করেছি। তিনি সূরায়ে ফাতেহার পর উচ্চস্বরে আমীন বলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এরূপ করেছেন। (কিতাবুল কুনা লি আবী বিশর দূলাবী) ১/৪৪১ হা. ১৫৫৮)

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বাভাবিক আমল ছিল আমীন অনুচ্চস্বরে বলা। তবে কখনো মুক্তাদিদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য উচ্চস্বরে বলেছেন। তাও চিৎকার করে নয়।

৪। হযরত হাসান সূত্রে বর্ণিত হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব ও হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. পরস্পর আলোচনা হলো। হযরত সামুরা রা. হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি স্মরণ রেখেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি স্থানে সিক্তাহ করতেন অর্থাৎ চুপ থাকতেন। একটি তাকবীরে তাহরীমা বলার পর দ্বিতীয়টি হলো, ولا الضالين তেলাওয়াত করার পর। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এটির স্বীকৃতি দিলেন না। তখন উভয়ে এই মাসআলা জানার জন্য উবাই ইবনে কা'আবের প্রতি পত্র লিখলেন। হযরত উবাই ইবনে কা'আব রা. উত্তরে লেখলেন, সামুরা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বিষয়টি ঠিকভাবেই স্মরণ রেখেছেন। (সুনানে আবু দাউদ ১/১১৩ হা. ৭৭৫, সুনানে তিরমিযী ১/৫৯ হা. ২৫১)

(উল্লেখ্য যে, তাকবীরে তাহরীমার পর সানা পড়া হয় এবং ফাতিহার পর আমীন বলা হয়। এগুলো যেহেতু অনুচ্চস্বরেই পড়া হত সে কারণে এদুটি সময়কে সিক্তা বা চুপ থাকার সময় বলা হয়েছে।)

৫। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত উমর রা. ও হযরত আলী র. বিসমিল্লাহ, আউজু বিল্লাহ এবং আমীন উচ্চস্বরে বলতেন না। (শরহে মা'আনিল আছার ১/১৫০)

৬। হযরত ইবরাহীম নখয়ী রহ. বলেন "পাঁচটি জিনিস অনুচ্চস্বরে বলা হয়- সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন এবং আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ।" (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/৮৭ হা. ২৫৯৭)

আমীনের বাস্তবতা কী?

'আমীন' দু'আর অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী) আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন قد اجيبت دعوتكما মাওলানা ছানাউল্লাহ রহ. এই আয়াতের অর্থ করেন এভাবে। "হযরত মুসা আ. দু'আ করতেন এবং হারুন আ. 'আমীন' বলতেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের উভয় ভাইয়ের দু'আ কবুল হয়েছে।" (সূরা ইউনুস আয়াত ৮৯, তাফসীর সানায়ী ৪/৮১)

দু'আ করবে অনুচ্চস্বরে :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

ادعوا ربكم تضرعا وخفيا নিজ প্রভুর কাছে বিনয় ভাবে অনুচ্চস্বরে দু'আ করো। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরায়ে আ'রাফ ৫৫)

সুতরাং 'আমীন' অনুচ্চস্বরে বলাই সর্বোত্তম এবং এটি নবী করীম (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামেরও আমল।

প্রত্যেক মুসলমানদের উচিত এসব জেনে শুনে বিভিন্ন মানুষের চিত্তাকর্ষক কথায় পাগল না হওয়া। শোনামাত্র কারো কথায় পাগল হওয়া কোনো বিবেকবান মুসলমানের কাজ নয়।

কাদিয়ানী কি আহলে হাদীস?

উপমহাদেশের অধিকাংশ গায়রে মুকাল্লিদ তথা কথিত আহলে হাদীসরা একথা প্রচার করে থাকে যে, মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হানাফী ছিল। কাদিয়ানী হানাফী হওয়ার কারণে মুজাদ্দিদ, মসীহ, মাহদী এবং অবশেষে নবুয়তের দাবি

করে থাকে। একথাও বলা হয় যে, কাদিয়ানী তার অনুসারীদের হানাফীদের অনুসরনের কথা বলে গেছে।

হানাফী ফিক্বহ এবং হানাফীদের অনুসরণের ব্যাপারে মীর্যা কাদিয়ানীর উদ্দেশ্য কী? এটি কাদিয়ানীর নিজের বক্তব্যের আলোকে দেখুন-

প্রতিশ্রুত মসীহ কি হানাফী মাযহাবের হবে?

এরপর মৌলবী বাহাউদ্দীন সাহেব আহমদাবাদী [মির্যা কাদিয়ানীকে] জিজ্ঞেস করল যে, মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানীতে প্রতিশ্রুত মাসীহের নিসবত লেখা হয়েছে যে, তারা হানাফী মাযহাবী হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

তখন মির্যা কাদিয়ানী বলল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যেমন ইমামে আজম কুরআনে কারীম থেকেই দলীল পেশ করে থাকেন, ঠিক তেমনি প্রতিশ্রুত মসীহও কুরআনের ইলম ও হাকীকতকে নিয়ে আসবেন।

কাদিয়ানী তার মাকতুবাতের অন্য স্থানে আরো স্পষ্ট ভাষায় এ কথার হাকীকত প্রকাশ করে লিখেছে, প্রতিশ্রুত মসীহকে কুরআনের হাকীকতের ইলম দেয়া হবে। [মালফুযাতে কাদিয়ানী- ২/৩২৯]

আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ্য করুন, মির্যা কাদিয়ানী এবং তাকে মান্যকারীদের হানাফী মাযহাব বা ফিক্বহে হানাফী ফিক্বহের উপর আমল করার দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

তাদের বক্তব্য অনুপাতে হানাফী মাযহাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যেমনভাবে ইমাম আজম আবূ হানীফা রহ. কুরআনে কারীম দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন, এমনিভাবে মির্যা কাদিয়ানী এবং কাদিয়ানীরাও করে থাকে। ফিক্বহে হানাফীর উপর আমল করে না। বরং তাদের ব্যাখ্যা অনুপাতে ফিক্বহে হানাফীর মূলনীতির মত আমল করে থাকে।

যেসব বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজে মির্যা কাদিয়ানীকে ফিক্বহে হানাফীর একটি ফিরক্বা বলে মনে হয়, তারা কবে হানাফী ফিক্বহের মত কুরআনের উপর আমলকারী হবে?

যেসব অপপ্রচারকারীরা মির্যা কাদিয়ানীকে হানাফী ফিক্বহের অনুসারী বলে প্রচার করে থাকে, তারা একটু চোখ খুলে দেখুন, মির্যা কাদিয়ানী কি কি শব্দে ফিক্বহে হানাফীর বিরোধীতা করেছে-

হানাফী ফিরক্বা

মির্যা কাদিয়ানী লিখেছে হানাফীদের দূর্ভাগ্যের কারণে তাদের মাঝে পরিত্যাজ্য বক্তব্য আর বিদআত স্থান নিয়েছে। হযরত ইমাম আজম আবূ হানীফা রহ.- তো

শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের মুত্তাকী- পরহেযগার ছিলেন। কিন্তু তার অনুসারীদের মাঝে যখন রূহানিয়্যাত বাকি রইল না, তখন তারা আরো বিদআতকে ফিক্বহে হানাফীতে প্রবিষ্ট করিয়ে ফেলে। সেই সাথে এমন ব্যক্তিদের তাকলীদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘণ করে, যাদের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি কুরআন স্বীকার করে না। রাসূল সা.- এর বক্তব্যের উপরও তাদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে বসে। আর নিজেদের মাকসাদ আর উদ্দেশ্যকে ঠিক রেখে ইমাম সাহেবের বক্তব্যকে যেভাবে ইচ্ছে ব্যাখ্যা করে চলে। [মালফুযাতে মির্যা কাদিয়ানী- ২/৩৫৬]

প্রিয় পাঠকগণ! উপরোক্ত বক্তব্যগুলো কারা দেয়? হানাফীরা? না আহলে হাদীসরা? আপনাদের বিবেকের কাছেই এর জবাবের ভার ন্যাস্ত করা হল।

শুধু তাই নয়, আহলে হাদীসদের মতবাদের সাথে আরো কত নিবিড় একাত্মতা মির্যা কাদিয়ানী প্রকাশ করেছে, তা ভাল করে দেখুন-

হানাফী শাফেয়ী মালেকী নাম সবই বিদআত?!

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী লিখেছে লোকেরা নিজেদের নাম হানাফী শাফেয়ী ইত্যাদি রেখেছে, এ সবই বিদআত। রাসূল সা. এর নাম দুটিই ছিল। একটি হল মুহাম্মদ আরেকটি হল আহমদ সা.। রাসূল সা. এর ইসমে আজম হল মুহাম্মদ সা.। যেমন আল্লাহ তাআলার ইসমে আজম হল আল্লাহ।

আল্লাহ নামটি বাকি সমস্ত নাম তথা হাইয়্যুন, কাইয়্যুম, রহমান, রহীম ইত্যাদির মাউসূফ। রাসূল সা. এর নাম আহমদ। এভাবেই ইসলামী দলগুলো ভুল করেছে। কেউ নিজেদের নাম হানাফী বলছে, কেউ নিজেদের মালেকী বলছে, কেউ নিজেদের শিয়া, কেউবা সুন্নী বলছে। অথচ রাসূল সাঃ এর নাম ছিল দুইটি। মুহাম্মদ ও আহমদ সা.।

সুতরাং মুসলমানদের দুটি দলই হতে পারে। মুহাম্মদী বা আহমদী। মুহাম্মদী সে সময় যখন তার মাঝে জালাল তথা তেজস্বীতার প্রভাব প্রবল হবে, আর আহমদী তখন যখন জামাল তথা সৌন্দর্যতা প্রবলতা পাবে। [মালফুযাতে মির্যা কাদিয়ানী- ২/২০৮- ২০৯]

সম্মানিত পাঠকগণ! আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিন। মির্যা কাদিয়ানী হানাফী না আহলে হাদীস? যে ব্যক্তি হানাফী শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী বলাকে বিদআত বলে থাকে, মুসলমানদের মুহাম্মদী বা আহমদী বলাতে দাওয়াত দেয়, উক্ত ব্যক্তির নাম হানাফী না আহলে হাদীস?

শুধু কি তাই? আহলে হাদীসদের থিউরী অনুসরণ করে মির্যা কাদিয়ানী একথা বলছে যে, হানাফী মাযহাব বিদআতী মাযহাব হয়ে গেছে! আসল মাযহাব থেকে

বিকৃত হয়ে গেছে! আর ইমাম আবূ হানীফা রহঃ কে হানাফীরা নাকি নবুওয়তের মর্যাদায় বসিয়ে দিয়েছে নাউজুবিল্লাহ!

হানাফীদের উপর এমন জঘন্য মিথ্যাচার হানাফীরা করে না আহলে হাদীসরা করে? তাহলে মির্যা কাদিয়ানী হানাফী থাকে না আহলে হাদীসদের মতবাদ প্রচারক হয়?

তাযকিরাতুল মাহদী

কাদিয়ানী ধর্মে দিক্ষিত কথিত আলেম সীরাজুল হক নুমানী জামালী আহমদীর লেখা হাদীয়াতুল মাহদীতে সীরাজুল হক সাহেব নিজের ঘটনা এভাবে লিখেন যে, একদিন হযরতকে আরজ করলাম যে, হুজুর! ওহাবী গায়রে মুকাল্লিদ একটি নাপাক ফিরক্বা তাই না? সে সময় আমি খুবই কট্টর হানাফী

ছিলাম। যাইহোক, আমি যখন বললাম, হযরত আপনি তাদের ব্যাপারে কী বলেন? তখন আমার কথা শুনে তিনি হাসি দিয়ে চুপ হয়ে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়দিন আমি আবার যখন উক্ত বিষয়ে জানতে চাইলাম, তখন তিনি জবাবে বললেন দেখ এই ফিরক্বাটিও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়েছে। এরা খারাপ না। যখন লোকেরা তাকলীদ এবং হানাফিয়্যাত এর উপর এত বেশি জোর দিতে লাগল যে, চার ইমামকে নবুওয়তের স্থানে অধিষ্ঠিত করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় উপকারার্থে এ ফিরক্বাটিকে সৃষ্টি করলেন। যাতে করে মুকাল্লিদরা সঠিক পথ ও মধ্যপন্থায় থাকে। তবে এতটুকু বিষয় তাদের মাঝে খারাপ যে, তাদের প্রত্যেকেই মুজতাহিদ ও ইমাম সেজে বসে আছে। সেই সাথে চার ইমামকে খারাপ বলতে শুরু করেছে।

আমি বললাম, এ ফিরক্বার প্রতিষ্ঠাতা ও পথপ্রদর্শক মৌলবী নজীর হুসাইন সাহেবের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? তিনি বললেন, আমাদের মাওলানা নজীর আহমাদ সাহেবের উপর সুনধারণা আছে। তিনি আল্লাহর ওলী। আমি বললাম, হুজুর! আমিতো মৌলবী নজীর হুসাইন সাহেবের ব্যাপারে অনেক খারাপ মন্তব্য করেছি। তিনি বললেন, মাফ চাওয়া উচিত। লোকটি খারাপ না। মানুষ যেমন মনে করে তিনি এমন নন।

তারপর যখন হযরতে আকদাসের খেদমত থেকে বিদায় নিলাম, তখন দিল্লি গিয়ে মৌলবী নজীর হুসাইন সাহেবের বাড়িতে গেলাম। আওয়াজ দিলাম। মৌলবী সাহেব বাড়ি থেকে এক বাচ্চাকে পাঠালেন কে এসেছে জিজ্ঞাসা করতে। আমি বললাম, আমি একজন মুসাফির। আপনি একটু বাইরে আসুন কিছু কাজ আছে।

তখন মৌলবী নজীর সাহেব বাইরে এলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। বললেন, কি কাজ? আমি বললাম, আরামে বসে বলি, মোড়া চেয়ার কিছু আনতে বলুন। মৌলবী সাহেব মোড়া আনালেন। আমরা উভয়ে বসে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি থাকেন কোথায়? আমি বললাম, আমি থাকিতো সাহারানপুর। কিন্তু এখন এসেছি কাদিয়ান থেকে। তখনি তিনি বললেন, হযরত মীর্যা গোলাম আহমাদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তার কাছ থেকেইতো আসছি। একথা শুনে তিনি [গায়রে মুকাল্লিদ মিয়া নজীর আহমাদ সাহেব] বললেন খুবই ভাল হয়েছে যে, আপনি সেখানে গিয়েছেন এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি পূর্বে অতিক্রান্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ লোকদের একজন আমি কাদিয়ানের সমস্ত আলোচনা তার কাছে বর্ণনা করলাম। আর বললাম, হযরতের [মির্যা কাদিয়ানীর] ইরশাদ অনুপাতে আপনার কাছে এলাম। আপনার ব্যাপারে আমি যে বেআদবীসূচক বাক্য বলেছি সেসবের ব্যাপারে ক্ষমা চাইতে। মৌলবী সাহেব তখন বললেন আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে মাফ করে দিলাম। আপনি যখনি কাদিয়ানে যাবেন, তখন হযরত মীর্যা সাহেবকে আমার সালাম জানিয়েন। তারপর আমি চলে এলাম। [তাযকীরাতুল মাহদী- ১/২১৩- ২১৫]

এই হল মীর্যা কাদিয়ানী ও আহলে হাদীসদের মাঝে মাখামাখির একটি খোল্লামখুল্লা চিত্র। একজন অপরজনকে মুকাদ্দাস বান্দা গণ্য করছে, অপরজন ওলীআল্লাহ হওয়ার সনদ দিচ্ছে।

এর চেয়ে বড় আর কী সনদ দিতে পারে কাদিয়ানী আর আহলে হাদীসরা পরস্পরে? যদি এর চেয়ে বড় কোন সনদ দিতে পারতো, তাহলে হয়তো তাও দিয়ে দিত। মির্যা কাদিয়ানীর উম্মত তাযকীরাতুল মাহদীর লেখক উক্ত ঘটনা লেখার সময় শুরুতেই বলে দিয়েছে যে, সে প্রথমে কট্টর হানাফী ছিল।

তাহলে কি বুঝা গেল? মির্যা কাদিয়ানীর কাছে আসার পর আহলে হাদীস কাদিয়ানী হয়েছে এইতো?

বাহ! চমৎকার মিল, আহলে হাদীস কাদিয়ানী!

মির্যা কাদিয়ানীর বিবাহ হানাফী আলেম পড়িয়েছে না আহলে হাদীস?

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিবাহ ১৭ই নভেম্বর ১৮৮৪ ঈসাব্দে আহলে হাদীস মৌলবী নজীর হুসাইন দেহলবী সাহেব পড়িয়েছেন। [তারীখে আহমাদিয়্যাত- ২৪]

যদি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হানাফী হতো, তাহলে তার বিবাহ হানাফী আলেম রেখে আহলে হাদীস আলেম কেন পড়িয়েছে?

আহলে হাদীসদের প্রশংসা কাদিয়ানীদের কবিতায় ইংরেজদের আমলে আহলে হাদীসদের প্রথম প্রথম ওহাবী বলা হতো। তখন গায়রে মুকাল্লিদদের বড় আলেম মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী ইংরেজদের কাছে দরখাস্ত করে নিজেদের নাম ওহাবীর বদলে আহলে হাদীস নামে রেজিষ্ট্রেশন করায়। আহলে হাদীস ওহাবীদের ব্যাপারে কাদিয়ানীরা কি বলে দেখুন-

بدعتیوں کا زور تھا مکہ میں آخر نجد سے

یادگار دورہ عبد الوہاب آہی گیا

মক্কায় বেদআতিদের শক্তি ছিল প্রবল অবশেষে, স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আব্দুল ওয়াহহাব এসেই গেলেন। একথা নির্দ্বিদ্ধায় স্বীকার করেছেন, আহলে হাদীস আলেম মাওলানা সানাউল্লাহ উমরতাসরী স্বীয় কিতাব তাহরীকে ওয়াবিয়্যাত পর এক নজর এর ১৬ নং পৃষ্ঠায়।

১ লুধিয়ানার উলামায়ে কেরাম ১৮৮৪ ঈসাব্দে মির্যা কাদিয়ানীর লিখিত বারাহীনে আহমদিয়া নামক বইয়ের ভিত্তিতে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে কাফের ঘোষণা দেন। [ফাতাওয়ায়ে কাদিরিয়া, লেখক মাওলানা মুহাম্মদ লুধিয়ানবী, পৃষ্ঠা নং- ৩]

কিন্তু আহলে হাদীস আলেম মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী সাহেব তার পুস্তিকা আশাআতুস সুন্নাহ এ মির্যা কাদিয়ানীর এ অভিশপ্ত বারাহীনে আহমদিয়াকে নজীরবিহীন গ্রন্থ বলে প্রশংসা করে। আজো আহলে হাদীসদের মুহাক্কিক আলেম মৌলবী ইয়াহইয়া গুন্ধলুয়ী সাহেব বলেন, বারাহীনে আহমদিয়া এমন কোন কিতাব নয়, যার উপর ভিত্তি করে মির্যা কাদিয়ানীকে কাফির ফাতওয়া দেয়া যায়। [মাতরাকাতুল হাদীস- ৩৯]

২ আহলে হাদীস আলেম সানাউল্লাহ উমরতাসরীতো আদালতে পর্যন্ত সাক্ষ্যি দিয়ে বলেছে যে, মির্যায়ী কাদিয়ানীরা মুসলমান। আর আমি মির্যাকে কাফের বলি না। [ফায়সালায়ে মক্কা- ৩৬]

সানাউল্লাহ উমরতাসরী আরো বলেন, মির্যায়ীদের পিছনে নামায শুদ্ধ হবে। [আখবারে আহলে হাদীস উমরতাসর- ১৯১৫ ঈসাব্দ সংখ্যা]

৩ আহলে হাদীস আলেম মৌলবী ইয়াহইয়া গান্ধলুয়ী, মৌলবী নজীর হুসাইন দেহলবীর শাগরেদ শামসুল হক ঢালয়ানুবী এবং আহলে হাদীসদের আকাবীরে উলামা মির্যায়ীদের কাফের বলতো না, শুধুমাত্র গোমরাহ বলে মন্তব্য করতো। [মাতরাকাতুল হাদীদ- ৮, ফায়সালায়ে মক্কা- ৭]

৪ শায়েখ খুরশীদ আহমদ আহমদী কাদিয়ানী সাহেব তার প্রণীত গ্রন্থ বাচ্চুকে লিয়ে জামাআতে আহমদিয়া কি মুখতাসার তারীখ এর ১৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেনঃ ১৮৬৮ বা ১৮৬৯ এর কথা। এক ব্যক্তি হুজুরকে [মির্যা কাদিয়ানীকে] মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী [আহলে হাদীস] সাহেবের সাথে

বাহাস করার জন্য নিয়ে গেল। মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী মুসলমানদের ঐ ফিরক্বার সাথে সম্পর্ক রাখতো যাদের আহলে হাদীস বলা হয়। তিনি যেন তাদের ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণিত করেন, এ কারণে তাকে [মির্যা কাদিয়ানীকে] নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তিনি মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী সাহেবের কাছে তাদের আক্বিদার কথা জিজ্ঞাসা করেন, আর তার আক্বিদাকে ইসলামের মুতাবিক পেলেন, তখন তিনি বাহাস ও মুকাবিলা করার পরিবর্তে ভরপুর মজলিসে ঘোষণা করলেন যে, এই আকিদা ঠিক আছে। আমি এ নিয়ে বাহাস করতে রাজি নই।

যে লোকেরা তাকে বাহাসের জন্য নিয়ে গিয়েছিল, তারা খুবই অসন্তুষ্ট হয়। বলতে থাকে, আপনি আমাদের অপমান করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন আমি যা কিছুই করেছি, তা আল্লাহ তাআলার খাতিরেই করেছি। আমার মানুষের বিরোধীতা করা বা তাদের প্রশংসা করার কোন পরওয়া নেই।

এ ঘটনায় আল্লাহ তাআলা খুশি হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করতে আল্লাহ তাআলা তার উপর ইলহাম নাজিল করে বলেন, খোদা তোমার এ কর্মে খুশি, আর আল্লাহ তোমাকে অনেক বরকত দিবেন, এমনকি বাদশাহরা তোমার কাপড় থেকে বরকত তালাশ করবে। [বারাহীনে আহমদিয়া- ৪/৫২০]

৫ গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ছেলে মির্যা বশীর আহমদ লিখেন, আমি যখন এ ঘটনাটি পড়ি, যখন একবার ঈসা মসীহ দাবি করার পূর্বে লোকেরা হযরত প্রতিশ্রুত মসীহকে [মির্যা কাদিয়ানীকে] মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীর মুকাবিলায় কতিপয় হানাফী ও ওহাবী মাসায়েলের উপর বাহাস করার জন্য আহবান করে। তখন একটি বড় মজলিসে লোকেরা উক্ত বাহাস শুনার জন্য একত্র হয়। সেসময় মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী সাহেব এক বক্তৃতা দিয়ে লোকদের মাঝে একটি জোশ তৈরী করে ফেলেন।

তখন লোকেরা হযরতের [গোলাম আহমদ কাদিয়ানী] কাছ থেকে জবাব শুনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ ছিল। কিন্তু হযরত সাহেব সামনে থেকে শুধু এতটুকু বলেন যে, এখনের বক্তৃতায় যা কিছু মৌলবী সাহেব বলেছেন, তাতে আমার এমন কোন কথা দৃষ্টিগোচর হয়নি যা আপত্তিকর। এ কারণে আমি তার জবাবে কিছুই বলবো না। কেননা, আমার উদ্দেশ্য খামাখা বাহাস করা নয়। বরং হককে তাহকীক করা।

সেসময় হযরতের জবাব শুনে লোকদের মাঝে যে হতাশা ও ক্ষোভ জন্ম নেয় তা পরিস্কার। কিন্তু হযরত হকের মুকাবিলায় স্বীয় প্রসিদ্ধি, সুনাম ও সুখ্যাতির পরোয়া করেননি। বরং ভয় পেয়েছে! লাঞ্ছিত হয়েছে ইত্যাদি গালি শুনে ওখান থেকে উঠে আসেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এ বান্দার এ পরাজয় যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয়েছি সেটির খাতিরে সমস্ত বিজয়ের চেয়েও বেশি প্রিয় হয়েছে। এ ঘটনার পর এক রাতও অতিক্রান্ত হয়নি, আল্লাহ তাআলা তার এ বান্দার কাছে ইলহাম পাঠালেন এই মর্মে যে, খোদার কাছে তোমার এ কর্ম খুবই পছন্দ হয়েছে। আর তিনি তোমাকে অনেক ইজ্জত ও বরকত দিবেন। এমনকি বাদশাহরা তোমার কাপড় থেকে বরকত তালাশ করবে। [সীরাতুল মাহদী২/৯১- ৯২]

বাহ! কি চমৎকার মোহাব্বত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আহলে হাদীসী মতবাদের প্রতি। তার পরও বেশরম আহলে হাদীস নামধারীরা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নাকি হানাফী একথা প্রচার করে বেড়ায়। অথচ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী পুরোই আহলে হাদীস ছিল একথা গোপন করাকে বড় দ্বীনের কাজ মনে করে থাকে। স্বাধীনচেতা আহলে হাদীসী মানসিকতার কারণেই যে, এ অভিশপ্ত মির্যা গোলাম কাদিয়ানী একবার ঈসা মসীহ আবার নবী হবার মত মারাত্মক দাবি করেছে তাও সাধারণ জনগণ থেকে লুকিয়ে বেড়ায়।

মির্যা কাদিয়ানীর দ্বিতীয় বিবাহ ও আহলে হাদীসদের মোহাব্বতের প্রকাশ

মির্যা কাদিয়ানীর উপর যখন দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য ইলহাম হয়, তখন সে তার প্রিয় আহলে হাদীস দোস্ত মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীর সাথে যোগাযোগ করে। কারণ তখন মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী বিয়ের ঘটকালি করতেন খুব। তার কাছে আহলে হাদীস ঘরের মেয়েদের এক লিষ্ট ছিল।

মির্যা কাদিয়ানী যখন বিয়ের কথা বলল মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীকে। তখন বাটালবী সাহেবের আহলে হাদীস দোস্ত মীর সাহেবের মেয়ের কথা মনে হয়। তখন মীর সাহেবের মেয়ের বয়স ছিল আঠার বছর।

প্রথম প্রথম মীর সাহেব মির্যা কাদিয়ানীর বয়স বেশি হওয়ায় বিয়েতে অমত পোষণ করেন। কিন্তু বাটালবী সাহেব মির্যা কাদিয়ানীর উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিল। এ কারণে মীর সাহেবকে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন। সেই সাথে মির্যা কাদিয়ানীর প্রশংসায় প্রশংসায় মীর সাহেবকে প্রলুভিত করে ফেলেন। অবশেষে মীর সাহেব বিয়েতে রাজি হয়ে যান।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ছেলে বশীর আহমদ লিখেনঃ আমার বিয়ে করার আগেই আমার সম্মানিত পিতা জানতে পারেন যে, তার দ্বিতীয় বিয়ে দিল্লিতে হবে।

এ কারণে তিনি মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী সাহেবের কাছে একথা ব্যক্ত করেন। তখন যেহেতু তার কাছে সমস্ত আহলে হাদীস মেয়েদের লিষ্ট থাকতো, আর মীর সাহেবও আহলে হাদীস ছিলেন এবং তার সাথে অনেক মিল-মোহাব্বতও ছিল।

এ কারণে হযরতের [মির্যা কাদিয়ানী] কাছে মীর সাহেবের নাম উপস্থাপন করেন। তথন তিনি তার কাছে প্রস্তাব জানিয়ে লিখেন। শুরুতে মীর সাহেব এ প্রস্তাবকে বয়সের পার্থক্য বেশি হওয়ায় ফিরিয়ে দেন।

কিন্তু অবশেষে রাজি হয়ে যান। তারপর হযরত আমাকে নিয়ে দিল্লি গিলেন। তখন হযরতের সাথে শায়েখ হামেদ আলী ও অন্যরাও ছিল। বিবাহ পড়িয়েছিল [আহলে হাদীস] মৌলবী নজীর হুসাইন সাহেব।

এটি ২৭শে মুহাররম ১৩০২ হিজরীর সোমবারের কথা। সেসময় আমার বয়স আঠার বছর ছিল। হযরত সাহেব [মির্যা কাদিয়ানী] বিয়ের পর মৌলবী নজীর হুসাইন সাহেবকে পাঁচ টাকা এবং একটি জায়নামায হাদিয়া দিয়েছিলেন। অধম বলছে যে, সে সময় প্রতিশ্রুত মসীহ সাহেবের বয়স ছিল ৫০ বছরের কাছাকাছি ছিল।

আব্বাজী বলতেন যে, তোমার চাচা আমার বিয়ের দেড় দুই বছর আগেই ইন্তেকাল করেছেন। আমি বলছি যে, চাচা ১৮৮৩ ঈসাব্দে ইন্তেকাল করেছেন। যেটি বারাহীন রচনার শেষ সময় ছিল। আর আব্বাজানের বিবাহ ১৮৮৪ ঈসাব্দের নভেম্বরে হয়েছে।

আমি আম্মাজান থেকে জানতে পারলাম যে, প্রথমে বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল রোববার দিন, কিন্তু হযরত বলে সোমবারে নির্ধারণ করেছেন।

[সীরাতে মাহদী- ১/৫৭- ৫৮]

সীরাতুল মাহদীর আরেকটি প্রমাণ

কাদিয়ানীর আহলে হাদীস স্ত্রী বলছেনঃ মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীর সাথে তোমার নানার অনেক গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনিই কয়েকবার তোমার আব্বার জন্য সুপারিশ করে চিঠি লিখেন।

সেই সাথে অনেক চাপাচাপি করে বলেন, মির্যা সাহেব খুবই ভাল ও অভিজাত খান্দানী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আমার মন মানছিল না। কারণ, একেতো বয়সের অনেক পার্থক্য ছিল। দ্বিতীয়ত আমরা দিল্লি অধিবাসীরা

পাঞ্জাবীদের প্রতি খুবই নাখোশ ছিলাম। অবশেষে একদিন মীর সাহেব লুধিয়ানার বাসিন্দা এক ছেলের ব্যাপারে বলল যে, তাদের পক্ষ থেকে অনেক পীড়াপীড়িমূলক আবেদন আছে। সেই সাথে তারা মানুষও অনেক ভাল। তাই এই সম্পর্ক করে নেয়া উচিত। আমি লোকটির পরিচয় জানতে চাইলাম। তখন আমার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হল না।

এ কারণে আমি অস্বিকৃতি জানিয়ে দিলাম। আমার আচরণে মীর সাহেব খুবই নারাজ হয়ে বললেন, বয়সতো আঠার বছর হয়ে গেছে, সারা জীবন কি তুমি এভাবে বসে থাকবে? আমি তখন জবাবে বললাম, আরে এই লোকদের চেয়েতো গোলাম আহমদ হাজার গুণ ভাল।

মীর সাহেব তখন চট করে একটি চিঠি বের করে আমার সামনে রাখলেন। বললেন, নাও গোলাম আহমদের চিঠিও এসেছে। যা কিছুই হোক না কেন, আমাদের চটজলদি ফায়সালা করতে হবে। আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে গোলাম আহমদকেই লিখে দাও।

সেই সময়ই তোমার নানাজান দোয়াত কলম নিয়ে লিখে দিলেন। এর ৮দিন পর তোমাদের আব্বা দিল্লি আসলেন। তার সাথে দুইজন চাকর ছিল। আর কিছু হিন্দু ও মুসলমান সাথি ছিল। [সীরাতে মাহদী- ২/১১১]

সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! এত মাখামাখি আহলে হাদীসদের সাথে আর আহলে হাদীস নামধারীরা প্রচার করছে যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নাকি হানাফী ছিল।

অল্প বয়স্ক আহলে হাদীস মেয়েকে আহলে হাদীস গুরু মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী মোহাব্বতের দোস্ত গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত ৫০বছরের বুড়োর কাছে কি স্বার্থে বিয়ে দিয়েছিলেন? শুধুই আহলে হাদীস ভাই ভাই এই কারণে নয়কি? ৫০ বছরের বুড়ো মির্যা কাদিয়ানীর বিয়ে ১৮ বছরের আহলে হাদীস পরিবারের সাথে দিয়ে মোহাব্বতের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তৎকালিন আহলে হাদীস গুরুজনেরা।

সময়ের প্রেক্ষাপটে মাযহাবের গুর"ত্ব

ভারতবর্ষে ইসলামের সূচনাযুগ থেকে নিয়ে বিগত শতাব্দির প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলমানদের আমলী জিন্দেগী ছিল বড়ই সৌহাদ্যপূর্ণ এবং প্রাণবন্ত। যেখানে ছিল

মান্যতা, ছিল শ্রদ্ধাবোধ। নেক আমল ও দ্বীনের পথে চলার জন্য একে অন্যের পরামর্শ ও সহযোগিতার অমলিন আচরণে হতো সিক্ত। মোগলদের ৮শত বছর এবং পূর্বাপর সময়গুলোতে এতদঞ্চলের ধর্মপরায়ণ সাধারণ মুসলমানরা নিজেদের জীবনকে পুরো দ্বীনের ছাঁচে গড়ার জন্য মাযহাবপন্থি সূক্ষ্মদর্শী উলামায়ে কেরামের দ্বারস্থ হতেন।

তাঁরা অক্লান্ত মেহনত- মোজাহাদা ও সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে কুরআন-সুন্নাহ- এর আলোকে জনসাধারণকে ফেকহী সমাধান দিতেন। সাধার মানুষ এসবের উপর আমল করে তাদের আমলী জিন্দেগীকে সুশোভিত করতেন। এটা এই অঞ্চলের মুসলমানদের হাজার বছরে ঐতিহ্য।

আলহামদুল্লিহ! এই ঐতিহ্য এখনও পর্যন্ত বজায় আছে এবং কেয়ামত অবধি বহাল থাকবে ইনশাআল্লাহ। কারণ, এটা শুধু মুসলমানদের প্রথাগত ঐতিহ্য নয়, বরং সাহাবায়ে কেরামের সোনালি যুগে আল্লাহ- রাসূল নির্দেশিত আর্দশের যে বিকাশ ছিল তারই অপরিবর্তিত প্রতিচ্ছবি। সে আলোচনা পরে করা যাবে।

সম্প্রতি শুরু হয়েছে মুসলমানদের এই সুন্দর ধারাবাহিক ঐতিহ্য এবং সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় আমলী জিন্দেগী বিনাশের মতো অপরিণামদর্শী পাঁয়তারা। কথিত আহলে হাদীস ছদ্মনামে গায়রে মুকাল্লিদ লা- মাযহাবীগণ মদীনা ভার্সিটি থেকে আল মাদানী হয়ে এসে এই অঞ্চলের মাযহাবপন্থি বিশেষত হানাফী মাযহাব অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের লোকদের পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া বাঁধানোর অবস্থা সৃষ্টি করছে।

কারো দ্বারস্থ হওয়া নয়, কারো মতামত বা সহযোগিতা নয় প্রত্যেককেই হতে হবে আহলে হাদীস! নিত্যদিনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিটি জিজ্ঞাসার জবাব ব্যক্তিমাত্রকেই সরাসরি হাদীস থেকে খুঁজে বের করে তবেই আমল করতে হবে। এমনই উদ্ভট এবং ভয়াল এক বিতিকিচ্ছি অবস্থার জন্ম দেয়া হচ্ছে।

সঙ্গত কারণেই হকপন্থি উলামায়ে কেরাম ইলেকট্রিক মিডিয়ার প্রতি সর্বদাই অনীহ ছিলেন। ছিদ্র- সন্ধানী আহলে হাদীসরা এই সুযোগটাকে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। যাদের ইলম এবং শিক্ষা- দীক্ষার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা যায় প্রচুর। যারা জনবিচ্ছিন্ন এবং নিতান্ত অখ্যাত সেই লোকগুলো মিডিয়ার সুযোগে মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য এবং বিভ্রান্তির তিক্ত বাষ্প ছড়াচ্ছে।

মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল আযহারীর ভাষায় মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে আসা অনেক পরিচিত বন্ধু- বান্ধবকে যাদেরকে

ইতোপূর্বে আমরা অনেক আশার দৃষ্টিতে দেখতাম লক্ষ করলাম, ঢাকায় ফিরে তাঁরা একান্তই জড়বাদী চিন্তা- চেতনার পরিচয় দিচ্ছেন।

কোথায় বাড়ি কিনবেন, কোথায় দোকান করবেন এগুলোই যেন তাদের চিন্তার কেন্দ্র। জাতীয় প্রয়োজন, ইসলামের প্রয়োজনে এখানে কী করণীয় তা নিয়ে তাদের মধ্যে কোনোই মাথাব্যাথা দেখা গেল না হ্যাঁ, দুচারজন অনেক চেষ্টা-তদবির করে মুবাল্লিগের চাকরি জুটিয়ে বিনা তাবলিগেই সৌদি বেতন- ভাতা গুণতে লাগলেন।

তাও আবার মওদুদী চিন্তাধারার বা তথাকথিত সালাফী না হলে সে চাকরি পাওয়া বা রক্ষা করা দুরূহ। তাদের খেদমত বা করণীয় অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নাস্তিকতা, দুর্নীতি বা হাজার হাজার বিদেশি সাহায্য প্রতিষ্ঠান এনজিও) কর্তৃক এদেশের ধর্ম ও সভ্যতা বিনাশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়।

তাদের সংগ্রাম ও সব সাধ্য- সাধনা এ দেশ থেকে হানাফী মাযহাব দূর করে কীভাবে সালাফিয়্যাত তথা গয়রে মুকাল্লিদ একটা সৌদি তল্পিবাহী সমাজ গড়ে তোলা যায়।

উপমহাদেশে হানাফী মতাদর্শের মশালটা যেহেতু দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের হাতে, আর তাদেরই সমর্থিত বিশ্বব্যাপী সফলতম ইসলামী প্রচারমিশন তাবলীগী জামাত যেহেতু কোটি কোটি মানুষের মনে দাগ কাটছে, দিন দিন পত্রপল্লবে সুশোভিত হচ্ছে তাই, তাদের মতে এ শিবিরটাকে যেমন করেই হোক তছনছ করে দিতে হবে।

এজন্য সৌদি সালাফী জামাতী মুবাল্লিগগণ আদাজল খেয়ে লেগেছেন। তাঁরা এখন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলেও তথাকথিত সালাফীদের গায়রে মুকাল্লিদ চিন্তাধারা এবং সালাফী লেখক আলবানির নামায শিক্ষাদানের অভিযানে নেমেছেন। হিদায়া, আলমগীরী, বাহরুর রায়েক, শরহে বেকায়া, বেহেশতী যেওর, রাহে নাজাত, মিফতাহুল জান্নাত নয় এখন সবরেফারেন্সের জন্য নাসিরুদ্দিন আলবানির পুস্তকাদিই পাঠক ও শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। সবাইকে সালাফী বানাতে হবে।

এই অশুভ শক্তির বীজকে পরিণতিতে পৌঁছতে দেওয়া যায় না। উলামায়ে কেরামকে আজ খুব বেশি করে ভাবতে হবে।

কারণ, মাযহাবমানা যদি শিরক হয়, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতো ভুবনবিখ্যাত মুজতাহিদ ইমাম যাঁর করুণার বারিধারায় কথিত আহলে হাদীসরাও

অবগাহন করে ফিরে সদা- সর্বদা তিনি যদি কাফের হয়ে যান তাহলে তো আমাদের দ্বীন- ঈমান সবই ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাবে!

মাযহাবের স্বরূপ, এর অনস্বীকার্যতা এবং অনুসরণীয় সোনালি যুগে এর ব্যাপক উপস্থিতির আলোচনা চরম গৌণ, অপাঙক্তেয় এবং বাহুল্য হলেও আজকের প্রেক্ষাপটে তা বারংবার অবতারণার দাবি রাখে। কারণ, একগেঁয়ে এবং গোয়ের্তুমি প্রকৃতির মানুষদের জন্য এটাই একমাত্র প্রতিষেধক। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটি সেই প্রণোদনা থেকেই লেখা।

তাকলীদ বা মাযহাবের স্বরূপ : একথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, মৌলিক অনুসরণ এবং আনুগত্য কেবলই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সা.- এর প্রতিই থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল সা.- এর প্রতিটি নির্দেশ এবং বিধান পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের মাঝে সুস্পষ্ট কিংবা ইঙ্গিতার্থকরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

যদি কুরআন- হাদীসে সুস্পষ্ট অর্থে কোনো হুকুম পাওয়া যায় এবং বাহ্যিক অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থের সম্ভাবনা না থাকে এবং কুরআন হাদীসের কোথাও ঐ হুকুমের খেলাফ কোনো বক্তব্য না থাকে তাহলে সকল মাযহাবের ইমামগণের মত হলো, নির্দিষ্ট ঐ হুকুমের উপরই আমল করতে হবে।

এর ব্যত্যয় ঘটানো চলবে না। এই মাসআলায় ইজতেহাদ কিংবা কারো অনুকরণ- অনুসরণের বিন্দু- বিসর্গমাত্র সুযোগ নেই। যেমন, নামায ফরজ কিনা এ ব্যাপারে কোনো ইমামের মতামত নেওয়া বা দেওয়ার কোনোই দরকার নেই। ঠিক কেউ যদি বলে, নামায পড়া লাগবে না তাহলে তার কথাও শোনার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, কুরআন- হাদীসে সুস্পষ্ট করণীয় এ ব্যাপারে বিবৃত আছে। সুদ বৈধ না অবৈধ এ ব্যাপারে গবেষণার কোনো মানে নেই।

কারণ, তা যে হারাম এ ব্যাপারে পরিষ্কার বক্তব্য কুরআন- হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে ইজতেহাদ বা গবেষণার যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি অন্য কারো অনুসরণও বৈধ নয়।

কিন্তু কুরআন এবং হাদীসে এমন অনেক বিধানাবলি রয়েছে যেগুলোতে কিছু সংক্ষিপ্ততা এবং অস্পষ্টতা বিদ্যমান। অথবা একাধিক অর্থের অবকাশ আছে কিংবা কুরআন হাদীসেরই অন্যত্র তার বিপরীতমুখী বিধান বাহ্যত দৃষ্টিগোচর হয় সে ক্ষেত্রে আমল করার দুটি মাত্র পথ খোলা আছে

১. কোনো ব্যক্তি নিজের ইলমী যোগ্যতা ও শক্তিশালী প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে চূড়ান্ত চেষ্টা- সাধনার মাধ্যমে শরীয়তের উদ্দিষ্ট বস্তু বোঝার চেষ্টা করা ২. ব্যক্তি

নিজে কুরআন- হাদীসের তথ্যের উদ্দেশ্য অর্জন এবং অনুসন্ধান করবে না বরং একজন নির্ভরযোগ্য এবং নিজের থেকে বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থ হবে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- তোমরা আহলে ইলমের কাছে জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা না জানো।

আর আহলে ইলমের কাছে জিজ্ঞাসা করে আমল করা এবং তার অনুসরণ করাই হলো তাকলীদ। এরই নাম মাযহাব। এর বেশি তো কিছু নয়।

হাদীস, আহলে হাদীস ও বাস্তবতা : গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে থাকেন।

যার মর্ম তাদের কাছে এই যে, হাদীসের ইলমও তাদের কাছেই আছে এবং হাদীসের উপর আমলও তাঁরাই করে থাকেন। যারা মাযহাব মানেন তাদের কাছে না আছে হাদীস এবং না তারা হাদীসের উপর আমল করেন! বস্তুত আহলে হাদীসদের এই ধারণার ভিত্তি হলো আত্মস্বীকৃতি এবং আত্মপ্রবঞ্চনার উপর।

যার বাস্তবতা হলো যোজন যোজন দূরে। প্রকৃত সত্য হলো, হাদীস শাস্ত্রের সাথে তাদের দূরতম সম্পর্কও অনুপস্থিত।

শুধুমাত্র কতিপয় বিরোধপূর্ণ মাসায়েল চর্চায় নিবৃত থেকেই তারা মুহাদ্দিস বনে গেলেন! হাদীসের উপর আমলকারী হয়ে গেলেন!

আর এ কারণেই নিত্য নতুন আবিকৃত মাসায়েলের বিধান সংশ্লিষ্ট হাদীস যখন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তারা হাতযুগল বগলদাবা করে চিন্তার সাগরে মুষড়ে পড়েন। এবং ঐ সকল ব্যক্তিদের কিতাবাদিই ঘাটতে থাকেন যাদেরকে মুশরিক বলতেও পরিশ্রান্ত হন না।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন।

اَلْمُقَدَّمَةُ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْحَقِّ الدِّهْلَوِيِّ رَحِمَه الْبَارِي

مُقَدِّمَةٌ فِيْ بَيَانِ بَعْضِ مُصْطَلَحَاتِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ مِمَّا يَكْفِيْ فِيْ شَرْحِ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْل وَاِطْنَابٍ اِعْلَم۔ اَنَّ الْحَدِيْثَ فِيْ اِصْطِلَاحِ جُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ يَطْلُقُ عَلَى قَوْلِ النَّبِّي ﷺ وَفِعْلِهِ وَتَقَرِيرِهِ وَمَعْنَى التَّقْرِيْرِ اَنَّهُ فَعَلَ اَحَدٌ أَوْ قَالَ شَيْئًا فِيْ حَضْرَتِهِ ﷺ وَلَمْ يُنْكِرْ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَالِكَ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّر وَكَذَالِكَ يَطْلُقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِه وَعَلَى قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِ.فَمَا اِنْتَهَى اِلَى النَّبِّي ﷺ يُقَالُ لَه **الْمَرْفُوْع** وَمَا اِنْتَهَى اِلَى الصَّحَابِيِّ يُقَالُ لَهُ **الْمَوْقُوْف** كَمَا يُقَالُ قَالَ أَوْ فَعَلَ أَوْ قَرَّرَ اِبْنُ عَبَّاسٍ أَوْ عَنْ اِبْنِ عَبَّاس قُوْفًا - أَوْ مَوْقُوْفٌ عَلَى اِبْنِ عَبّاَسٍ -

ভুমিকা: শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ. মৃত ১০৫২ হিজরী) রচিত শব্দের আধিক্যতা ও বাক্যের দীর্ঘতা পরিত্যাগ করে হাদীস শাস্ত্রের কিছু পরিভাষা উপস্তাপনের উদ্দেশ্যে ভূমিকা। যা কিতাবখানা বোধগম্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট

হাদীস: জুমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) মুহাদ্দিসীন দের পরিভাষায় হাদীস বলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা কাজ ও সম্মতি বুঝায়।

তাক্বরীর التَّقْرِيْر। সম্মতি অর্থ কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে (অবগতিতে) কোন কাজ করল অথবা কোন কথা বলল আর তিনি এ ব্যাপারে তাকে দুষেননি, নিষেধও করেননি বরং নিরবে সমর্থন করেন।

এভাবে حديث হাদীস বলতে সাহাবী ও তাবেঈদের কথা কাজ ও সম্মতিও বুঝায়।

মারফু' المرفوع। যে হাদীসের সনদ (কে বা কার থেকে বর্ণনা করেছেন) এভাবে বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক নামসমূহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে। যেমন বলা হয় قال رسول الله ﷺ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক কথাটি বলেছেন। أو فعل كذا। অথবা করেছেন। أو قرر অথবা সম্মতি দিয়েছেন।

মাওকুফ: الموقوف। যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে যেমন বলা হয় قال ابن عباس ইবনে আব্বাস বলেছেন أو فعل করেছেন أو قرر সম্মত ছিলেন অথবা বলা হয় ইবনে আব্বাস থেকে স্থগিতাবস্থায়। অথবা أو مَوْقُوْفٌ عَلَى اِبْنِ عَبّاَسٍ ইবনে আব্বাস উপর (বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিকতা তিনি পর্যন্ত গিয়ে আটকে যাওয়া বা)

وَمَا اِنْتَهَى اِلَى التَّابِعِيِّ يُقَالُ لَهُ **الْمَقْطُوْعُ** وَقَدْ خَصَّص بَعْضُهُمْ اَلْحَدِيثَ بِالْمَرْفُوْعِ وَالْمَوْقُوْفِ إِذَا الْمِقْطُوْعُ يْقَالُ لَهُ الْأَثْرُوَقَدْ يَطْلُقُ الْأَثْرُعَلَىالْمَرْفُوْعِ كَمَا يُقَالالْاَدْعِيَةُ الْمَاثُوْرَةُ لِمَا جَاءَ مِنَ الْاَدْعِيَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالطَّحَاوِىُّ سَمَّىكِتَابَهُ الْمُشْتَمَلَ عَلَى بَيَانِ الْأَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ وَأَثَارِ الصَحَابَةِ بِشَرْحِ مَعَانِى الْأَثَارُ وَقَالَ السَّخَاوِىُّ اِنَّ لِلطَّبْرَانِىْ كِتَابَا مُسَمَّى بِتَهْذِيْبِ الْاَثَارِ مَعَ اَنَّه مَخْصُوْصٌ بِالْمَرْفُوْعِ وَمَا ذُكِر فِيْهِ مِنَ الْمَوْقُوْفِ فَبِطَرِيْق التَّبْعِ وَالتَّطَفُّلِ وَالْخَبَرُ وَالْحَدِيْثُ فِيْ الْمَشْهُوْرِ بِمَعْنَى وَاحِد وَبَعْضُهُمْ خَصُّوا الْحَدِيْثَ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِوَالتَّابِعِيْنَ وَالْخَبَرُبِمَاجَاءَ عَنْ اَخْبَارِالْمُلُوْكِ وَالسَّلَاطِيْنِ وَالْاَيَّامِ الْمَاضِيَةِ وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ مُحَدِّثٌ ولِمَنْ يَّشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيْخِ اَخبَارِىٌّ

মাক্বতু' المقطوع। যে হাদীসের সনদ তাবেঈ পর্যন্ত পৌছেছে যেমন বলা হয় قال سعيد ابن المسيب সাইদ ইবনে মুসাইয়াব বলেছেন عن ابن سيرين ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত। (মারফু, মাওকুফ, মাকতু তিনটিকেই উল্লেখিত অর্থে হাদীস বলা হয়)।তবে কখনো কখনো শুধু মারফু, মাওকুফকেই হাদীস বলে। মাকতুকে (হাদীস বলে না বরং) আসার বলা হয়।

আবার কখনো مرفوع কেই أثر বলা হয়। যেমন:

ক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দোয়াসমূহ (যেগুলির সনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে) কে الأدعية الماثورة বলা হয়। (الماثور। শব্দটি الأثر থেকে নির্গত)

খ. ইমাম ত্বাহাবী নবীজির হাদীসে মারফু ও সাহাবাদের আছার সম্বলিত স্বীয় কিতাবের নাম রেখেছেন শরহে মাআনীল আসার।

গ. আল্লাামা সাখাভী বলেন ইমাম তাবরানীর তাহযীবুল আসার নামক একখানা কিতাব আছে অথচ ইহা শুধু মারফু হাদীসেই সিমাবদ্ধ। এতে যে সকল মাওকুফ হাদীস উল্লেখ হয়েছে তা প্রসঙ্গক্রমে অনিচ্ছায় সন্নেবেশিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ মতে হাদীস ও খবর ক)একার্থবোধক। খ) কেউ বলেন (একার্থবোধক নয় বরং বিপরীত) হাদীস বলে রাসূল সাহাবী তাবেঈ সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়কে। আর খবর বলে রাজা বাদশাহ সম্পর্কীয় ও অতীতের ঘটনাবলীকে। এজন্যই যিনি হাদীস নিয়ে মগ্ন থাকেন তাকে মুহাদ্দিস বা হাদীস বিশারদ বলে। আর যিনি ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত্র থাকেন তাকে আখবারী বা ঐতিহাসিক বলে।

الحديث والخبر والأثر والسنة استعمالها فرقها

হাদীস, খবর, আসর, সুন্নত শব্দগুলির ব্যবহার ও পার্থক্য

খবর ও হাদীস এ তিনটি অভিমত

ক. সমর্থবোধক (مترادف)যেমনটি বলেছেন হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী।

খ. বিপরীত (متبائن)হাদীস হচ্ছে রাসূল সাহাবী তাবেঈ সম্পর্কীয় বিষয়। আর খবর হচ্ছে রাজা বাদশার অতীত ইতিহাস ইত্যাদি। যেমনটি বলেছেন খোরাসানবাসী উলামায়ে কেরাম।

গ. হাদীস সীমিত খবর ব্যাপক عموم خصوص مطلقহাদীস শুধু রাসূল সম্পর্কীয় বিষয় এবং খবর রাসূল ও অন্যান্যদের সম্পর্কীয় বিষয়কে বলে। যেমনটি বলেছেন ফুকাহায়ে মাওয়ারাউন্নাহার।

হাদীস ও আসর এ চারটি অভিমত।

ক. সমর্থবোধক এজন্য হাদীস সম্বলিত গ্রন্থাদির নাম রাখা হয়েছে 'আদইয়ায়ে মাসুরা' কিতাবুল আসার, শরহে মা'আনিল আসার, মুসকালুল আসার ইত্যাদি।

খ. বিপরীত অর্থবোধক متبائنহাদীস বলতে শুধু মারফু গুলিকে বুঝায়। আর আসার শুধু মাওকুফ গুলিকে বুঝায়। যেমনটি বলেছেন ফুকাহায়ে খুরাসান।

গ. বিপরীত অর্থবোধক তবে ব্যাখ্যা ভিন্ন। হাদীস বলতে শুধু মারফু বুঝায়, আসার বলতে মাওকুফ, মাকতু, খবর সব বুঝায়।

ঘ. বিপরীত অর্থবোধক তবে ব্যাখ্যা ভিন্ন। হাদীস বলতে শুধু মারফু বুঝায়, খবর বলতে ব্যাপকভাবে সকলের বিষয়াদি বোঝায়। এবং আসার বলতে শুধু মাওকুফ ও মাকতুকেই বোঝায় এটি হচ্ছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত।

হাদীস ও সুন্নত এর তিনটি অভিমত।

ক. সমর্থবোধক যদি সুন্নত শব্দ সাধারনভাবে উল্লেখ করা হয়।

খ. বিপরীত অর্থবোধক হাদীস বলতে মারফু বুঝায়, সুন্নত বলতে মাওকুফ বুঝায়, যদি সাহাবীর নামের সাথে উল্লেখ হয়। যেমন সুন্নতে আবি বকর, সুন্নতে উমর।

গ. বিপরীত অর্থবোধক তবে ব্যাখ্যা ভিন্ন হাদীস বলতে قولي কথা সম্পর্কীয় হাদীস বুঝায়। তার সুন্নত বলতে فعلي সম্পর্কীয় হাদীস বোঝায়। এই অভিমতটি বেশি প্রচলিত। (হাদীস তিন প্রকার, এক. মারফু, দুই. মাওকুফ, তিন. মাকতু।)

وَالرَّفْعُ قَدْ يَكُوْنُ صَرِيْحًا وَقَدْ يَكُوْنُ حُكْمًا اَمَّا صَرِيْحًا فَفِيْ الْقَوْلِيِّ كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا أَوْ كَقَوْلِهِ أَوْ قَوْلِ غَيْرِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّه قَالَ كَذَا وَفِالْفِعْلِيِّ كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ رَأَيْتُ رَسُوْلَ ﷺ فَعَلَ كَذَا أَوْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهفَعَلَ كَذَا أَوْ عَنِ الصَّحَابِيِّ أَوْ غَيْرِهِ مَرْفُوْعًا أَوْ رَفَعَهُ اَنَّه فَعَلَ كَذَا وَفِالتَّقْرِيْرِيَّاَنْ يَّقُوْلَ الصَّحَابِيُّ وَغَيْرُه فَعَلَ فُلَانٌ أَوْ اَحَدٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ كَذَا كَذَا وَلَا يَذْكُرُا اِنْكَارَه

মারফু (আবার দুই প্রকার।) কখনো ক. সরীহ বা প্রত্যক্ষভাবে হয় কখনো খ. হুকমী বা পরোক্ষভাবে হয়।ছরিহ বা প্রত্যেকটা (আবার তিন প্রকার) ১. কওলী বা কথা বিষয়ক, ২. ফেইলী বা কাজ বিষয়ক, ৩. তাকরিরী বা সম্মতি বিষয়ক।

যদি কাওলী বা কথা বিষয়ক হয় তার উদাহরণ ক. كقول الصحابي سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا সাহাবীর বক্তব্য রাসূলকে এরকম বলতে শুনেছি। খ. أو قول غيره قال رسول الله ﷺ সাহাবী অথবা অন্য কেউ বলল রাসূল (সা.) বলেছেন। গ. أو عن رسول الله ﷺ انه قال كذا সাহাবী অথবা অন্য কেউ বলল রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত তিনি এ রকম বলেছেন।

যদি ফে'লী বা কাজ বিষয়ক হয় তাহলে তার দৃষ্টান্ত

ক. كقول الصحابي رأيت رسول الله ﷺ فعل كذا রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি এরকম করেছেন।

খ. أو عن رسول الله ﷺ انه فعل كذا রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত তিনি এ রকম করেছেন।

গ. أو عن الصحابي أو غيره مرفوعا সাহাবী অথবা অন্য কারো থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। ঘ. أو رفعه أنه فعل كذا সাহাবা অথবা অন্য কেউ হাদীসটির সনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উন্নীত করে বলেন তিনি এ রকম বলেছেন।

যদি তাকরীরী বা সম্মতি বিষয়ক হয় তাহলে তার নমুনা ক. أن يقول الصحابي أو غيره فعل فلان أو أحد بحشرة النبي ص كذا ولا يذكرا إنكاره সাহাবী অথবা অন্য কেউ বললেন রাসূল (সা.)-এর উপস্থিতিতে অমুক বা কেউ এরকম করেছে কিন্তু এর সাথে রাসূল (সা.)-এর নিন্দা উল্লেখ করেননি।

وَأَمَّا حُكْمًا فَكَإِخْبَارِ الصَّحَابِيِّ الَّذِىْ لَمْ يُخْبِرْعَنِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدَّمَةِ مَالَا مَجَالَ فِيْهِ لِلْاِجْتِهَادِ عَنِ الْاَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ كَاِخْبَارِ الْاَنْبِيَاءِ أَوِ الْاَتِيَةِ كَالْمَلَاحِمِ وَالْفِتَنِ وَاَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ عَنْ تَرَتُّبِ ثَوَابٍ مَخْصُوْصٍ أَوْ عِقَابٍ مَخْصُوْصٍ عَلَى فِعْلٍ مَخْصُوْصٍ فَاِنَّه لَا سَبِيْلَ اِلَيْهِ اِلَّا السِّمَاعُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْيَفْعَلُ الصَّحَابِيُّ مَالَا مَجَالَ لِلْاِجْتِهَادِ فِيْهَاَوْيُخْبِرُ الصَّحَابِىُّبِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ كَذَا فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ لِاَنَّ الظَّاهِرَ اِطِّلَاعُه ﷺ عَلَى ذَالِكَ وَنُزُوْلِ الْوَحْىِ بِهِ - أَوْ يَقُوْلُوْنَ وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا لِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ السُّنَّةَ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّه يَحْتَمِلُ سُنَّةَ الصَّحَابَةِ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِ يْنَ فَاِنَّ السَّنَّةَ يَطْلُقُ عَلَيْهِ.

তদ্রূপ হুকমী বা পরোক্ষটা ও আবার তিন প্রকার। এক. কওলী, দুই, ফে'লী, তিন. তাকরীরী)।

যদি কওলী হয়, তাহল তার উদাহরণ

এমন সাহাবীর বর্ণনা যিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতব থেকে বর্ণনা করেছেন না,বা এমন বর্ণনা যাতে উক্ত সাহাবীর (ইজতেহাদ) যুক্ত কিয়াস খাটিয়ে বলার সুযোগ নেই। যেমন-ক. অতীতের ইতিহাস নবীদের কাহিনী।

খ. ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য যুদ্ধ-বিদ্রহ, ফিৎনা-বিভ্রান্তি, কিয়ামতের ভীবিষিকা। গ. কোন কাজে নির্ধারিত সওয়াব বা আযাবের যোগ্য হওয়ার সংবাদ। কারণ উল্লেখিত বিষয়ে একথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে উক্ত সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেই বর্ণনা করে থাকবেন।

যদি ফে'লী বা কাজ বিষয়ক হয়, তাহলে তার উপমা

সাহাবী এমন কাজ করেন যাতে একথা বলার সুযোগ নেই যে, তিনি আসমানী কিতাব পড়ে কিংবা ইজতেহাদ (কিয়াস যুক্তি) খাটিয়ে করেছেন বরং একথা মেনে নিতেই হয় যে তিনি হয়তো এ কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখে নিজে করেছেন।

যদি তাকরীরী বা সম্মতি বিষয়ক হয় তার নমুনা

ক. সাহাবী সংবাদ দিলেন যে তারা নবীজির জামানায় ওহী নাযিল হওয়ার যুগে এরকম কাজ করতেন কারণ স্বাভাবিক ভাবেই যুগ এক হওয়ার কারণে ইহা রাসূল (সা.) অবগত হওয়ার কথা। সাহাবাদের উক্ত কাজটি অবৈধ হলে তিনি নিষেধ করতেন। আর তিনি নিজে অবগত না হলেও আল্লাাহ তাআলা তাকে ওহীর মাধ্যমে তাকে অবগত করতেন কারণ তখন তো ওহী অবতীর্ণ হতো। যেহেতু নবী যুগের কাজ হওয়া

সত্ত্বেও নবী (সা.)-এর নিষেধ পাওয়া যায়নি তাই ধরে নেওয়া যায় এতে নবীজির সম্মতি ছিল।

খ. সাহাবাগণ বললেন وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا এটা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। এখানে যেহেতু রাসূল (সা.) বা সাহাবী কারো কথা বা কাজের উল্লেখ নেই তাই ধরে নেওয়া যাবে এ সুন্নত বা রীতি নীতিতে রাসূল সমর্থন ছিল কারণ বাহ্যিকভাবে সুন্নত বলে রাসূল সুন্নতই বোঝানো হয়। তবে কেউ কেউ বলেন সুন্নত বলতে সাহাবী ও খুলাফায়ে রাশেদীনের তরীকা বোঝানোর সম্ভাবনাও আছে। কেননা সুন্নত শব্দটি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়।

এ পর্যন্ত শুধু মারফু এর ৬ প্রকারের পরিচয় দেওয়া হলো। অনুরূপভাবে যদিও যুক্তির নিরিখে মওকুফ এর ৬ প্রকার মাকতু এর ৬ প্রকার হাদীস মোট ১৮ প্রকার হয়ার কথা ছিল কিন্তু তাবেঈর যে উক্তি কর্ম ও সমর্থন কিয়াসী

অথবা ইসরাইলী বর্ণনা নয়, তা موقوف حكمي হওয়া যুক্তির দাবী হওয়া সত্তেও বাস্তবে তাকে مرفوع حكمي বলে। সুতরাং موقوف শুধু صريح-এর ৩টি প্রকারেই সীমাবদ্ধ। مرفوع حكمي موقوف حكمي এ সন্নিবেশিত। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তার অমর গ্রন্থ نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر এ موقوف-এর সজ্ঞা ও প্রকার বর্ননার পর লিখেন ولايجيئ فيه جميع ماتقدم بل معظمه অর্থাৎ مرفوع হাদীসের সকল প্রকার موقوف হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তবে সিংহভাগ প্রযোজ্য। অতঃপর বিদগ্ধ লিখক مقطوع-এর সজ্ঞা বর্ননার পর এর প্রকারের আলোচনা টানেননি। এতে مقطوع-এর صريح প্রকার গুলি লুপ্ত না হলেও প্রকার حكمى লি موقوف حكمى-এর প্রকার গুলির মতো লুপ্ত হওয়ারই ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ তাবে তাবেঈর যে উক্তি কর্ম ও সমর্থন কিয়াসী অথবা ইসরাইলী বর্ণনা নয়, তাকে তাবেঈ কিংবা সাহাবীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত না করে রাসূলুল্লাহ সা. এর দিকেই সম্পৃক্ত করা হবে। বলা হবে তাবে তাবেঈর কছে কোন ভাবে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে পৌছার কারনেই তিনি এমনটি বর্ননা করতে পেরেছেন সুতরাং موقوف حكمي ও حكمي مقطوع-এর তিনটি করে আরো ৬ প্রকার বের করে এর সজ্ঞা বর্ণনা করা যেমনটি মুফতি আব্দুস সালাম সুনামগঞ্জী কৃত উলুমে হাদীস সহ অন্যান্য পুস্তিকায় করা হয়েছে তা বাস্তবতার নিরীখে উত্তীর্ন হবার নয়। নিদেন পক্ষে موقوف حكمي-এর প্রকার ত্রয় তো নিশ্চিত ভাবে আল্লামা আসকালানীর ঘোষনা অনুযায়ী প্রত্যাখ্যাত। (শরহু নুখবাতিল ফিকার)

والْإِسْنَادُ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ يَجِيْئُ بِمَعْنَى ذِكْرِ السَّنَدِ وَالْحِكَايَةُ عَنْ طَرِيْقِ الْمَتَنِ - وَالْمَتْنُ مَا اِنْتَهَى اِلَيْهِ الْاِسْنَادْ فَاِنْ لَمْ يَسْقُطْ رَاوٍ مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ الْبَيْنِ فَالْحَدِيْثُ مُتَّصِلٌ وَيُسَمَّى عَدَمَ السُّقُوْطِ إِتِّصَالًا - وَاِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ أَوْ اَكْثَرَ فَالْحَدِيْثُ مُنْقَطِعٌ - وَهَذَا السُّقُوْطُ اِنْقِطَاعٌ وَالسُّقُوْطُ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ مِنْ اَوَّلِ السَّنَدِ وَيُسَمَّى مُعَلَّقًا - وَهَذَا الْاِسْقَاطُ تَعْلِيْقًا - وَالسَّاقِطُ قَدْ يَكُوْنُ وَاحِدًا وَقَدْ يَكُوْنُ اَكْثَرَ وَقَدْ يُحْذَفُ تَمَامُ السَّنَدِ كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُصَنِّفِيْنَ يَقُوْلُوْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالتَّعْلِيْقَاتُ كَثِيْرَةٌ فِيْتَرَاجِمِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ وَلَهَا حُكْمُ اْلِاتِّصَالِ لِاَنَّه اِلْتَزَمَ فِيْ هَذَا الْكِتَابِ اَنْ لَّايَاْتِيَ اِلَّابِالصَّحِيْحِ - وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ فِيْ مَرْتَبَةِ مَسَانِيْدِهِ- اِلَّا مَاذُكِرض مِنْهَا مُسْنَدًا فِيْ مَوْضِعِ آخر مِنْ كِتَابِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فِيْهَا بِاَنَّ مَا ذُكِرَ بِصِيْغَةِ الْجَزْمِ وَالْمَعْلُوْمِ كَقَوْلِهِ قَالَ فُلَانٌ أَوْ ذَكَرَ فُلَانٌ دَلَّ عَلَى ثُبُوْتِ اِسْنَادِهِ عِنْدَهُ فَهُوَ صَحِيْحٌ قِطْعًا

ইসনাদ : (ক) কারো মতে সনদ এর সমার্থবোধক।

(খ) কখনো সনদের আলোচনা ও মতনের মাধ্যম বা রাবীদের সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়াকেও ইসনাদ বলে।

মতন : সনদ (রাবীদের ধারাবাহিক নমের উল্লেখ) যেখানে শেষ সেখান থেকেই আরম্ব। (সনদ থেকে রাবীর নাম বাদপড়া নাপড়া অনুপাতে হাদীস দুই প্রকার

(১) متصل মুত্তাসিল,

(২) منقطع মুনকাতি

মুত্তাসিল : যদি হাদীসের সনদের কোন দিক থেকে কোন রাবীর নাম বাদ না পড়ে তাহলে সেই হাদীসে মুত্তাসিল বলে। এবং যদি বাদ পড়াকে ইত্তেসাল বলে।

মুনকাতি : যদি হাদীসের সনদের দিক থেকে এক বা একাধিখ রাবীর নাম বাদ পড়ে তাহলে সেই হাদীসকে মুনকাতি বলে। আর বাদ পড়াকে ইনেকতা বলে। মুনকাতি আবার তিন প্রকার যথা-

১। معلق মুআল্লাাকা,

২। مرسل মুরসাল,

৩. معضل মু'যাল। বাদপড়া যদি সনদের প্রথমদিকে থেকে হয়। যেমন মুসান্নিফের উস্তাদ তাকে মুআল্লাক বলে এবং এমন বাদ দেওয়াকে তালীক বলে। (রাবীর নাম বাদ দেওয়ার কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে) যথা-

১। একটি নাম বাদ দেওয়া,

২। একাধিক নাম বাদ দেওয়া,

৩। পূর্ণ সনদ লুপ্ত করা, যেটা মুসান্নিফগণের স্বভাব। তারা (পূর্ণ সনদ লুপ্ত করে) বলেন- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

التعليقات সহীহ বুখারীর শিরোনামগুলিতে প্রচুর মুআল্লাক রয়েছে। সেগুলি মুত্তাসিলের মতো (গ্রহণযোগ্য) কারণ তিনি উক্ত কিতাবে একমাত্র সহীহ হাদীস গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করেছেন। তবে উক্ত মুআল্লাকগুলি কোথাও সনদ সহকারে বর্ণিত না হওয়ার ফলে (গ্রহণযোগ্য হলেও) তার মুসনাদ গুলির সমস্তরের হবে না। তবে যদি স্বীয় কিতাবের অন্যত মুসনাদ আকারে উল্লেখ থাকে এগুলি কে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করা হয়। যেমন- قال فلان اوذكر فلان

ক. দৃঢ়তার সাথে معروف সিগা দ্বারা বর্ণিত যেমন قال او ذكر এগুলি প্রমাণ করে হাদীসটির সনদ তার নিকট গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এটা নিশ্চিত সহীহ।

وَمَاذَكِرَه بِصِيْغَةِ التَّمْرِيْضِ۔وَالْمَجْهُوْلِ كَقِيْلَ وَيُقَالُ وَذُكِرَ فَفِىْ صِحَّتِهِ عِنْدَه كَلَامٌ وَلَكِنَّه لَمَّا أَوْرَدَه فِيْ هَذَا الْكِتَابِ كَانَ لَه اَصْلٌ ثَابِتٌ وَلِهَذَا قَالُوْا تَعْلِيْقَاتُ الْبُخَارِىِّ مُتَّصِلَةٌ صَحِيْحَةٌ وَاِنْ كَانَ السُّقُوْطُ مِنْ آخِرِ السَّنَدِ فَاِنْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِىِّ فَالْحَدِيْثُ مُرْسَلٌ وَهَذَا الْفِعْلُ اِرْسَالٌ كَقَوْلِ التَّابِعِىِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّ ىاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَجِيئُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ اَلْمُرْسَلُ وَالْمُنْقَطِعُ بِمَعْنًى وَالْإِصْطِلَاحُ الْاَوَّلُ اَشْهَرُوَحُكْمُ الْمُرْسَلِ التَّوَقُّفُ عند جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ لِاَنَّه لَا يُدْرَى اَنَّ السَّاقِطَ ثِقَةٌ اَوْلَا لِاَنَّ التَّابِعِىَّ قَدْ يَرْوِىْ عَنِ التَّابِعِىِّ وَفِىْ التَّابِعِىِّ ثِقَةٌ وَ غَيْرُ ثِقَةٍ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَة۔وَمَالِكٍ اَلْمُرْسَلُ مَقْبُوْلٌ مُطْلَقًا وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا اَرْسَلَه لِكَمَالِ الْوُثُوْقِ وَالْاِعْتِمَادِ لِاَنَّ الْكَلَامَ فِيْ الثِّقَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَه صَحِيْحًا لَمْ يُرْسِلْهُ وَلَمْ يَقُلْ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّىاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

খ. দূর্বলভাবে مجهول সীগা দ্বারা বর্ণিত যেমন قيل ويقال এগুলি প্রমাণ করে হাদীসটির সনদের বিশুদ্ধতায় তার মন্তব্য রয়েছে, তবে যেহেতু তিনি স্বীয় সহীহ বুখারী কিতাবে ২। مرسل যদি রাবীর পতন (বাদপড়া) সনদের শেষ থেকে তাবেঈর পরে হয় তাকে মুরসাল বলে এবং এ কাজ তাবেইর পরের কোন তাবেঈরী সাহাবীর নাম লুপ্ত করা কে ইরসাল বলে। যেমন কোন তাবেঈ বললেন قال رسول الله ﷺ মুহাদ্দেসীনদের পরিভাষায় কখনো মুরসাল ও মুনকাতে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ মত অপ্রসিদ্ধ, প্রসিদ্ধ মত প্রথমে উল্লোখিত।অর্থাৎ পরিভাষায় (পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হওয়া) منقطع সনদের যে কোন দিক থেকে রাবীর পতন مرسل সনদের শেষ থেকে রাবীর পতন।

মুরসালের হুকুম : চারটি মাতামত রয়েছে, জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে স্গিত রাখা (আমল করা ও দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা) কারণ পতিত রাবী বিশ্বস্ত কি না। জানা নেই। কেননা তাবঈ কখনো অন্য তাবেঈ থেকে বর্ণনা করেন তার তাবেঈদের মাঝে বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত উভয় প্রকার রাবী আছে।

২। ইমাম আবু হানীফা রহ. ও মালিক রহ.-এর কাছে মুরসাল হাদীস নিঃশর্তে গ্রহণযোগ্য। তারা বলেন (কোন তাবেঈ) রাবীর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বস্তা ও নির্ভরযোগ্যতার কারণেই তা নাম লুপ্ত করেন। কারণ কথাটাইতো বিশ্বস্ত্রতায় যদি তাবেইর নিকট সনদটি বিশ্বস্থ না হতো (রাবী বিশ্বস্থ না হতেন) তাহলে তিনি ইরসাল (রাবীর নাম লুপ্ত) করে قال رسول الله ﷺ বলতেন না।

وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ اِنْ اُعْتُضِدَ بِوَجْهٍ آخَرَ مُرْسَلٍ أَوْ مُسْنَدٍ وَإِنْ كَانَ ضَعِيْفًا قُبِلَ - وَعَنْ أَحْمَدَ قَوْلَانِ وَهَذَا كُلُّه اِذَا عُلِمَ اَنَّ عَادَةَ ذَالِكَ التَّابِعِىِّ اَنْ لَا يُرْسِلَ اِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ وَاِنْ كَانَتْ عَادَتُه اَنْ يُرْسِلَ عَنِ الثِّقَاتِ وَغَيْرِ الثِّقَاتِ فَحُكْمُه اَلتَّوَقُّفُ بِالْاِتِّفَاقِ كَذَا قِيْلَ وَفِيْهِ تَفْصِيْلٌ اَزْيَدَ مِنَ ذَالِكَ ذَكَرَهُ السَّخَاوِىُّ فِيْ شَرْحِ الْاَلْفِيَةوَاِنْ كَانَ السُّقُوْطُ مِنْ اَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ فَاِنْ كَانَ السّاَقِطُ اِثْنَيْنِ مُتَوَالِيَايُسَمَّى مُعْضَلًا بِفَتْحِ الضَّادِ-وَاِنْ كَانَ وَاحِدٌ أَوْ اَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ يُسَمَّى مُنْقَطِعًا-وَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ الْمُنْقَطِعُ قِسْمًامِنْ غَيْرِ الْمُتَّصِلِ- وَقَدْ يُطْلَقُ الْمُنْقَطِعُ بِمَعْنَى غَيْرِ الْمُتَّصِلِ مُطْلَقًا شَامِلًا لِجَمِيْعِ الْاَقْسَامِ وَبِهَذَا الْمَعْنَى يُجْعَلُ(المنقطع) مَقْسَمًا وَيُعْرَفُ الْاِنْقِطَاعُ وَسُقُوْطُ الرَّاوِىْ بِمَعْرِفَةِ عَدَمِ الْمُلَاقَاتِ بَيْنَ الرَّاوِيْ وَالْمَرْوِيِّ عَنْهُ اِمَّا بِعَدَمِ الْمُعَاصَرَةِ أَوْ بِعَدَمِ الْاِجْتِمَاعِ وَالْاِجَازَةِ عَنْهُ

৩। ইমাম শাফেঈ রহ.'র নিকট মুরসালকে যদি অন্য কোন মুরসাল বা মুসনাদ (যদিও সেটা ضعيف দুর্বল হয়) দ্বারা শক্তি শক্তিশালী করা হয় তাহলে উক্ত মুরসাল গ্রহণযোগ্য হবে। ৪। ইমাম আহমদ রহ.-এর দুটি মত রয়েছে।

(ক) توقف স্থগিত।(খ) مقبول مطلقا নিঃশর্তে গ্রহণযোগ্য। এ সকল মতামত কখন যখন জানা থাকে যে উক্ত তাবেঈ শুধু বিশ্বস্ত্র রাবীই লুপ্ত করেন আর যদি বিশ্বস্ত্র অবিশ্বস্ত উভয় প্রকার লুপ্ত করা তার অভ্যাস হয়, তাহলে উক্ত মুরসালের হুকুম যে (১ম মাতামতের মত) স্থগিত রাখা এতে কারো দ্বিমত নেই। এভাবে বলা হয়েছে। (উসুলে হাদীসের কিতাবসমূহে) এখানে আরো বিশদ ব্যাখ্যা আছে যা আল্লামা সাখাভী তাঁর شَرْحِ الْأَلْفِيَةِ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৩। **معضل** যদি সনদের মধ্য থেকে ধারাবাহিকভাবে দু'জন রাবী পতিত হন তাহলে তাকে মুযাল। (ض হরফে যবর সহকারে) বলে।

৪। **منقطع** যদি এক রাবী অথবা একাধিক স্থান থেকে অধিক রাবী পতিত হন তাহলে তাকে মুনকাতি বলে। (মুনকাতি যদিও সাধারনভাবে মুত্তাসিল এর বিপরীত সকল প্রকারকে সন্নিবেশিতকারী مقسم বা ভাজ্য স্বয়ং গাইরে মুত্তাসিল কেই বলে কিন্তু) উক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে মুনকাতি হবে স্বয়ং গাইরে মুত্তাসিল এর একটি প্রকার মাত্র। ইনকেতা বা সনদের মধ্য থেকে রাবীর নাম বাদ পড়া সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় (রাবী ও মারবী) বর্ণনাকারী ও যার থেকে বর্ণনা করা হয় তারা পরস্পরের- ক) সমকালিন না হওয়া অথবা খ) সমকালীন হলেও একত্র না হওয়া গ) অনুমতি না পাওয়ার দ্বারা

بِحُكْمِ عِلْمِ التَّارِيْخِ الْمُبِيْنِ لِمَوَالِيْدِ الُّرواةِ وَوَفِيَّاتِهِمْ وَتَعْيِيْنِ اَوْقَاتِ طَلَبِهِمْ وَبِهَذَا صَارَ عِلْمُ التَّارِيْخِ اَصْلًا وَعَمَدَةً عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ- وَمِنْ اَقْسَامِ الْمُنْقَطِعِ اَلْمُدَلَّسُ-بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَيُقَالُ لِهَذَا الْفِعْلِ اَلتَّدْلِيْسُ- وَلِفَاعِلِهِ مُدَلِّسٌ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُوْرَتُه اَنْ لَّا يُسَمِّىَ الرَّاوِىُّ شَيْخَهُ الَّذِىْ سَمِعَ مِنهُ بَلْ يَرْوِىْ عَمَّنْ فَوْقَه بِلَفْظٍ يُوْهِمُ السِّمَاعَ وَلَا يَقْطَعُ كَذِبًا كَمَا يَقُوْلُ عَنْ فُلَانٍ وَقَالَ فُلَانٌ وَالتَّدْلِيْسُ فِيْ اللُّغَةِ كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ فِى الْبَيْعِ وَقَدْ يُقَالُ اِنَّه مُشْتَقٌّ مِنء الدَّلْسِ وَهُوَ اِخْتِلَاطُ الظَّلَامِ وَاِشْتِدَادُه سُمِّىَ بِهِ لِاِشْتِرَاكِهِمَا فِى الْخِفَاءقَالَ الشَّيْخُ حُكْمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيْسُ لَايُقْبَلُ مِنْهُ اِلَّااِذَاصَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ قَالَ الشُّمُنِّىُّ اَلتَّدْلِيْسُ حَرَامٌ عِنْدَالْاَئِمَّةِ رُوِىَ عَنْ وَكِيْعٍ اَنَّه قَالَ لَايَحِلُّ تَدْلِيْسُ الثَّوْبِ فَكَيْفَ بِتَدْلِيْسِ الْحَدِيْثِ وَبَالَغَ شُعْبَةُ فِيْ ذَمِّهِ

যা আসমাউর রিজাল সুনির্দিষ্ট ইতিহাস শাস্ত্রের আলোকে রাবীদের ১। জন্মসন, ২। মৃত্যুসন, ৩। ইলমান্বেষনের নির্ধারিত সময় ও ৪। সফর দ্বারা নির্ণয় করা যায়। এজন্যই তো মুহাদ্দিসীনদের নিকট ইতিহাস শাস্ত্র মূল ও ভিত্তি হয়ে আছে। مدلس মুদাল্লাস মীমে পেশ ও লামে যবর সহকারে রাবীর নাম লুপ্ত হওয়া منقطع পষ্ট হলে এর নাম অস্পষ্ট হলে এর নাম مدلس এ হিসাবে মুনকাতে এর একটি প্রকার। যেমন করাকে বলে তাদলীস যে করে তাকে বলে মুদালিস লামের যের সহকারে তাদলীসের নমুনা হচ্ছে রাবী যে শায়খ থেকে হাদীসটি শুনেছেন তাকে সনদে উল্লেখ না করে তার উর্ধতন কোন শায়খ থেকে এমন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে যার দরুন তার কাছ থেকে সরাসরি শ্রবণের ধারণা হয় কিন স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলে না যে তার থেকে সরাসরি শুনেছে যেমন বলে عن فلان অমুক থেকে বর্ণিত قال فلانঅমুক বলেছেন।تدليس তাদলীস এর আভিধানিক অর্থ ক। ক্রয় বিক্রয়ের সময় পণ্যের গোপন করা। খ। কেউ বলেন তাদলীস শব্দটি دليس থেকে নির্গত যার অর্থ অন্ধকারের মিশ্রণ ও ঘনত্ব। অস্পস্টতায় গোপ করা ও অন্ধকারের সাথে মিল থাকায় উপরোক্ত প্রকার হাদীসকে تدليس নাম করণ করা হয়।

তাদলীসের নিন্দাবাদ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর উস্তাদ বলেন,ক. যার থেকে তাদলীস প্রমানিত হবে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যদি সুস্পষ্টভাবে (حدثنا ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে) বর্ণনা করে থাকে তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। খ. আল্লামা তকী উদ্দীন আহমদ শুমুন্নী মৃত (৮৭২) বলেন হাদীসের ইমামগনের মতে তাদলীস হারাম।গ. আল্লামা ওয়াক্বী বলেন- কাপড় বিক্রি ক্ষেত্রে যেখানে তাদলীস (দোষ গোপন রাখা) অবৈধ। (অথচ এটা পার্থিব বিষয়) সেখানে হাদীসের ক্ষেত্রে তাদলীস কিভাবে বৈধ হতে পারে। (যা দ্বীনের ভিত্তিমূল)। ঘ. ইমাম শু'বা রহ. তাদলীসের তীব্র নিন্দা করেছেন।

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْ قُبُوْلِ رِوَايَةِ الْمُدَلِّسِ فَذَهَبَ فَرِيْقٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ اِلَى اَنَّ التَدْلِيْسَ جَرْحٌ وَاَنَّ مَنْ عُرِفَ بِهِ لَا يُقْبَلُ حَدِيْثُه مُطْلَقًا وَقِيْلَ يُقْبَلُ وَذَهَبَ الْجُمْهُوْر اِلَى قُبُوْلِ تَدْلِيْسِ مَنْ عُرِفَ اَنَّه لَا يُدَلِّسُ اِلَّا عَنْ ثِقَةٍ كَابْنِ عُيَيْنَةَ وَاِلَى رَدِّ مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى يَنُصَّ عَلَى سِمَاعِهِ بَقَوْلِهِ سَمِعْتُ اَوْحَدَّثَنَا أَوْ اَخْبَرَنَا وَالْبَاعِثُ عَلَى التَّدْلِيْسِ قَدْ يَكُوْنُ لِبَعْضِ النَّاسِ غَرَضٌ فَاسِدٌ مِثْلُ اِخْفَاءِ السِّمَاعَ مِنَ الشَّيْخِ لِصِغْرِ سِنِّهِ أَوْ عَدَمِ شُهْرَتِهِ وَجَاهِهِ عِنْدَ النَّاسِ وَالَّذِىْ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ اَكَابِرٍ لَيْسَ لِمِثْلِ هَذَا بَلْ مِنْ جِهَةِ وُثُوْقِهِمْ لِصِحَّةِ الْحَدِيْثِ وَالْاِسْتِغْنَاءِ بِشُهْرَةِ الْحَالِ- قَالَ الشُّمُنِّىُّ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ سَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الثِّقَاتِ وَعَنْ ذَالِكَ الرَّجُلِ فَاسْتَغْنَى بِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْرِ اَحَدِهِمْ أَوْ ذِكْرِ جَمِيْعِهِمء لِتَحَقُّقِهِ بِصِحَّةِ الْحَدِيْثِ فِيْهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُرْسِلُ-

মুদালি≠সের হাদীসের হুকুম : মুদাল্লিস রাবীর হাদীস গ্রহণে উলামায়ে কেরাম ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ক. মুহাদ্দেসীন ও ফুকাহাদের এক অংশের মতে তাদলীস একটি দোষ ও এ দোষে যে দোষী হবে তার কোন হাদীসই গ্রহণযোগ্য হবে না। খ. আরেকটি অংশের মতে গ্রহণযোগ্য হবে। গ. জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে যারা শুধুমাত্র বিশ্বস্ত রাবীর নামই লোপ করেন যেমন ইবনে উয়াইনা, তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে, আর যারা দুর্বল ও সবল সকল প্রকার রাবীর নাম লোপ করেন তাদের হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে। হ্যাঁ যদি سمعت অথবা حدثنا অথবা اخبرنا। শব্দের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে শ্রবণের ঘোষণা দেন তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে।

তাদলীস করার কারণ : তাদলীস করণে কোন কোন রাবীর মন্দ উদ্দেশ্য থাকে, যেমন উস্তাদের বয়সের স্বল্পতা, অপ্রসিদ্ধি, প্রতিপত্তিহীনতার কারণে এমন উস্তাদের কাছ থেকে শ্রবণকে (লজ্জাজনক মনে করে) গোপন করা।কোন কোন আকাবিরদের থেকে যে তাদলীস সংঘটিত হয়েছে তা পূর্বোক্ত তাদলীসের মত নয় বরং হাদীসের বিশুদ্ধতায় আস্া ও রাবীর অবস্ার প্রসিদ্ধির কারণে রাবীর নাম উল্লেখ নিস্প্রয়োজন মনে করে তাদলীস করেছেন। আল্লামা শুমুন্নী বলেন, হতে পারে তাদলীসকারী হাদীসখানা বিশ্বস্ত রাবীদের একদল থেকে এবং ঐ উস্তাদ থেকেও শুনেছেন। অতঃপর হাদীসটির বিশুদ্ধতা তার কাছে প্রমাণিত হওয়ার শুধু উস্তাদের নাম উল্লেখ করে অবশিষ্ট একজনের অথবা সকলের নাম উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন মনে করেছেন। যেমনটি মুরসিল রাবী করে থাকেন।

وَاِذَا وَقَعَ فِيْ سَنَدٍ أَوْ مَتَنٍ اِخْتِلَافُ مِنَ الرُّوَاة بِتَقْدِيْمٍ وَ تَاخِيْرٍأَوْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ أَوْ اِبْدَالِ رَاوٍ مَكَانَ رَاوٍ أَوْ مَتَنٍ مَكَانَ مَتَنٍ أَوْ تَصْحِيْفٍ فِيْ اَسْمَاءِ السَّنَدِ أَوْ اَجْزَاءِ الْمَتَنِ أَوْ بِاِخْتِصَارٍ أَوْ حَذْفٍ أَوْ مِثْلِ ذَالِكَ فَالْحَدِيْثُ مُضْطَرَبُفَاِنْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا وَالِاّ فَالتَّوَقُّفُ وَاِنْ اَدْرَجَ الرَّاوِىُّ كَلَامَه أَوْ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنْ صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيٍّ مَثَلًا لِغَرَضٍ مِنَ الْاَغْرَاضِ كَبَيَانِ اللُّغَةِ أَوْ تَفْسِيْرٍ لِلْمَعْنَى أَوْ تَقْيِيْدٍ لِلْمُطْلَقِ أَوْ نَحْوَ ذَالِك فَالْحَدِيْثُ مُدْرَجُ فَصْلُ-تَنْبِيْهُ وَهَذَا الْمَبْحَثُ يَنْجَرُّ اِلَى رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَنَقْلِهِ بِالْمَعْنَى وَفِيْهِ اِخْتِلَافُ فَالْاَكْثَرُوْنَ عَلَى اَنَّه جَائِزَةٌ مِمَّنْ هُوَ عَالِمُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَمَاهِرُ فِيْ اَسَالِيْبِ الْكَلَامِ وَعَارِفُ بِخَوَاصِّ التَّرَاكِيْبِ وَمَفْهُوْمَاتُ الْخِطَابِ لِئَلَّا يُخْطِئَ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ-وَقِيْلَ جَائِزٌ فِيْمُفْرَدَاتِ الْأَلْفَاظِ دُوْنَ الْمُرَكَّبَاتِ وَقِيْلَ جَائِزٌ لِمَنْ اِسْتَحْضَرَ اَلْفَاظَه حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ

মুযত্বারাব : مضطرب রাবীর মুখস্ত শক্তিতে দূর্বলতার দরুন যদি বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার সাথে হাদীসের সনদে বা মতনে বিরোধ দেখা দেয়, আগানো পিছানো, বাড়ানো-কমানো, এক রাবীর নামের স্থলে অন্য রাবীর নাম, এক মতনের স্থলে অন্য মতন, সনদের নামে বা মতনের কোন অংশে নুকতা হারাকাতের পরিবর্তন, সংক্ষেপ লোপ করনের বা এরকম কোন গরমিল করণের দ্বারা। তাহলে উক্ত হাদীসকে মুযতারাব বলে। যদি বিরোধী বিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তাহলে তাকে متفق الحديث বলে, নতুবা তাকে توفق বলে।

মুদরাজ : যদি কোন রাবী নজের অথবা অন্যের যেমন সাহাবী, তাবেঈর কথা কোন উদ্দেশ্যে যথ আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করা অর্থের ব্যাখ্যা করা শর্তযুক্তকে শর্তযুক্ত করা ইত্যাদিতে হাদীসে ঢুকিয়ে দেন তাকে মুদরাজ বলে।

পরিচ্ছেদ: রিওয়ায়াত বিল মা'না : উপরোক্ত হাদীসে বা সংযোজনের আলোচনা (হাদীসের হুবহু শব্দ ত্যাগ করে শুধু মর্মার্থ নিজ ভাষায় বর্ণনাকরা এর প্রসঙ্গ টেনে এনেছে।হাদীসের হুবহু শব্দ বাদ দিয়ে শুধু মর্মার্থ বর্ণনা করার বৈধতা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ক. অধিকাংশের মতে এটা একমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য বৈধ যিনি আরবী জ্ঞান সম্পন্ন, ভাষার রীতিতে অভিজ্ঞ, রচনা শৈলী ও সম্ভোধনের তাৎপর্যাবলীতে দক্ষ, যাতে সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে ভ্রান্তির স্বীকার না হন। খ. কেউ বলে শুধু একক শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করা বৈধ বাক্যের নয়।গ. কারো মতে ঐ ব্যক্তির জন্য বৈধ যিনি হাদীসের মূল শব্দ সমুহ স্মরণ রেখেছেন কেননা মূল শব্দ স্মরণ থাকলেই তো তিনি এখানে অর্থ বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন। (এর বিপরীত)

وَقِيْلَ جَائِزٌ لِمَنْ يَحْفَظُ مَعَانِىَ الْحَدِيْثِ وَنَسِىَ اَلْفَاظَهَا لِلضَّرُوْرَةِ فِيْ تَحْصِيْلِ الْاَحْكَامِ- وَاَمَّا مَنْ اِسْتَحْضَرَ اَلْفَاظَه فَلَا يَجُوْزُ لَه لِعَدَمِ الضَّرُوْرَةِ وَهَذَا الْخِلَافِ فِيْ الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ اَمَّا اَوْلَوِيَّةُ رِوَايَةِ اللَّفْظِ عَنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيْهَا فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَضَّرَاللهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا فَادَّاهَا كَمَا سَمِعَ الْحَدِيْثُ وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنَى وَاقِعٌ فِيْ الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَغَيْرِهَا وَالْعَنْعَنَةُ رِوَايَةُ الْحَدِيْثِ بِلَفْظِ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ وَالْمُعَنْعَنُ حَدِيْثٌ رُوِىَ بِطَرِيْقِ الْعَنْعَنَةِ-وَيُشْتَرَطُ فِيْ الْعَنْعَنَةِ اَلْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَاللِّقَى عِنْدَ الْبُخَارِىِّ وَالْاَخْذُ عِنْدَ قَوْمٍ آخَرِيْنَ وَمُسْلِمٌ رَدَّ عَلَى الْفَرِيْقَيْنِ اَشَدَّالرَّدِّ وَبَالَغَ فِيْهِ - وَعَنْعَنَةُ الْمُدَلِّسِ غَيْرُ مَقْبُوْلَة كُلُّ حَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ سَنَدُهُ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُسْنَدٌ هَذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ-وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّىْ كُلَّ مُتَّصِلٍ مُسْنَدًا وَاِنْ كَانَ مَوْقُوْفًااَوْمَقْطُوْعًا-

ঘ. কারো মতে ঐ ব্যক্তির জন্য বৈধ হাদীসের অর্থসমূহ যার স্মরণ আছে, আর হুবহু শব্দ ভুলে গেছেন এমতাবস্থায় বিধি বিধান চয়নের প্রয়োজনে তার জন্য বৈধ। সুতরাং যার হুবহু শবদ স্মরণ আছে তার জন্য বৈধ নয় কেননা তার প্রয়োজন নেই। এ সকল মতপার্থক্য শুধু বৈধ কি না তা নিয়ে কিন্তু কোন প্রকার পরিবর্তন ব্যতিত হুবহু শব্দে বর্ণনা করা উত্তম হওয়ার ব্যাপারে সকল একম। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে আলোকময় করেদিন যে আমার হীস শ্রবণ করে সংরক্ষণ করেছে, অতঃপর তা হুবহু বর্ণনা করেছে। সিহাহ সিত্তাসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে রিওয়ায়াত বিল মা'না বিদ্যমান আছে।

হাদীসে মুআনআন (معنعن) : عن فلان عن فلان অমুক থেকে অমুক থেকে এরূপ শব্দে হাদীস বর্ণনা করাকে আনআনা বলে। আর আনআনা পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীসে মুআনআন বলে।হাদীসে মুআনআন(মুত্তাসিলের মত গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে- ক. ইমাম মুসলিম রহ. এর মতে راوى ومروى عنه ছাত্র ও উস্তাদের মধ্যে সমসাময়িকতা। খ. ইমাম বুখারী রহ.এর মতে ছাত্র উস্তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ প্রমানিত হওয়া। গ. অন্যান্য মুহাদ্দিসীনদের মতে ছাত্র কর্তৃক উস্তাদ থেকে হাদীস শ্রবণ গ্রহণ প্রমাণিত হওয়া।ইমাম মুসলিম রহ. শেষোক্ত দুই মতের ঘোর বিরোধিতা করেছেন এবং এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। (তবে একথায় সকল একমত যে,) মুদালিস রাবীর হাদীসে মুআনআন গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীসে মুসনাদ (مسند) : ক. যে সকল মারফু হাদীসের সনদ মুত্তাসিল তাকে হাদীসে মুসনাদ বলে। এটাই প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মত।খ. কারে মতে মুত্তাসিল সনদের সকল হাদীসকেই মুসাদ বলে, যদিও তা মাওকুফ কিংবা মাকতু হয়।

وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّىْ الْمَرْفُوْعَ مُسْنَدًا وَاِنْكَانَ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا فَصْلٌ وَمِنْ اَقْسَامِ الْحَدِيْثِ الشَّاذُّ وَالْمُنْكَرُ وَالْمُعَلَّلُ-وَالشَّاذُّ فِيْ اللُّغَةِ مَنْ تَفَرَّدَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا وَفِىْ الْاِصْطِلَاحِ مَا رُوِىَ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ رُوَاتُه ثِقَةً فَهُوَ مَرْدُوْدٌ -وَاِنْكَانَ ثِقَةً فَسَبِيْلُه التَّرْجِيْحُ بِمَزِيْدِ حِفْظٍ وَضَبْطٍ أَوْ اَكْثَرِ عَدَدٍ وَوُجُوْهٍ آخَرَ مِنَ التَّرْجِيْحَاتِ اَلرَّاجِحُ يُسَمَّى مَحْفُوْظًا وَالْمَرْجُوْحُ شَاذًّا وَالْمُنْكَرُ حَدِيْثٌ رَوَاهُ ضَعِيْفٌ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ اَضْعَفُ مِنْهُ وَمُقَابْلُه اَلْمَعْرُوْف فَالْمُنْكَرُ وَالْمَعْرُوْفُ كُلًّا رَاوِيْهِمَا ضَعِيْفٌ وَاَحَدُهُمَا اَضْعَفُ مِنَ الْآخَرِ وَفِىْ الشَّاذِّ وَالْمَحْفُوْظِ قَوِىٌّ اَحَدُهُمَا اَقْوَى مِنَ الْآخَرِ وَالشَّاذّوَالْمُنْكَرُ مَرْجُوْحَانِ وَالْمَحْفُوْظُ وَالْمَعْرُوْفُ رَاجِحَانِ وَبَعْضُهُمْ لَم يَشْتَرِطُوْا فِى الشَّاذِّ وَالْمُنْكَرِ قَيْدَ الْمُخَالَفَةِ لِرَاوٍ آخَرَ قَوِيًّا أَوْ ضَعِيْفًا

গ. কেউ কেউ সকল মারফু হাদীসকেই সুনাদ বলেন। যদিও তা মুরসাল অথবা মা'যাল কিংবা মুনকাতি হয়। পরিচ্ছেদ হাদীসের প্রকার ভেদের মধ্যে আছে ১। شاذশায ২। منكر মুনকার, ৩। معلل মু'আল্লাল

শায شاذ শব্দের আভিধানিক অর্থ, যে দল থেকে বের হয়ে একাকী হয়েছে। মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায়, যে হাদীস (এমন বর্ধিত অংশ সহকারে) বর্ণিত হয়েছে যা বিশ্বস্ রাবীদের হাদীসে পাওয়া যায় না। যদি উক্ত হাদীসের রাবী বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে হাদীসটির নাম হবে মারদুধ। যদি বিশ্বস্ত হয়, তাহলে উভয় হাদীসের বিশ্বস্ রাবীর মধে কোন একজনকে প্রাধান্য দিতে হবে। ১। স্মরণ শক্তির ও ২। সংরক্ষণ ক্ষমতার প্রাচুর্যতায় বা ৩। সনদের সংখ্যাধিকের কিংবা প্রাধান্য দানের অন্যন্য গুনাবলীর মাধ্যমে। প্রাধান্য প্রাপ্ত রাবীর হাদীসকে মাহফুযু ও প্রাধান্য বঞ্চিত রাবীর হাদীসকে শায বলে।যদি উভয় রাবী অবিশ্বস্ত হয় (যাদেরকে হাদীসে মারদুধ বলে) তাদের মধ্যে প্রাধানপ্রাপ্ত (কম অবিশ্বস্ত রাবীর হাদীসকে মারুফ এবং প্রাধান্য বঞ্চি বেশি অবশিষ্ত রাবীর হাদীসকে মুনকার বলে।

মোদ্দাকথা মারুফ ও মুনকার উভয় হাদীসের রাবী থাকেন দুর্বল। অবিশ্বস্ত একজন অপরজনের চাইতে বেশি দুর্বল। অবিশ্বস্ত।এবং মাহফুয ও শায উভয় হাদীসের রাবী থাকেন শক্তিশালী (বিশ্বস্ত)। একজন অপরজনের চাইতে বেশি শক্তিশালী (বিশ্বস্ত)। শায ও মুনকার প্রাধান্য বঞ্চিত। মাহফুয ও মারুফ প্রধান্যপ্রাপ্ত। ২। কারো মতে শায ও মুনকার হওয়ার জন্য অন্য শক্তিশালী কিংবা দুর্বল কোন প্রকার রাবীর বিরোধিতার প্রয়োজন নেই। বরং কোন বিশ্বস্ত রাবীএককভাবে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন যার অনুকুলে অন্য কোন সনদ ও সহযোগী পাওয়া যায় না তাকেই শায বলে। এই অর্থে কোন বিশ্বস্ত রাবী যদি এককভাবে কোন সহীহ হাদীসও বর্ণনা করেন তাহলে তাকেও শায বলা হবে।

وَقَالُوْا اَلشَّاذُّ مَارَوَاهُ الثِّقَةُ وَتَفَرَّدَبِهِ وَلَايُوْجَدُ لَه أَصْلٌ مُوَافِقٌ وُمُعَاضِدُلَه وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى فَرْدٍ ثِقَةٍ صَحِيْحوَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا الثِّقَةَ وَلَاالْمُخَالَفَةَ وَكَذَالِكَ الْمُنْكَرُ لَمْ يَخُصُّوْا بِالصُّوْرَةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَسَمُّوْا حَدِيْثَ الْمَطْعُوْنِ بِفِسْقٍ أَوْ فَرْطِ غَلَطٍ اَوْكَثْرَةِ غَفْلَةٍ مُنْكَرًا-وَهَذِهِ اِصْطِلَاحَاتٌ لَامُشَاحَةَ فِيْهَا وَالْمُعَلَّلُ بِفَتْحِ اللَّامِ اِسْنَادٌ فِيْهِ عِلَلٌ وَاَسْبَابٌ غَامِضَةٌ خَفِيَّةٌ قَادِحَةٌ فِى الصِّحَّةِ يَتَنَبَّهُ لَهَا الْحُذَّاقُ الْمَهَرَةُ مِنْ اَهْلِ هَذَا الشَّانِ كَاِرْسَالٍ فِى الْمَوْصُوْلِ وَوَقْفٍ فِىْ الْمَرْفُوْعِ وَنَحْوِ ذَالِكَ وَقَدْ يَقْتَصِرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّلِ بِكَسْرِ اللَّامِ عَنْ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ كَالصَّيْرَفِيِّ فِيْ نَقْدِ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَاِذَا رَوَى رَاوٍ حَدِيْثًا-وَرَوَى رَاوٍ آخَرَ حَدِيْثًا مُوَافِقًا لَه يُسَمَّى هَذَا الْحَدِيْثُ تَابِعًا-بِصِيْغَةِ اِسْمِ الْفَاعِلِ وَهَذَا مَعْنَى مَايَقُوْلُ الْمُحَدِّثُوْنَ تَابَعَه فُلَانٌ

৩। কেউ বলেন শায হওয়ার জন্য রাবী বিশ্বস্ত হওয়ারও প্রয়োজন নেই, কারো বিরোধিতা কারার প্রয়োজন নেই। (শুধু এককভাবে যে কোন হাদীস যে কেউ বর্ণনা করুক তাকে শায বলা হবে। অনুরূপভাবে কারো মতে হাদীস মুনকার হওয়ার জন্য ও উল্লেখিত শর্তাবলী যেমন রাবী হওয়া এর বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই। শুধু পাপাচারী বা অতিরিক্ত ভুলকারী কিংবা অত্যযধিক অলস রাবীর হাদীসকে মুনকার বলে। এ সকল পরিভাষায় মূলত কোন বৈপরিত্য নেই।

হাদীসে মুআ'ল্লাল : প্রথম লামে যবর সহকারে যে হাদীসের সনদে হাদীসটির বিশুদ্ধতায় প্রতিবন্ধক এমন কোন তীক্ষ্ণ ত্রুটি ও সুক্ষ গোপন কারণ নিহিত আছে যা এই শাস্ত্রের দক্ষ অভিজ্ঞরাই কেবল অনুভব করতে সক্ষম। যেমন মুত্তাসিল হাদীসকে মুরসাল রুপে, মারফু হাদীসকে মাওকূফ রুপে অনুরূপভাবে এক প্রকারকে অন্য প্রকারের রুপে উস্পাপন করা ঐ গোপন কারণগুলি এতই সুক্ষ্ণ যে কখনো مَعَلِّلْ (প্রথম লামের যের সহকাওে স্বয়ং মুআল্লাল বলে আখ্যাদানকারী) ও দাবীর পক্ষে প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে যান। যেমন স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা নিরীক্ষন কারীও কোন মুদ্রাকে আসল বা নকল বলে দাবী করলে কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হন। মুতাবি যদি কোন রাবী কোন হাদীস বর্ণনা করেন (আর উক্ত হাদীসকে বা মাত্র এক রাবির বর্ণিত হাদীস মনে করে নেওয়া হয় এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় যে, আরেকজন রাবী উক্ত হাদসের মতো একটি হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে পরবর্তী হাদীসকে اِسْمِ الْفَاعِلِ শব্দে تَابِع বলা হবে এমনটি করাকে মুতাবাআত বলে। এ অর্থেই মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলে থাকেন تابعه فلان এই হাদীসটির মতো একটা হাদীস অমুক বর্ণনা করেছেন।

وَكَثِيْرًامَّا يَقُوْلُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ وَيَقُوْلُوْنَ وَلَه مُتَابِعَاتٌ وَالْمُتَابَعَة يُوْجِبُ التَّقْوِيَةَ وَالتَّايِيْدَ وَلَايَلْزِمُ اَنْ يَكُوْنَ الْمُتَابِعُ مُسَاوِيًّا فِى الْمَرْتَبَةِ لِلْاَصْلِ وَاِنْ كَانَ دُوْنَه يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَةِ وَالْمُتَابَعَةُ قَدْ يَكُوْنُ فِيْ نَفْسِ الرَّاوِيِّ وَقَدْ يَكُوْنُ فِيْ شَيْخٍ فَوْقَه وَالْأَوَّلُ اَتَمُّ وَاَكْمَلُ مِنَ الثَّانِيِّ لِاَنَّ الوَهْنَ فِيْ أَوَّلِ الْاِسْنَادِ اَكْثَرُ وَاَغْلَبُ وَالْمُتَابِعُ اِنْ وَافَقَ الْاَصْلَ فِيْ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى يُقَالُ مِثْلُه وَاِنْ وَافَقَ فِى الْمَعْنَى دُوْنَ اللَّفْظِ يُقَالُ نَحْوَهُ وَيُشْتَرَطُ فِى الْمُتَابَعَةِ أَنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْثَانِ مِن صَحَابِيِّ وَاحِدوَاِنْ كَانَ صَحَابِيَيْنِ يُقَالُ لَه شَاهِدٌ كَمَا يُقَالُ لَه شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَيُقَالُ لَه شَوَاهِدُ وَيَشْهَدُ بِهِ حَدِيْثُ فُلَانٍ وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّوْنَ الْمُتَابِعَ بِالْمُوَافَقَةِ فِى اللَّفْظِ وَالشَّاهِدُ فِى الْمَعْنَى سَوَاءٌ كَانَ مِنْ صَحَابِيِّ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ صَحَابِيَيْنِ

ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ বুখারিতে অধিক হারে এরকম বলেছেন। কেউ বলেন وله متابعاتএ হাদীসটির অনেক সহযোগি হাদীস আছে। মুতাবাআত হাদীসটিকে শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ করে তোলে। মুতাবে হাদীসটি মূল হাদীসের সমস্তরের হওয়ার জরুরী নয়। মূল হাদীসের নীচেরস্তরেরও হতে পারে।

মুতাবাআত দুই প্রকার

ক. কখনো স্বয়ং রাবীর মধ্যে হয়ে থাকে, যাকে পূর্ণাঙ্গ মুতাবাআত বলে।

খ. কখনো রাবীর উরের কোন উস্তাদের মধ্যে হতে পারে, যাকে অপূর্ণাঙ্গ মুতাবাআত বলে। প্রথম প্রকারটি দ্বিতীয় প্রকারের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ কেননা সনদের প্রথমদিকে অধিকতর ও সিংহভাগ দুর্বলতা থাকে।

মুতাবে হাদীসটি যদি মুল হাদীসটির শব্দে ও অর্থে মিল থাকে তাহলে বলা হয় مثلهআর যদি শুধু অর্থে মিল থাকে, শব্দে নয় তাহলে বলা হয় نحوه

মুতাবাতের জন্য শর্ত হচ্ছে দুইটি

ক. উভয় হাদীস এক সাহাবী থেকে বর্ণিত হওয়া। খ. উভয় হাদীসের অর্থ ও মর্ম এক হওয়া। যদি হাদীসদ্বয় দুই সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় হাদীসটিকে বলা হয় শাহিদ যেমন বলা হয়। له شاهد من حديث ابى هريرة হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি এই হাদীসটির শাহিদ। কখনো বলা হয় له شواهد হাদীসটির প্রচুর শাহিদ রয়েছে। يشهد به حديث فلان অমুক থেকে বর্ণিত হাদীসটি এই হাদীসের শাহিদ। গ. কেউ কেউ উভয় হাদীসে শুধু শব্দে মিল থাকাকে মুতাবাআত বলেন এবং অর্থে মিল থাকাকে শাহিদ বলেন। চাই এক সাহাবী থেকে বর্তি হোক চাই একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হোক।

وَقَدْ يَطْلُقُ الشَّاهِدُ وَالْمُتَابِعُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالْأَمْرُ فِيْ ذَالِكَ بَيِّنٌ وَتَتَبُّعُ طُرُقِ الْحَدِيْثِ وَاَسَانِيْدِهِ لِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ يُسَمَّى الْاِعْتِبَار فَصْلٌ - وَاَصْلُ اَقْسَامِ الْحَدِيْثِ ثَلْثَةٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ ضَعِيْفٌ الصَّحِيْحُ اَعْلَى مَرْتَبَةًوَالضَّعِيْفُ اَدْنَى وَالْحَسَنُ مُتَوَسِّطٌ وَسَائِرُ الْاَقْسَامِ الَّتِيْ ذَكَرْتُ دَاخِلَةٌ فِيْ هَذِهِ الثَّلَاثَة فَالصَّحِيْحُ مَا ثَبَتَ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَاشَاذٍّ فَاِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ فَهُوَ الصَّحِيْحُ لِذَاتِهِ وَاِنْ كَانَ فِيْهِ نَوْعُ قُصُوْرٍ وَوُجِدَ مَا يُجْبَرُ ذَالِكَ الْقُصُوْرُ مِنْ كَثْرَةِ الطُّرُقِ فَهُوَ الصَّحِيْحُ لِغَيْرِهِ وَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ فَهُوض الْحَسَنُ لِذَاتِهِ وَمَا فُقِدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِى الصَّحِيْحِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيْفُ وَالضَّعِيْفُ اِنْ تَعَدَّدَ طُرُقُه وَانْجُبِر ضُعْفُه يُسَمَّى حَسَنًا لِغَيْرِه وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اَنَّه يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ جَمِيْعُ الصِّفَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ فِى الصَّحِيْحِ نَاقِصَاتٌ فِى الْحَسَنِ لَكِنَّ التَّحْقِيْقَ اَنَّ النُّقْصَانَ الَّذِىْ اُعْتُبِرَ فِى الْحَسَنِ اِنَّمَا هُوَ بِخِفَّةِ الضَّبْطِ وَبَاقِىْ الصِّفَاتِ بِحَالِهَا

ঘ. মুতাবে ও শাহিদ কখনো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর কারণ সুস্পষ্ট। এতেবার মুতাবে ও শাহিদ জানার উদ্দেশ্যে হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়াত ও সনদ অনুসন্ধান করাকে এতেবার বলে।

পরিচ্ছেদ হাদীসের মূল প্রকারভেদ : মৌলিকভাবে হাদীস তিন প্রকার: ১। صحيح সহীহ, ২। حسن হাসান, ৩। ضعيف যঈফ। সহীহ সর্বোচ্চ ও যঈফ সর্বনিম্ন এবং হাসান মধ্যস্তরের হাদীস। পূর্বোল্লিখিত সকল প্রকার হাদীসই এই তিন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ : যে হাদীসটি বিশ্বস্ত, মেধাবী রাবী কর্তৃক মুআল্লাল ও শায হওয়া ছাড়াই মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয় তাকে সহীহ বলে। যদি এ সকল পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থভাবে থাকে তাহলে উক্ত হাদীসকে সহীহ লিযাতিহী বলে।

সহীহ লিগাইরিহী : যদি এ সকল গুনে কোন প্রকার ঘাটতি হয় আর সনদের আধিক্য ইত্যাদি দ্বারা এ ঘাটতি পূন করা যায় তাহলে তাকে সহীহ লিগাইরিহী বলে।

হাসান : লিযাতিহী আর যদি ঘাটতি পুরনের কিছু না পাওয়া যায় তাহলে তাকে হাসান নিযাতিহী বলে।

যঈফ : যদি উল্লোখিত গুণসমূহ পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক অনুপস্তিত থাকে আর এ ঘাটতি পূরনের কোন উপয় না থাকে তাহলে তাকে যঈফ বলে।

হাসান লিগাইরিহী : যইফ হাদীসের ঘাটত যদি সনদের আধিক্য ইত্যাদি কোন উপায়ে দুর হয়ে যায় তাহলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলে। মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্যে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় সহীহ এর সংজ্ঞায় উল্লোখিত সকল গুণেই দুর্বলতা থাকলে হাদীস হাসান হয় কিন্তু ব্যাপার তা নয় বরং বাস্তব কথা হলো সহীহ ও হাসানের মধ্যকার পার্থক্য হচ্ছে শুধু স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে সহীহ হাদীস হাসানের পরিণত হয়।

وَالْعَدَالَةُ مَلَكَةٌ فِى الشَّخْصِ تَحْمِلُه عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوَّةِ وَالْمُرَادُ بِالتَّقْوَى اِجْتِنَابُ الْاَعْمَالِ السَّيِّئَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْفِسْقِ وَالْبِدْعَةِ وَفِى الْاِجْتِنَابِ عَنِ الصَّغِيْرَةِ خِلَافُ اَلْمُخْتَارُ عَدَمُ اِشْتِرَاطِهِ لِخُرُوْجِهِ عَنِ الطَّاقَةِ اِلَّاالْاِصْرَارِ عَلَيْهَا لِكَوْنِهِ كَبِيْرَةً وَالْمُرَادُ بِالْمُرُوَّةِ اَلتَّنَزُّهُ عَنْ بَعْضِ الْخَسَائِسِ وَالنَّقَائِصِ الَّتِىْ هِىَ خِلَافُ مُقْتَضَى الْهِمَّةِ وَالْمُرُوَّةِ مِثْلُ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الدَّنِيَّةِ كَالْاَكْلِ وَالشُّرْبِ فِى السُّوْقِ وَالْبَوْلُ فِى الطَّرِيْقِ وَاَمْثَالُ ذَالِكَوَيَنْبَغِىْ اَنْ يُعْلَمَ اَنَّ عَدْلَ الرِّوَايَةِ اَعَمُّ مِنْ عَدْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّ عَدْلَ الشَّهَادَةِ مَخْصُوْصٌ بِالْحُرِّوَعَدْلُ الرِّوَايَةِ يَشْتَمِلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْمُرَادُ بِالضَّبْطِ حِفْظُ الْمَسْمُوْعِ وَتَثْبِيْتُه مِنَ الْفَوَاتِ وَالْاِخْتِلَالِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنَ مِنْ اِسْتِحْضَارِهِ وَهُوَ قِسْمَانِ ضَبْطُ الصَّدَرِ وَضَبْطُ الْكِتَابِ فَضَبْطُ الصَّدَرِ بِحِفِظِ الْقَلْبِ وَوَعْيِهِ وَضَبْطُ الْكِتَابِ بِصِيَانَتِهِ عِنْدَه اِلَى وَقْتِ الْاَدَاء

আদালত ব্যক্তির এমন যোগ্যতা যা তাকে تقوى ও مروة বা মানবতায় উদ্বুদ্ধ করে। তাকওয়া এর মর্ম হচ্ছে শিরক পাপাচারিতা ও বিদআত ইত্যাদি মন্দ কর্ম থেকে মুক্ত থাকা। আর সগীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা মুত্তাকি হওয়ার জন্য শর্ত কি না এতে মতবেদ আছে। গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে শর্ত হওয়া। কারণ সগীরাহ গুনাহমুক্ত হওয়া মানুষের সাধ্যের বাহিরে তবে হ্যাঁ সগীরাহে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া তাকওয়ার পরিপন্থি এতে কারো দ্বিমত নেই। মুরুওয়াত এর মর্ম হচ্ছে এমন কিছু অভদ্র ও নিচু স্বভাব পরিহার করা যা আত্মমর্যাদাবোধ ও মানবীয় শিষ্টাচার পরিপন্হি। যেমন কিছু বৈধ অথচ নীচু স্বভাব উদাহরণতঃ বাজারে খানা পিনা, রাস্তায় প্রস্রাব করা ও অনুরূপ নিচু স্বভাবের কার্যাবলী।

জেনে রাখা উচিৎ: হাদীস বর্ণনায় বিশ্বস্ত হওয়া সাক্ষীর বিশ্বতার তুলনায় ব্যাপক। কারণ সাক্ষীর বিশ্বস্থতায় সীমাবদ্ধ স্বাধীনের মধ্যে (কারণ গোলাম বা পরাধীনের বিশ্বস্ততা আদালতে অগ্রাহ্য) পক্ষান্তরে হাদীস বর্ণনার বিশ্বস্ততার স্বাধীন পরাধীন উভয়কে সন্নিবেশন করে (কারণ বিশ্বস্ত স্বাধীনের হাদীস যেমন গ্রহণযোগ্য বিশ্বস্ত গোলামের হাদীসও তেমন গ্রহণযোগ্য।

الضبط যবত এর মর্ম হচ্ছ শ্রুত হাদীসের মুখস্ত করণ ও হারানো-বিকৃতি থেকে এমনভাবে সংরক্ষণ যাতে প্রয়োজনের সময় অনায়াসে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়।

যবত দুই প্রকার : ক. ضبط الصدر খ. ضبط الكتابة

যাবতুস সদর স্মৃতিতে অংকন ও সংরক্ষণ

যবতুল কিতাবত হাদীসের লিখিত কপি হাদীস বর্ণনার সময় পর্যন্ত বর্ণনা কারীর সংগ্রহে বিদ্যমান থাকা।

فَصْلٌ: اَمَّا الْعَدَالَةُ فَوُجُوْهُ الطَّعْنِ الْمُعَلَّقَةِ بِهَا خَمْسٌ اَلْاَوّلُ بِالْكِذْبِ وَالثَّانِىْ بِاِتِّهَامِهِ بِالْكِذْبِ وَالثَّلِثُ بِالْفِسْقِ وَالرَّابِعُ بِالْجِهَالَةِ وَالْخَامِسُ بِالْبِدْعَةِ **وَالْمُرَادُ بِكِذْبِ الرَّاوِىِّ** اَنَّه ثَبَتَ كِذْبُه فِى الْحَدِيْثِ النَّبَوِىِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمَّا بِاِقْرَارِ الْوَاضِعِ أَوْ بِغَيْرِ ذَالِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ - وَحَدِيْثُ الْمَطْعُوْنِ بِالْكِذْبِ يُسَمَّى مَوْضُوْعًا وَمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ تَعَمُّدُ الْكِذْبِ فِى الْحَدِيْثِ وَاِنْ كَانَ وُقُوْعُه فِى الْعُمَرِ مَرَّةً وَاِنْ تَابَ مِنْ ذَالِكَ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيْثُه اَبَدًا بِخِلَافِ شَاهَدِ الزُّوْرِ اِذَا تَابَ فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيْثِ الْمَوْضُوْعِ فِيْ اِصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ هَذَا لَااَنَّه ثَبَتَ كِذْبُه وَعُلِمَ ذَالِكَ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ بِخُصُوْصِهِوَالْمَسْئَةُ ظَنِّيَّةٌ وَ الْحُكْمُ بِالْوَضْعِ وَالْاِفْتِرَاءِ بِحُكْمِ الظَّنِّ الْغَالِبِ وَلَيْسَ اِلَى الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ بِذَالِكَ سَبِيْلٌ فَاِنَّ الْكَذُوْبَ قَدْ يَصْدُقُ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَاقِيْلَ فِيْ مَعْرِفَةِالْوَضْعِ بِاِقْرَارِ الْوَاضِعِ اَنَّه يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ كَاذِبًا فِيْ هَذَاالْاِقْرَارِ فَاِنَّه يُعْرَفُ صِدْقُه بِغَالِبِ الظَّنِّ وَلَوْلَاذَالِكَ لَمَا سَاغَ قَتْلُ الْمُقِرِّ بِالْقَتْلِ وَلَارَجْمَ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَاءِ فَافْهَم

(عدالت))বিশ্বস্ডতা বিনষ্টকারী দুষ পাঁচটি-

১. মিথ্যা বলা, ২. মিথ্যার অপবাদ দুষ্ট হওয়া, ৩. পাপচারিতা, ৪. অজ্ঞাত অপরিচিত হওয়া, ৫. বিদআতী হওয়া।

রাবীর মিথ্যাচারের মর্ম হচ্ছে হাদীসে নববীতে তার মিথ্যাচার প্রমানিত হওয়া। হয়তো তার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে নতুবা অন্য কোন সুত্রের মাধ্যমে। الموضوع মিথ্যার দুষে দোষী রাবীর হাদীসকে موضوع বা জাল হাদীস বলে।

আর যে ব্যক্তি থেকে হাদীসে সেচ্ছায় মিথ্যাচার প্রমাণিত হয় যদিও তা জীবনে এক বার হয়,যদিও সে এরূপ মিথ্যা থেকে তওবা করে, তবুও তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না। পক্ষান্তরে সাক্ষীদাতা যদি তওবা করে তা হলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় হাদীসে মওযু বলতে এটাই বুঝয় অর্থাৎ রাবীর জীবনে এক বার কোন একটা হাদীস জাল করেছিল, যদ্বারা একথা ধারণা করে নেওয়া হয় যে হয়তো সে সকল হাদীসেই এমন করে থাকবে।

আদৌ এটা উদ্দেশ্য নয় যে তার মিথ্যা সকল হাদীসে প্রমাণিত এবং বিশেষভাবে এই হাদীসেও তা জানা গেছে।

মূলত বিষয়টি অনুমান হতে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে অপবাদ ও জাল সাভ্যস্ত করা হয় এ ব্যাপারে দৃঢ় ও অকাট্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন পথ নেই। কারণ মিথ্যুকও কখনো সত্য বলে এ আলোচনা দ্বারা হাদীস জালকারীর স্বীকারোক্তিতে হাদীসের জাল হওয়া অবগত হওয়ার যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তা সমাধান হয়ে যায়। এভাবে যে তার উক্ত স্বীকারোক্তিতে মিথ্যাবাদী ও তো হতে পারে।

কারণ তার স্বীকারোক্তির সত্যতা প্রবল ধারণা ভিত্তিতে সাব্যস্ত্র হয়। যদি এট (প্রবল ধারণ গ্রহণযোগ্য)না হয় তাহলে হত্যা স্বীকার কারীকে মৃত্যুদন্ড ও ব্যভিচার স্বীকার কারীকে প্রস্থর আঘাতে প্রাণদন্ড দেওয়া যাবে না। কারণ তখনও তাদের স্বীকারোক্তিতে মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে।

এ সম্ভাবনাকে নাকোচ করে দিয়ে প্রবল ধারণাটা ধরতব্য হওয়ার কারণ এতে স্বীকারোক্তি প্রদান কারীর কোন লাভ নেই। থাকলে বলা যেত যে, এই লাভ অর্জনের জন্য স্বীকারোক্তি দিচ্ছে বরং এতে তার মারাত্মক ক্ষতি। তদ্রূপ হাদীস জালকারীর স্বীকারোক্তিও একই কারণে গ্রহণ হয়। (অনুধাবন কর)

وَاَمَّا اِتِّهَامُ الرَّاوِىِّ بِالْكِذْبِ فَبِاَنْ يَّكُوْنَ مَشْهُوْرًا بِالْكِذْبِ مَعْرُوْفًا فِيْ كَلَامِ النَّاسِ وَلَمْ يَثْبُتْ كِذْبُه فِى الْحَدِيْثِ النَّبَوِىِّ وَفِىْ حُكْمِهِ رِوَايَةُ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ مَعْلُوْمَةً ضَرُوْرِيَّةً فِى الشَّرْعِ كَذَا قِيْلَ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ مَتْرُوْكًا كَمَا يُقَالُ حَدِيْثُه مَتْرُوْكٌ وَفُلَانٌ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ وَهَذَا الرَّجُلُ اِنْ تَابَ وَصَحَّتْ تَوْبَتُه وَظَهَرَتْ اَمَارَاتُ الصِّدْقِ مِنْهُ جَازَ سِمَاعُ الْحَدِيْثِ وَالَّذِىْ يَقَعُ مِنْهُ الْكِذْبُ اَحْيَانًا نَادِرًا فِيْ كَلَامِهِ غَيْرِ الْحَدِيْثِ النَّبَوِىِّ فَذَالِكَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِيْ تَسْمِيَةِ حَدِيْثِهِ بِالْمَوْضُوْعِ أَوْ الْمَتْرُوْكِ وَاِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً **وَاَمَّاالْفِسْقُ** فَالْمُرَادُبِهِ اَلْفِسْقُ فِىْ الْعَمَلِ دُوْنَ الْاِعْتِقَادِ فَاِنَّ ذَالِكَ دَاخِلٌ فِى الْبِدْعَةِ وَاَكْثَرُمَايُسْتَعْمَلُ الْبِدْعَةُ فِى الْاِعْتِقَادِ وَالْكِذْبُ وَاِنْ كَانَتْ دَاخِلًا فِىْ الْفِسْقِ لَكِنَّهُمْ عَدُّوْهُ اَصْلًا عَلَى حَدَةٍ لِكَوْنِ الطَّعْنِ بِهِ اَشَدُّ وَاَغْلَظُ **وَاَمَّا جَهَالَةُ** الرَّاوِىِّ فَاِنَّه اَيْضًا سَبَبٌ لِلطَّعْنِ فِى الْحَدِيثِ لِاَنَّه لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ اِسْمُه وَذَاتُه لَمْ يُعْرَفْ حَالُه وَاَنَّه ثِقَةٌ اَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ

মিথ্যার অপবাদ দুষ্ট রাবী : (দ্বারা উদ্দেশ্য) হলো মানুষের সাথে কথোপকথনের মিথ্যাবাদী রুপে কুখ্যাত ও পরিচিত হওয়া। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা থেকে তার মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত ঐ হাদীস যা শরীয়তের কোন অত্যাবশ্যকীয় ও সুবিদিত বিধানের বিরোধী। এভাবে বলা হয়েছে। এ প্রকার হাদীসকে মাতরুক متروك বলা হয়। যেমন বলা হয় অমুকের হাদীস متروك বা পরিত্যক্ত। অমুক فلان متروك الحديث হাদীসের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত এরূপ ব্যক্তি যদি তাওবা করে আর তার তাওবা খাটি হয় এবং তার মধ্যে সত্যবাদীতার নিদর্শন পাওয়া যায় তাহলে তার হাদীস শ্রবণ (গ্রহণ) বৈধ। আর যে ব্যক্তি থেকে হাদীসে নববী ছাড়া কথায় বার্তায় কোন কোন সময় অল্প স্বল্প মিথ্যা সংঘটিত হয় এ কারণে তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযু বা মাতরুক বলা যাবে না যদিও অল্প স্বল্প মিথ্যা বলাটাও গুনাহের কাজ।

فسق তথা পাপাচার দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে আমলী বা কর্মগত পাপাচার। এতকাদি বা বিশ্বাসগত পাপাচর নয়। কারণ বিশ্বাসগত পপাচার বিদআতের অন্তর্গত এবং বিদআত শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতেকাদি বা বিশ্বাসগত পাপাচারের বেলায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

كذب বা মিথ্যা যদিও পাপাচারের অন্তভুক্ত তবুও মুহাদ্দিসগণ এটাকে স্বতন্ত্র প্রকার হিসাবে গণ্য করার কারণ হলো হাদীস শাস্ত্রে মিথ্যাচারে অভিযুক্ত হওয়া মারাত্মক গুরুতর অপরাধ।

جهالة الراوى বা রাবীর অপরিচিত হওয়া ও হাদীস শাস্ত্রে দোষের কারণ। এজন্য যে যখন তার নাম ও সত্তাই জানা গেল না তখন তার অবস্থাও অজ্ঞাত রইল। এবং সে বিশ্বস্ত নাকি অ বিশ্বস্ত তাও অজনা রইল।

كَمَا يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ أَوْ اَخْبَرَنِيْ شَيْخٌ وَهَذَا يُسَمَّى مُبهَمًا وَحَدِيْثُ الْمُبْهَمِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ صَحَابِيًّا لِاَنَّهُمْ عُدُوْلٌ وَاِنْ جَاءَ الْمُبْهَمُ بِلَفْظِ التَّعْدِيْلِ كَمَا يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ عَدْلٌ أَوْ حَدَّثَنِيْ ثِقَةٌ فَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ وَالْاَصَحُّ اَنَّه لَايُقْبَلُ لِاَنَّه يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ عَدْلًا فِيْ اِعْتِقَادِهِ لَا فِيْ نَفْسِ الْاَمِ وَاِنْ قَالَ اِمَامٌ حَاذِقٌ قُبِلَ **وَاَمَّا الْبِدْعَةُ** فَالْمُرَادُ بِهِ اِعْتِقَادُ اَمْرٍ مُحْدَثٍ عَلَى خِلَافِ مَاعُرِفَ فِيْ الدِّيْنِ وَمَاجَاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَصْحَابَه بِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَتَاْوِيْلٍ لَا بِطَرِيْقِ جُحُوْدٍ وَاِنْكَارٍ فَاِنَّ ذَالِكَ كُفْرٌ وَحَدِيْثُ الْمُبْتَدِعِ مَرْدُوْدٌ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ اِنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِصِدقِ اللَّهْجَةِ وَصِيَانَةِ اللِّسَانِ قُبِلَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنْ كَانَ مُنْكَرًا لِاَمْرٍ مُتَوَاتِرٍ فِيْ الشَّرْعِ وَقَدْ عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ كَوْنُه مِنَ الدِّيْنِ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا الصِّفَةِ يُقْبَلُ وَاِنْ كَفَّرَهُ الْمُخَالِفُوْنَ مَعَ وُجُوْدِ ضَبْطٍ وَوَرَعٍ وَتَقْوًى وَاِحْتِيَاطٍ وَصِيَانَةٍ

যেমন কেউ বলে حدثني رجل এক ব্যক্তি আমার কাছে প্রার্থনা করেছেন অথবা বলে اخبرني شيخ এক শায়খ আমাকে অবহিত করেছেন। মেন রাবলি হাদিসেক মুবহাম বলে এবং হাদিসে মুবহাম গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অজ্ঞাত ব্যক্তিটি অবিশ্বস্ত ও হতে পারে। তবে অজ্ঞাত ব্যক্তি যদি সাহাবী হন তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সকল সাহাবীই বিশ্বস্ত। মুবহাম হাদিস যদি আস্যজ্ঞাপক শব্দে বর্ণিত হয়। যেমন কেউ বলে أخبرني عدل এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে অবহিত করেছেন অথবা বলে حدثني ثقة এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, এতে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মতটি হচ্ছে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হতে পারে এই রাবী বর্ণনাকারীর বিশ্বাস মতে বিশ্বস্ত। অথচ বাস্তবে বিশ্বস্ত নয়। তবে হ্যাঁ যদি হাদিসের কোন অভিজ্ঞ ইমাম বলেন তাহলে উক্ত হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে।

البدعة বিদাত এর মর্ম হচ্ছে রাসূল সা ও সাহাবীদের থেকে বর্ণিত ও ধর্মীয় প্রসিদ্ধ বিধানের বিপরীত নতুন কোন মতবাদে বিশ্বাস করা কোন প্রকার সংশয় ও ব্যাখ্যার সুযোগে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকারের ভিত্তিতে নয়, কারণ এমনটা করা কুফুরী।

বিদআতির হাদিস حديث المبتدع

১. জুমহুর মুহাদ্দিসীনদের মতে গ্রহণযোগ্য নয়। ২. কতিপয় মুহাদ্দিসীনদের মতে সত্যভাষী ও সংযতবাক বিদআতির হাদিস গ্রহণযোগ্য। ৩. কেউ বলেন ধর্মীয় বিষয় হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণি ও মুতাওয়াতির ভাবে বর্ণিত শরীয়তের কোন বিধান অস্বীকারকারী বিদআতীর হাদীস গ্রহণ যোগ্য নয়। যদি অস্বীকারকারী না হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। সংরক্ষণ ক্ষমতা, খোদাভীতি, পরহেজগারী, সতর্কতা, ত্রুটিমুক্ত থাকা সত্বেও বিরোধিরা তাকে কাফির আখ্যা দিলেও তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে।

وَالْمُخْتَارُ اَنَّه اِنْ كَانَ دَاعِيًا اِلَى بِدْعَتِهِ وَمُرَوِّجًا لَه رُدَّ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَ قُبِلَ اِلَّا اَنْ يَرْوِىَ شَيْئًا يُقَوِّىْ بِهِ بِدْعَتَه فَهُوَ مَرْدُوْدٌ قِطْعًا وَبِالْجُمْلَةِ الْاَئِمَّةُ مُخْتَلِفُوْنَ فِيْ اَخْذِ الْحَدِيْثِ مِنْ اَهْلِ الْبِدَعِ وَالْاَهْوَاءِ وَاَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الزَّائِغَةِ وَقَالَ صَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ اَخَذَجَمَاعَةٌ مِنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ مَنْ فِرْقَةِ الْخَوَارِجِ وَالْمُنْتَشَبِّهِيْنَ اِلَى الْقَدَرِ وَالتَّشَيُّعِ وَالرَّفَضِ وَسَائِرِ اَصْحَابِ الْبِدَعِ وَالْاَهْوَاءِ وَقَدْ اِحْتَاطَ جَمَاعَةٌ آخَرُوْنَ وَتَوَرَّعُوْا عَنْ اَخْذِ حَدِيْثٍ مِّنْ هَذِهِ الْفِرَقِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ نِيَّاتٌ اِنْتَهَى وَلَاشَكَّ اَنَّ اَخْذَ الْحَدِيْثِ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ يَكُوْنُ بَعْدَ التَّحَرِّىْ وَالْاِسْتِصْوَابِ وَمَعَ ذَالِكَ الْاِحْتِيَاطِ فِيْ عَدَمِ الْاَخْذِ قَدْ ثَبَتَ اَنَّ هَؤُلَاءِ الْفِرَقِ كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ الْاَحَادِيْثَ لِتَرْوِيْجِ مَذَاهِبِهِمْ وَكَانُوْا يُقِرُّوْنَ بِهِ بَعْدَالتَّوْبَةِ وَالرُّجُوْعِ والله اعلم

فَصْلٌ. وَاَمَّا وُجُوْهُ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضَّبْطِ فَهِيَ اَيْضًا خَمْسَةٌ اَحَدُهُمَا فَرْطُ الْغَفْلَةِ وَثَانِيُهَا كَثْرَةُ الْغَلَطِ وَثَلِثُهَا مُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ وَرَابِعُهَاوَهْمٌ وَخَامِسُهَا سُوْءُ الْحِفْظِ

৪. নির্বাচিত মত হচ্ছে যদি সে বিদআতের দিকে আহবানকারী ও প্রচলনকারী হয়, তাহলে তার হাদিস প্রত্যাখ্যাত হবে। এমনটি না হলে গ্রহণীয় হবে। তবে যদি তার বর্ণিত হাদিস তার বিদআতের সমর্থক হয়, তাহলে তার হাদিস নিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যাত হবে। মোটকথা বিদআতী, আত্মপুজারী, ভ্রান্তমতবাদে বিশ্বাসীদের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণে আইম্মায়ে হাদীস বিভিন্ন মত পোষন করেছেন। জামেউল উসূল গ্রন্কার বলেন একদল আইম্মায়ে হাদিস খারেজী কুদরীয়া, শিয়া, রাফেযীসহ সর্বপ্রকার বিদআতি ও আত্মপুজারীদের কাছ থেক হাদীস গ্রহণ করেছেন।

পক্ষান্তরে অন্য একদল মুহাদ্দিস এ সকল ফেরকার লোকদের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং বিরত রয়েছেন। এতে তাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সকল ফিরকার কাছ থেকে কেবল অনুসন্ধান ও সত্যোদঘাটনের পরেই হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যে হাদিস গ্রহণ না করার মধ্যে সতর্কতা নিহিত। কারণ তারা নিজেদের মতামত প্রতিষ্টিত করার জন্য হাদিস জাল করতো বলে প্রমাণিত। তওবা করার পর তারা তা স্বীকার করত।

ضبط সংরক্ষণ সম্পর্কিত দোষ পাঁচটি।

১. فرط الغلط সীমাতিরিক্ত ভুল। ২. كثرة الغفلة অত্যধিক অলসতা। ৩. مخالفة الثقات বিশ্বস্ত রাবীদের বিরোধিতা। ৪. الوهم ধারণার বশীভুত। ৫. سوء الحفظ স্মৃতির ত্রুটি

اَمَّا فَرْطُ الْغَلَةِ وَكَثْرَةُ الْغَفْلَةِ فَمُتَقَارِبَانِ فَالْغَفْلَةُ فِيْ السَّمَاعِ وَتَحَمُّلِ الْحَدِيْثِ والْغَلَطُ فِيْ الْاِسْمَاعِ وَالْاَدَاءِ وَمُخَالَفَةُ الثِّقَةِ فِيْالْاِسْنَادِ وَالْمَتِنِ يَكُوْنُ عَلَى اَنْحَاءٍ مُتَعَدَّدَةٍ تَكُوْنُ مُوْجِبَةً لِلشُّذُوْذِ وَجَعْلُه مِنْ وُجُوْهِ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضَّبْطِ مِنْ جِهَةِ اَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى مُخَالَفَةِ الثِّقَاتِ اِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَعَدَمُ الصِّيَانَةِ عَنِ التَّغْيِيْرِ وَالتَّبْدِيْلِ- وَالطَّعْنُ مِنْ جِهَةِ **الْوَهْمِ** وَالنِّسْيَانِ الَّذَيْنِ اَخْطَابِهِمَا وَرُوِىَ عَلَى سَبِيْلِ تَوَهُّمٍ اِنْ حَصَلَ الْاِطِّلَاعُ عَلَى ذَالِكَ بِقَرَائِنِ دَالَّةٍ عَلَى وُجُوْهِ عِلَلٍ وَاَسْبَابٍ قَادِحَةٍ كَانَ الْحَدِيْثُ مَعَلَّلًا وِهَذَا اَغْمَضُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ وَاَدَقُّهَا وَلَايَقُوْمُ بِهِ اِلَّامَنْ رُزِقَ فَهْمًا وَحِفْظًا وَاسِعًا وَمَعْرِفَةً تَامَّةً بِمَرَاتِيْبِ الرُّوَاةِ وَاَحْوَالِ الْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُوْنِ كَالْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ اَرْبَابِ هَذَا الْفَنِّ اِلَى اَنْ اِنْتَهَى اِلَى الدَّارَ قُطْنِيِّ وَيُقَالُ لَمْ يَاْتِ بَعْدَهَ مِثْلُه فِيْ هَذَا الْاَمْرِ والله اعلم **وَاَمَّا سُوْءُ الْحِفْظِ** فَقَالُوْا اَنَّ الْمُرَادَ بِهِ اَنْ لَايُكُوْنَ اِصَابَتُه اَغْلَبَ عَلَى خَطَائِهِ وَحِفْظُه وَاِتْقَانُه اَكْثَرَ مِنْ سَهْوِهِ وَنِسْيَانِهِ يَعْنِىْ اِنْ كَانَ خَطَئُه وَنِسْيَانُه اَغْلَبَ اَوْمُسَاوِيًا لِصُوَابِهِ وَاِتْقَانِهِ كَانَ دَاخِلًا فِيْ سُوْءِ الْحِفْظِ

فرط الغلط সীমাতিরিক্ত ভুল ও অত্যাধিক অলসতা উভয়টা প্রায় কাছাকাছি পর্যায়ের। অলসতা হয়ে থাকে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণের সময় এবং ভুল হয়ে থাকে বর্ণনা ও শোনানোর সময়।

محالفة الثقات বিশ্বস্ত রাবীদের বিরোধিতা সনদ ও মতনে বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যে, কারণে হাদিসকে শায বলে। বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতাকে ضبط সম্পর্কিত দোষসমূহের লিষ্টভুক্ত করা হয়েছে। এই জন্য যে বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতা হয়ে থাকে একমাত্র সংরক্ষণ ও স্মরণ রাখতে না পারা ও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন মুক্ত থাকতে না পারার কারণে।

الوهم ধারণা ও স্মৃতি বিসৃত হওয়ার কারণে সংসয়ের স্বীকার হয়ে রাবী যে ভুল করে তা যদি এমন নিদর্শন দ্বারা অবগত হওয়া যায়, যা হাদীসের বিশুদ্ধতায় খুত ও ত্রুটির কারণে এমন হাদীসকে মুয়াল্লাল বলে। ইহা হাদীস শাস্ত্রের সুক্ষ্ণ ও তীক্ষ্ণ বিষয় এ বিষয়ে একমাত্র ঐ ব্যক্তি পারদর্শী হতে পারে যাকে আল্লাহ প্রশস্ স্মরণশক্তি দান রাবীদের স্তর সনদ ও মতনের অবস্া সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি দান করেছেন। যেমন হাদীস শাস্ত্রের পূর্বপুরুষগণ যাদের ধারাবাহিকতা ইমাম দারে কুতনি রহ. মৃত ৩৮৫ হি. পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। বলা হয় তার পরে তাঁর মতো এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কেউ আসেননি।

স্মরণশক্তির দুর্বলতার মর্ম হচ্ছে যার সঠিক বর্ণনা ভুল বর্ণনার তুলানায় বেশি নয়, তবে স্মরণ শক্তি ও সংরক্ষণ ক্ষমতা প্রবল, স্মৃতি বিস্মৃতি ও হারিয়ে ফেলার তুলনায়। অর্থাৎ তার ভুল ও স্মৃতি বিস্মৃতি হওয়া যদি সঠিক বর্ণনা করা ও সংরক্ষণ ক্ষমতার সমান বা বেশি হয়, তাহলে সে রাবী স্মরণশক্তি দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

فاالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ صُوَابُه وِاِتْقَانُه وَكَثْرَتُهُمَ وَسُوْءُ الْحِفْظِ اِنْ كَانَ لَازِمَ حَالِهِ فِيْ جَمِيْعِ الْأَوْقَاتِ وَمُدَّةِ عُمْرِهِ لَايُعْتَبَرُ بِحَدِيْثِهِ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُحَدِّثِيْنَ هَذَا اَيْضًا دَاخِلٌ فِى الشَّاذِّ وَاِنْ طَرَءَ سُوْءُ الْحِفْظِ لِعَارِضٍ مِثْلُ اِخْتِلَالٍ فِى الْحَافِظَةِ بِسَبَبِ كِبْرِ سِنِّهِ أَوْ ذِهَابِ بَصَرِهِ أَوْ فَوَاتِ كُتُبِهِ فَهَذَا يُسَمَّى مُخْتَلِطًا فَمَارُوِىَ قَبْلَ الْاِخْتِلَاطِ وَالْاِخْتِلاَلِ مُتَمَيِّزًا عَمَّارَوَاهُ بَعْدَ هَذِهِ الْحَالِ قَبْلُ وَاِنْ لَمْ يُتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ وَاِنْ اِشْتَبَهَ فَكَذَالِكَ وَاِنْ وُجِدَ لِهَذَ الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٌ وَشَوَاهِدُ تَرَقَّى مِنْ مَرْتَبَهِ الرَّدِّ اِلَى الْقُبُوْلِ وَالرُّجْحَانِ وَهَذَا حُكْمُ اَحَادِيثِ الْمَسْتُوْرِوَالْمُدَلِّسِ وَالْمُرْسَلِ **فَصْلٌ** اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ اِنْ كَانَ رَاوِيْه وَاحِدًا يُسَمَّى غَرِيْبًا - وَاِنْ كَانَ اِثْنَيْنِ يُسَمَّى عَزِيْزًا- وَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ يُسَمَّى مَشْهُوْرًا اَوْمُسْتَفِيْضًا وَاِنْ بَلَغَتْ رُوَاتُه فِى الْكَثْرَةِ اِلَى اَنْ يَسْتَحِيْلَ الْعَادَةُ تَوَاطُئُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ يُسَمَّى مُتَوَاتِرًاوَيُسَمَّى الْغَرِيْبُ فَرْدًا اَيْضًا وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ رَاوِيْهِ وَاحِدًا كَوْنُه كَذَالِكَ وَلَوْ فِيْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْاِسْنَادِ لَكِنَّه يُسَمَّى فَرْدًا نِسَبِيًّا وَاِنْ كَانَ فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ يُسَمَّى فَرْدًا مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِمَا اِثْنَيْنِ اَنْ يَكُوْنَ فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ كَذَالِكَ

সুতরাং এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে রাবীর সঠিক বর্ণনা ও সংরক্ষণ ক্ষমতা কিংবা উভয়টা।

স্মরণশক্তির দুর্বলতা যদি রাবীর উপর সর্বদা সারাজীবন চেপে থাকে যাকে লাযেম বলে। তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। কিছু মুহাদ্দিসদের নিকট এরকম রাবীর হাদীস ও শায এর অন্তর্ভুক্ত।

আর যদি স্মরণ শক্তির দুর্বলতা কোন কারণে হঠাৎ আবির্ভুত হয়, যাকে طاري বলে। যেমন বার্ধক্যের কারণে অথব দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হওয়ার কারণে অথবা হাদীস সম্বলিত কপি হারিয়ে যাওয়ার কারণে।

এমন রাবীর হাদীসকে মুখতালাত বলে। এমতাবস্থায় রাবী যে হাদীসগুলি اختلاط ও اختلال মিশ্রিণ ও স্মরণশক্তির অভাব যোগ হওয়ার আগে বর্ণনা করেছেন পরে বর্ণিত হাদীসগুলি থেকে পৃথক করে সেগুলি গ্রহণযোগ্য হবে।

যদি পথক করা না যায় তাহলে মুলতবী রাখতে হবে। যদি এ জাতীয় হাদীসের শক্তি বৃদ্ধিকারী মুতাবি ও শাহিদ পাওয়া যায় তাহলে হাদীস প্রত্যাখ্যাত ও মুলতবী হওয়া থেকে গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য প্রাপ্তের স্তরে উন্নীত হবে। মাসতুর, মুদাল্লাস ও মুরসাল হাদীসের হুকমও এরকমই।

পরিচ্ছেদ সহীহ হাদীসের রাবী যদি একজন হয়, তাহলে তাকে গরীব বলে দুইজন হলে আযীয বলে দুই এর অধিক হলে মাশহুর বা মুসতাফিজ বলে।যদি রাবির সংখ্যা এমন অধিক হয়, যাতে এতসব লোক মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাওয়া স্বভাবত অসম্ভব মনে হয়, তাকে মুতাওয়াতির বলে।

غريب এর অপর নাম فرد ফরদ , রাবী এক জন হওয়ার অর্থ হচ্ছে সনদের কোন স্হানে এক জন হওয়া। ইহাকে ফরদে নিসাবি (فردنسبى) বলে।

আর যদি সনদের সব খানে রাবি একজন হয় তাহলে ইহাকে فردمطلق ফরদে মুতলাক বলে।হাদীসে আযীযে দুই জন রাবী হওয়ার অর্থ হচ্ছে সবখানে দুইজন হওয়া। যদি কোথাও রাবী এক জন হয়ে যায় তাহলে হাদীস আর আযীয থাকবে না গরীব হয়ে যাবে।

فاِنْ كَانَ فِيْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مَثَلًا لَمْ يَكُنِ الْحَدِيْثُ عَزِيْزًا بَلْ غَرِيْبًا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ مَعْنَى اِعْتِبَارُ الْكَثْرَةِ فِى الْمَشْهُوْرِ اَنْ يَكُوْنَ فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْنِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ اَنَّ الْاَقَلَّ حَاكِمٌ عَلَى الْاَكْثَرِ فِيْ هَذَا الْفَنِّ فَافْهَم وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ اَنَّ الْغَرَابَةَ لَاتُنَا فِى الصَّحَّةَ وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْثُ صَحِيْحًا غَرِيْبًا بِاَنْ يَّكُوْنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِهِ ثِقَةً وَالْغَرِيْبُ قَدْ يَقَعُ بِمَعْنَى الشَّاذِّ اَىْ شُذُوْذًا هُوَ مِنْ اَقْسَامِ الطَّعْنِ فِى الْحَدِيْثِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْمَصَابِيْحِ مِنْ قَوِلِهِ هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَمَّا قَالَ بِطَرِيْقِ الطَّعْنِ وَبَعْضُ النَّاسِ يُفَسِّرُوْنَ الشَّاذَّ بِمُفْرَدِالرَّاوِىِّ مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ مُخَالَفَتِهِ لِلثِّقَاتِ كَمَا سَبَقَ وَيَقُوْلُوْنَ صَحِيْحٌ شَاذٌّوَصَحِيْحٌ غَيْرُ شَاذٍّ فَالشُّذُوْذُ لِهَذَاالْمَعْنَى اَيْضًالَا يُنَافِالصَّحَّةَ كَالْغَرَابَةِ وَالَّذِىْ يُذْكَرُ فِيْ مَقَامِ الطَّعْنِ هُوَ مُخَالِفٌ لِلثِّقَاتِ **فَصْلٌ** اَلْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ هُوَ الَّذِىْ فُقِدَ فِيْهِ شَرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِى الصَّحَّةِوَالْحَسَنِ كُلًّااَوْبَعْضًاوَيُذَمُّ رَاوِيْهِ بِشُذُوْذٍاَوْنِكَارَةٍ اَوْعِلَّةٍ

অনুরুপ ভাবে হাদীসে মাশহুরে রাবীর সংখ্যাধিক্যতা গ্রহনযোগ্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে সবখানে রাবী দুয়ের অধিক হওয়া। হাদীস বিশারদদের ভাষায় বহুল প্রচলিত বাক্য أَنَّ الْأَقَلَّ حَاكِمٌ عَلَى الْاَكْثَرِ فِيْ هَذَا الْفَنِّ(এ শাস্ত্রে রাবীদের সংখার স্বল্পতা কার্যকারী হয় সংখ্যাধিক্যতার মোকাবেলায়) এর মর্ম ইহাই, বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম কর।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা গেল হাদীস গরবি হওয়া সহীহ হওয়ার পরিপন্থী হয়। একই হাদীস সহীহ ও গরীব উভয় গুনে গুনান্বিত হতে পারে। এইভাবে যে প্রত্যেক রাবী একক হওয়ার কারণে গরীব এবং বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে সহীহ কোন কোন সময় গরীব শব্দটি شاذ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এমন طعن যা দোষমুক্ত হাদীসের একটি প্রকার। ইহাই শায উদ্দেশ্য। মাসাবীহ গ্রন্থকারের উক্তি هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ-এর যখন তিনি হাদীসের দোষ গুণ বিচার করতে একথা বলেন। কোন কোন মুহাদ্দিস একক রাবলি হাদীসকেই শায বলেন। বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতা না পাওয়া গেলেও যা পূর্বে বর্ণিত এবং শার্য। صحيح غير شاذ এই হাদীসটি সহীহ তবে শায নয়। সুতরাং এ অর্থে ও শায হওয়া সহীহ হওয়ার পরিপন্থী নয়। হা দোষ বর্ণনার স্থলে যে শাযের আলোচনা হয় তা দ্বারা বিশ্বস্ত রাবীর বিরুদ্ধে বর্ণনাই উদ্দেশ্য হয়।

পরিচ্ছেদ: ضعيف যইফ দুর্বল ঐ হাদীসকে বলে যার মধ্যে সহীহ হাসান হাদীসে বিবেচ্য সকল কিংবা কিছু শর্ত অনুপস্থিত, এমন হাদীসের রাবী সাধারণত শায (বিশ্বস্ত রাবির বিরুধিতাকারী) মুনকির (যইফ রাবীর বিরোধিতাকারী যইফ) ও মুআল্লিল (ধারণকারী) ইত্যাদি দুষে নিন্দিত হয়ে থাকে।

وَبِهَذَا الْاِعْتِبَارِ يُتَعَدَّدُ اَقْسَامُ الضَّعِيفِ وَيَكْثُرُاِفْرَادًا وَتَرْكِيبًا وَمَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ وَالْحَسَنِ لِذَاتِهِ اَوْلِغَيْرِهِ اَيْضًا يَتَفَاوَتُ الْمَرَاتِبَ وَالدَّرَجَاتِ فِيْ كَمَالِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَة الْمَاْخُوْذَة فِيْ مَقْصُوْدِه مَعَ وُجُوْدِ الْاِشْتِرَاكِ فِيْ اَصْلِ الصِّحَّةِوَالْحَسَنِ وَالْقَوْمُ ضَبَّطُوْمَرَاتِبَ الصِّحَّةِ وَعَيَّنُوْوَذَكَرُوْا اَمثِلَتَه مِنَ الْاَسَانِيْدِ وَقَالُوْا اِسْمُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ يَشْمَلُ رِجَالَه كُلَّه وَلَكِنَّ بَعْضَه فَوْقَ بَعْضٍ وَاَمَّا اِطْلَاقُ اَصَحِّ الْاَسَانِيْدِ عَلَى سَنَدٍ مَخْصُوْصٍ عَلَى الْاِطْلَاقِ فَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه وَقِيلَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ وَقِيْلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ وَالْحَقُّ اَنَّ الْحُكْمَ عَلَى اِسْنَادٍ مَخْصُوْصٍ بِالْاَصَحِّيَّةِ عَلَى الْاِطْلَاقِ غَيْرُ جَائِزٍ اِلَّااَنَّ فِي الصِّحَّةِ مَرَاتِبُ عُلْيَا وَعِدَّة مِنَ الْاَسَانِيْدِ يَدْخُلُ فِيْهَا وَلَوْ قُيِّدَ بِقَيْدٍ بِاَنْ يُقَالَ اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ الْبَلَدِالْفُلَّانِيِّاَوْفِالْبَابِ الْفُلَّانِيِّ اَوْفِيْ الْمَسْئَلَةِ الْفُلَّانِيَّةِ يَصِحُّ وَاللهُ اعلم **فَصْلٌ** وَمِنْ عَادَةِ التِّرْمِذِيِّ اَنْ يَقُوْلَ فِيْ جَامِعِهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ- حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ- حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ وَلَاشُبْهَةَ فِيْ جَوَازِ اِجْتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالصَّحَّة

এই অনুপাতেই যইফ হাদীসে যৌথ দুষের ভিত্তিতে ও সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। হাদীসেরপ্রকার চথুষ্টয় এক সহীহলি-যাতিহী, দুই-লিলগাইরিহী, তিন হাসান লিযাতিহী চার হাসান লিগাইরিহী ও বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত হয়। এদের সংজ্ঞায় গৃহীত গুণাবলি পূর্ণাঙ্গতায় স্তর ও শ্রেণীর তারতম্যের কারণে যদি ও মৌলিক ভাবে সহীহ ও হাসান গুণে সকল প্রকারই শরীক।

একদল মুহাদ্দীসিন সহীহ হাদীসের স্তর সমূহ গ্রন্থ ও চিহ্নিত করেছেন এবং বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে এর উদাহরণও পেশ করে বলেছেন যে এগুলোর সকল রাবীই বিশ্বস্তা ও সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন।

তবে একজনের গুণ অন্য জনের গুণের তুলনায় উচ্চতর। শর্তহীনভাবে কোন বিশেষ সনদকে اَصَحِّ الْاَسَانِيْدِ

(সর্বাধিক বিশুদ্ধতম সনদ) বলার মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে।

কারো মতে সর্বাধিক বিশুদ্ধতম সনদ হচ্ছে زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه

কারো মতে مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَر

কারো মতে الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ।সঠিক কথাটি হচ্ছে শর্তহীনভাবে বিশেষ কোন সনদকে أَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ ঘোষণা করা সঠিক নয়, তবে এতটুকু বলা যায় যে এই সনদটি বিশুদ্ধতায় উচু স্তরের এবং অনেকগুলো সনদ উচু স্তরের অন্তভূক্ত।

যদি কোন শর্ত যুক্ত করে এভাবে বলা হয় যে অমুক শহরের বা অমুক অধ্যায়ের বা অমুক মাসআলার সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতম সনদ। তাহলে ঠিক আছে।

পরিচ্ছেদ : ইমাম তিরমীযি সাহেবের অভ্যাস হচ্ছে তিনি স্বীয় জামেয় তিরমীযিতে বলেন حديث حسن صحيح এই হাদীসটি হাসান ও সহীহও। حديث غريب حسن এই হাদীসটি গরীব এবং হাসান। حديث غريب صحيح এই হাদীসটি গরীব ও সহীহ। একই হাদীসের হাসান ও সহীহ সম্মেলন সম্ভব। এতে সন্দেহ নেই।

بِاَنْ يَكُوْنَ حَسَنًا لِذَاتِهِ وَصَحِيْحًا لِغَيْره وَكَذٰلِكَ فِىْ اِجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ وَالصَّحَّةِ كَمَا اَسْفَلْنَا وَاَمَّا اِجْتِمَاعُ الْغَرَابَةِ وَالْحَسَنِ فَيَسْتَشْكِلُوْنَه بِاَنَّ التِّرْمِذِىَّ اِعْتَبَرَ فِى الْحَسَنِ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ غَرِيبًاوَيُجِيْبُوْنَه بِاَنْ اُعْتُبِرَ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ فِى الْحَسَنِ لَيسَ عَلَى الْاِطْلَاقِ بَلْ فِىْ قِسْمٍ مِنْهُ وَحَيْثُ حُكِمَ بِاِجْتْمَاعِ الْحَسَنِ وَالْغَرَابَةِ اَلْمُرَادُ قِسْمٌ آخَرَ وَفِىْ بَعْضِهَا حُسْنًا وَقِيْلَ اَلْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ بِاَنَّه يَشُكُّ وَيَتَرَدَّدُ فِىْ اَنَّه غَرِيْبٌ أَوْ حَسَنٌ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ جَزْمًا وَقِيْلَ اَلْمُرَادُ اَلْحَسَنُ هَهُنَا لَيَسَ مَعْنَاه الْاِصْطِلَاحِىُّ بَلِ اللُّغوِىُّ بِمَعَنَى مَا يَمِيْلُ اِلَيْهِ الطَّبْعُ-وَهَذاَ الْقُوْلُ بَعِيْدٌ جِدًّا **فصل** الاحتجاج فى الاحكام بالخبر الصِّحِيْحِ مجْمَعُ عَلَيْهِ وَكَذَالِكَ بِالْحَسَنِ لَذَاتِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِوَهُوَ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيْحِ فِىْ بَابِ الْاِحْتِجَاجِ وَاِنْ كَانَ دَوْنَه فِىْ الْمَرْتَبَةِ

এভাবে যে (রাবীর ত্রুটির কারণে) সহীহ লিগাইরিহীএবং (রাবীর ত্রুটি পূরণের উপযোগী সনদের সংখ্যাধিক্য না থাকার কারনে) হাসান লিযাতিহী হবে। অনুরুপভাবে গরীবও সহীহর সম্মেলনও। সনদের সংখ্যা এক হওয়ার কারণে গরীব, রাবীর গুণাবলী পূর্ণাঙ্গ থাকার কারণে সহীহ যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে গরীব ও হাসানের সম্মেলনকে মুহাদ্দিসগন জটিল মনে করেন কারণ ইমাম তিরমিযী রহ. হাসান হওয়ার জন্য সনদের আধিক্যতা শর্তারোপ করেছেন। সুতরাং তার ভাষ্য মতেই হাসানে অধিক সনদ হওয়া সত্তেও হাদীস গরীব হবে কীভাবে?

মুহাদ্দীসগণ এ প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। ক) তিনি সনদের সংখ্যাধিক্যের শর্তারোপ ঢালাওভাবে সকল হাসানে করেন না। বরং হাসানের কোন কোন প্রকারে এ শর্তারোপ করেন। সুতরাং যে হাসানের সাথে গরীবের সম্মিলন গঠিয়েছেন সেখানে হাসানের অন্য প্রকার বুঝতে হবে। যে প্রকারে সনদের সংখ্যাধিক্যের শর্ত নেই। খ) কেউ বলেন এমন মন্তব্য দ্বারা সনদেন ভিন্নতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এভাবে যে এ হাদীসের গরীব পর্যায়ের একটি সনদ আছে। এবং হাসান পর্যায়ের ও একটি সনদ আছে গ) কারও মতে এখানে উভয় শব্দের মধ্যখানে একটি واو উহ্য আছে। যা أو (অথবা) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং غَرِيْبٌ حَسَنٌ অর্থ হবে হাসান অথবা গরীব। অর্থাৎ তিনি হাদীসটি হাসান নাকি গরীব এব্যাপারে নিশ্চিতরূপে অবহিত না হওয়ার কারনে সিদ্ধান্তহীনতার দরূন এমন মন্তব্য করেছেন। ঘ). কারও মতে এখানে হাসান শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাসান অর্থ চিত্তাকর্ষক-চমৎকার। সুতরাং غَرِيْبٌ حَسَنٌ অর্থ হবে হাদীসটি গরীব হলে ও (অধ্যায়েরে দাবী পূরণে) চিত্তাকর্ষক-চমৎকার। এ জবাবটি বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।

পরিচ্ছেদঃ বিধানাবলীতে সহীহ হাদীস দ্বারা দলীল উপস্পাপন সর্বজন স্বীকৃত। অনুরূপভাবে জুমহুর উলামায়েকেরামের মতে হাসান লিযাতিহি দ্বারাও দলীল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হাসান লিযাতিহী সহীহ এর অন্তর্ভূক্ত। যদিও স্তরের দিক দিয়ে হাসান সহীহ এর নীচে।

وَالْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ الَّذِىْ بَلَغَ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ مَرْتَبَةَ الْحَسَنِ لِغَيْرِه اَيَضًا مُجْمَعٌ وَمَا اِشْتَهَرَ اَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيْفَ مُعْتَبَرٌ فِىْ فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ لَا فِىْ غَيْرِها اَلْمُرَادُ مُفْرَدَاتُه لَا مَجْمُوْعه لِاَنَّه دَاخِلٌ فِىْ الْحَسَنِ لَا فِى الضَّعِيْفِ صَرَّحَ بِهِ الْاَئِمَّةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنْ كَانَ الضَّعِيْفُ مِنْ جِهَةِ سُوْءِ حِفْظٍ وَاِخْتِلَاطٍ أَوْ تَدْلِيْسٍ مَعَ وُجُوْدِ الصّدْقِ والدِّيَانَةِ يُنْجَبَرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِوَاِنْ كَانَ مِنْ جِهَةَ اِتِّهَامِ الْكِذْبِ اَوِ الشُّذُوْذِ لَايُنْجَبَرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَالْحَدِيْثُ مَحْكُوْمٌ عَلَيَهِ بَالضَّعِيْفِ وَمَعْمُوْلٌ بِهِ فِىْ فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ وَعَلَى مِثْل هَذَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُحْمَلَ مَا قِيْلَ اَنَّ لُحُوْقَ الضَّعِيْفِ بِالضَّعِفِ لَا يُفِيْدُ قُوَة وَاِلَّا فَهَذاَ الْقَوْلُ ظَاهَرُ الْفَسَادِ فَتَدَبَّرْ **فَصْلٌ** : لَمَّا تَفَاوَتَتْ مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ وَالصِّحَاحُ بَعْضُهَا اَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ فَاعْلَمْ اَنَّ الَّذِىْ تَقَرَّرَ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ اَنَّ صَحِيْحَ الْبُخَارِىَّ مَقَدَّمٌ عَلَى سَائِرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ حَتَّى قَالُوْا اَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ الله صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّوَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ رَجَّحُوْا صَحِيْحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيْحِ الْبُخَارَيِّ

আর যে যইফ হাদীস সনদের আধিক্যের কারণে হাসান লিগাইরীতে উন্নীত হয়েছে এর দ্বারাও দলীল পেশ করা সর্বজন স্বীকৃত। আর যে কথাটা প্রশিদ্ধ হয়ে আছে যে, যইফ হাদীস ফাযায়েল আমালে গ্রহণযোগ্য, অন্যত্র নয় এ যঈফ হাদীস উদ্দেশ্য নয়। কেননা তখন উহা সনদের আধিক্যের কারণে হাসানের অর্ন্তভূক্ত হয়ে গেছে, যঈফের নয়। যা হাদীস বিশারদগণ স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন কেউ কেউ বলেছেন রাবীর মধ্যে সত্যবাদিতা ও ধার্মিকতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও স্মরণ, মিশ্রণ ও তাদলীস জনিত ত্রুটির কারণে যদি হাদীস যঈফ হয় তাহলে সনদের আধিক্য দ্বারা ক্ষতিপুরণ হয়ে যাবে।আর মিথ্যার অপবাদ দুষ্ট অথবা শায, কিংবা সীমাতিরিক্ত ভুল জনিত ত্রুটির কারণে যদি হাদীস যঈফ হয় তাহলে সনদের আধিক্য দ্বারা ক্ষতিপুরণ হবে না।

ফলে হাদীসের উপর "যঈফ" বিশেষণ আরোপিত হবে এবং এরূপ হাদীস ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে আমলযোগ্য হবে। আর প্রশিদ্ধ উক্তি اَنَّ لُحُوْقَ الضَّعِيْفِ بِالضَّعِفِ لَا يُفِيْدُ قُوَة "যঈফ হাদীসের সাথে যঈফ হাদীসের সম্মিলন শক্তিশালী হওয়ার ফায়দা দেয়না।" উক্ত প্রকারের উপর প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয়। অন্যথায় এ উক্তির অসারতা প্রকাশ্য। চিন্তাকর- সহীহ হাদীসের স্থলে যখন তারতম্য প্রমাণিত হলো। এক সহীহ অন্য সহীহ হাদীসের তুলনায় বেশী সহীহ। জেনে রাখ যমহুর মুহাদ্দিসীনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে সহীহ বুখারী হাদীস শাস্ত্রে সংকলিত সকল গ্রন্থের মধ্যে অগ্রগণ্য (বিশুদ্ধতম মত)। এমনকি তারা ঘোষণা করেছেনأَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ الله صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ আল্লাহর কিতাবের পর সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতম কিতাব হচ্ছে সহীহ বুখারী। কিছু সংখ্যক পশ্চিমা হাদীস বিশারদ সহীহ বুখারীর পর সহীহ মুসলিমকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

وَالْجُمْهُوْرُ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ هَذَا فِيْمَا يَرْجِعُ اِلَى حُسْنِ الْبَيَانِ وَجُوْدَةِ الْوَضْعِ وَالتَّرْتِيْبِ رِعَايَةِ دَقَائِقِ اْلِاشَارَاتِ وَمَحَاسِنِ النِّكَاتَ فِى الْاَسَانِيْدِ وَهَذَا خَارِجٌ همِنَ الْبَحْثِ وَالْكَلَامُ فِى الصِّحَّةِ وَالْقُوَّة وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا وَلَيَس كِتَابٌ يُسَاوِىْ صَحِيْحَ الْبُخَارِىِّ فِىْ هَذَا الْبَابِ بِدَلِيْلِ كَمَالِ الصَّفَاتِ الَّتِىْ اُعْتُبِرَتْ فِى الصِّحَّةِ فِيْ رِجَالِهِ وَبَعْضُهُمْ تَوَقَّفَ عَلَى تَرْجِيْحِ اَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَالْحَقُّ هُوَ الْاَوَّلُ - وَالْحَدِيْثُ الَّذِىْ اِتَّفَقَ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهِ يُسَمَّى مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّيْخُ بِشَرِطِ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ صَحَابِىِّ وَاحِدٍوَقَالُوْا مَجْمُوْعُ الْاَحَادِيْثِ الْمُتَّفَقَةِ عَلَيْهِ اَلْفَانِ وَثَلَثُمِاة وَسِتَّةٌ وَّعِشْرُوْنَ وَبِالْجُمْلَةِ مَا اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَيْخَانِ يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِه ثُمَّ مَاتَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِىُّ ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بَهِ مُسْلِمٌ ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ ثَمَّ مَا هُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِىِّ ثُمَّ مَا هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ثُمَّ مَا هُوَ رَوَاه غَيْرُهُمْ مِنَ الْاَئِمَّةِ الَّذِيْنَ اِلْتَزَمُوْا الصِحَّةَ وَصَحَّحُوْهُ فَالْاَقْسَامُ سَبْعَةٌ

এর জবাবে যমহুর বলেছেন এ প্রাধ্যন্য মোড় নিয়েছে উপস্থাপনের সৌন্দর্যতা, সংকলন ও বিন্যাসের উৎকৃষ্টতা ও সনদ সমুহে সুক্ষ্ম ইঙ্গিত ও হৃদয়গ্রাহী রহস্যের গুরুত্বারোপের দিকে। এটাতো আলোচনার বহির্ভূত বিষয়। আলোচ্য বিষয় হলো বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা এবং এতদোভয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদী। এ দৃষ্টিকোন থেকে সহীহ বুখারীর মানের কোন কিতাব নেই। এর প্রমাণ হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য রাবীদের মধ্যে যে সকল গুণাবলী অপরিহার্য সহীহ বুখারী রাবীদের মধ্যে এগুলোর পুর্ণাঙ্গতা। কেউ কেউ একটির উপর অপরটির প্রাধান দেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন। তবে প্রথম মতটিই সঠিক। যে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রা. উভয়ে স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন তাকে মুত্তাফাক আলাইহি বলা হয়। শায়খ মুহিউসসুন্নাহ বলেন হাদীসটি মুত্তাফাক আলাইহী হওয়ার জন্য উভয়ের বর্ণনা এক সাহাবী থেকে হওয়া শর্ত।

হাদীস বিশারদগণ বলেছেন মুত্তাফাক আলাইহি হাদীসের সংখ্যা দুই হাজার তিনশত ছাব্বিশ (২৩২৬) মুদ্দাকথা ১. যে হাদীসগুলি শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন সেগুলী অন্য হাদীসের তুলনায় অগ্রগণ্য হবে। ২. অত:পর যেগুলী এককভাবে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। ২. অত:পর যেগুলী এককভাবে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ৪. অত:পর যেগুলী শায়খাইনের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হবে।৫. অত:পর যেগুলী শুধু বুখারীর শর্তানুযায়ী ৬. অত:পর যেগুলী শুধু মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। ৭. অত:পর যেগুলি শায়খাইন ব্যতিত ঐ সকল ইমামগণ বর্ণনা করেছেন যারা স্বীয় কিতাবে একমাত্র সহীহ হাদীসই বর্ণনা করবেন বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এবং তারা এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণও করেছেন। সুতরাং সহীহ হাদীসের স্তর হল ৭টি।

وَالْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ اَنْ يَكُوْنَ الرِّجَالُ مُتَّصِفِيْنَ بِالصِّفَاتِ الَّتِىْ يَتَّصِفُ بِهَا رِجَالُ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ مِنَ الضَّبْطِ وَالْعَدَالَةِ وَعَدَمِ الشُّذُوْذِ وَالنِّكَارَة وَالْغَفْلَةِ وَقِيلَ اَلْمُرَادَ بِشَرْطِ البُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ رِجَالُهُمَا اَنْفُسُهُمْ وَالْكَلَامُ فِىْ هَذَا طَوِيْلٌ ذَكَرْنَاه فِىْ مُقَدَّمَةِ شَرْحِ سَفْرِ السَّعَادَة فَصْلٌ اَلْاَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ لَمْ تَنْحَصِرْ فِىْ صَحِيْحَيْ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ وَلَمْ يَسْتَوْعِبَاالصِّحَاحَ كُلَّهَا بَلْ هُمَا مُنْحَصِرَانِ فِى الصِّحَاحِ وَالصِّحَاحُ الَّتِىْ عِنْدَهُمَا وَعَلَى شَرْطِهِمَا اَيْضًالَمْ يُوْرِدَاهُمَا فِىْ كِتَابَيْهِمَا فَضْلًاعَمَّاعِنْدَغَيْرِهِمَا قَالَ الْبُخَارِىُّ مَااَوْرَدْتُّ فِىْ كِتَابِىْ هَذَا اِلَّا مَا صَحَّ وَلَقَدْ تَرَكْتُ كَثِيْرًا مِنَ الصِّحَاحِ وَقَالَ مُسْلِمٌ اَلَّذِىْ اَوْرَدْتُّ فِىْ هَذَا الْكِتَابِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ صَحِيْحٌ وَلَااَقُوْلُ اَنَّ مَا تَرَكْتُ ضَعِيْفٌ وَلَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ هَذَا التَّرْكِ وَالْاِتْيَانِ وَجْهُ تَخْصِيْصِ الْاَيْرَادِ وَالتَّرْكِ اِمَّا مِنْ جِهَةِ الصَّحَّةِ أَوْ مِنْ جِهَةِ مَقَاصِدٍ اُخَرَ - وَالْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدُ اللهِ اَلنِّيْشَابُوْرِىُّ صَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ اَلْمُسْتَدْرَكَ بِمَعْنَى اَنَّ مَا تَرَكَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ مِنَ الصِّحَاحِ اَوْرَدَه فِىْ هَذَا الْكِتَابِ وَتلَافَى وَاِسْتَدْرَكَ

বুখারী ও মুসলিমের শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উভয়ের রাবীদের মধ্যে যে সকল গুন বিদ্যমান, যেমন ১. الضبط সংরক্ষরণ, ২. العدالة বিশ্বস্থতা, ৩. عدم الشذوذ সাজ না হওয়া, ৪. غير النكارة মুনকির না হওয়া, ৫. عدم الغفلة অলসতা মুক্ত হওয়া। ঐ সকল গুণ হাদীসের রাবীর মধ্যে উপস্থিত থাকা। কারও মতে বুখারী মুসলিমের শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য স্বয়ং তাদের রাবীগণ। এ ব্যাপারে আলোচনা অনেক দীর্ঘ যা আমি সফরুদ সা'আদা গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। সহীহ হাদীস সমূহ শুধু বুখারী ও মুসলিম সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সীমাবদ্ধ নয় এমনকি তারা উভয়ে সকল সহীহ হাদীস সন্নিবেশিত করার দাবীও করেননি। বরং তাদের গ্রন্দ্বয় সহীহ হাদীসে সীমাবদ্ধ। যে সকল সহীহ হাদীস তাদের সংগ্রহে এবং তাদের শর্তের অনুকূলে ছিল সেগুলির সবটি তাদের গ্রন্দ্বয়ে বর্ণনা করেননি। আর যে সকল সহীহ হাদীস অন্যের সংগ্রহে বিদ্যমান ছিল সেগুলিতো রয়েই গেল। যেমন ইমাম বুখারী বলেন مَا أَوْرَدْتُّ فِىْ كِتَابِىْ هَذَا اِلَّا مَا صَحَّ وَلَقَدْ تَرَكْتُ كَثِيْرًا مِنَ الصِّحَاحِ আমি আমার এ গ্রন্থে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসগুলি বর্ণনা করেছি এবং অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।ইমাম মুসলিম রা. বলেন وَلَا اَقُوْلُ اَنَّ مَا تَرَكْتُ ضَعِيْفٌ এই গ্রন্থে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছি সবই সহীহ। একথা বলিনা যে যেগুলি ছেড়ে দিয়েছি সেগুলি যঈফ। এই পরীক্ষা করা ও বর্ণনা করার অবশ্যই কোন কারণ আছে। হয়তো বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে নতুবা অন্য উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে। হাকীম আবু আব্দুল্লাহ নিসাপুরী (র.) আল মুসতাদরাক নামক একখানা কিতাব রচনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) যে সকল সহীহ হাদীস তাদের কিতাবদ্বয়ে বর্ণনা করেননি ঐ সকল সহীহ হাদীস তিনি এই কিতাবে বর্ণনা করে সহীহ হাদীস হাতছাড়া হওয়ার ক্ষতিপুরণ করেছেন।

بَعْضُهَا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَ بَعْضُهَا عَلَى شَرْطِ اَحَدِهِمَا وَ بَعْضُهَا عَلَى غَيْرِ شَرْطِهِمَا وَقَالَ اِنَّ الْبُخَارِىَّ وَمُسْلِمًا لَمْ يَحْكُمَا بِاَنَّه لَيْسَ اَحَادِيْثُ صَحِيْحَةٌ غَيْرَ مَا خَرَّجَاه فِىْ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ - وَقَالَ قَدْ حَدَثَ فِىْ عَصْرِنَا هَذَا فِرْقَةٌ مِّنَ الْمُبْتَدِعَةِ اَطَالُوْا اَلْسِنَتَهُمْ بِالطَّعْنِ عَلَى اَئِمَّةِ الدِّيْنِ بِاَنَّ مَجْمُوْعَ مَاصَحَّ عِنْدَكُمْ مِنْ الْاَحَادِيْثِ لَمْ يَبْلُغْ زُهَاءَ عَشَرَةِ اٰلَافٍ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِىِّ اَنَّه قَالَ حَفِظْتُ مِنَ الصِّحَاحِ مِاَةَ اَلْفِ حَدِيْثٍ وَمِنْ غَيْرِ الصَّحَاحِ مِائَتَىْ اَلْفٍ وَالظَّاهِرُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّه يُرِيْدُ الصَّحِيْحَ عَلى شَرْطِهِ وَيَبْلُغُ مَا اَوْرَدَ فِىْ هَذَا الْكِتَابِ مَعَ التَّكْرَارِ سَبْعَةُ آلَافٍ وَمِاَتَانِ وَخَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ حَدِيْثًا وَبَعْدَ حَذْفَ التَّكْرَارِ اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ - وَلَقَدْ صَنَّفَ اْلآخَرُوْنَ مِنَ الْاَئِمَّةِ مِثْلصَحِيْحُ اِبْنِ خُزَيْمَةَ الَّذِىْ يُقَالُ لَه اِمَامُ الْاَئِمَّةِ وَهُوَ شَيْخُ اِبْنِ حَبَّانَ وَقَالَ بْنُ حَبَّانَ فِىْ مَدْحِهِ مَارَاَيْتُ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحدًا اَحْسَنَ فِيْصَنَاعَةِ السُّنَنِ وَاَحْفَظَ لِلْاَلْفَاظِ الصَّحِيْحَةِ مِنْهُ كَانَ السَّنَدُ وَالْاَحَادِيْثُ كُلُّهَا نَصْبَ عَيْنِهِ وَمِثْلُ صَحِيْحِ اِبْنِ حِبَّانَ تِلْمِيْذُ اِبْنِ خُزَيْمَةَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَاضِلٌ اِمَامٌ فَهَّامٌ قَالَ الْحَاكِمُ كَانَ بْنُ حِبَّانَ مِنْ اَوْعِيَةِ الْعِلْمِ وَاللُّغَةِ وَالْحَدِيْثِ وَالْوَعْظِ وَكَانَ مِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ

এগুলো কিছু হাদীস সহীহাইনের শর্ত মোতাবেক, কিছু হাদীস কোন একটির শর্ত মোতাবেক। কিছু হাদীস সহীহাইনের শর্ত বহির্ভূত এবং তিনি বলেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ কথা ঘোষণা করেননি যে সহীহাইনের বাহিরে বর্ণিত কোন হাদীস সহীহ নয়। তিনি (নিশাপুরী) বলেন আমাদের এই যুগে বিদআতী একটি ফেরকার উদ্ভব হয়েছে। ধর্মীয় ইমামগণের সমালোচনায় যারা জিহ্বা লম্বা করে দিয়েছে তারা বলে তোমাদের সংগ্রহে যত সহীহ হাদীস আছে এর সংখ্যা ১০ হাজারের কাছাকাছি হবে না।

অথচ ইমাম বুখারী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি একলক্ষ সহীহ হাদীস ও ২ লক্ষ গাইরে সহীহ হাদীস মুখস্ত করেছি। বাহ্যত এটাই মনে হয় যে তিনি সহীহ দ্বারা তার শর্ত মোতাবেক সহীহ উদ্দেশ্য করেছেন।

এই কিতাবে বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা تکرار পুনরাবৃত্তিসহ ৭২৭৫ (সাত হাজার দুইশত পঁচাত্তর) আর পুনরাবৃত্তি ছাড়া ৪০০০ (চার হাজার) অন্যান্য কিতাবের ইমামগণও সহীহ হাদীসের কিতাব সংকলন করেছেন। যেমন ক) صَحِيْحُ إِبْنِ خُزَيْمَةَ সহীহ ইবনে খুযাইমা, যাকে ইমামুল আইম্মা বলা হতো। মৃত: ৩৩১ হিজরী।

তিনি ইবনে হিব্বান (র.)-এর উস্তাদ ছিলেন। তাঁর প্রশংসায় ইবনে হিব্বান বলেন হাদীস সংকলনে, সহীহ হাদীস মুখস্ত করেন। পৃথিবীর বুকে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি। সকল হাদীস যেন তার চোখদপণে ছিল।

খ) صَحِيْحِ اِبْنِ حَبَّانَ সহীহ ইবনে হাব্বান রহ., ইবনে খুযাইমার ছাত্র। বিশ্বস্ত, প্রামান্য, অভিজ্ঞ ও শীর্ষ পর্যায়ের বিচক্ষণ ছিলেন।

তার প্রশংসায় হাকীম (নিশাপুরী) বলেন ইবনে হিব্বান ইলম, অভিধান, জ্ঞান, হাদীস ও উপদেশ মালার ভান্ডার ছিলেন। একজন অন্যতম বুদ্ধিমান ছিলেন।

وِمِثْلُ صَحِيْحِ الْحَاكِمِ اَبِيْ عَبْدِ اللهِ النَّيْشَابُوْرِيِّ اَلْحَافِظُ الثِّقَةُ الْمُسَمَّى بِالْمُسْتَدْرَكِ وَقَدْ تَطَرَّقَ فِيْ كِتَابِهِ هَذَا التَّسَاهُلَ وَاَخَذُوْاعَلَيْهِ وَقَالُوْا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ اَمْكَنُ وَاَقْوَى مِنَ الْحَاكِمِ وَاَحْسَنَ وَاَلْطَفَ فِيْ الْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُوْنِ- وَمِثْلُ الْمُخْتَارَاتُ لِلْحَافِظِ ضِيَاءُ الدِّيْنِ اَلْمُقَدَّسِيُّ وَهُوَ اَيْضًا خَرَّجَ صِحَاحًا لَيْسَتْ فِي الصَّحِيْحِ وَقَالُوْا كِتَابُه اَحْسَنُ مِنَ الْمُسْتَدْرَكِ وَمِثْلُ صَحِيْحِ اِبْنِ عَوَانَةَ وَابْنُ السَّكَنِ وَالْمُنْتَقَى لِاِبْنِ جَارُوْدِ وَهَذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالصِّحَاحِ وَلَكِنَّ جَمَاعَةً اِنْتَقَدُوْا عَلَيْهِ تَعَصُّبًا أَوْ اِنْصَافًا وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ وَاللهُ اَعْلَمُ فَصْلٌ: اَلْكُتُبُ السِّتَّةُ الْمَشْهُوْرَةُ الْمُقَرَّرَة فِي الْاِسْلَامِ الَّتِيْ يُقَالُ لَهَا الصِّحَاحَ السِّتُّ هِيَ صَحِيْحُ الْبُخَارِيُّ وَصَحِيْحُ مُسْلِمٍ وَجَامِعُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالسَّنَنُ لِاَبِيْ دَاودَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ - وَعِنْدَ الْبَعْضِ اَلْمُوَطَّا بَدْلَ ابْنِ مَاجَةَ - وَصَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ اِخْتَارَ الْمُوَطَّاوَفِيْ هَذِهِ الْكُتُبِ الْاَرْبَعَةَ أَقْسَامُ مِنَ الْاَحَادِيْثِ مِنَ الصَّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالضِّعَافِ وَتَسْمِيَتُهَا بِالصِّحَاحَ السِّتِّ بِطَرِيْقِ التَّغْلِيْبِ

গ اَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمِ النَّيْشَابُوْرِيِّ তিনি হাফিজুল হাদীস ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তবে তিনি তাঁর এ কিতাবে মারাত্মক নমনীয়তা দেখিয়েছেন। যে কারণে উলামায়ে কেরাম তার সমালোচনা করেছেন। তারা বলেছেন হাকীম, আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরীর তুলনায় ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান পারদর্শী ও বিশ্বস্ এবং সনদ ও মতনে উত্তম ও সুক্ষ্ম দর্শী।

ঘ) اَلْمُخْتَارَاتُ।আল মুখতারাত হাফিজ জিয়াউদ্দীন মুকাদ্দাসি রচিত তিনিও এমন সকল সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন যা সহীহাইনে নেই। হাদীস বিশারদগণ বলেছেন তাঁর কিতাব খানা মুসতাদরাক এর চাইতে উত্তম।

ঙ) صَحِيْحِ اِبْنِ عَوَانَةَ সহীহ ইবনে আওয়ানাহ

চ) صَحِيْحِ اِبْنُ السَّكَنِ সহীহ ইবনে সাকান

ছ) المنتقى। আল মুনতাকা লিইবনে জারুদ এই সকল কিতাবে সহীহ হাদীসই বিদ্যমান। তবে একদল মুহাদ্দিসীন এগুলোর সমালোচনা করেছেন। (কেউ)

পক্ষপতিত্ব গ্রহণ করে অথবা (কেউ) ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর এটা সত্য যে প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে রয়েছে মহাজ্ঞানী।

সিহাহ সিত্তার পরিচয় : ইসলামী শরীয়াতে প্রসিদ্ধ স্বীকৃত ছয়টি কিতাব যেগুলিকে الصحاح الستة (বিশুদ্ধতম ছয় গ্রন্থ) বলা হয়। সেগুলি হচ্ছে:

১) সহীহুল বুখারী

২) সহীহ মুসলিম

৩) আল জামে লিততিরমিযী

৪) সুনানে আবু দাউদ

৫) সুনানে নাসাঈ

৬) সুনানে ইবনে মাযাহ।কারও মতে ইবনে মাযার স্লে মুয়াত্তা হবে। জামিউল উসুল গ্রন্থকার এ মতটিই পছন্দ করেছেন।

আর এই চার কিতাবে (সহীহাইন ছাড়া) সহী, হাসান, যঈফ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার হাদীস রয়েছে। এতদসত্ত্বেও সহীহ হাদীসের সংক্যাধিক্যের কারণে এগুলিকে সিহাহ সিত্তা নাম করণ করা হয়েছে। নতুন কোন পরিভাষা।

وَسَمَّى صَاحِبُ الْمَصَابِيْحِ اَحَادِيْثَ غَيْرَ الشَّضيْخَيْنِ بِالْحِسَانِ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَرِيْبٌ مِن الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَهُوَ اِصْطِلَاحٌ جَدِيْدٌ منه وَقَالَ بَعْضُهُمْ كِتَابُ الدَّارِمِيِّ اَحْرَى وَالْيَقُ بِجعْلِهِ سَادِسَ الْكُتُبِ لَاَنَّ رِجَالَه اَقَلُّ ضُعْفًا وَوُجُوْدُالْاَحَادِيْثِ الْمُنْكَرَة وَالشَّاذَّة فِيْهِ نَادِرٌ وَلَه اَسَانِيْدُ عَالِيَةٌ وَثُلَاثِيَّاتُه اَكْثَرُ مِنْ ثُلَاثِيَّاتِ الْبُخَارِيِّ وَهَذِهِ الْمُذْكُوْرَة مِنَ الْكُتُبِ اَشْهَرُ الْكُتُبِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَثِيْرَة شَهِيْرَةٌ وَ لَقَدْ اَوْرَدَ السِّيُوْطِيُّ فِيْ كِتَابِ جَمْع الْجَوَامِعِ مِنْ كُتُبٍ كَثِيْرَةٍ يَتَجاَوَزُ خَمْسِيْنَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالضِّعَافِ وَقَالَ مَا اَوْرَدْتُ فِيْهَا حَدِيْثًا مَوْسُوْمًا بِالْوَضْعِ اِتَّفَقَ الْمُحَدِّثُوْنَ عَلَى تَرْكِهِ وَرَدِّه وَالله اعلم وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمِشْكوة فِيْ دِيْبَاجَةِ كِتَابِهِ جَمَاعَةً مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمُتْقِنِيْنَ وَهُمُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم وَالْاِمَامُ مَالِكٌوَالْاِمَامَ الشَّافِعِيُّ وَالْاِمَامُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

মাসাবিহ গ্রন্থকার শায়খাইন ব্যতিত অন্যান্য চার ইমামের বর্ণিত হাদীসকে নাম রেখেছেন حسان হাসান। এটা এই কারণের (চার কিতাবে হাসান হাদীস বিদ্যমান থাকার) নিকটবর্তী। আভিধানিক অর্থেরও কাছাকাছি। অথবা এটা তার আবিস্কৃত কেউ কেউ বলেছেন মুসনাদে দারেমী সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ স্থানে রাখার উপযুক্ত ও মানানসই। কারণ তার কিতাবের হাদীসের রাবী কম সংখ্যক দুর্বল।

ইহাতে মুনকার ও শায হাদীস পাওয়া দুষ্কর। তার সনদগুলীও عالي উচ্চতর। তার সুলাসিয়াত (তিন রাবী বিশিষ্ট হাদীস) বুখারীর সুলাসিয়াত চাইতেও অধিক। উল্লেখিত কিতাবগুলি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এছাড়াও বহু প্রসিদ্ধ কিতাব রয়েছে। ইমাম সুয়ুতী র. জমউল জাওয়ামে কিতাবে পঞ্চাশেরও অধিক কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন। যেগুলিতে সহীহ হাসান ও যঈফ (সর্বপ্রকার হাদীস সন্নিবেশিত ছিল) এবং তিনি বলে গেছেন জাল বলে চিহ্নিত যেগুলির পরিত্যাগ ও প্রত্যাখ্যানে মুহাদ্দিসীনগণ একমত পোষণ করেছেন। এমন কোন হাদীস আমি এতে উল্লেখ করিনি।

মিশকাত গ্রন্কার স্বীয় কিতাবের ভূমিকায় হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ইমামদের এক জামাতের আলোচনা করেছেন। তারা হলেন

১. ইমাম বুখারী রহ. (মৃত: ২২৫ হিজরী)
২. ইমাম মুসলিম রহ. (মৃত: ২৬১ হিজরী)
৩. ইমাম মালিক রহ. (মৃত: ১৭৯ হিজরী)
৪. ইমাম শাফেঈ রহ. (মৃত: ২০৪ হিজরী)
৫. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ (মৃত্যু ২৪১ হিজরী)

وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاودَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِيُّ وَالدَارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرَزِيْنُ وَأَجْمَلَ فِيْ ذِكْرِ غَيْرِهِمْ وَكَتَبْنَا اَحْوَالَهُمْ فِيْ كِتَابٍ مُفْرَدٍ مَسَمَّى بِالْاِكْمَالِ بِذِكْرِ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ وَمِنَ الله التَّوْفِيْقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ فِى الْمَبْدَءِ وَالْمَاٰلِ وَاَمَّا الْاِكْمَالُ فِىْ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكوة فَهُوَ مُلْحَقٌ فِيْ آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ

৬. ইমাম তিরমিযী রহ. (মৃত্যু ২৭৯ হিজরী)
৭. ইমাম আবু দাউদ রহ.(মৃত্যু ২৭৫ হিজরী)
৮. ইমাম নাসাঈ রহ. (মৃত্যু ৩০৩ হিজরী)
৯. ইমাম ইবনে মাজা রহ. (মৃত্যু ২৭৩)
১০. ইমাম দারেমী রহ. (মৃত্যু ৫৫ হিজরী)
১১. ইমাম দারা কুতনী রহ. (মৃত্যু ৩৮৫)
১২. ইমাম বাইহাক্বী রহ. (মৃত্যু ৪৫৮)
১৩. ইমাম রযীন রহ. (মৃত্যু ৫২৫ হিজরী)

অন্যান্যদের আলোচনা ত্যাগ করেছেন, আমি তাদের জীবনী আল ইকমাল বি যিকরী আসমা-ইর রিজাল নাম স্বতন্ত্র গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। আল্লাহর পক্ষ থেকেই সহায়তা, শুরু ও সমাপ্তিতে তিনিই আশ্রয়স্থল। আর মিশকাত প্রণেতা কতৃক রচিত আল ইকমাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবখানা অত্র কিতাবের (মিশকাতের) শেষে সংযোজিত।

প্রকাশের পথে লেখকের অন্যান্য সংকলন

১. الذهب والنحاس فى دفع قال بعض الناس
২. من ذاالذى لايفهم الترمذى
৩. সিয়াম সাধনা
৪. বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্বনবীর মেরাজ
৫. অফুরন্ত দৌলত মাতাপিতার খেদমত
৬. আক্রান্ত ইসলামী শিক্ষা
৭. সামাজিক বিশৃংখলায় গীবতের ভূমিকাঃ পরিত্রানের উপায়